পরিচয়

শ্রাবণ-পৌষ, ১৩৫২

ষাণ্মাসিক সূচী

পরিচয়

পঞ্চদশ বর্ষ ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

শ্রাবণ, ১৩৫২

আধুনিক রূপবিদ্যার একদিক

"ভবেৎ সৌন্দর্যমঙ্গানাং সন্নিবেশো যথোচিতম্"

—শ্রীরূপগোস্বামী

সাহিত্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, শিরা-উপশিরা, পেশী-স্নায়ু-গ্রন্থি সবই হ'ল ভাষা এবং ভাষার প্রয়োগ-কৌশল। ভাব ও ভাষা অভিন্নসত্তা। সাহিত্য ও শিল্পকলায় ভাবের কোন পৃথক সত্তা নেই। আমরা চিরদিন জানি ভাবের বাহন ভাষা, কিন্তু ভাষার বাহন ভাবও। ভাষার পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েই ভাবের পক্ষে মুক্তাকাশে বিচরণ সম্ভব, আবার ভাষার পক্ষেও তাই। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, সাহিত্যে ও শিল্পকলায় ভাষা ও ভঙ্গিটাই আসল। ভাষা ও ভঙ্গির সঙ্গে আরও একটি বিষয় আসে—যথোচিত ভাব-সন্নিবেশ। দেহের সৌন্দর্য ও লাবণ্য বৃদ্ধি যেমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যথোচিত সন্নিবেশের উপর নির্ভর করে, তেমনি যথোচিত ভাব-সন্নিবেশ, ঘটনা-গ্রন্থন এবং তদনুরূপ প্রকাশ-ভঙ্গির উপর সাহিত্য ও শিল্পকলার উৎকর্ষ নির্ভর করে। আধুনিক রূপবিদ্যার (Æsthetics) এটা একটা বিরাট দিক। এই রচনার বিচার্য বিষয় হ'ল এই যে, পুরাতন শিল্পশাস্ত্রের সঙ্গে আধুনিক রূপবিদ্যার এই বিষয়ে মৌলিক কোন পার্থক্য নাই। অর্থাৎ আধুনিক রূপবিদ্যার ডায়েলেকটিক্সের বীজ পুরাতন শিল্পশাস্ত্রের মধ্যেও ছিল, শুধু তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও দৃষ্টি ছিল না।

ঋগ্বেদের ঋক্‌গুলির মধ্যে যে সব কামনা-বাসনার রূপ দেখতে পাই, সেগুলি একেবারে সহজ, সরল, অকৃত্রিম, আদিম মানুষের নয়। আর্য-অনার্যদের সংঘর্ষ ও বিরোধের কথা অনেকবার অনেক ঋকের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে। তার সঙ্গে আছে সেই বৈদিক যুগের কৃষি ও পশু-পালন-প্রধান সমাজের জীবন যাত্রার শান্তি, কল্যাণ, ধন ও প্রাচুর্য কামনা। প্রায় এই নিয়েই ঋগ্বেদ। এর মধ্যে অবশ্য প্রকৃতির সরল, স্বোৎসারিত উপাসনাই কাব্য। যেখানে এই কাব্যের পরিচয় পাই সেখানে কল্পনার ঐশ্বর্যে, অনুভূতির সরলতায় ও গভীরতায়, প্রকাশ-ভঙ্গির মনোহারিতায় মনে হয়

সেই বৈদিক যুগের ঋক্ রচয়িতারা আমাদের এই আধুনিক যুগের অনেক কবি-প্রতিভাকেই ম্লান ক'রে দেবেন। কল্পনার উদারতায় ও সন্নিবেশে, মন্ত্রের বর্ণে ও ধ্বনি-সংযোগে এবং তার যথোচিত রূপায়ণে এমন অনেক ঋক্ আছে যা আজও কাব্য-বিচারে অতুলনীয়। শুধু "উষার" স্তুতির কথা বললেই যথেষ্ট হবে। উষার যে-রূপ বৈদিক ঋষিরা ধ্যান করেছিলেন, সেরূপ এত জীবন্ত, এত প্রাণস্পর্শী ও সর্বব্যাপী যে উষার ঋক্‌গুলি পাঠ বা আবৃত্তি করলে মনে হয় বাস্তবিকই কতকাল থেকে এই "গৃহকর্মকর্ত্রী গৃহিণী", "নীহারবর্ষী ক্ষণস্থায়িনী স্বর্গদুহিতা", "নিত্যযৌবন-সম্পন্না, শুভ্রবসনা আকাশদুহিতা", "মিষ্টভাষী, আলোকবিকশিতাঙ্গী, দীপ্তিমতী, আবক্ষঅনাবৃতা যুবতী উষার" উদয় হ'চ্ছে, কতকাল পর্যন্ত উদয় হবে। এ-কল্পনায় ফাঁকি নেই, কষ্ট নেই। চোখের সামনে উষার অনাবৃত যে-রূপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, এ হ'ল তারই ধ্যান মন্ত্র। গভীর অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা হ'ল এ-কল্পনার উৎস। এই অনুভূতির প্রকাশ হ'য়েছে গায়ত্রী, ত্রিষ্টুভ্, অনুষ্টুপ্ প্রভৃতি বৃত্তবদ্ধ রূপে। বৃত্তবদ্ধতাই এর আসল রূপ নয়। এর স্বর ও বর্ণ বা রঙ পর্যন্ত আছে। ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সাতরকম হ'ল ছন্দের স্বর। গায়ত্রী আদি ছন্দের বর্ণ শ্বেত, সারঙ্গ, পিশঙ্গ, কৃষ্ণ, নীল, লোহিত ও গৌর। ছন্দের বৃত্তবদ্ধ রূপ ছাড়াও স্বরগ্রাম ও বর্ণচ্ছটা আছে। ঋগ্বেদের ঋকে তো আছেই। সুতরাং ঋগ্বেদেও দেখতে পাই আমাদের ভাবপ্রকাশের ভাষা যখন আদি ভারতীয় আর্য বা বৈদিক ভাষা ছিল তখনও প্রকৃতি-কবি, গৃহী ও ঋষি হব্যদাতাদের ভাব-প্রকাশের কুশলতা ছিল কতখানি। প্রকাশভঙ্গিও তাঁদের সাধনা ও ধ্যান ছিল। তাই তো বেদাধ্যয়নকামীকে এই শান্তিমন্ত্র পাঠ ক'রে বেদাধ্যয়নে ব্রতী হ'তে হয়ঃ "ওঁ বাঙ্‌মে মনসি প্রতিষ্ঠাতা মনোমে বাচি প্রতিষ্ঠিতমাবিরাবীর্ম্মএধি", অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয় আমার মনে প্রতিষ্ঠিত হোক্, মন আমার বাগিন্দ্রিয়ে প্রতিষ্ঠিত হোক্।

প্রকাশ-ভঙ্গির কঠোর সাধনা আমাদের ভারতীয় শিল্পী ও কবিদের বৈশিষ্ট্য ছিল, এ-কথা বললে অনেকে নিশ্চয়ই বিস্মিত হবেন। চারিত্রিক ও সামাজিক অবনতির ফলে আমরা কঠোর সাধনাকে বর্জন ক'রেই কারয়িত্রী প্রতিভা ঐশী ও জন্মগত মনে ক'রে আত্মগৌরব বোধ করি। সেযুগের শিল্পীদের কিন্তু 'প্রতিভা' সম্বন্ধে এরকম আজগুবী ধারণা ছিল না। প্রতিভা, কাব্যশক্তি ও কলাসৃষ্টিশক্তিকে তাঁরা শ্রম ও অধ্যবসায়-সাপেক্ষ বলেই মনে করতেন। প্রতিভা দৈবিক বা মাতৃগর্ভজ, এ হ'ল জরাগ্রস্ত সমাজের অত্যুগ্র ব্যক্তিসর্বস্বতার অবদান। আমাদের ভারতবর্ষের মূর্তিশিল্পী ও প্রতিমাশিল্পীরা যোগসাধন করতেন মন অভিনিবিষ্ট করার জন্যে, বহুবিধ পার্শ্বচিন্তা ও আনুষঙ্গিক ভাবাবেগ অপসারিত ক'রে প্রধান ভাব ও ভাবমূর্তির প্রতি একাগ্রচিত্ত হওয়ার জন্যে। এইভাবে মনোনিবেশ ক'রে তাঁরা সেই দেবমূর্তি,

বিগ্রহ বা প্রতিমার একটি রূপ ধ্যান করতেন এবং সেই ধ্যানমূর্তিই ছিল তাঁদের "Model", যা থেকে পাথরে, রঙে বা অন্য কোনো উপাদানে তাঁরা তাঁকে রূপায়িত করতেন। আনন্দ কুমারস্বামী ব'লেছেন: "It will be observed that imagination (the power of having mental images) is here *deliberately exercised*...Similar conception of the operation of imagination are to be found already in Rg. Veda, where for example 'বাক্' is spoken of as 'seen' or 'heard', ideas are hewn out in the heart, and thought is formulated as a carpenter shapes wood." (A. Coomerswamy: Transformation of Nature in Art. p. 175.)

রীতি, ধ্বনি ও রস

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র অনুসন্ধান করলে এই মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়। 'রীতি' সাহিত্যের সর্বস্ব না হ'লেও সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। বিষয়বস্তুর পূর্ণোপলব্ধি ভিন্ন রীতির যোগ্য প্রয়োগ ও বিকাশ সম্ভব নয়। কঠোর রীতিসাধনা ভিন্ন রসসৃষ্টি ব্যর্থ হয়। রীতি, ধ্বনি ও রস পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হ'লেও, ধ্বনি ও রসের সত্তা সম্পূর্ণ "রীতির" উপর নির্ভরশীল, এবং বিশেষ রীতির বিকাশ বিশেষ উপলব্ধি, উপাদান আত্মীকরণ, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ ভিন্ন অসম্ভব। প্রথমে অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, বিষয়োপলব্ধি, বিষয় ও বিষয়ীর একাত্মীকরণ, তারপর বিবিধ কলার বিচিত্র রীতিতে তার সর্বাংগসুন্দর রূপগঠন এবং সর্বশেষে সেই রূপ ও সুসন্নিবেশিত অংগ-সংস্থান থেকে বিষয়ের পুনরোপলব্ধি, অর্থাৎ রসাস্বাদন।

অলংকার শাস্ত্রের আদিপর্বের কালনির্ণয় করা কঠিন। আমরা ভরতের **নাট্যশাস্ত্র** থেকেই আরম্ভ করতে পারি। 'বাচিকাভিনয়' আলোচনাপ্রসঙ্গে ভরত শব্দ, শব্দ-গঠন ও ভাষার দোষগুণ বিচার করেছেন। ভাষার 'গুণ' ভরতের মতে দশটি। (১) **শ্লেষ**: কবির ঈপ্সিত অর্থ শব্দের শ্লিষ্টতার (Coalescence) ভিতর দিয়ে যখন পরিস্ফুট হয়ে উঠবে তখনই তার শ্লেষগুণ থাকবে। (২) **প্রসাদ**: যে শব্দগুলি প্রযুক্ত হবে তার ভিতর দিয়ে অর্থটি পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠবে, তাকেই বলে প্রসাদগুণ। (৩) **সমতা**: চূর্ণপদের পরিমিত ব্যবহার দ্বারা অর্থ প্রকাশকেই বলে সমতা। (৪) **সমাধি**: বিশেষ ভাব বা অর্থ সন্নিবেশিত করা'হ'ল সমাধিগুণ। (৫) **মাধুর্য**: যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করলেও বিরক্তিবোধ হয় না, এমন যে শব্দের সুমিষ্টতা তাকেই মাধুর্যগুণ বলে। (৬) **ওজস্**: সমাসবদ্ধ, বিবিধ ও বিচিত্র

পদরচনাকে বলে ওজঃগুণ। (৭) **সৌকুমার্য :** সুখপ্রযোজ্য, সুশ্লিষ্ট শব্দ সমন্বয় থেকে যখন সুকুমার অর্থ প্রকাশ পায় তখন তাকে সৌকুমার্যগুণ বলে। (৮) **অর্থব্যক্তি :** শব্দের দ্বারা যখন অতি শীঘ্র অর্থ প্রতিপত্তি হয় তখন হয় অর্থব্যক্তি। (৯) **উদার** বা **উদাত্ত :** শৃঙ্গার ও অদ্ভুত ভাবের যে দিব্য প্রকাশ, 'চিত্রার্থ' ও 'সূক্ত' (সু+উক্ত) শব্দ প্রয়োগ দ্বারা যে সৌষ্ঠববৃদ্ধি তাকে উদার বা উদাত্তগুণ বলে। (১০) **কান্তি :** শব্দের 'লীলাদি' চেষ্টা বা লীলায়িত শব্দবন্ধ (Composition of words) যদি 'প্রসাদ-জনক' হয় তাহ'লে তাকে কান্তিগুণ বলে। এই হ'ল নাট্যশাস্ত্রোল্লিখিত ভাষার দশটি গুণ। দণ্ডী ও বামন এইসব গুণের বিস্তারিত বিশ্লেষণ ক'রেছেন এবং ভরতের মধ্যে যা অস্পষ্ট ও অপুষ্ট রয়েছে তা পরে তাঁদের আলোচনায় স্পষ্ট ও পুষ্ট হয়ে আলংকারিকদের রীতিবাদী সম্প্রদায়ের মতামতকে একটি বিশেষ রূপদানে সমর্থ হয়েছে। ধ্বনিবাদীদের পূর্বে রীতিবাদীদের কাব্য-বিচার ভরত থেকে আরম্ভ ক'রে দণ্ডী ও বামনে এসে পূর্ণতা লাভ ক'রেছে বলা চলে।

দণ্ডী তাঁর 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থে দুই প্রকার প্রায়-বিপরীত-ধর্মী রচনারীতির কথা উল্লেখ করেছেন। একটি **বৈদর্ভ মার্গ,** আর একটি **গৌড় মার্গ।** বৈদর্ভ মার্গের প্রতিই দণ্ডীর পক্ষপাতিত্ব স্পষ্ট, কারণ রচনার যে দশটি গুণ তা বৈদর্ভেরই বৈশিষ্ট্য। তাই ব'লে যে গৌড় মার্গের কোন 'গুণ' নেই এবং তার যা গুণ তা দোষ, এমন কথা দণ্ডী কোথাও জোর ক'রে বলেন নি। যেমন, শ্লেষগুণ সম্বন্ধে দণ্ডী বলেছেন, সর্ব-কোমল বর্ণের আধিক্য হেতু শৈথিল্যদোষ ঘটে এবং যে রচনায় এই শৈথিল্য নেই, বন্ধগৌরব আছে, তাকেই শ্লেষ বলে। এই বন্ধগৌরব বৈদর্ভী মার্গের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু গৌড়ীয় মার্গের নাও হ'তে পারে। অনুপ্রাস-প্রিয়তার জন্যে অল্প-প্রাণ বর্ণের আধিক্য গৌড়ীয় রচনায় থাকা আশ্চর্য নয়। গৌড়ীয় রচনার গুণ হ'ল জটিল শব্দ ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলা এবং অর্থ সহজবোধ্য না ক'রে দুর্বোধ্য করা। দণ্ডীর মতে অনুপ্রাস দু'রকম—**শ্রুত্যনুপ্রাস,** ও **বর্ণানুপ্রাস।** কণ্ঠ, দন্ত বা তালু যে কোন একস্থান থেকে এক-উচ্চারণের জন্যে বর্ণের যে শ্রুতিসাম্য ঘটে তাকেই বলে শ্রুত্যনুপ্রাস, আর একই শব্দের বা বর্ণের পুনরাবৃত্তিকে বলে বর্ণানুপ্রাস। বর্ণানুপ্রাস গৌড়ীয় রচনার বৈশিষ্ট্য, শ্রুতি-সাম্য বা শ্রুত্যনুপ্রাস বৈদর্ভী রচনার গুণ। অপার্থদোষ বা সমুদায়ার্থ-শূন্যতা, ব্যর্থদোষ, সংশয়দোষ প্রভৃতি যে সব দোষের কথা দণ্ড্যাচার্য উল্লেখ করেছেন, তা আবার পাত্র ও ক্ষেত্র বিশেষে গুণও হ'তে পারে এবং দেশ-কাল-কলা-ন্যায়-শ্রুতি বিষয়ক মারাত্মক দোষও 'কবিকৌশলাৎ' কদাচিৎ 'গুণ' হয়।

বামন যদিও দণ্ডী ও ভরতকেই অনুসরণ ক'রে অগ্রসর হ'য়েছেন, তাহ'লেও রীতিবাদীদের মতামত বামনের মধ্যেই অনেকটা পরিণতি লাভ ক'রেছে বলা চলে। বামনের মতে "রীতি" প্রধানত তিনটি, **বৈদর্ভী, গৌড়ী,** ও **পাঞ্চালী।** সর্বগুণ-

সম্পন্না, সুতরাং সর্বশ্রেষ্ঠ রীতি হ'ল বৈদর্ভী, গৌড়ী হ'ল ওজঃকান্তিমতী, পাঞ্চালী হ'ল মাধুর্য ও সৌকুমার্য গুণবিশিষ্ট। "রীতিরাত্মা কাব্যস্য"—রীতিই হ'ল কাব্যের আত্মা এবং 'বিশিষ্ট পদরচনাং রীতিঃ'। কাব্যের এই প্রস্থান বা রীতির ভেদ হয় কবি-প্রতিভার স্বভাবের ভিন্নত্ব হেতু।

ধ্বনিবাদীদের মধ্যে আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। রীতিবাদীদের দোষ দেখিয়ে ধ্বনিবাদীরা বললেন যে নিষ্কলঙ্ক অবয়বে ভূষণ যোগ করলেই সৌন্দর্য বাড়ে না, দেহেরও না, কাব্যেরও না। "নারীদেহের লাবণ্য যেমন অংগ সংস্থানের অতিরিক্ত অন্য জিনিস, তেমনি মহাকবিদের বাণীতে এমন বস্তু আছে যা শব্দ, অর্থ, বাচনভঙ্গি, এ-সবের অতিরিক্ত আরও কিছু।" এই অতিরিক্ত বস্তুই হ'ল কাব্যের আত্মা। শ্রেষ্ঠ কাব্য নিজের শব্দার্থে পরিসমাপ্ত না হয়ে বিষয়ান্তরের ব্যঞ্জনা করে। আলংকারিকেরা কাব্যের এই বাচ্যাতিরিক্ত রূপান্তরের ব্যঞ্জনার নাম দিয়েছেন 'ধ্বনি'। এই ব্যঞ্জিত অর্থের আলংকারিক পরিভাষা হ'ল "ব্যঙ্গ্য" অথবা "ব্যঙ্গ্যার্থ"। ধ্বনিবাদীদের মতে এই ব্যঙ্গ্যই কাব্যের আত্মা।

রীতিবাদ ও ধ্বনিবাদের মধ্যে গুণগত পার্থক্য কিছু আছে ব'লে মনে হয় না। রীতিবাদে রীতিবিচারের প্রাধান্যই বেশি, ধ্বনিবাদে ধ্বনির ও রসের। কিন্তু রীতিবাদীরাও রসকে একেবারে যে অস্বীকার করেননি তা দণ্ডাচার্য ও বামনাচার্যের রীতির গুণবিশ্লেষণের মধ্যেই দেখা যায়। আবার ধ্বনিবাদীরা কাব্যাঙ্গকে যথেষ্ট খাটো করলেও তাকে একেবারে কিছু-না ব'লে বাতিল করতে পারেননি। রীতিবাদ ও ধ্বনিবাদের যথোচিত সমন্বয়-সাধনেই আধুনিক অলংকারশাস্ত্র রচিত হতে পারে। আমাদের কথা হ'ল "রস" বা "ধ্বনি" ধোঁয়াটে কথা, তার বদলে আমরা বিষয় বা বিষয়ানুভূতি বলতে পারি। কবির বা শিল্পীর যে-কাব্য-বিষয় বা কলা-বিষয়, অর্থাৎ তাঁর যা বিষয়ানুভূতি তাকেই তিনি রূপ দিতে চান। তিনি যে বিষয়টি সমগ্র সত্তা দিয়ে সম্পূর্ণ উপলব্ধি ও অনুভব ক'রেছেন, যতদূর সম্ভব তারই অখণ্ড প্রতিমূর্তি তিনি পাঠক বা দর্শকের কাছে উপস্থিত করতে চান। এই উপস্থিত করার কাজটি কবির দিক থেকে আদৌ সহজসাধ্য নয়। খণ্ড খণ্ড, মনের চতুর্দিকে বিকীর্ণ ও বিক্ষিপ্ত অনুভূতি ও ঘটনাপুঞ্জ থেকে কবি একাগ্রচিত্তে, 'ধ্যানবলে' এমন সব ঘটনা, অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি নির্বাচন করবেন এবং তাদের পারম্পর্য এমনভাবে রক্ষা ক'রে গ্রথিত করবেন যে একমাত্র তার সহায়তায় তিনি তার খণ্ডচিত্রগুলিকে সর্বাধিক সমগ্রতা ও অখণ্ডতা দানে সমর্থ হবেন। যিনি যত বড় শক্তিশালী কবি ও শিল্পী তাঁর এই পারম্পর্য ও নির্বাচন তত বেশি সার্থক। একেই আধুনিক ভাষায় "montage" বলে এবং এই "মণ্টেজ" আধুনিক রূপবিদ্যার সব চেয়ে বড় কথা। রীতিবাদীদের "বিশিষ্ট পদরচনা," শব্দের শ্লিষ্টতা ও বন্ধগৌরব ভিন্ন ধ্বনিবাদীদের

ধ্বন্যালোকে পৌঁছানো একেবারেই সম্ভব নয়। রীত্যালোক পার হয়ে তবে ধ্বন্যালোক। রমণীদেহের লাবণ্য শুধু অঙ্গ-সংস্থান নয় ঠিকই, কিন্তু বিশিষ্ট অঙ্গ-সংস্থানের ফলেই 'লাবণ্য'-সৃষ্টি সম্ভব। লাবণ্য অঙ্গাতিরিক্ত হলেও অঙ্গকে জড়িয়েই তার অস্তিত্ব। 'রস' বাচ্যাতিরিক্ত হ'লেও বাচন-ভঙ্গি ও বাচ্যার্থকে নিয়েই রসসৃষ্টি সম্ভব।

বৈষ্ণব রূপবিদ্যা

সংস্কৃত আলংকারিকদের পর আমাদের দেশের বৈষ্ণব কবিদের কথা উল্লেখ না করলে রূপবিদ্যার আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কারণ অলংকারশাস্ত্রের চেয়ে বৈষ্ণবশাস্ত্রের অবদান রূপবিদ্যায় কোন অংশেই কম নয়। 'সাহিত্যদর্পণ', 'কাব্যালংকার', 'কাব্যাদর্শ', 'সরস্বতী কণ্ঠাভরণ', 'ধ্বন্যালোক' প্রভৃতি গ্রন্থের পাশা-পাশি 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'উজ্জ্বলনীলমণি' প্রভৃতি গ্রন্থের বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করা চলে। 'ভাব' সম্বন্ধে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' বলেন: "শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষরূপ, প্রেমরূপ সূর্যকিরণের সাদৃশ্যশালী এবং রুচিদ্বারা চিত্তস্নিগ্ধকারী পদার্থকে 'ভাব' বলে। ভাব অংকুরিত হ'লে ক্ষমা, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা প্রভৃতি অনুভাব প্রকাশ পায়। ভক্তিশাস্ত্রমতে মুখ্য ও গৌণ ভেদে রতি দুই প্রকার। রতির গাঢ়তাই ভক্তিরস বা প্রেম। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই পাঁচটি মুখ্য ভক্তিরস; আর হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র ভয়ানক ও বীভৎস এই সাতটি গৌণ ভক্তিরস। রতি আস্বাদনের হেতুকে "বিভাব" বলে। বিভাব সংখ্যায় দুই—আলম্বন বিভাব, উদ্দীপন বিভাব। যা অবলম্বন ক'রে কৃষ্ণরতি হৃদয়ে জাগে তাকেই আলম্বন বিভাব বলে। যা ভাব-উদ্দীপনে সহায়তা করে তাকে বলে উদ্দীপন বিভাব। "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে"ও অতি সংক্ষেপে এই রসতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে (মধ্যলীলা, ১৯ পরিচ্ছেদ)। রূপগোস্বামীর "উজ্জ্বলনীলমণিঃ" গ্রন্থে নানাবিধ ভাব, বিভাব ও অনুভাবের মনোরম বর্ণনা আছে, যা শৃংগার-রসাত্মক হ'লেও সৌন্দর্যে, লালিত্যে, মনোহারিত্বে ও ভাবমাধুর্যে অতুলনীয়। বৈষ্ণব সাধক কবির রূপচিন্তার কথা না বললে বৈষ্ণব রূপবিদ্যার বিশেষত্ব বোঝা যাবে না। শ্রীরাধাকৃষ্ণকে কিভাবে ধ্যান করতে হবে, কিভাবে সদাসর্বদা তাঁদের রূপচিন্তা করতে হবে, তারই উপায় বর্ণনা ক'রে শ্রীরূপগোস্বামী "শ্রীরূপচিন্তামণিঃ" নামে একখানি কাব্য-গ্রন্থিকা রচনা করেছিলেন। এই রূপচিন্তা ও রূপারাধনার যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা আধুনিক রূপবিদ্যার আলোচনা প্রসঙ্গে আমি বিশেষ-ভাবে অনুধাবনীয় মনে করি।

শ্রীরূপগোস্বামী বলছেন, প্রথমে শ্রীরাধিকার মন্দহাস্য স্মরণ করতে হবে। এই মন্দহাস্যেরও রূপ আছে। কি সেই রূপ? নীলবসনা কিশোরীর নীলাবগুণ্ঠনের

অন্তরাল থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে এসে যে মন্দহাস্য ভক্ত-হৃদয় তুষ্ট করে, এ সেই হাস্য। তারপর মাথার বেণী ও বক্রালক থেকে আরম্ভ ক'রে পায়ের নখ পর্যন্ত খণ্ড খণ্ড রূপের প্রত্যেকটি ধ্যাননিবিষ্টচিত্তে স্মরণ করতে হবে। বেণীপাকানো সুকুঞ্চিত কেশ, রুচির আকর চূড়ার মণিটি, দিব্য পত্র-পাশ্ব অলংকার, চূর্ণকুন্তল, ললাটোপরি তিলকপংক্তি, ভ্রূ ও নয়নযুগল, কুণ্ডলমণ্ডিত কর্ণদ্বয়, চক্রশলাকিকা ও গণ্ডতলের মকরীযুগল, গজমুক্তাসহ নাসিকা, রক্তওষ্ঠ, দন্তকান্তি, তিলসহ চিবুক, ত্রিরেখাসহ কম্বুতুল্য কণ্ঠ এবং সেই কণ্ঠের ক্রমলম্বমান হার, অনুচ্চ স্কন্ধদ্বয়, অঙ্গদ বা বাজুসহ হাত দু'খানি, কংকণ ও চুড়ি বেষ্টিত দুই হাতের দুই কফোণি, নখশোভাশ্রিত দশ অঙ্গুলী ও তার দশটি রত্নাঙ্গুরী, অরুণাভ কাঁচুলিসহ স্তনদ্বয়, ত্রিবলীসহ নাভি ও মধ্যদেশ, সুনীল বসনের নিচে উরুদ্বয়, জানুদ্বয় ও জঙ্ঘাদ্বয়, গুল্‌ফদ্বয় অর্থাৎ পায়ের গোড়ালি দুটি, তার সঙ্গে বলয়নূপুর-শোভাময়ী দশাঙ্গুরী, চন্দ্রের দর্পহারী দশটি নখ এবং তারপর পদতলের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন চিহ্নকে স্মরণ ক'রতে হবে। এতেও রূপচিন্তা সম্পূর্ণ হবে না। আবার বিলোমে বা বিপরীত দিক থেকে, অর্থাৎ পায়ের নখ থেকে আরম্ভ করে মাথার কেশ ও মন্দহাস্য পর্যন্ত রূপচিন্তা করতে হবে। তবেই শ্রীরাধার পূর্ণরূপটি উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

প্রত্যেক অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের এই রূপচিন্তা ও রূপ-সন্নিবেশ, এই খণ্ডরূপ বর্ণন থেকেই পূর্ণাবয়ব মূর্তিটি, অখণ্ড রূপটি রসোত্তীর্ণ হয়ে মানসপটে ভেসে ওঠে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপমাধুর্য ও রসাত্মক স্বরূপ উপলব্ধি করতে হ'লে যেমন তাঁদের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সন্নিবেশ ও বিশেষ সৌন্দর্য চিন্তা ও ধ্যান করতে হয়, সাধারণ ন্যাড়ানেড়ীদের মত বারকয়েক 'রাধাকৃষ্ণ' 'রাধাকৃষ্ণ' বললেই হয় না, তেমনি কলাসৃষ্টি করতে হ'লে তার আঙ্গিকের কঠোর সাধনা এবং উপাদানের পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপ-বিশ্লেষণ ও রূপচিন্তার আবশ্যক হয়। যথোচিত অঙ্গসন্নিবেশ ভিন্ন রূপসৃষ্টি সার্থক হয় না, অথবা সমগ্রতা লাভ করে না।

সাহিত্যের অঙ্গ-সংস্থান হ'ল ভাষা, শব্দ-বিন্যাস, উক্তি-বৈচিত্র্য, বাচনভঙ্গি এবং ভাব ও ভাষার সুসমঞ্জস সন্নিবেশ ও সমন্বয়। রবীন্দ্রনাথের একটি সাধারণ কবিতা এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করি:

"গোরুর গাড়ির সারি হাটের রাস্তায়,
রাশি রাশি ধুলো উড়ে যায়,
রাঙা রাগে
রৌদ্রে গেরুয়া রং লাগে
ওদিকে ধানের কল দিগন্তে কালিমাধূম্র হাত
ঊর্ধ্বে তুলি, কলঙ্কিত করিছে প্রভাত।

ধান পচানির গন্ধে
বাতাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
মিশাইছে বিষ।
থেকে থেকে রেলগাড়ি মাঠের ওপারে দেয় শিষ।
দুই প্রহরের ঘণ্টা বাজে।
সমস্ত এ ছন্দভাঙা অসংগতি মাঝে
সানাই লাগায় তার সারঙের তান।
কী নিবিড় ঐক্যমন্ত্র করিছে সে দান..."

(সানাই)

এই কবিতাটিতে পেলাম একটা নিখুঁত পরিপূর্ণ ছবি, আঁচড়ের পর আঁচড়ে যে ছবিটি সম্পূর্ণরূপে চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে। এই আঁচড় ক'টির পারম্পর্যই কিন্তু আসল এবং বিশেষভাবে উপলব্ধি করার বিষয়। খণ্ডরূপগুলি সাজাবার এই যে বিশেষ প্রণালী বা রীতি, একেই আধুনিক ফিল্ম টেকনিকের ভাষায় বলে "Montage"। এই 'মন্টেজ' সম্বন্ধে বিশ্ববিখ্যাত সোভিয়েট ফিল্ম পরিচালক আইজেনস্টাইন বলেছেন: "Actually, to achieve its result, a work of art directs all the refinement of its method to the *process*. A work of art, understood dynamically, is just this process of arranging images in the feelings and mind of the spectator." (S. M. Eisenstein : The Film Sense). ফিল্মের পরিচালক, অভিনেতা ও দর্শকদের সম্বন্ধে যা সত্য, চিত্রকর ও চিত্রদর্শক, কথাশিল্পী ও পাঠক, সকলের সম্বন্ধেও ঠিক তাই সত্য। আইজেনস্টাইন বলেছেন: "...this same dynamic principle lies at the base of all truly vital images, even in such an apparently immobile and static medium as, for example, painting." শ্রীরূপগোস্বামীর "ভবেৎ সৌন্দর্যমঙ্গানাং সন্নিবেশো যথোচিতম্" আর আইজেনস্টাইনের "মন্টেজের" মূলকথা একই। উপরের 'সানাই' কবিতাটিতেও খণ্ডরূপগুলি এমনভাবে গ্রথিত হয়েছে যে, সব মিলিয়ে হয়েছে একটি অখণ্ডরূপের মালা, যার মধ্যে আর 'ছন্দভাঙ্গা অসংগতি' নেই; সানাই তার সারঙে তান লাগাচ্ছে এবং আমাদের মনে হ'চ্ছে 'সমস্ত এ ছন্দভাঙা অসংগতি মাঝে···কী নিবিড় ঐক্যমন্ত্র করিছে সে দান···।"

সাহিত্যে শুধু এই ঘটনাবন্ধ নয়, তার সঙ্গে শব্দবন্ধও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আলংকারিকেরা যে নানাপ্রকার শব্দগুণের কথা উল্লেখ করেছেন তার প্রত্যেকটি অন্যদিক থেকে বিচার করলে অর্থগুণও বটে। শ্লেষ, প্রসাদ, সমাধি, মাধুর্য, সৌকুমার্য,

অর্থব্যক্তি, ওজস্ প্রভৃতি যেসব শব্দগুণের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি তার প্রত্যেকটি অর্থগুণেরই আর একদিক। শব্দ ও অর্থ অভেদাত্মা। শব্দ তখন ব্যাকরণের বন্দীশিবির থেকে মুক্ত হয়ে রসলোকে বিলীন হয়ে যায়। বোদ্‌লেয়র বলেন: "...the grammar, the arid grammar itself, becomes something like an evoked sorcery, the words are alive again in flesh and in blood, the substantive, in its substantial majesty, the adjective, a transparent vestment that clothes and colours it···and the verb, angel of movement." (Baudelaire, *Les Paradis Artificiels*. Trans. and Quoted by Arthur Symons.) ভাবের বিশিষ্টতা অনুযায়ী বিশেষ শব্দগুণের প্রয়োজন হয়, এবং ভাব, শব্দ ও অর্থ একাত্মা না হ'লে সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব হয় না। আরও বিস্তারিত বিশ্লেষণ করলে বলতে হয়, শব্দ শুধু ভাব-প্রতীক নয়, শব্দের একটা আক্ষরিক মূর্তিও আছে, রূপগোস্বামী যাকে "অক্ষর-মাধুরী" বলেছেন। আধুনিক কলাবিদ্‌রা বলেন, শব্দের এই অক্ষর-মাধুরী পর্যন্ত পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে প্রভাবিত করে এবং সাহিত্যের রসোপলব্ধিতে সহায়তা করে। রিচার্ডস্ বলেন: "The eye is depicted as reading a succession of printed words. As a result there follows a stream of reaction..." (I. A. Richards: Principles of Literary Criticism.)। অপ্‌টিক্ নার্ভ মস্তিষ্কে যে চিত্র পাঠায়, অডিটরি নার্ভ যে ধ্বনি ও স্বর পাঠায়, নার্ভের সেই সব চিত্র-বার্তা, স্বর-বার্তা ও অর্থ-বার্তা মস্তিষ্কের কোষগুলি থেকে বৈদ্যুতিক প্রবাহের বা তরঙ্গের সৃষ্টি করে। নার্ভের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় মস্তিষ্কে যে তাড়িৎ-তরংগের সৃষ্টি হয়, আধুনিক শারীরবিজ্ঞানীরা বলেন সেটা আধুনিক পদার্থ-বিদ্যার বিকীরণের (Radiation) সমধর্মী। আধুনিক পদার্থবিদ্যার মতে এই বিকীরণ একটি নিরবচ্ছিন্ন যান্ত্রিক প্রবাহ নয়, ঝলকে ঝলকে এর গতি সঞ্চারিত হয় এবং রূপান্তর ঘটে। সুতরাং দৃশ্য, ধ্বনি, শব্দার্থ প্রভৃতি যা কিছু নার্ভ মস্তিষ্কে বহন ক'রে নিয়ে যায়, মস্তিষ্ক সেগুলিকে নিয়ে জোড়াতালি দেয় না। মস্তিষ্ক সেগুলিকে একটি অখণ্ডরূপ দান করে। এই সব দৃশ্য, ধ্বনি, বাচ্যার্থ, ঘটনাবন্ধ প্রভৃতির গুণগত রূপান্তর ঘটে মস্তিষ্কে, যার ফলে আমাদের সাহিত্যের রসোপলব্ধি সম্ভব হয়। এইজন্যই শিল্পী ও কবি যা সৃষ্টি করেন, সমালোচক ও কলাবিদ্‌রা তাকে শুধু বিশ্লেষণ করেন না, পুনরায় সৃষ্টি করেন। এই পুনঃসৃষ্টিই হ'ল সমালোচকের ধর্ম এবং সেটা মৌলিক সৃষ্টি অপেক্ষা কোন অংশেই সহজসাধ্য নয়।

লেওনার্দো দ্য ভিঞ্চির পরিকল্পিত "The Deluge" চিত্রের খসড়া সম্পর্কে আইজেন্‌স্টাইন্ বলেছেন: "We must point, however, to the fact that

the description follows a quite *definite movement.* Moreover, the course of this movement is not in the least fortuitous. The movement follows a *definite order*, and then, in corresponding *reverse order*, returns to phenomena matching those of the opening." বর্ণনার একটি বিশিষ্ট গতি আছে এবং সেই গতিরও আবার একটি নির্দিষ্ট পরম্পরা বা ক্রম আছে। ঘটনা ও দৃশ্যের অনুলোম ও বিলোম গতির ক্রমায়াত ধারা বিষয়বস্তুর পূর্ণমূর্তি-চিত্রণে অনিবার্য হয়ে ওঠে। একেই আইজেন্‌স্টাইন্ "typical elements of a montage composition" বলেছেন। বামনাচার্য "সমাধি" গুণের "আরোহাবরোহক্রমাঃ", অর্থাৎ আরোহ ও অবরোহের ক্রম বলতে বোধ হয় এই অর্থই নির্দেশ ক'রেছেন। রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতাগুলির এই বৈশিষ্ট্যই প্রধান। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্য,—সাহিত্য ও শিল্পেরও প্রধান বৈশিষ্ট্য এই সমাধিগুণ। সংগীতের স্বরের যেমন আরোহ অবরোহ আছে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেরও উপাদান-সজ্জা, ঘটনা-গ্রন্থন ও খণ্ডদৃশ্য-বয়নেরও ঠিক তেমনি আরোহ অবরোহ আছে। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের শব্দ সমাবেশের মধ্যেও এই সমাধিগুণ দেখা যায়। বর্তমান যুগের চিত্রাভিনয় ও মঞ্চাভিনয় এই একই গুণসম্পন্ন। এইভাবে বিষয়ান্তর্গত ভাব ও অনুভূতিপুঞ্জকে শিল্পী সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত ক'রে তাঁর মূল ভাব-মূর্তিটিকে সর্বাধিক অখণ্ডতা ও সার্থকতা দান করতে সক্ষম হন এবং পাঠক ও দর্শককে ঘটনা, দৃশ্য, শব্দ ও চরিত্রের আরোহ অবরোহের ক্রমায়াত ধারার ভিতর দিয়ে তীব্রাবস্থায় নিয়ে যান, তারপর আবার তাদের সম্যাবস্থায় ফিরিয়ে আনেন। আধুনিক রূপবিদ্যার এইটাই মূল কথা এবং আধুনিক রূপবিদ্যা এখানে সংপূর্ণ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত। এই হ'ল আধুনিক রূপবিদ্যার বৈজ্ঞানিক ডায়েলেকৃটিক্‌সের মূল কথা। প্রাচীন রূপবিদ্যায় এই "ডায়েলেকৃটিক্‌স্" স্বীকৃত হলেও, বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর তা রচিত হয়নি। বর্তমান যুগের বিপ্লবী বিজ্ঞান আধুনিক রূপবিদ্যাকে এই বৈজ্ঞানিক ডায়েলেকৃটিক্‌সের ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

বিনয় ঘোষ

একটি সনেট

আমার দিগন্তে ওঠে নিষ্প্রভ পাণ্ডুর এক চাঁদ
বিগতযৌবন, কোনো অতীতের বন্ধুর মত।
পৃথিবীর হাটে পাতা হিংসার ক্ষুধিত যত ফাঁদ
অসহায় প্রবঞ্চিত জীবনেরে টানে অবিরত।
তবু, দেখি প্রবলের রথচক্র ডুবেছে মাটিতে
অন্তিম সমরে কর্ণ ভোলে যত পাশুপত-রীতি।
দর্পের চূড়ান্তে দেখি, বঞ্চিতের উদ্যত ঘাঁটিতে
ক্ষুভিত জনতা আনে প্রত্যাঘাতী বিপ্লবের নীতি।
লোলচর্ম্ম বৃদ্ধ মনে, তাই এ সান্ত্বনা
ধ্বংস-ভস্ম-স্তূপ হতে উঠে আসে প্রবল জীবন।
শীতের সেনারা হত তুষারের দুর্গদ্বার তলে।
বসন্তের জয়ধ্বজা দীপ্ত চৈত্রে আনে উন্মাদনা।

আবার নাম্‌বে সন্ধ্যা। নব-পূর্ণিমায় স্নাত প্রাণ
বলিষ্ঠ চাঁদে কি পাবে দুরন্ত প্রেমের আহ্বান॥

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

একটি কবিতা

[শস্‌টাকোভিচ্‌, রুশ সঙ্গীতকার, যুদ্ধের মহাসঙ্গীতের রচয়িতা। স্যাণ্ডবার্গ আমেরিকান কবি, লোক-কবিতার লেখক।

কার্ল স্যাণ্ডবার্গের জন্ম ১৮৭৮-এ যুক্তরাষ্ট্রে ইলিনয়ে। ১৩ বছর বয়সে কর্মজীবন আরম্ভ, পেশা দুধের গাড়ি চালানো, তারপর ড্রাইভারি থেকে রঙের মিস্ত্রীর কাজ পর্যন্ত নানা রকমের কাজ,—যতদিন না স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধ বাধে।

লড়াই-এর এক বন্ধুর কাছে পড়াশুনোর উৎসাহ পান। গ্রাজুয়েট হন অশেষ অধ্যবসায়ে ও পরিশ্রমে, তারপর সংবাদপত্র-সেবা।

কলেজে পড়ার সময়েই স্যাণ্ডবার্গ কবিতা লিখতে শুরু করেন। ১৯১৫-য় তাঁর প্রথম কবিতার বই মার্জিতরুচি শিল্পরসিকদের আতংকিত করে: শ্রমিক-জীবন, কড়া কথা, ঘরোয়া slang। আরো অনেক কাব্যগ্রন্থ তাঁর পর পর বার হয়। তাঁর প্রতিভার খরমধ্যাহ্নের

পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৩৬-এ লেখা কাব্যগ্রন্থে, যার নাম দি পিপ্‌ল্‌, ইয়েস,—জনগণ, আলবৎ।

আমেরিকার নিজস্ব চারণ কবি স্যাণ্ডবার্গ। অবিশ্বাস ও ব্যক্তিত্ববোধের দ্বন্দ্ব-বন্ধুর পথ পার হয়ে সাধারণ মানুষ সংহত শক্তির ধ্বজা তুলে দাঁড়িয়েছে তাঁর কাব্যে। তারই জয়গান তাঁর শক্ত লেখনীতে, সহজ ভাষায়, কখনো ছন্দে, কখনো মুক্ত আবেগে। মেরুদণ্ডহীন ভাবপ্রবণতার বিলাস তাঁর কাব্যে আমল পায়না। সবল সরল কাঠিন্য তাঁর আঙ্গিকে ও প্রকাশে। অনেক সময় তাঁর রচনা নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে—নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধেই সে নিষ্ঠুরতা। কিন্তু কারুণ্য, মমত্ববোধ ও সৌন্দর্যানুভূতি স্যাণ্ডবার্গের অন্তরের ফল্গুপ্রবাহ! আর জনসাধারণ,—ভ্রান্ত ও অবহেলিত, যারা আগামীকালের প্রদীপ্ত সম্ভাবনাকে সফল করছে আজকের প্রতি মুহূর্তের শক্তি সঞ্চয়ে, তাদেরই ভাষা, তাদেরই কল্পনা ও প্রেরণা তাঁর কাব্য ও গানের উপজীব্য।

এই কবিতাটি নেয়া তাঁর আধুনিকতম গ্রন্থ হোম ফ্রণ্ট্‌ মেমো থেকে।

সঙ্গীত শিল্পী

মার্ক্‌সীয় ধ্যানধারণার ব্যবহারিক প্রকাশ সংস্কৃতির কী অপূর্ব পরিবর্তন ঘটায় তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ সোভিয়েট সঙ্গীত। শিল্পই শিল্পের গতি, কৃষ্ণদর্শনের ফল কৃষ্ণদর্শন,—এই নীতি সবচেয়ে প্রবল সঙ্গীতের ক্ষেত্রে। শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের সংজ্ঞা বৈয়াকরণের বিশুদ্ধতম বিলাস, বিভিন্ন ধ্বনি-বিন্যাসের চূড়ান্ত চাতুর্যই তার মূল, এমন কি স্বাভাবিক অনুভূতি পরিতৃপ্তিরও ঊর্ধ্বে তার স্থান। সোভিয়েট সংস্কৃতি এই সঙ্গীতকে প্রতিষ্ঠা করেছে অগণিত জনগণের জীবন-নাট্যশালায়; সাধারণের চেতনার, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মানসিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের ও অভিব্যক্তির বাহন করেছে সঙ্গীতকে। ভাস্কর্য বা অংকন, সঙ্গীত বা সাহিত্য, কোনো শিল্পেরই সত্য মূল্য নেই,—মহত্তর বিশ্বপরিকল্পনার ও জনগণের মিলিত আত্মবিকাশের সঙ্গে তার যোগাযোগ যদি না থাকে—সোভিয়েট সংস্কৃতির মূলনীতি হল এই।

অন্যান্য শিল্পের চেয়ে অধিকতর ও গুরুতর সমস্যা দেখা দেয় সোভিয়েট সঙ্গীতের নবজীবনের পথে। এই পথের একনিষ্ঠ পথিক ডিমিট্রি শস্‌টাকোভিচ্‌, বর্তমান রাশিয়ার অন্যতম সার্থক সুরকার। তাঁর জন্ম ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে; স্যাণ্ডবার্গের চেয়ে বয়সে আটাশ বছরের ছোট। প্রথম সিম্ফনির প্রকাশ ১৯২৬-এ।

বিপ্লবের ঠিক পরেই অপরাপর শিল্পের মতো সঙ্গীতেও হাওয়া আসে প্রাক্তন সমাজ-ব্যবস্থা ও সংস্কৃতিতে সোজাসুজি তীব্র বিদ্রূপ করার,—সে বিদ্রূপাত্মক শিল্প সৃষ্টির নিজস্ব গরিমা কিছু থাক বা না থাক। এটা ছিল অত্যন্ত সহজ, স্বাভাবিক ও জনপ্রিয় মনোবৃত্তি। সোভিয়েট শিল্পের এই যুগে শস্‌টাকোভিচ্‌ যা রচনা করেন, যেমন The Lady Macbeth of Mtsensk নামে অপেরা, তার জন্যে তাঁকে তিরস্কার করেন স্টালিন নিজে। আপাত-মধুর রীতি পরিত্যাগ করে বহু ভুলভ্রান্তি ও অন্বেষণের মধ্যে দিয়ে সোভিয়েট শিল্প মহত্তর আদর্শের পথে চলেছে। পথ দেখিয়েছে সোভিয়েট রাষ্ট্র নিজে, এই বলে যে, শিল্পের বাস্তবতা

অসংখ্য রূপের মধ্যে প্রকাশ হতে পারে। এই বিচিত্র রূপ কেবলমাত্র চমকপ্রদ নূতনত্ব ও আঙ্গিকের অভিনবত্ব নয়,—এর মূল ভিত্তি হবে সত্য,—এর প্রকাশে যে নূতনত্ব থাকবে তা হবে মহত্বেরই নূতন আবেদন।

এই সত্য শস্টাকোভিচ্ বহু পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সঞ্চয় করে গেছেন আত্মবিকাশে। এই আত্মবিকাশের প্রধান পরিচয় তাঁর পঞ্চম সিম্ফনিতে। এখানে তিনি বলেছেন, আমার সৃষ্টির মূলে আছে মানুষ তার অনুভূতির পরিপূর্ণ বিকাশে; বেদনা ও যন্ত্রণা যেমন ভাবে জীবনের আশ্বাস ও আনন্দে গিয়ে পরিপূর্ণ হয়, আমার সঙ্গীতও তেমনি পরিপূর্ণতায় পরিসমাপ্তি লাভ করেছে।

বর্তমান যুদ্ধে শস্টাকোভিচ্ লেনিনগ্রাদে হোমগার্ড হন। তাঁর বিশেষ কাজ ছিল সে শহরের বোমারু আক্রমণের আগুন নেভানো। যুদ্ধের মধ্যে বসে তিনি তাঁর সপ্তম সিম্ফনি লেখেন, কিছুটা লেনিনগ্রাদে, বাকি মস্কো ও কুইবিশেফে।

ফাশিজ্ম্-এর বিরুদ্ধে এই তাঁর অমোঘ অস্ত্র। সমস্ত সোভিয়েট-যুদ্ধের একটি শ্রেষ্ঠ সুর মূর্তি লাভ করে তাঁর এই সপ্তম সিম্ফনিতে। এক দিকে শ্রেষ্ঠতম আদর্শবাদ, প্রেম আনন্দ ও সৃজনীশ্রম, অপরদিকে অর্থহীন ধ্বংস, যান্ত্রিক বর্বরতা ও অকরুণ মৃত্যু—এই দুই দুনিয়া, সভ্যতা-সংঘাত মূর্ত হয়েছে তাঁর এই মহৎ সঙ্গীতে।—অনুবাদক]

অনুবাদ

গত রবিবার বিকেলে।
আমেরিকার সমস্ত আকাশ জুড়ে
বাজে সপ্তম সিম্ফনি,—
লক্ষ লক্ষ লোক শোনে
শব্দে স্বরে সঙ্গীত রূপে উদ্ঘাটিত
যুদ্ধছায়াচ্ছন্ন তোমার, রুশিয়া।

মস্কোয় গত বছর
লিখে চলেছ তোমার স্বরলিপি।
লিখেছ বসন্ত-শেষে, নবীন গ্রীষ্মে,
লিখেছ যেদিন না ঝরাপাতার না তুষার পড়ার দিন।
ওদিকে নাৎসি বোমার উদ্যত আক্রমণ।
ছুটেছ পথে আগুন নেভাতে,
বিমানহানার আগুন,

আবার ঘরে ফিরে
সঙ্গীত সৃষ্টির সাধনা।
তাই যখন মস্কো বেতারে রুশিয়ার লাল খবর—
সে খবর প্রধান মন্ত্রী স্টালিনেব,
মার্শাল টিমেশেংকোর
আর শস্‌টাকোভিচের—
সঙ্গীতশিল্পী ডিমিট্রি শস্‌টাকোভিচ।

সুদীর্ঘ ফ্রণ্ট জুড়ে লড়ছে লালফৌজ,—
রাজধানী টলোমলো।
শত্রু হেনেছে এমন মারণাস্ত্র
ইতিহাসে যার নজির নেই।
কালো ইস্পাতের মৃত্যু-শকুন
হানা দেয় কর্কশ চীৎকারে,
বাতাস কাঁপে ধ্বংসের গর্জনে।
অসংখ্য মত্ত কালো হাতী,
স্থলে ওঠা জলচর কোন্ অতিকায়
গুঁড়ি মেরে ছুটে আসে।
প্রতিরোধ লালফৌজ।
তাদেরো ট্যাংক আর অ্যান্টি-এয়ার ক্র্যাফ্‌ট্‌,
টোটাভরা বন্দুক
আর পদাতিক,
মৃত্যু দিয়ে মৃত্যুর পুরস্কার।
যুদ্ধ দেখে সারা দুনিয়া
নিরুদ্ধ বিস্ময়ে,
বাটান বেতারে
মার্কিণ সেনাপতি ম্যাক্ আর্থাবের ঘোষণা—
বাঃ স্টালিন, বাঃ অপূর্ব, চমৎকার!

আর ডিমিট্রি শস্‌টাকোভিচ, তুমি
দিনে দিনে সৃজন করেছ সঙ্গীত
যার মূর্ছনায় সেই আবেগ আছে আঁকা,

জনগণের জলন্ত আবেগ,
নাৎসিভাষায় অসভ্য বর্বর,
তাদের সংহতি,—
শব্দে ছন্দে উদ্ভাসিত অপূর্ব জাতি,
যারা দেশরক্ষায় মৃত্যুপণ,—
যাদের শিল্পী রচে স্বর
বিস্ফোরণের সিংহাসনে বসে।

সঙ্গীতের সমাধি হয়েছে বার্লিনে,
আর প্যারিসে আর ব্রুসেল্‌সে,
আমস্টার্ডাম, কপেন হেগেন, অস্‌লো
প্রাগ আর ওয়ার্‌শতে,—
যেখানে নাৎসির হানা আর নাৎসি নববিধান,
সঙ্গীত কোথাও নেই।
আর জলন্ত মস্কোতে, ডিমিট্রি শল্‌টাকোভিচ,
বয়েস মাত্র ছত্রিশ,
পর পর ছুটির পর
সপ্তম সিম্ফনি রচনায় তুমি রত।
১৯৪২-এর নব বসন্ত ;
তুষারে নামল সূর্যরশ্মির বর্ষাফলক,
মাঠে মাঠে বরফ গেল গলে,
আর লাগল আগুন লাল রুশিয়ায় ;—
ইস্পাতের ঝন্‌ঝনি, রক্তের ফোয়ারা।
এরই মধ্য থেকে তোমার সঙ্গীত তুমি পাঠালে
মাইক্রোফিল্মে বন্দী করে টিনের বাক্সে এঁটে
সারা দুনিয়ায়।

মস্কো থেকে বুড়ো ইরাণ,
থুথুড়ে মিশর,
রাজধানী কায়রো।
সেখান থেকে সোজাপথ
আর কতো বাঁকাপথ ঘুরে
অবশেষে ন্যু ইয়র্ক্‌।

তাই আজ বেতারে
লক্ষ লক্ষ লোক শোনে তোমার বাণী,
ডি, শস্টাকোভিচ,
সপ্তম সিম্ফনি।

কী বার্তা এ আনল বহন করে
সপ্ত সমুদ্র পারে,
এড়িয়ে সাবমেরিণ, বোমারু প্লেন ?
কী এর অর্থ
কানে এসে বাজে,
আঘাত করে চেতনায় !

শ্যামলা ধরিত্রী,
সুবিস্তীর্ণ উপত্যকা,
মানুষের পরিশ্রম,—
শস্য, খাদ্য, জীবনের মূলধন।
শান্তি, শান্তি।
কোন্ শ্বেত পক্ষীর উধাও সঞ্চরণ,
দুটি ডানায় খুসি আর সুখ
তারি সন্ধানে
সমগ্র জাতি চলেছে গহন অরণ্য-পথে !

সহসা তার পরে
তূর্য নিনাদ আর বজ্রের গর্জন—
তীব্র থেকে তীব্রতর,
এবার শুরু যুদ্ধ
জাতির পরীক্ষা,
সমগ্র মানব সমাজের অগ্নিদীক্ষা।

তোমার সঙ্গীত বাজে
যুদ্ধের প্রচণ্ড নির্ঘোষে—
হত্যা করে, রক্ষা করে,
ঘোষণা করে দৃপ্ততেজে—
সহস্র মৃত্যুর চেয়ে ভীষণ

নাৎসি অধিকার—
সহস্র মৃত্যুব প্রান্তে
জীবনের প্রদীপ্ত আভাস।
তোমার বাণী
তার সঙ্গে মিশে যায়
জেনারাল ম্যাক্ আর্থারের বেতারবার্তা—
বাঃ স্টালিন, অপূর্ব, চমৎকার!

রাশিয়ার জনগণ,
সাম্প্রতিক পরাজয়,
মুহূর্তের পিছু হটা,
কিন্তু সর্বশেষে চরম জয়লাভ।
তারা জানে মূক স্তব্ধ আত্মদানের বেদনা,
জানে যুদ্ধ আমৃত্যু,
যুদ্ধ যেন গান।
রক্তাক্ত তুষার আর গলিত অঙ্গার
কিছু না কিছু না—
জন্মভূমি পবিত্র রুশিয়া—
তার কাছে কিছু না কিছু না।

মস্কো থেকে কায়রো থেকে মান্হাটান
টিনে আঁটা তোমার গান
আমরা শুনেছি,
রক্তের দ্রুতস্পন্দনে বলেছি
ধন্যবাদ, ডিমিট্রি শস্টাকোভিচ্‌
বলেছি, অভিনন্দন।
তোমার সঙ্গীত,
সেই অপূর্ব জনগণের মূর্ত বিকাশ,
যারা গান করে
পরাজয়ে,
গান করে বিজয়ে
যারা মূল্য দেবে যুগ-যুগান্তের
মানব মুক্তির, গণ-সংহতির॥

অভিযান

(চার)

মেয়েটি রূপবতী, সুন্দরী মেয়ে। সব চেয়ে সুন্দর তার গায়ের রঙ আর চুল। গায়ের রঙ তার যত ফরসা চুলের রঙ তত ঘন কালো। দুপুরের রৌদ্রে তার মুখখানি সিন্দুরের মত রাঙা হয়ে উঠছে, শুভ্র স্বচ্ছ ত্বকের নিচে রক্তোচ্ছাস যেন স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। রাঙা টকটকে মুখের মধ্যে চোখের পাতাগুলি এবং ভ্রূদুটিও ঘন কাল; ছোট কপালটিকে ঘিরে ঘন কাল রুক্ষ চুলের রাশি ফেঁপে-ফুলে রয়েছে, তাতেই মেয়েটিকে অপূর্ব্ব সুন্দর দেখাচ্ছে। তেমনি তাকে মানিয়েছে সাদা থান কাপড়ে; নিরাভরণ বৈধব্যেই যেন তাকে সবচেয়ে ভাল দেখায়। মেয়েটি অল্পেই উঠে বসল। উঠে গায়ের কাপড়-চোপড় সম্বৃত করে, মাথায় অল্প ঘোমটা টেনে দিয়ে নিতান্ত নিরাসক্তের মত বসে রইল। সঙ্গী প্রৌঢ়ের জন্য কোন আকুলতাই তার দেখা গেল না। সে উঠে বসতেই নরসিং প্রৌঢ়ের কাছে এল। নিতাই তার মুখে জল দিচ্ছিল। লোকটি মাটির উপর তখনও পড়েছিল। চোখ দিয়ে অনর্গল জল পড়ছে আর ক্রমাগত কাশছে লোকটি; নাকে মুখে চোখে তামাকের গুঁড়ো ঢুকেছে বেচারার। কালো, বেঁটে, মোটা লোক, কাপড় চোপড় পরার ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারা যায় এদেশী মানুষ নয়। নরসিং এক নজরেই চিনলে— লোকটি হয় ভকত-টকত অর্থাৎ মাড়োয়ারী নয় তো সাহু টাহু অর্থাৎ হিন্দুস্থানী বেনিয়া কেউ হবে; তামাকের ব্যবসা করে। লোক সে হরেক রকমের দেখেছে তার গাড়ীর কল্যাণে। নিতাইয়ের হাত থেকে জলের টিনটা নিয়ে বেশ খানিকটা জল দিয়ে তার মুখ ধুইয়ে দিয়ে বললে—উঠুন—উঠে বসুন।

লোকটি কোন সাড়াও দিলে না, তেমনি ভাবে পড়ে রইল। নরসিং আবার বললে, উঠুন। শুনছেন?

নিতাই বললে—ভুঁটে প্যাটে মার এক খোঁচা, এখুনি কোঁক করে কোলাব্যাঙের মতন লাফিয়ে উঠে বসবে। না হয় তো কাতুকুতু দাও। ন্যাকামী ক'রে পড়ে আছে বেটা!

রাম হি-হি করে হাসতে শুরু করে দিলে। মেয়েটি মুখে কাপড় দিয়ে ঘুরে বসল। নরসিং লোকটির হাত ধরে টেনে তুলে বেশ যত্ন করেই বসিয়ে দিলে, বললে—লাগে নাই তো বেশী, এমন করছেন কেন? উঠে বসুন।

উঠে বসেই লোকটি হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল।—অরে বাপরে বাপ, হামারা জান চলা গেয়ারে বাবা, মর গেইলো রে বাবা! হায় ভগোয়ান!

নরসিংয়ের ইচ্ছা হ'ল একটি চড় কষিয়ে দেয় লোকটির গালের উপর। এই দুপুর রৌদ্রে নিজের গাড়ী ফেলে লোকটার ন্যাকামী শোনা তার কাছে অসহ্য বোধ হচ্ছিল ক্রমশ। তবুও ভদ্রতা রক্ষার জন্যই সে চুপ করে রইল, হাজার হলেও গাড়ী উল্টে তামাকের বোঝা চাপা পড়ে খানিকটা চোট খেয়েছে লোকটা।

পরক্ষণেই কিন্তু লোকটা উঠে দাঁড়াল, গাড়োয়ানটার দিকে হাত বাড়িয়ে এক মুহূর্ত্তে কান্না থামিয়ে গর্জ্জন করে উঠল—হারামজাদে উল্লুকে বাচ্চে—তুম হারামজাদে হামারা জান মার দেতা। তারপর আর সাধারণ গালিগালাজে তার কুলিয়ে উঠল না, আরম্ভ করলে অশ্রাব্য অশ্লীল গালাগাল। তারপর আরম্ভ করলে শাসন; তেরা খাল উতার লেবে হামি, হাড্ডি তোড় দিবে; ফাটকমে ভেজবে হামি শালাকো।

তার পরই অকস্মাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল আরও উগ্র এবং উচ্চ কণ্ঠে—আরে হারামজাদী কুত্তি বে-সরমী কাঁহাকা তু' হাসছিস? কেনে হাসছিস? কাহে? কাহে? বলতে বলতে সে এগিয়ে গেল মেয়েটির দিকে।

মুহূর্ত্তে পাংশু হয়ে উঠল মেয়েটির মুখ—ত্রস্ত ভাবে সে পিছিয়ে গেল কয়েক পা। নরসিং আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না, খপ ক'রে সে পিছন থেকে লোকটিব হাত ধ'রে একটা ঝাঁকানি দিয়ে টেনে আটকে দিয়ে বলে উঠল—এই য়ো!

সে ঝাঁকানি এবং ধমক খেয়ে লোকটি চমকে উঠল—এর জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না; নরসিংয়ের মুখের দিকে সে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। নরসিং বললে, কি রকম লোক মশাই আপনি? এই একেবারে হাউমাউ ক'রে কেঁদে সারা, আর এই একেবারে গাড়োয়ানের ওপর বীর-বিক্রম, এই মেয়ে-লোককে মারতে ছুটছেন। আপনার মাথা-টাথা খারাপ না কি!

নিতাই বলে উঠল—পিঠের চামড়া তুলবার, হাড় ভাঙবার আর আইন নাই বুঝলেন! সে তুমি যে হবে সেই হও। রাজাই হও আর মহারাজাই হও! আর মেয়ে লোকের গায়ে হাত তুললে তোমাকেই যেতে হবে ফটকে! হ্যাঁ—

নরসিংয়ের রাগ খানিকটা বেড়ে গেল, অকারণে যেন বেড়ে গেল, সে অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বললে—গাড়োয়ান তোমাকে ইচ্ছে ক'রে ফেলে দেয় নাই। আর মেয়েটিই বা কি দোষ করলে তোমার কাছে?

রাম হি-হি করে হেসে উঠল, মেয়েটির সে মুখ ঘুরিয়ে হাসি সে দেখেছিল, বললে—পচা কুমড়োর মত ওই ভুঁড়ি নাচ দেখলে কেউ না হেসে থাকতে পারে? হাসির বেগ সামলাতে না-পেরে সে এবার বসে পড়ল।

নরসিং এবার তাকেও ধমক দিয়ে উঠল—রাম!

লোকটি এতক্ষণে কথা বললে। শান্ত ধীর অথচ গম্ভীর স্বরে বললে, হামারা হাঁত ছোড় দিজিয়ে। তার সে কথা বলার ভঙ্গিতে কণ্ঠস্বরে নরসিং আশ্চর্য্য হয়ে

গেল। কে বলবে যে, এই লোকটাই কয়েক মুহূর্ত্ত আগে সঙের মত হাত-পা ছুঁড়ে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত চীৎকার করছিল।

লোকটি আবার বললে, আপনি হামার জান বাঁচাইয়েছেন। আপনাকে সাথ হামি তকরার করবে না। লেকেন হাঁত ছোড়িয়ে দিন।

নরসিংয়ের হাত আলগা হয়ে গেল আপনা থেকে। লোকটি টেনে নিলে নিজের হাত।

লোকটি বললে—গাড়োয়ানের বাত শুনেন তো হামার পাশ। বিচার করেন তো। আঙুল বাড়িয়ে গাড়োয়ানটাকে দেখিয়ে সে বললে, উকে হামি বারণ করলাম দফে দফে, বারণ করলাম মাঠকে ভিতর মৎ যাও, গাড়ী খাড়া রাখো মোটর কে পিছে। মোটর চলা যায় গা তো গাড়ী চালাও। নেহি শুনা হামারা বাত। বোলা কি ধূলা হোগা। আওর উসকা এক বাত দেখেন তো, দেখেন তো। 'মাঠের ভিতর কেমন মজা করে যাব। দেখেন তো।' ফিন হাম মানা কিয়া। মর বাত নেহি শুনা। হট সে গাড়ী ঘুমা দিয়া মাঠকে উধার—গরু চর গিয়া নালাকে বাঁধপর। আপ হর্ণ দিয়া ডরকে মাবে গরু মার দিয়া লাফ! বাস উলট্ গিয়া গাড়ী। কথা শেষ করে সে নরসিংয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত্ত। তারপর বললে—আব আপ বোলিয়ে তো উসক কসুর হ্যায় কি নেহি?

নরসিং রাম নিতাই তিন জনকেই স্তব্ধ হয়ে থাকতে হ'ল এবার। গাড়োয়ানের অপরাধ এরপর স্বীকার না করে উপায় কি?

লোকটি এবার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হাসলে; তুচ্ছতায় ঘৃণায় সে হাসি মর্ম্মান্তিক। এবং সে হাসিও সাধারণ লোকে হাসতে পারে না। হেসে সে বললে—আউর ওই মেইয়া লোকটির বাত শুনবেন? উসকে হামি কিনে আনছি মশা। আড়াই শাও রূপেয়া দিয়া ওকরা বাপকে।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল তিনজনে।

লোকটি বললে—মাইয়া লোকটার পুকুর ঘাটসে পাকড়কে লিয়ে গিযেছিল, চার আদমী, দোঠো মুসলমান, এক আদমী বগ্‌দী, এক আদমী হাড়ি। কেস হুয়া। উ চার আদমীকে জেল হো গেয়া। লেকেন কেস মে বাপকে দেনা হো গেয়া। গাঁওমে পতিত হুয়া। হাম দিয়া আড়াই শও রূপেয়া উসকে বাপকো। উ বেটি কো দিয়া হামার সাথ—হামারা বাড়ীমে ঝিকে কাম করবে। আবার সে একটু থামলে, তারপর প্রশ্ন করলে, বোলিয়ে তো—ওকরা হাসনে কা একতিয়ার হ্যায়?

নরসিং অবাক হয়ে গেল। সে শুধু ফিরে তাকালে ওই মেয়েটির দিকে। মেয়েটি যেন পাথর হয়ে গিয়েছে। মাটির দিকে চেয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে, মাথার ঘোমটা কখন দুপুরের উতলা বাতাসে উড়ে খসে পড়েছে, কিন্তু সে বোধও তার নাই।

লোকটি আবার হাসলে। তারপর বললে—ই গাড়ী কিসকা হ্যায়? আপতো ডেরাইবর হ্যায়।

নরসিং এ-প্রশ্নে একটু সচেতন হয়ে উঠল এবং ওই প্রশ্নে একটু বিরক্তও হ'ল—গাড়ী কিসকা হ্যায়? সে গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলে—হাঁ ড্রাইভ আমি নিজেই করি। লেকেন গাড়ী হামারা হ্যায়।

নিতাই পরিষ্কার ক'রে দিলে কথাটা—ট্যাক্সী হ্যায়। সিংজীই মালিক হ্যায়, নিজেই ড্রাইভ করতা হ্যায়।

—ট্যাক্সী?

—হাঁ—হাঁ—ভাড়াকে মোটর গাড়ী।

হাসলে লোকটি—উ জানতা হ্যায় হাম। লেকেন ইধার কাঁহা জায়গা ট্যাক্সী?

নরসিং গম্ভীর ভাবেই বললে—বাড়ী যাতা হ্যায়, গিরবরজা গাঁও জানতা আপ?

—হাঁ হাঁ।

—ওহি হামারা গাঁও।

—হাঁ হামি শুনিয়েছি কি ছত্রি লোগের এক লেড়কা ইমামবাজারমে ট্যাক্সী কিয়া হ্যায়। হামার নাম আপ নেহি শুনা? শুখনরাম সাহু, শহর শ্যামপুরমে হামারা গদী। তামাকুল চাউলকে কারবার। গিরবরজামে হামারা তিন চার খরিদ্দার খাতক হ্যায়।

নামটা নরসিংয়ের পরিচিত, লোকটা মস্ত বড় ব্যবসাদার। কিন্তু ওই উদ্ধত ভঙ্গি নরসিংয়ের ভাল লাগল না। সে বললে—না। কই আপনার নাম আমি শুনি নাই কখনও। সঙ্গে সঙ্গে সে মোটরের দিকে অগ্রসর হ'ল। বললে—নিতাই জল দে রেডিয়েটারে। বেলা অনেক হয়ে গেল।

—আরে শুনো—শুনো—কি নাম তুমার?

নরসিং কথার উত্তর দিলে না। নিতাই কিন্তু ফিরে লোকটির দিকে না তাকিয়ে পারলে না।

শ্যামপুর পৌঁছা দেগা হামা লোগনকে?

হেসে নিতাই বললে—কত ভাড়া দেবেন?

—তুমলোগ বোলো—কেতনা লেগা।

আবার নরসিং বললে—লোকটাকে জব্দ করবার জন্যেই বললে—পঞ্চাশ টাকা।

—পচাশ? ভ্রূকুঞ্চিত করে লোকটি বললে—পনরো মাইল রাস্তা যানেকো লিয়ে পচাশ রুপেয়া?

নরসিং বললে—গাড়োয়ানটাকে পাশের গাঁয়ে পাঠিয়ে একখানা গরুর গাড়ী দেখ। নে-রে নিতাই মার হ্যাণ্ডেল।

—রোখো! পচাশ রূপেয়াই দেবে হামি। লোকটা অগ্রসর হয়ে এসে গাড়ীর দরজার হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়াল।

পঞ্চাশ টাকা! নিতাই নরসিংয়েব মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। নরসিং বললে—দে দরজা খুলে।

*　　*　　*　　*

লোকটা বিচিত্র লোক। গাড়ীতে উঠেই সিগারেট বার করলে। নরসিংকে দিয়ে বললে—লেও ভাইয়া।

নরসিং মাথা নেড়ে বললে—না থাক।

লোকটা পিছনের সিট থেকে উঠে নরসিংয়ের কাঁদে হাত দিযে বললে—কেয়া ভাই—হামার পরে গোসা করিয়েছে তুমহি? না—কেয়া? কি কসুর করলম ভাইয়া?

নিতাই বুঝেছিল ব্যাপারটা—সে বলে উঠল—কি আপনি তুমি তুমি করছেন বলুন তো? ট্যাক্সী চালাই বলে আমরা কি ছোটলোক না কি?

—আরে রাম-রাম-রাম! রাম কহো ভাইয়া! ইসকো লিয়ে গোসা কিয়া? আরে ভেইয়া বোলিয়ে তো—আপনা লোগসে হামারা কেতনা উমর বেশী হুয়া? আরে দেখিয়ে তো মাথা হামরা—একদম সব সাদা হোইয়ে গেলো। হামি দাদা—আপলোগ ভাই। বলে সে হা-হা করে হেসে উঠল।

নিতাই এবার হেসে ফেললে, বললে—তা যদি বলেন তবে কথা নাই।

রাম হি-হি করে হেসেই চলেছিল—সে নিতাইয়ের কানে কানে বললে—লোকটার কানের চুল দেখ মাইরী—যেন রাম ছাগলের দাড়ী! সে শুধু লক্ষ্য করছিল—লোকটার কোথায় কি হাস্যকর কুশ্রিতা আছে।

নরসিংয়ের পিঠে হাত দিয়ে শুখনরাম আবার বললে—লেও ভেইয়া—পিয়ো সিগরেট! এবার সে নরসিংয়ের মুখে গুঁজে দিলে সিগারেট।

সঙ্গে সঙ্গে নিতাই ক্ষেত্রটাকে লঘু করে তুললে বেশ একটি সরস রসিকতা ক'রে। বললে—দাদা নয—সাওজী আমাদের ঠাকুরদাদা! "ঠাকুরদাদা পেয়ারা খায়।" না কি সাওজী।

সাওজী খুশি হয়ে উঠল—বহুৎ আচ্ছা—পিয়ো তুমভি সিগারেট পিয়ো!

রাম হঠাৎ প্রচণ্ডবেগে হি হি ক'রে হেসে উঠল—বললে—ওই মেয়েলোকটি আমাদের ঠাকরুণ দিদি—না কি সাওজী।

নরসিংহ আপনার অজ্ঞাতসারেই বোধ করি পিছনের দিকে ফিরে দেখলে এবার, দেখলে ওই মেয়েটিকে। মেয়েটি কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

শ্যামনগর যেতে পথে পড়ে পাঁচমতী। এই পাঁচমতীর কায়স্থ বাড়ীতে এসে ঢুকেছিলেন—গির্‌বরজার মা-লক্ষ্মী। এখানকার কায়স্থরা এখনও সমস্ত দেশের

মধ্যে নামজাদা ধনী; বনিয়াদী জমিদার। বড় বড় পাকা তিন মহল চার মহল বাড়ী—উঁচু পাঁচীল ঘেরা বাগান পুকুর, সে রাজা-রাজড়ার মত কাণ্ডকারখানা। মূল বাড়ী থেকে চার বাড়ী হয়েছিল, চার বাড়ীর থেকে এখন আরও অনেক বাড়ী হয়েছে। এখানকার কায়স্থরা শুধু জমিদারই নয়—বড় বড় লেখাপড়া-জানা লোক সব। কয়েকজন জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েছে, ডেপুটি তো অনেক, কায়স্থবাড়ীর ছেলে যে ছোট কাজ করে সে সব-রেজিষ্ট্রর। উকীল ব্যারিষ্টারও অনেক। মা সরস্বতীর প্রসাদে কায়স্থরা মা লক্ষ্মীকে বেঁধে রেখেছে।

সেই কথাই তো বলতো—নরসিংয়ের দিদিমা। বলতো—ওই যে মানুষের মনের মধ্যে সাপের মাথার মাণিকের মত মতি, মানুষ মূর্খ হলে ওই মূর্খামী গোবরের মত মতিকে ঢাকা দেয়, চাপা দেয়। গোবরের তলায় চাপা-পড়া মাণিক হারিয়ে আগের যেমন সব অন্ধকার দেখে, মূর্খ হলে মূর্খামীর ময়লায় আচ্ছন্ন মতিতে মানুষও তেমনি তখন পৃথিবীতে পথ দেখতে পায় না।

লেখা-পড়া শিখবে বলেই নরসিং ঘর থেকে পালিয়ে মামার দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু নরসিংয়ের ভাগ্য। সে কি করবে?

চেষ্টার সে ত্রুটি করে নাই। মামার বাড়ীর ভাত খেতে তার নূনের দরকার হ'ত না, এক এক গ্রাস ভাত মুখে তুলত আর মামীর এক একটি কথার হুল এসে বিঁধত—তার ফলে চোখের জল গড়িয়ে মিশত গিয়ে ভাতের সঙ্গে। সেও সে সহ্য করেছিল। তবে তার মামা ধরণী রায় বড় ভাল লোক ছিল। সে ছিল ওখানকার ডাকবাঙলার রক্ষক। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড থেকে মাইনে পেত মাসে বারো টাকা। মামা তাকে ইমামবাজারের ইস্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিয়েছিল।

মামী জিজ্ঞাসা করেছিল—ভাগ্নেকে তো ভর্ত্তি করে দিয়ে আসা হ'ল—মাস মাস মাইনে কে জোগাবেন শুনি?

তখন সন্ধ্যাবেলা, মামার গাঁজার মৌতাত ধরে এসেছে, চোখ বন্ধ করে মামা ভুড়ুৎ-ভুড়ুৎ করে হুকোয় টান দিচ্ছিল। মামার কানে কথাটা গেলই না বোধ হয়।

মামী এসে মামার মুখের কাছে চীৎকার করে উঠল—কথা কানে যাচ্ছে না নাকি?

মামা চোখ খুলে বললে এবার—কি? চিল্লাছিস কেনে তু?

—চিল্লাস কেনে? সাধে চিল্লাই—বলি ভাগ্নের মাইনে কে দেবে?

মামা খুব গম্ভীর ভাবে কয়েক মুহূর্ত্ত মামীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। মামী বললে—তাকিয়ে আছে দেখ, যেন আমাকে ভস্ম ক'রে দেবে।

মামা উঠে দাঁড়াল। মামী সরে এল খানিকটা।

গোঁফে তা দিয়ে মামা বললে—হাম দেগা। আমি বাবু ধরণীধর রায়, আম্মার ভাগ্নে, আমি মাইনে দেব।

—বাবু ফরণী ফর রায়! বাবু! মাইনে মাসে বারো টাকা। বারো রুপেয়াকে বাবু।

মামা সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে গিয়ে মামীর ঘাড়ে ধরে বেশ ঘা কতক বসিয়ে দিলে। আমি বারো রুপেয়াকে বাবু? বারো রুপেয়াকে বাবু হায় হায়? তারপর তাকে ঠেলে ঘর থেকে বাইরে বার করে দিলে—নিকালো! নিকালো! আভি নিকালো!

দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল নরসিং; তার মনে হয়েছিল—সমস্ত অপরাধ তার। ছি-ছি-ছি! কেন সে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল। সমস্ত রাত্রি সে সেদিন কেঁদেছিল। মামী অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এসেছিল অন্য দরজা দিয়ে।

মাসের ত্রিশ দিনের মধ্যে বিশ দিন অন্তত এই ধরনের কিছু না কিছু ঘটত। এ ধরনের যা কিছু সে অবশ্য ঘটত সন্ধ্যার পরে। সকাল বেলাতেই মাথায় পাগড়ী বেঁধে লাঠি নিয়ে গোঁফে তা দিয়ে মামা বেরিয়ে যেত—ডাকবাংলার বারান্দায় বসে শনের দড়ি পাকাত—সামনের খোলা জায়গায় তার গরুগুলি ঘাস খেয়ে ঘুরে বেড়াত। এগারটায় মামা বাড়ী ফিরত। নরসিং তার আগেই ইস্কুল বেরিয়ে যেত। মামার অনুপস্থিতিতে মামী শোধ তুলত তার উপর। নরসিং আসবার পর থেকেই তার শরীর খারাপ হয়ে পড়ল। সকালে যথা নিয়মে উঠে কাজকর্ম্ম সারত আর নিজের অদৃষ্টকে গাল পাড়ত। এইতেই নরসিংয়ের সব চেয়ে বেশী ভয় হ'ত। আজও মামীর কথা মনে করতে গেলে তার ওই সকালের সেই ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত রূপই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে; সে আজও শিউরে ওঠে। মামী সকালে দরজা খুলে বেরিয়েই আরম্ভ করত—ঝাঁটা মারি, ঝাঁটা মারি নিজের অদেষ্টকে। মরণ হয় তো শরীর জুড়োয়, হাড়ে বাতাস লাগে। বিধেতা মুখপোড়ার দেখা পাই তো একবার জিজ্ঞেসা করি—তোর করণটা কি? সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দরজাটা খুলে ডাকত বাউড়ী ঝিটাকে—বলি ওলো ও হারামজাদী, ও-গতরখাকী! বলি আর আসবি কখন? তারপর পড়ত নরসিংয়ের উপর—আর তুমি তো বাবা নবাবজাদা, বাদশাহের ভাগ্নে, তোমাকে তো কিছু বলবার জো নাই আমার! পড় বাবা পড়, পড়ে হাকিম হবে—আমীর হবে—আঁটকুড়ো মামাকে পিণ্ডি দেবে—মামা বত্রিশটা দাঁত বার করে সোনার রথে চড়ে স্বর্গে যাবে।

বলে হন হন করে গিয়ে গরুগুলোকে বাইরে বার করত। ফেরবার পথে আবার বলত—দিব্যি দিয়ে রাখছি তোমাকে, আমাকে যেন পিণ্ডি দিয়ো না তুমি।

মামার গলার শব্দ শোনা যেত এই সময়, মামা ফিরত প্রাতকৃত্য সেরে। মামী আবার ঘুরে পড়ত মামার উপর। গাঁজার সরঞ্জাম, আয়না চিরুণী, কাপড় বার করে

দিত আর বলেই চলত এ পোড়া দেহ পাত হলেই বাঁচি, আমার খেয়ে সুখ নাই, ঘুমিয়ে শান্তি নাই, খেটে-খেটে আমার পরমায়ু কমে গেল। দেহের সুখ অসুখ নাই, মনের ভাল মন্দ নাই, বারমাস সেই বাঁদীগিরি।

মামা বলত থাক থাক, আমি নিজেই সব নিচ্ছি, তোমাকে কিছু করতে হবে না।

—না না না। এত 'ছেন্দায়' কাজ নাই।

—না। আমার কাজ তোমাকে করতে হবে না। আমার হাত-পা আছে। আমি অক্ষম নই।

—ভাল হবে না বলছি। আমি মাথা খুঁড়ব। বলতে বলতে মামী সব জিনিস-পত্র এনে নামিয়ে দিত। মামা জিনিসপত্রগুলোকে সরিয়ে দিয়ে বলত—নেই লেগা হাম। নেই লেগা। বলে জিনিসগুলিকে উঠিয়ে নিয়ে যেত—যেখানে ছিল সেই-খানে। মামী চীৎকার করত—যদি না নাও তো আমার মরা মুখ দেখ। তা' হ'লে মাথা খাও।

মামা আবার জিনিসগুলি নিয়ে এসে বসত যথাস্থানে।

মামা চলে গেলেই ঘরের দাওয়ায় আঁচল বিছিয়ে আবার একদফা শুয়ে পড়ত। কোনদিন মরা বাপের জন্য কাঁদত। কোনদিন নিজের মন্দ ভাগ্যের জন্য কাঁদত। কোনদিন নিজেই নিজের মাথা টিপত আর কাতরাতো।—ও বাবা, ও মা! তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই তার নাক ডাকতে শুরু হ'ত। ঘণ্টা দেড়েক ঘুমিয়ে মামী উঠে বসে কিছুক্ষণ হাই তুলত, আড়মোড়া ভাঙত, তারপর আরম্ভ করত ভাঁড়ার ও রান্নার কাজ। এর মধ্যেই বেজে যেত সাড়ে নটা দশটা।

সভয়ে নরসিং বলত—ইস্কুলের বেলা হল মামী।

মামী বলত—তার মামী কি করবে বাবা?

নরসিং একটু ভেবে বলত—চারটি মুড়ি দাও আমাকে।

মামী বলত—মুড়ি এখন দুদিন ভাজতে নাই, পান্তাভাত আছে খাও তো খাও।

পরদিন নরসিং পান্তা ভাতই চাইত, কিন্তু মামী বলত—পান্তা কটা যদি তোমাকেই দোব, তবে ঝিয়ের পাতে দোব কি আমি? মুড়ি দিচ্ছি, গেলো, গিলে যাও।

রাত্রে ভাত খেতো মামার সঙ্গে। তখন ইচ্ছে হ'ত রাক্ষসের মত খায় সে কিন্তু মামীর ভয়ে ভাত সে দ্বিতীয়বার চাইতে পারত না।

দেড় মাস। দেড় মাস সে মামার বাড়ীতে ছিল। দেড় মাসের মধ্যেই নিজেই বুঝতে পারলে সে অনেক দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। ইস্কুল দু-মাইল পথ, এই পথটা হাঁটতে সে দু তিনবার বসত—পথের ধারের গাছতলায়। দেড়মাস পর হঠাৎ সেদিন

কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বেধে গেল। মামা কেমন করে জেনে ফেলেছিল—নরসিংয়ের দিনে ভাত না-পাওয়ার কথা।

মামী স্পষ্ট বলে দিলে মুখের উপর,—আমি পারব না, পরের ছেলের জন্যে দশটায় ভাত রাঁধতে আমি পারব না।

মামী হঠাৎ ক্ষেপে উঠেছিল যেন। সে নরসিংকে বলে উঠল—মর—ম'রে আমার পেটে আয়—আমি তখন—

মামী কথা শেষ করতে পায় নাই। মামা চীৎকার ক'রে উঠেছিল জানোয়ারের মত। নরসিংও সে চীৎকারে আঁতকে উঠেছিল। মামী স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারপরই সে ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে খিল দিয়েছিল।

মামা কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে হঠাৎ উঠে নরসিংয়ের হাত ধরে বলেছিল—চল—আও হামারা সাথ।

টেনে—প্রায় টানতে টানতে নরসিংকে নিয়ে গিয়ে মামা উঠেছিল—ইমাম-বাজারের রাধাশ্যামবাবুর বাড়ী। বাবুদের কয়লার ব্যবসা আছে, ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের কণ্ট্রাক্টারী করে, জমিদারীও কিছু আছে, বাবুরা বড় লোক। শুধু বড় লোকই নয়, অন্নদানও করে বাবুরা। দু-তিনটি ছাত্র বাবুদের বাড়ীতে থেয়ে ইস্কুলে পড়ে। ধরণী রায় ডাকবাংলার অনেক দিনের কীপার; ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ওভারসিয়ার, ইঞ্জিনীয়ার তাকে ভালও বাসে এবং তাদের হুকুম নিয়ে অনেক দিন থেকেই কণ্ট্রাক্টার হিসেবে বাবুদের বাড়ীতেও যাওয়া-আসা করে, এই দাবীতে ধরণী রায় নরসিংকে নিয়ে এসে বাবুর সামনে নমস্কার ক'রে দাঁড়াল—এই আমার ভাগ্নে। ইস্কুলে পড়ছে। ওকে চারটি করে ভাত আপনাকে দিতে হবে।

নরসিং সবিস্ময়ে চারিদিক দেখছিল। গিবুরগঞ্জার বাইরে তার জীবনের পরিচয় খুব বেশী নয়, তবে পাঁচমতী বারকয়েক গিয়েছিল—পাঁচমতীর ধন ঐশ্বর্য্য জাঁকজমক সে দেখেছে; সে ধন ঐশ্বর্য্যের কাছে এ বাড়ীর ঐশ্বর্য্য কিছু নয়, তবুও ছোটখাটোর মধ্যে এর হাল্কা অথচ ঝরঝরে তকতকে ব্যবস্থা দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। পাঁচমতীর বাবুদের আস্তাবলে ঘোড়া আছে, পিলখানায় হাতি আছে, একটা লম্বা বারান্দায় পাল্কী ঝুলানো আছে, সহিস, মাহুত, বেহারা সর্দ্দার সে অনেক ব্যাপার। এখানে কাঠের তাকের উপর রাখা আছে চারখানা চকচকে দু-চাকার গাড়ী। দু-জন হাফপ্যাণ্ট পরা ছোকরা ন্যাকড়া দিয়ে আরও দু-খানা গাড়ী বারান্দায় পরিষ্কার করছে। হঠাৎ ভট্‌ভট্ শব্দ ক'রে একখানা জবরদস্ত দু-চাকার গাড়ী এসে দাঁড়াল। মোটা চাকা—অনেক কলকব্জা—পিছনের দিকে একটা নল থেকে ভক-ভক ক'রে ধোঁয়া উড়িয়ে চলে এল। গাড়ী থেকে নামল—একেবারে ফিটফাট সায়েবী পোশাক পরা—একজন অল্পবয়সী বাবু। নেমেই টুপীটা খুলে হাতে নিয়ে খট খট করে এসে ঘরে ঢুকল।

মামা ধরণী রায় খুব সম্ভ্রমভাবে নমস্কার ক'রে বললে—এই আমাদের মেজ হুজুর চলে এসেছেন। আর ভাবনা নাই।

বল কি রায়! আমার জন্যে কোন দুর্ভাবনায় তোমার ঘুম হচ্ছিল না! নাও একটা সিগারেট খাও। তারপর ধীরে সুস্থে শোনা যাবে তোমার দুর্ভাবনার কথা। বলে মেজবাবু একটা টিন খুলে একটা সিগারেট বার করে দিলে। মেজবাবুর কথার ধরনের মত কথার ধরন নরসিং এর আগে কখনও শোনে নাই। অদ্ভুত লাগছিল তার মেজবাবুকে। কিন্তু তার চেয়েও বেশী তার মনকে আকর্ষণ করছিল ওই কলকব্জা ওয়ালা দু-চাকার গাড়ীটা। ইচ্ছা হচ্ছিল ওটাকে সে একবার নেড়ে দেখে। একবার ছোঁয়। শুধু ছুঁয়ে দেখা।

মেজবাবুর সে মোটর সাইকেলটা তার জীবনে এমন রঙ ধরিয়েছিল যে, সে রঙ এখনও ফিকে হ'ল না। তার বড় ইচ্ছা ছিল—ঠিক মেজবাবুর মত চোখে একটা নীল চশমা এঁটে ঐ গাড়ীটাতে চেপে পায়ের চাপে সেই পা দানীর মত হ্যাণ্ডেলটাকে ধাক্কা দিয়ে গাড়ীটাকে ছেড়ে দেয়। উড়ে চলে গাড়ীটাতে চেপে। তার মনে হ'ত গাড়ীটা রাস্তার উপর দিয়ে চলে না—শূন্যলোক দিয়ে উড়ে যায়। রাস্তার বাঁকের মুখে প্রায় কাত হয়ে প্রায় মাটি ছুঁয়ে চলে যায় সকলের দৃষ্টির বাইরে। সে আর তার হ'ল না। কোথায় যে চলে গেল গাড়ীখানা, তার পাত্তা আর নরসিং পায় নাই। মেজবাবুর মৃত্যুর পর গাড়ীখানা কিনেছিল তার এক বন্ধু সার্কেল ডেপুটি। সে বদলী হয়ে চলে গেল। তারপরও খোঁজ করেছিল নরসিং—কিনবার জন্য অবশ্য নয় এমনি খোঁজ করেছিল ওই শখে—ওই মায়ায় খোঁজ করেছিল। জেনেছিল সার্কেল ডেপুটি গাড়ীখানাকে বিক্রী করেছে একজন আবগারীর সায়েবকে।

মেজবাবুর জিনিস—জিনিসটাকে রাখবার জন্য সবাই অনুরোধ করেছিল বড়বাবুকে। কিন্তু বড়বাবু সে লোকই নয়। হিসেব নিকেশ লাভ-লোকসান না দেখে বড়বাবু কিছু করে না। কিন্তু সব হিসেব বাঁকা। সহজ নিয়মে হিসেব বড়বাবু করে না।

মেজবাবুর ছিল দরাজ মেজাজ; মামা ধরণী রায়ের কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিয়ে দিলে—বেশ তো, এ আর এমন কি কথা। থাকবে তোমার ভাগ্নে। পড়ুক।

বড়বাবু চুরট টানছিল—এতক্ষণে বললে—তোমাদের ওভারসিয়ার বাবু কবে আসবেন হে? খরচ পত্র করে পাথর কুচিগুলো জমা করলাম, আর সেগুলো এক কথা—নেব না বলে দিলেন তিনি। ওভারসিয়ার বাবু এলে তুমি বলবে তাঁকে, বুঝলে!

তেরশো ছাব্বিশ সাল বাইশে ফাল্গুন—ওই দিনটা মনে আছে নরসিংয়ের; ইমাম বাজারে রাধাশ্যামবাবুর বাড়ীতে সে ঢুকেছিল।

*　　*　　*

নিতাই তাকে সজাগ ক'রে দিলে। সিংজী!

—হুঁ!

ধুলোর নিচে বেজায় 'গচকা'—আরও স্পীড কমিয়ে স্থান। তা ছাড়া—। আশে-পাশে সে তাকিয়ে দেখলে। দেখে বললে—মাঠ দিয়ে ভাঙুন বরং। গচকাও

বাঁচবে আর গাড়ীগুলাকেও 'পাস' করে যাওয়া হবে। শালা গাড়ীর 'রুহট' লেগে গিয়েছে রে বাবা!

গাড়ীর স্পীড কমানো সত্যই দরকার, পুরু ধুলোর নিচে কোথায় খানা-খন্দক আছে বুঝবার উপায় নাই। এ রাস্তায় উঠেই সেকথা নরসিংহের মনে হয়েছিল। কিন্তু অন্যমনস্কতার মধ্যে কখন কথাটা সে ভুলে গিয়েছে। তা' ছাড়া গাড়ীতে প্যাসেঞ্জার চড়লেই কেমন একটা জোরে যাবার তাগিদ আপনা থেকেই মনের মধ্যে এসে পড়ে। প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে বসলেই তার তাঁবেদারী করতে হয়, 'রোখো' বললেই রুখতে হবে, 'জলদি কর' বললেই স্পীড বাড়াতে হবে। তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিতে পারলেই খালাস—টাকাটাও পকেটে এসে যায়। ওই পাঁচমতীর কায়স্থ বাবুদের দালানগুলোর চিলেকোঠার মাথাগুলি দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, সেই অন্যমনস্কতাব মধ্যে কখন যে এই তাগিদটা তার হুঁশিয়ারী বোধকে ছাপিয়ে উঠেছে সে তাব খেয়াল ছিল না। গাড়ীটা বড় ঝাঁকানি খাচ্ছে, 'বডিটা' দুলছে, স্প্রিংযে মধ্যে মধ্যে শব্দ উঠছে। তা ছাডা সামনে চলেছে সারিবন্দী গরুর গাড়ী। সামনে আসছে আবার একটা নদীর ঘাট। এই ছোট গ্রাম্য বাস্তাটা ওই নদীর ঘাটে নবাবী আমলের পুরানো বড় শড়কের সঙ্গে মিশেছে। নদীব ঘাটটায় মস্ত একটা বাজার। বড় বড় গাছের ছায়ার তলায গরুর গাড়ীগুলি রেখে যাত্রীরা ওখানে খাওয়া দাওয়া করে।

নদীপার হয়ে একটা রাস্তা চলে গিয়েছে শ্যামনগর, শ্যামনগর থেকে শহব মুবশিদাবাদ। এপার থেকে রাস্তাটা চলে গিয়েছে মুরশিদাবাদ জেলা পার হয়ে বর্দ্ধমান। নরসিং যে রাস্তাটায় আসছে এটা আসছে বামনগরের ঘাট থেকে। মধ্যে মধ্যে আশ-পাশ থেকে দু-চারটে গ্রামের পথ এসে মিলেছে। সারি বন্দী মানুষ চলেছে, অধিকাংশই হাটুরের দল—কাঁধে ভার নিয়ে—মাথায় বোঝা নিয়ে চলেছে—পাঁচমতীর হাটে, সারিবন্দী গাড়ী চলেছে—কতকগাড়ীতে চলেছে মাল, কলাই, পেঁয়াজ, সরষে, আলু; দেশান্তরে নিয়ে চলেছে—বিক্রী করে ধান কিনে আনবে! কতক গাড়ীতে চলেছে যাত্রী। মামলা মকদ্দমার যাত্রীই বেশী, শ্যামপুর আদালত, মুরশিদাবাদ আদালত চলেছে সব। এ ছাড়াও যাত্রী আছে বই কি। মানুষের কাজের কি অন্ত আছে!

রাস্তাটার চেহারা হয়েছে অদ্ভুত। বিস্তীর্ণ মাঠের চারিদিক পরিষ্কার—শুধু মাঝখানে একটা ধুলার বিরাট কুণ্ডলী চলে গিয়েছে—রেলের ইঞ্জিনের পিছনের ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত।

নরসিং সজাগ হয়ে উঠল এবার।

তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে এবার যেন মানুষের রাজ্য এল। মানুষ চলছে, পায়ে পায়ে ধুলো উড়ছে, হোক গরুর গাড়ী—গাড়ী চলছে—গরুর খুরে—গাড়ীর চাকায় ধুলো উড়ছে—শুধু উড়ছে নয়—চলছে; উড়ে চলেছে—গাড়ীর টাপরে—চাকায়—গরুর খুরে—মানুষের গায়ে লেগে চলেছে, এখান থেকে ওখান।

নিতাই বললে—ডাইনে ওই দেখুন—ওই জায়গাটায় ধানের গাড়ী যাবার পথ ছিল—কাটা রয়েছে—পগার। ওইখানে—

—হুঁ।

পিছনে তাকিয়ে দেখলে নরসিং, সাহজী খুব গম্ভীর হয়ে বসে আছে। মেয়েটি কখন জেগেছে, সে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পথের ওই ধুলোর কুণ্ডলীর দিকে।

নরসিংয়ের হঠাৎ মনে হল—গাড়ীর চাকায় লেগে দু-এক টুকরো মাটি যেমন চলেছে এদেশ থেকে ওদেশ—মেয়েটিও চলেছে ঠিক তেমনি ভাবে।

নরসিং গাড়ীর মুখ ঘুরিয়ে দিলে; ক্লাচে পা দিয়ে স্টীয়ারিংয়ের গোল মাথাটা পাক দিয়ে ঘুরিয়ে দিলে, সামনের চাকা দুটো মোড় ফিরে—ধীরে ধীরে মাঠের ভিতরে এগিয়ে গেল। নিতাই ভাল ব'লেছিল—মাঠের পথ অনেক ভাল।

ক্রমশঃ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় সমাজপদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

[ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের লেখা "ভারতীয় সমাজপদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস" পরিচয়ে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। সেই লেখার "উপসংহারে"রও কতকাংশ প্রকাশিত হবার পর গত ১৩৫১-এর শ্রাবণ থেকে আমরা তার প্রকাশ বন্ধ রাখতে বাধ্য হই। সামান্য যা কাগজ পরিচয়ের তখন বরাদ্দ ছিল তাতে কোনো ধারাবাহিক লেখা ছাপা সম্ভব হয় নাই। এবার তাই ডাক্তার দত্তের লেখার অবশিষ্টাংশ আমরা ক্রমশ প্রকাশিত করছি। পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য পূর্বে আলোচিত অংশের সামান্য চুম্বক এখানে প্রদত্ত হল। সম্পাদক]

ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন দেশ, তাহার কৃষ্টিও অতি প্রাচীন। কয়েকবার ভারতীয় কৃষ্টির উত্থান ও পতন হয়েছে। শারীরিক নরতাত্ত্বিক হিসাব অনুসারে ভারতে নানা মূলজাতির নিদর্শন পাওয়া যায়। ভারতের কৃষ্টির আদিযুগ প্রাচীন প্রস্তরযুগ (Palaeolithic age) হতে ধরা যায়। প্রাচীনকালীয় এই সভ্যতার মূলের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হচ্ছে। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার সহিত বৈদিকযুগের সভ্যতার কোন সম্বন্ধ আছে কিনা, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

লেখক মনে করেন, শবদাহের যে প্রয়োগ অশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্রে প্রদত্ত হয়েছে, হারাপ্পায়ও সেইরূপ হাঁড়িতে পোরা অস্থি (urn) আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব বিষয়ে প্যান্-জার্মান রাজনীতিক কুসংস্কারের ছায়া ভারতীয় আলোচনায় এখনও চলে। আসলে "আর্য্য" একটা জাতিতাত্ত্বিক-কৃষ্টিগত-সমবায়-সঞ্জাত লোকসমষ্টি মাত্র। "দ্রাবিড়"ও একটা ভাষার নাম।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারত একই কৃষ্টির অধীন। কিন্তু ভারত আজ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে "আর্য্য" হয় নাই, 'হিন্দু' ও ভারতবাসীর অর্থও এক নয়। যে আর্য্যধর্ম্ম প্রসূত ধর্ম্ম ও তৎনীতিসঞ্জাত সামাজিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে সেই 'হিন্দু'। হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদি আজও বৈদিক ব্যবস্থার অনুশাসন বহন করিতেছে। হিন্দুর প্রাচীন অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত অন্য দেশীয় প্রাচীন ইণ্ডো-ইউরোপীয় জাতিদের আচারের কিঞ্চিৎ মিল ছিল। মূলতঃ হিন্দুর বর্ণবিভাগ বর্গগত (বা শ্রেণীগত) ছিল। হিন্দুর "আচার" "টটেম" প্রসূত, "তাবু" সঞ্জাত। অন্যান্য প্রাচীন জাতিদের মধ্যেও এইরূপ পবিত্রতা ও অপবিত্রতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা দেখা যায়। আসলে এইগুলিতে "শ্রেণী" লক্ষণই প্রকাশ পায়। বৌদ্ধরাও এই বর্ণ ও আচার বিচার বিষয়ে মুক্ত ছিল না। প্রত্যেক সামন্ততন্ত্রী সমাজে প্রথমত নিম্নবৃত্তি-গুলিই ঘৃণিত হয়, সেই সব পেশার লোকও ঘৃণ্য হয়। ভারতের সামন্ততান্ত্রিক সমাজেও তাহারই অভিব্যক্তি হয়েছে। ক্রমে বিভিন্ন শ্রেণী (guild) সমুদ্ভূত হয়। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি বন্ধ হলে জাতি (caste) বিভাগ সৃষ্টি করে। ইহার ফলে হিন্দুসমাজে জাতি বিভাগ (Vertical division) এবং শ্রেণী-বিভাগ (Horizontal division) দুইই প্রকাশিত হয়।

একথা স্মরণ রাখা একান্ত আবশ্যক যে ধর্ম্মের হিসাব দিয়া ইতিহাসের ব্যাখ্যার পশ্চাতে থাকে ইতিহাসের অর্থনীতিক ব্যাখ্যা (Economic Interpretation of History)। ধর্ম্মের প্রাচীর দ্বারা মানব নিজের সামাজিক পদমর্য্যাদা সংরক্ষণ করিতে চায়; ইহা আমরা বুঝি। কিন্তু সেই ধর্ম্মটি কি? উহা কি তথাকথিত আপ্তবাক্য নিঃসৃত ধর্ম্ম (Revealed Religion) বা তর্ক ও আলোচনা দ্বারা উপনীত সিদ্ধান্তের ধর্ম্ম (Rational Religion)? অথবা মানবের স্বাভাবিক অভিব্যক্তির সহিত বিজড়িত কৌমগত রীতি ও ধর্ম্ম বিশ্বাস [ইহাকেই কৌমগত ধর্ম্ম (Tribal Religion) বলা হয়]। পৃথিবীর সকল স্থানেই অভিজাত নিজের পদমর্য্যাদা সংরক্ষণের জন্য নানাবিধ 'তাবু' সৃষ্টি করিয়া নিজেকে তন্মধ্যে গণ্ডীভুক্ত করে। এইগুলি কৌমগত রীতির (mores) অন্তর্গত হয়। অবশ্য ইহাতে ইতিহাসের অর্থনীতিক ব্যাখ্যাই সমর্থিত হয়।° অভিজাত ও উচ্চশ্রেণীর লোকেরা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নানাবিধ বিধি-নিষেধ সৃষ্টি করে। অসভ্য ও বর্ব্বরা-বস্থায় এইগুলিকে কৌমগত রীতি বলা হয়। কিন্তু ইহার পশ্চাতে থাকে শোষণনীতি (exploitation); আর সভ্য সমাজে বনিয়াদী স্বার্থের তরফদার পুরোহিত-তন্ত্র এই সব নীতিকে প্রচলিত ধর্ম্মের নামে চালায়। ভারতেও তাহাই হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুর পুনর্জ্জন্মবাদ প্রত্যেক হিন্দুকে স্বীয় জাতিগত কর্ম্মে সুদৃঢ় থাকিতেই নির্দেশ দেয়। সত্য বটে, উত্তম কর্ম্ম দ্বারা সে পরকালে ভাল ও উর্দ্ধগতিপ্রাপ্ত হওয়ার বাসনা হৃদয়ে পোষণ করে। কিন্তু এই কর্ম্ম'র অর্থ—ওয়েবার যাহা বলিয়াছেন সেই রূপ বলিয়া মনে হয় না। পুনর্জ্জন্ম, কর্ম্মফল, প্রাক্তন, অদৃষ্ট প্রভৃতি মত দ্বারা লোকের

মনে সমাজ-বিপ্লব বা সংস্কার-প্রবৃত্তি অন্তর্হিত করা হইয়াছে। সাধারণ হিন্দুর মন এই 'কর্ম্মবাদে' জড়ত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার মন হইতে সংগ্রামেচ্ছা দমিত হইয়াছে।

সামন্ততান্ত্রিক পুঁজিবাদ এই সকল বিধানকে স্পষ্ট করিতে পারে নাই। ইতিহাসে দেখা যায়, ইউরোপীয় মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের পুঁজিবাদ এই প্রাচীন বিধানগুলিকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। মার্টিন লুথারের সময়ে তাঁহারই প্রচারের ফলে এখন দক্ষিণ জার্মানির কৃষকেরা বিদ্রোহ করিয়া জমিদারদের বিপক্ষতা করিতে থাকে, তখনই লুথার স্বয়ং ওয়েবারের বর্ণিত মত প্রচার করিতে থাকেন। বনিয়াদী স্বার্থের তরফদার রূপে তিনি তখন ফতোয়া দেন—"তাঁহাদের (কৃষকদের) মার, হত্যা কর, রক্ষা করিও না।" (৪)

আমরা দেখিয়াছি যে ভারতীয় সমাজ যতই বর্ত্তমান যুগের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে জাতিভেদের ব্যবস্থা ও নানা প্রকারের সামাজিক কড়াকড়ি, ছুৎমার্গ প্রভৃতি ততই বাড়িতে থাকে। এই ব্যাপারের বিশ্লেষণ করিলে ইহাই বলা যায় যে, ভারতের সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের পুঁজিবাদ এই সব বিধি-নিষেধকে বাড়াইতে থাকে, কারণ ইহার উদ্দেশ্য ছিল বনিয়াদী স্বার্থের সংরক্ষণ, আর সমাজ সংস্কার বা সমাজ-বিপ্লবকে অসম্ভব করা। এই কর্ম্মের সহায়ক ছিল সামন্তবর্গের তাঁবেদার পুরোহিততন্ত্র। তখন ভারতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মার্টিন লুথার আবির্ভূত হইয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্মো ভয়াবহ"। এই সঙ্গে, পুনর্জন্ম (বেদে অজ্ঞাত), প্রাক্তন, কর্ম্মফল প্রভৃতির মাহাত্ম্য তারস্বরে প্রচারিত হইতে লাগিল। এই পুরোহিত-তাঁবেদাররাই স্মৃতিকার, অবতার প্রভৃতি নামে সম্মান ও শ্রদ্ধার আসন পাইতে থাকেন। ফলে সামন্ত-পুঁজিবাদ এই সকল বিধি-নিষেধকে ধ্বংস না করিয়া আরও বাড়াইয়া তুলিল। ইহার ফলেই দিনকে দিন নানা প্রকারের জাতির সৃষ্টি হইতে থাকে, উহারা কেহ কাহারও সহিত আহারাদি করে না ও বিবাহ করে না। দেখা গেল, জাতিভেদের পশ্চাতে ইতিহাসের অর্থনীতিক কারণসমূহ ও শোষণ-নীতিই বিরাজ করে।

সংস্কৃত সাহিত্য হইতে এই সংবাদ পাওয়া যায় যে, গুপ্তযুগ ও তৎপরবর্ত্তী সময়ে উত্থিত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মগুলি 'তাবু'-সংশ্লিষ্ট নিষেধ বিধিগুলিকে ধর্ম্মের বিশিষ্ট অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। গুপ্তযুগে রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রাধান্য লাভ করে; তখনকার বৈষ্ণবধর্ম্ম—এই সকল 'তাবুকে' 'আচার' রূপে স্বীয় ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া লয়; এইরূপে ছুৎমার্গের প্রাধান্য বিশেষভাবে বাড়াইয়া তোলে। এই সময়ে যে সব ধর্ম্ম সম্প্রদায় উত্থিত হয় তাহাদের উপর সামন্ততন্ত্রের প্রভাব বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। সেই জন্যই 'তাবু' প্রসূত ছুৎমার্গের প্রভাবও সেই সব সম্প্রদায়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রাচীন 'বিষ্ণু পুরাণ' হইতে আরম্ভ করিয়া অর্ব্বাচীন 'হরিভক্তি বিলাস' পর্য্যন্ত গ্রন্থাদি তুলনামূলক রূপে পাঠ করিলে এই তথ্যেরই প্রমাণ লাভ করা যায়। এই 'ছুৎমার্গ'রূপ বিধি নিষেধ, হিন্দুর সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনের কর্ম্মধারা পরিবর্ত্তিত

(৪) Hayes—History of Modern Europe.

করিয়াছে। যেমন, প্রাচীন ভারতের একটি রীতি ছিল যে আহারের সময় খাদ্যাদি কাষ্ঠের জলচৌকির উপর রাখিয়া আহার করা হইত। এই প্রথা আজও পশ্চিম ভারতে প্রচলিত আছে। বশিষ্ঠ সংহিতা বলে "কোলে রাখিয়া ভোজন করিবে না; অধঃস্থাপিত পাত্রে ভোজন করিবে না" (১৪ অধ্যায়)। ইতিপূর্ব্বেই একথা বলা হইয়াছে যে বশিষ্ঠ সংহিতা গুপ্তযুগের বহু পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছিল। এই স্মৃতিতে উক্ত আছে, ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় অভ্যাগত হইলে তাহার জন্য মহাবৃষভ বা মহাছাগ পাক করিবে (৪র্থ অধ্যায়)। কিন্তু খোদিত লিপিতে দেখা যায় যে গুপ্তযুগে "গো-হত্যা" পাপ বলিয়া গণ্য হইত। আবার বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ আছে, "কাষ্ঠময় ত্রিপদাদির উপরিস্থিত পাত্রে...ভোজন করিবে না (৩।১১।৮০)।" চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের স্মৃতি হরিবিলাসগ্রন্থে ত্রিপাদে (tripod) খাদ্য রাখিয়া আহার করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ফলে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব ভারতে এই প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। মণিপুর ও আসামে অভিজাতদের মধ্যে উক্ত প্রথা আছে; তবে ওখানকার 'ত্রিপদ' ধাতু নির্ম্মিত হয়। এই অভিনব প্রথা প্রচলিত হওয়ার কারণ স্পর্শদোষ।

বৈষ্ণবধর্ম্ম সংক্রান্ত যাবতীয় প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকসমূহ হইতে সার সংগ্রহ করিয়া উপরোক্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব স্মৃতি লিখিত হইযাছে। ইহা পাঠে বেশ হৃদয়ঙ্গম হয় যে, প্রাচীন কৌমগত টটেমপ্রসূত বিশ্বাস ও বিধি নিষেধগুলি কি প্রকারে নব-বৈষ্ণব ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করা হইয়াছে। এইগুলিব বিশ্লেষণে 'তাবু' ও 'মানা' বিশ্বাসই অন্যরূপে বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়। উদাহরণ লওয়া যাউক। যেমন, প্রসাদ অতি পবিত্র দ্রব্য রূপে বর্ণিত হইয়াছে। গুরু বা ইষ্ট অথবা কোন বিগ্রহকে যে খাদ্য নিবেদন করা হয়, উহাকে 'প্রসাদ' বলা হয়। এই উৎসর্গীকৃত প্রসাদে দেবতার দেবত্ব সঞ্চারিত হয; ইহা গ্রহণে প্রসাদ গ্রহণকারী ব্যক্তির মধ্যে যে দেবতাব নামে নিবেদিত দ্রব্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল তাহার গুণ ও শক্তি সঞ্চারিত হয়। এই কারণেই লোকে জগন্নাথের কণিকা মাত্র প্রসাদ লাভে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। বৈষ্ণবেরা যেমন এই 'প্রসাদ তত্ত্ব' বিস্তারিত ভাবে বিবচিত করিয়াছেন, দক্ষিণের শৈবগণও তেমনি প্রসাদের মাহাত্ম্য বাড়াইয়াছে। কানাড়ী ভাষায় রচিত খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর যাদব বংশীয় দেবগিরির রাজা কল্লারের এক তাম্রলিপিতে (৫) উল্লিখিত আছে, শৈব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা সঙ্গমবাসব প্রসাদতত্ত্বে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। ইনি প্রসাদের একটি অর্থও প্রদান করেন। আসলে, এই প্রসাদতত্ত্বের পশ্চাতে পূর্ব্বোক্ত mystic mana বিশ্বাস অন্তর্নিহিত আছে। প্রাচীন ইহুদি ও মুসলমানের কোরবানীর মাংস ভক্ষণ, খৃষ্টানদের Encharist রূপে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও হিন্দুর প্রসাদের পশ্চাতে একই তত্ত্ব নিহিত (৬)। যখন দেবতা বা উচ্চ লোকের প্রসাদ গ্রহণে উহার গুণ গ্রহণকারীর মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তখন তদ্বিপরীত পক্ষে নিম্নশ্রেণীয় লোকের স্পৃষ্ট ভোজ্য উচ্চবর্ণেব লোকের পক্ষে হানিকর, সুতরাং শূদ্র

(৫) Epigraphic Indica—vol. xxı. No. 2. (৬) Roberstson—Religion of the shemetics

বা নিম্ন বর্ণের লোকের স্পৃষ্ট অন্ন উচ্চ বর্ণের লোকের পক্ষে বর্জ্জনীয় হইল। এই প্রকারের প্রাচীন কৌমগত খাদ্য ও স্পর্শ বিষয়ক 'তাবু'সমূহ ও 'মানা' বিশ্বাস ভারতের সামন্ততান্ত্রিক সমাজে শ্রেণীস্বার্থে প্রণোদিত ধর্ম্ম বিশ্বাস ও সামাজিক আচার রূপে হিন্দু সাধারণের গলায় জগদ্দল পাথরের ন্যায় ঝুলাইয়া দেওয়া হইল। বস্তুতঃ বৈষ্ণবেরা এই বিশ্বাস ও রীতিকে দার্শনিক তত্ত্বদ্বারা যে-প্রকারের ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়াছেন পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম্ম তদ্রূপ করিতে পারে নাই। এই প্রাচীন বিশ্বাসগুলি সামন্ততান্ত্রিক কটাহের ছাপ পাইয়া হিন্দুকে এমনভাবে চারিদিকে অক্টোপাসের ন্যায় ঘিরিয়া আছে যে, মনে হয় হিন্দু যেন কেবল কতকগুলি 'তাবু' প্রতিপালনের জন্যই জন্মিয়াছে!

হিন্দুধর্ম্মের বিবর্ত্তন

এই প্রসঙ্গে হিন্দুর ঐতিহাসিক যুগের ধর্ম্মের বিবর্ত্তনের ধারা লক্ষ্য করিবার বিষয়। পূর্ব্বেই এই বিষয়ে আলোচিত হইয়াছে যে ধর্ম্ম বিভিন্ন যুগের ছাপ বহন করে। ধর্ম্ম আজ জনৈক বাঙ্গলা সাহিত্যিকের ভাষায় "পুরুত ঠাকুর পাঁজি ও পদী পিসী"র বুলিতে আবদ্ধ হইয়াছে। অর্থাৎ ধর্ম্ম আজ বিস্মৃত অতীতে কৌমগত তুক্‌তাক্, হাঁচি-টিকটিকির বাধা, মানবের উপর ঝাড়ন-ফোড়ন, গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব, উচাটন প্রভৃতি বিশ্বাস ও কুসংস্কারের সহিত অভিন্ন হইয়া গিয়াছে। এই সব ছাড়াও বৈদিক জাতি প্রসূত ধর্ম্মের একটা ধারা আছে। এই ধারা যুগে যুগে নূতন কলেবর পরিগ্রহ করিয়াছে। বৈদিক যুগের পর একদিকে যেমন কপিলের নাস্তিক্য-বাদ, জৈন ও বৌদ্ধদের মতে বিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, অন্যদিকে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতনের পর সনাতন বর্ণাশ্রমের ও বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের পুনরুত্থান ঘটিতে লাগিল। কিন্তু ভারশিব হইতে গুপ্ত সম্রাটদের সময় মধ্যে যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনঃ প্রচার হয় তাহাতে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের স্থান ছিল না। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুত্থানকারিগণের পক্ষে বেদের পুনঃ প্রচলন করান তখন অসম্ভব হইয়াছিল। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড আর পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হয় নাই, যদ্যপি শাসকশ্রেণী তদ্বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। এই সময়ে নানা সম্প্রদায়ের উত্থান হয়, তন্মধ্যে অনেকগুলির নাম আজ সাহিত্যে ও লেখমালা মধ্যেই মাত্র পাওয়া যায়। এই যুগের পুরাণ সমূহে নানা ব্রত ও দেবদেবীর পূজার বিবরণাদি পাওয়া যায়। এই সমস্ত তান্ত্রিকযুগে বৈদিক ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতার স্থান অতি নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হয়। জাতক সমূহে যে সকল দেবতার নামোল্লেখ আছে, এই যুগের সাহিত্যে তাহারা অন্তর্হিত হইয়াছে। পুরাতন কুবের এখন অমর যক্ষপতি হইয়াছে, দেবতাদের একটা hierarchy-ও গঠিত হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্য হইতে নানা গল্প লইয়া পৌরাণিক কাহিনী সকল রচিত হইয়াছে এবং তাহা হইতে বিভিন্ন রাজা কর্ত্তৃক বিভিন্ন দেবতার পূজার সৃষ্টি হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালেও সেই ধারা চলিয়াছে, মুসলমান যুগেও তাহাই চলে। বাঙ্গলায় বর্ত্তমান দেবদেবীর পূজাদি বড় বড় হিন্দু জমিদারদের দ্বারা প্রচলিত হয় বলিয়া প্রবাদ আছে, তাহাও এই ক্ষেত্রে স্মরণীয়।

তান্ত্রিক ধর্ম্মের উদ্ভব

অতঃপর তান্ত্রিকযুগে শক্তি উপাসনা নানাভাবে প্রকট হয়। তান্ত্রিক ধর্ম্মের উদ্ভব সম্পর্কে নানা মত আছে। একদল বলেন, ইহা বৈদিক সাহিত্য নিঃসৃত। কেহ কেহ সিন্ধু-উপত্যকা-সভ্যতার মধ্যে ইহার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেন। হর্ষবর্দ্ধনের সময় হইতে তান্ত্রিক মতের ছাপ সংস্কৃত সাহিত্য বহন করে। এই তান্ত্রিক মত বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ উভয়েই পোষণ করিত। এই মতে নানা প্রকারের প্রক্রিয়া দ্বারা অলৌকিত ও অনৈসর্গিক কর্ম্ম করিয়া লোকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করা ধর্ম্মের একটা মস্ত বড় অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরা এই সঙ্গে আলকেমির চর্চ্চাও করিতেন। যাঁহারা আলকেমী দ্বারা নানা অলৌকিক কার্য্যাদি করিতেন বলিয়া দাবী করিতেন—বৌদ্ধ পুস্তকে তাহাদিগকে 'সিদ্ধ' বলা হইত। আর তাহাদের সঙ্গিনীদের 'ডাকিনী' নামে অভিহিত করা হইত। লামা তারানাথ বলিয়াছেন, ('মাণিকের খনি') * ভারতে কখনও সিদ্ধের অভাব হয় নাই; কিন্তু সম্রাট ধর্ম্মপালের সময় ঘন ঘন সিদ্ধদের আবির্ভাব হয়। ইহার অর্থ, মহাযানী পালরাজ বংশের রাজত্ব কালে বৌদ্ধধর্ম্ম একটা নূতন জীবনী-শক্তি পায়, আর ইহার "মন্ত্র যান" শাখা বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই তান্ত্রিকের দলই 'আলকেমী'র চর্চ্চা করেন। তারানাথ বলেন, সিদ্ধ নাগার্জ্জুন অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; ইহার মধ্যে পারা-সিদ্ধি, চক্ষুর ঔষধ প্রস্তুতকরণ সিদ্ধি, সোনালী রং করা (gold tincture) সিদ্ধি ছিল। এই প্রকারের পূর্ণ সিদ্ধেরা অবশেষে সশরীরে স্বর্গে আরোহণ করিতেন।

বৌদ্ধ পুস্তকসমূহ পাঠে জানা যায় যে, বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের সঙ্গে তীর্থিকদের বিবাদ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। তীর্থিকদের বৌদ্ধ-তান্ত্রিকেরা অধিক শক্তিশালী ম্যাজিক দ্বারা পরাস্ত করিত। এই সকল গল্প ও কাহিনী পাঠে বুঝা যায় যে, আদিম যুগের magic and incantation-এ (যাদু ও তন্ত্রমন্ত্রের তুক্‌তাক্) বিশ্বাস ইহারা লোক সমাজে পুনঃ প্রচলিত করিয়াছিলেন, এবং তৎসঙ্গে 'আলকেমী' যুক্ত করিয়া লোকদের বিমুগ্ধ করিতেন। ধর্ম্মের আকারে ইহা শোষণ-নীতির (exploitation) একটি অঙ্গরূপে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। বৌদ্ধদের দলে এই সঙ্গে সিদ্ধ ভিক্ষুদের অস্থি উপাসনা প্রভৃতি সংযোজিত হইয়া লোকের মস্তিষ্ককে বিকল করিয়া দিয়াছিল। যখন সিদ্ধ কিম্বা গুরু প্রভৃতির অলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা অসম্ভব সম্ভব হয়, অনৈসর্গিক বাগু সম্পন্ন হয়, তখন যুক্তি ও বিজ্ঞানের স্থান জগতে কোথায়? কাজেই সাধারণের মধ্যে স্বাধীন মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চিন্তাশক্তি বিলুপ্ত ও অন্তর্হিত হয়। বৌদ্ধেরা গুরুবাদে খুব বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁহাদের মতে গুরু ব্যতীত আর কাহাকেও মানিবার প্রয়োজন নাই (সরোরুহ পাদের দোঁহা দ্রষ্টব্য)। ইহার ফলে, লোক অন্ধ বিশ্বাসী হয়। এই প্রকারে সকল সম্প্রদায়েই নেতাদের শোষণ-নীতি অবাধগতি প্রাপ্ত হয়।

ক্রমশঃ

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

* B. N. Datta—Mystic Tales of Lama Taranatha

উপকূল

আরো এগিয়ে চলে ওরা। কোথা থেকে যেন পোড়াধানের ভ্যাপ্‌সা গন্ধ আসছে ভেসে, কেমন যেন সোঁদা সোঁদা গন্ধ। নদীর ওপারের আকাশটা লাল হ'য়ে উঠেছে। অনেক দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে ছাতের টিন আর বাড়ীর কাঠগুলো ফাটার অবিশ্রান্ত শব্দ। আরও একটা বস্তি জ্বালিয়ে দিয়েছে বোধ হয়; আরও একটা গ্রাম বুঝি নিশ্চিহ্ন হ'লো।

পিছিয়ে পড়েছিলো মা তান। ওর কাছে এ যেন একটা প্রকাণ্ড বিস্ময়। সাজানো গৃহস্থালী ছেড়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে আত্মগোপন, আর এই নৈশ-অভিযান অনির্দ্দেশের পথে।

—কি, দাঁড়িয়ে রইলে যে? বিরক্ত কণ্ঠে বলে উঠলো ঘোষ: মতলবটা কী তোমার, শুনি?

—দেখেছো কী লাল হ'য়ে উঠেছে ওদিকের আকাশটা আর কিসের যেন গন্ধ আস্‌ছে ভেসে!

—হ্যাঁ, দেখেছি বই কী! একটানা অবসাদ ঘোষের কণ্ঠে: তোমার জাতভাই-দের কাণ্ড। প্রকাণ্ড ধানের গুদামগুলোয় আগুন লাগাচ্ছে। জাপানীদের অভিনন্দন জানানো হ'চ্ছে। এদিকে মরুক দেশের লোক না খেতে পেয়ে। যত সব বেআক্কেলে কাণ্ড।

অভিভূত হ'য়ে পড়ে মা তান।

রূপকথার গল্পের মত শোনাচ্ছে যেন। যেন অনেকদূরের এক রাজপুত্র আসছে পক্ষী-রাজের পাখায় ভর ক'রে আর তারই জন্য বাতি জ্বালানো হয়েছে তোরণে তোরণে।

—সত্যি, ভারি মজা, না? মা তান মিঠে ক'রে বললো।

—হ্যাঁ, মজা আর নয়। যাকে ধরছে তাকেই কচুকাটা করছে। ওদের মতন অমন নৃশংস জাত আর আছে নাকি ছুনিয়ায়!

অনেকদূর থেকে আওয়াজ ভেসে আসে: ঘোষ, কি করছো তুমি এখনও ওখানে? প্রিয়ার সঙ্গে আলাপ করার প্রচুর অবসর পাবে পরে। এখনও অনেক মাইল হাঁটতে হবে, সে খেয়াল আছে?—গলাটা টমাসের। অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে ওদের দল।

মা তানকে তাড়া দিয়ে নিয়ে চলে ঘোষ।

অনেকখানি এগিয়ে এসেছে জাপ সৈন্য। বর্মীরাও হাত মিলিয়েছে তাদের সঙ্গে। বড়ো বড়ো বাঁশের ডগায় কাপড় বেঁধে মশাল তৈরী করেছে, ধূ ধূ ক'রে জ্বলছে আগুনের শিখা। গ্রাম আর শহর পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে সেই লেলিহান শিখায়।

কেন পালাচ্ছে ভারতীয়েরা এমন কুকুরের মতন? পলায়নপর ভারতীয়দের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায় তারা। দাঁড়ায় আর চীৎকার করে ওঠে: শুধু সুসময়ের ফসল লুটতেই বুঝি আসো তোমরা? আমাদের জমি আর জায়গা, আমাদের মা আর বোনদের উপভোগ করতে? আজ এই বিপদের সময় কুকুরের মত ল্যাজ গুটিয়ে বাড়ীর পথ ধরেছ বুঝি?

আমতা আমতা ক'রে উত্তর দেয় দু একজন। কেউ বা আর্তস্বরে কেঁদে ওঠে সভয়ে।

ফলে চক্‌চকে দাগুলো জ্বলে ওঠে মশালের আলোয় আর আগুনের শিখা এক চাল থেকে লাফিয়ে বেড়ায় অন্য চালে।

মা তান আর ঘোষ সদ্যবিবাহিত দম্পতি। সঙ্গে টমাস—ঘোষের বহুকালের বন্ধু, পেট্রোলের কারখানার মেকানিক্‌। বাকী দুজন বর্মী—একজন বৌদ্ধ পুরোহিত, মা তানের পরিবারের মঙ্গলকামী; আর একজন তারই অনুচর।

জন পাঁচেক মিলে ছোট্ট একটা দল। এই রকম অসংখ্য ছোট ছোট দলের সৃষ্টি হয়েছে রেঙ্গুন থেকে আরাকানের পথে পথে।

নানা জাত আর অসম বয়সের বিভিন্ন লোকের সমাহার।

অনেক ঘোরাঘুরির পর অবশেষে আশ্রয় মিললো তাদের—শান স্টেটের অখ্যাত এক পল্লীতে।

যুদ্ধের ছায়া এখনও নিবিড় হ'য়ে ওঠে নি এদিকে। ছোট ছোট পাহাড়ের কোল জুড়ে শানদের কাঠের বাংলোগুলো। চেয়ে চেয়ে ভারী ভালো লাগে ঘোষের—কেমন যেন আশ্বাস পায় ও এই শান্ত পরিবেশে।

—দেখেছো মা তান! তরল কণ্ঠে চীৎকার ক'রে ওঠে ঘোষ: কী সুন্দর ওই নীলরংয়ের পাখীটা! লাল টুকটুকে ঠোঁট দিয়ে কি যেন ঠোক্‌রাচ্ছে, না?

একটা ভাঙা প্যাকিং কেসের ওপরে ব'সে ব'সে জ্যামের টিন খুলছিল টমাস।

—ঠিক আছে ঘোষ। সে উৎসাহিত করে ওদের: এই তো চাই। ঘুরিয়ে নিয়ে এসো না তোমার সাথীকে আশেপাশের পাহাড়তলীতে নীলপাখী আর লালপাখী দেখিয়ে।

কথাটা মনে লাগে ঘোষের।

—যাবে না কি মা তান? চলো না ঘুরে আসি একটু: ঘোষ অনুনয় করে।

কিন্তু এ সব ভালো লাগে না মা তানের। ঘোষের এই কাঙালপনা আর টমাসের বাঁকা হাসি। অনেক দূরে যেন অশ্রান্ত গর্জ্জন ও শুনতে পায়। অসংখ্য পদাতিক আর অশ্বারোহী সেনায় ছেয়ে গেছে মাঠ, ঘাট আর শহরের পথ। ওর জাতভাইরা এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করছে তাদের। মশালের আলোয় রাঙা হয়ে উঠেছে সারা আকাশ, আর সেই আলোর ছোঁয়ায় ঝক্‌ঝক্‌ ক'রে জ্বলছে রাজপুত্রের মাথার

মণিটা। নতুন এক জীবন গ'ড়ে উঠছে এই সংঘাতে। প্রচুর আলো আর বাতাস আর উন্মুক্ত জীবন—ভাবতেও ভারী ভালো লাগে মা তানের। কেন ওরা পালিয়ে এলো এত দূরে—নিষ্প্রাণ আর নিশ্চেতন এই অখ্যাত পল্লীতে ?

—কি ভাবছো মা তান ? কাছে এসে দাঁড়ায় ঘোষ, বাড়ীর কথা বুঝি ?

হেসে ওঠে মা তান, বাড়ীর কথা ! অনেক আত্মীয়-স্বজন বুঝি আছে সেখানে। বাপ মা আর অগুন্‌তি ভাইবোন। মা তান হাসে আর একটু পরেই কেমন যেন বেদনার ছায়া নামে ওর কচি মুখে। চোখের কোণে টলমল ক'রে ওঠে জলের বিন্দু।

অনেক কথা মনে পড়ে যায় ঘোষের ঃ

প্যাগোডার সিঁড়ির ধাপে ফুল আর মোমবাতি নিয়ে বসতো একটি মেয়ে। ফুলেরই মতন সুন্দর আর মোমের মতন কোমল। কী যাদু যেন মাখানো ছিল তার চোখ দুটিতে। যতবারই গিয়েছে ঘোষ—কী এক দুর্বার শক্তি যেন ওকে টেনে নিয়ে গেছে প্রতিবার মেয়েটির কাছে। পায়ের জুতোটা তার জিম্মায় খুলে রেখে প্রচুর ফুল আর মোমবাতি কিনেছে ঘোষ প্রত্যেকবারে—প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত। কেমন যেন মায়া পড়ে গিয়েছিলো তার। আত্মীয়স্বজনহীন বিদেশে কেমন যেন আশ্রয়ের ভাষা ছিলো মেয়েটির নিকষ কাজল দুটি চোখে।

ধরা দিলো ঘোষ। মা তানেরও আপনার বলতে কেউই ছিল না। কোনো-দিক থেকেই সম্ভাবনা ছিল না সামান্য বাধার।

মা তান হ'লো মিসেস্ ঘোষ।

কিন্তু মাঝে মাঝে কেমন যেন মনে হয় ঘোষের, সুখী হয়েছে কি মা তান ? নূতন জীবনের মধুর আস্বাদে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠেছে কি ওর দেহ—যেমন অপূর্ব্ব শিহরণ জেগেছে ঘোষের সারা দেহে আর মনে ?

কয়েকদিনের মাত্র নিরুপদ্রব আর নিঃশঙ্ক জীবন। তারপর হঠাৎ একদিন ঘন কালো মেঘে আচ্ছন্ন হ'য়ে উঠল ওদের আকাশ। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়োজাহাজ নূতন বার্ত্তা নিয়ে এলো শহরের বুকে। অনেক প্রাণ ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেল আর অগোছাল হ'য়ে গেল অসংখ্য সংসার। ভারী বুটের শব্দ এগিয়ে আসতে লাগল দিনের পর দিন।

অবশেষে একরাতের অন্ধকারে শহর ছাড়ল ঘোষ—মা তানকে সঙ্গে নিয়ে।

সারা বর্মার ম্যাপে অনুসন্ধানী চোখ বুলিয়েও যে গ্রামের নাম কোনদিন খুঁজে পায় নি ঘোষ, আজ সেই গ্রামেই ঘরসংসার পেতে বসলো সে। শান্ত আর নিঝুম এই গ্রাম,—খুব ভালো লাগে ঘোষের।

মাঝে মাঝে অবশ্য কেমন যেন গোলমেলে কথা বলে বৌদ্ধ পুরোহিতটা। ভারী ভয় হয় ওর। ভবিষ্যত বলতে পারে নাকি লোকটা ?

চোখ দুটো কেমন যেন জ্বলে ওঠে তার আর থমথমে গলার আওয়াজঃ ওরা এদিকেও আসবে। সারা বর্মা অধিকার করবে ওরা, তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যাবে ঘোষ সাহেবের দেশের দিকে।

চম্‌কে ওঠে ঘোষ। বলে কি লোকটা? ইংরেজদের হটাতে হটাতে সাগর পার ক'রে দেবে নাকি এরা? দূর। তাও না কী হয় কখনও!

বিরাট অস্বস্তি একটা ঝেড়ে ফেলছে এমনি একটা মুখের ভাব করে ঘোষ, বাছাদের টের এইবার পাওয়াবে। আচমকা আক্রমণ ক'রে অনেকখানিই এগিয়ে এসেছে। এবার বাড়ীর পথেই ফিরতে হবে সবাইকে। অত সহজে উপনিবেশ হাতছাড়া করে না ইংরেজ।—বল্‌তে বল্‌তে কেমন যেন একটা শান্তি পায় ঘোষঃ আহা, জিতুক ইংরেজ। অমন আরামের চাকরি আর শান্ত জীবন!—মা তানকে ঘিরে অসংখ্য স্বপ্নের মুহূর্ত!—চুরুটটায় টানের পর টান দেয় ঘোষ।

একদিন গভীর রাত্রে কিন্তু লুজির * বাড়ীতে গং বেজে ওঠে; পাহাড়ে পাহাড়ে অপূর্ব্ব হ'য়ে প্রতিধ্বনিত হয় তার শব্দ।

ধাক্কা দিয়ে ঘোষকে জাগিয়ে দেয় মা তান, ওগো শিগ্‌গির ওঠো। জাপানীরা এসেছে।—অবিচলিত ওর কণ্ঠস্বর।

আচম্‌কা ধাক্কায় হাঁউমাঁউ ক'রে চীৎকার ক'রে ওঠে ঘোষ। টমাস আর পুরোহিত ছুটে আসে পাশের ঘর থেকে। তারপর সবাই মিলে লুজির বাড়ীর দিকে রওনা হয়।

লুজি হাতের মোটা কাঠের হাতুড়িটা দিয়ে অবিশ্রাম গং বাজিয়ে চলেছে আর তাকে ঘিরে গ্রামের লোকেরা উৎকণ্ঠিত আবেগে প্রতীক্ষা করছে।

শব্দটা থামিয়ে আস্তে আস্তে বলতে শুরু করে লুজি, গ্রাম আর নিরাপদ নয়। এই বেলা সরে পড়ুক সকলে। মাইল বিশেকের মধ্যে এসে পড়েছে শত্রু সৈন্য। প্রচুর রক্তপাত করতে করতে আসছে তারা আর তাদের পায়ের চাপে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাচ্ছে গ্রাম আর ছোট ছোট শহর। পালিয়ে যাক সকলে। গ্রামের দায়িত্ব নিতে আর রাজী নয় সে। কথার ফাঁকে ফাঁকে গংএর আওয়াজ করে লুজি—ব্যাপারটা তাতে যেন বীভৎস হ'য়ে ওঠে আরো।

বিবর্ণ হ'য়ে আসে ঘোষের মুখ। যে হাতে দৃঢ়ভাবে ও ধরেছিলো মা তানের হাত, সে হাতটি কেমন যেন ভিজে ভিজে ঠেকে।

এখানেও আসছে তারা। আশ্চর্য্য, বাধা দিতে পারলো না কেউ তাদের! এতো বড়ো একটি প্রদেশের সমস্ত গ্রাম আর শহর লুফ্‌তে লুফ্‌তে দুর্দমবেগে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে তারা—সহস্রলোককে আশ্রয়হীন ক'রে। এই অবিচারের বিরুদ্ধে কেউ নাই মাথা তুলবার!

* লুজি—মোড়ল।

চোখে কিন্তু স্বপ্ন নামে মা তানের : এখানেও আস্ছে তারা—দেশের পর দেশ জয় করতে করতে। শহর ছাড়বার আগে পর্যন্তও সে শুনেছে রেডিয়োতে, সাগর পারের এই পীত সৈনিকেরা স্বাধীনতার সনদ আনবে বহন ক'রে। যে শিকল তারা অনুভব করেনি কোনদিনই, অথচ যে শিকল বাঁধা ছিল তাদের পায়ে—সে শিকল ভেঙে তারা চূরমার করে দেবে। ওর জাতভাইরা স্বাধীন হয়েছে নাকি, পায়ের শিকল টুটে গেছে তাদের !—লুজির এই গং বুঝি সেই পরাধীনতার অবসানেরই জয়ধ্বনি !—পুলকিত হ'য়ে ওঠে মা তান।

মা তানের হাতটা ধ'রে সজোরে টান দেয় ঘোষ : তাড়াতাড়ি ওঠো, এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদের।

অনুভূতিতে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে মা তানের। ওর সমস্ত স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হ'য়ে যায়। উঠে দাঁড়ায় ও। তারপর চলতে শুরু করে ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে।

পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে বিসর্পিল পথ। চড়াই আর উৎরাই ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে চলে ওরা। প্রথমে টমাস, তারপর হাত ধরাধরি ক'রে ঘোষ আর মা তান, সব শেষে পুরোহিত আর তার অনুচর।

সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গেই আশ্রয় রচনা ক'রে ওরা। শুকনো ডালপালা সংগ্রহ ক'রে আগুন জ্বালায়, আর প্রহরে প্রহরে এক একজন পুরুষ জেগে জেগে পাহারা দেয়। তারপর ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আবার চলা শুরু—মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত প্রহর পার হ'য়ে।

মা তান কেমন যেন একটু গম্ভীর। খুব অল্প হাসে, আর কথা বলে তার চেয়েও কম। ঘোষের অবিশ্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে কখনো বা ছোট্ট ক'রে বলে "হুঁ" আর "না" কিংবা হয়ত ঘাড় নেড়েই জবাব শেষ করে। কি যেন একটা ভাবছে মা তান। মাঝে মাঝে চোখদুটো কুঁচকে চায় পিছনের দিকে—ফেলে-আসা পথের বাঁক যেখানে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে ছোট এক পাহাড়ের পিছনে। তারপর বুক কাঁপিয়ে ছোট এক নিঃশ্বাস ফেলে আর জিজ্ঞাসা করে ঘোষকে : কোথায় যাচ্ছি আমরা ঘোষ !

—যেখানেই হোক। হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তর দেয় ঘোষ, অন্তত ওদের হাত থেকে তো বাঁচতে হবে—যে ক'রেই হোক।

আর কিছু জিজ্ঞাসা করে না মা তান। আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নেয় নিজের হাতটা ঘোষের হাত থেকে, তারপর চল্‌তে শুরু করে মাথা নিচু ক'রে।

অনুচরটা ছুটে এসে কি যেন বলে পুরোহিতকে। উল্লসিত হ'য়ে উঠে পুরোহিত আর ডাকে ঘোষকে হাত নেড়ে নেড়ে।

বরাত খুব ভালো বল্‌তে হবে ঘোষের,—এমনই সময় আর এই পথে গরুর গাড়ী পাওয়া গিয়েছে একটা। খুবই চড়াদর হাঁকছে গাড়োয়ান, কিন্তু দর কষাকষির সময় নয় এখন।

অবশ্য ঘোষেরও সেই মত। কতো টাকা আর নেবে গাড়োয়ান। পার করে দেবে তো এই খাড়া পাহাড় আর নিচের ওই বন্ধুর উপত্যকা।

দুইচাকা ছোট্ট গাড়ী। বুড়ো গাড়োয়ান—এই দেশীয়। মাথা পিছু দুশো টাকা।

তা হোক, নিশ্চিন্ত আরামে বললো ঘোষঃ নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিতে পারলে আরো দুশো টাকা দেবে সে গাড়োয়ানকে। মা তানের হাত ধরে গাড়ীতে উঠিয়ে দেয় ঘোষ।- তারপর ওঠে আর সকলে।

বেশ কিছুদিন একটানা চললো এইভাবে। শুধু মাঝে মাঝে গাড়ী থামিয়ে আহারের আয়োজন, একটু বিশ্রামের পরে আবার নিরুদ্দেশ যাত্রা।

কিন্তু হঠাৎ একদিন বাধলো বিপত্তি। প্রকাণ্ড একটা ঝাঁকুনী দিয়ে থেমে গেলো গাড়ীটা। বলদটা বসে পড়ে হাঁটু গেড়ে আর বাঁদিকের চাকাটা খুলে গড়াতে গড়াতে গিয়ে পড়ে খাদের ভিতরে। অনেক নিচু খাদ। কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলে মাথা ঝিমঝিম করে। সরু রুপোলী ফিতার মত দেখা যায় পাহাড়ী নদী বয়ে চলেছে একটা। মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়ে গাড়োয়ান—উপায়!

উপায় অবশ্য হয়ে যায়। একটু পরেই গাড়ীটা ঘিরে দাঁড়ায় ছোট খাট এক জনতা। হাতে লম্বা ধারালো দা আর কারো হাতে বাঁশের ওপরে গাঁথা বর্শার ফলা। পুরোহিতকে দেখে ওরা প্রণাম করে নতজানু হ'য়ে, আড় চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে মা তানকে। কিন্তু এরা কারা! সাহেবী পোষাক পরা এ দুটি ভারতীয়? আর তাদের দেশের মেয়েই বা কেন এদের সঙ্গে?—অসংখ্য জিজ্ঞাসায় মুখরিত হয়ে ওঠে জনতা। একটানা গুঞ্জন আর মাঝে মাঝে সন্দিগ্ধ চাউনি এদের দিকে।

ব্যাপারটা অনেকটা পরিষ্কার ক'রে আনে পুরোহিত। এরা পালাচ্ছে না কোথাও শুধু আশ্রয় খুঁজছে নিরাপদ আর শান্ত কোন আশ্রয়।

বৃদ্ধেরা কিছুটা নরম হ'য়ে আসে কিন্তু যুবকদের কেমন যেন অস্থির ভাব একটুঃ তাদের জাতের মেয়ে কেন এদের সঙ্গে। কি সম্পর্ক তার সেটাই শুনতে চায় তারা। পুরোহিত কি যেন বলে ফিস্‌ ফিস্‌ করে দু একজনের কানে কানে। জনতা যেন একটু শান্ত হ'য়ে আসে। কয়েকজন এগিয়ে এসে পথ দেখায় এদের।

আশ্রয় একটা মিললো অবশ্য। গোলপাতার চাল আর কাঠের দেয়াল। ছোট্ট দুটি কামরা। একটি দখল করলো ঘোষ আর মা তান, অন্যটিতে রইলো টমাস। পুরোহিত আর তার অনুচর গাঁয়ের প্যাগোডায় আশ্রয় নিলো।

কেমন যেন অস্বস্তি লাগে ঘোষের। পথে ঘাটে অদ্ভুত ভাবে চেয়ে থাকে যুবার দল। এগিয়ে গিয়ে কথা বলতে গেলে দু-এক কথার উত্তর দিয়েই সরে যায় ওরা। মা তান আর ঘোষকে একসঙ্গে দেখলেই চোখগুলো জ্বলে ওঠে ওদের, আর ফিস্‌ফিস্‌ করে কি যেন বলাবলি করে ওরা।

কিছুদিন ধ'রে সারা গাঁয়ে কেমন যেন একটু চন্‌মনে ভাব। প্রত্যেকের মুখেই কিসের যেন একটা চঞ্চলতা। ঠিক সন্ধ্যাব সময়ে ঢাক পিটিয়ে গেল একদল লোক। ঢাকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার ক'রে বলতে শুরু করলো, আজ রাত আটটায় সবাই যেন হাজির হয় প্যাগোডার চাতালে। সভা আছে, খুব জরুরী এক সভা।

ঘোষের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে ঢাক পেটাল লোকগুলো। ঢাক পেটাল আর খুব চড়া গলায় আউড়ে গেল সভার কথাটা।

কিসের আবার জরুরী সভা? বুঝে উঠতে পারে না ঘোষ, আর লোকগুলো এতক্ষণ ধ'রে ওর ঘরের সামনে দাঁড়িয়েই বা ঢাক পিটিয়ে গেল কেন!

একটু রাত হ'তে পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে প্যাগোডায় হাজির হ'লো ওরা।

অনেকদূর পর্যন্ত মশালের আলোয় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। সারা গাঁয়ের লোক এসে জুটেছে সেখানে—আবাল বৃদ্ধ বনিতা। প্রৌঢ় পুরোহিত একজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুটো হাত নেড়ে কি যেন ব'লে চলেছে। খুব উত্তেজিত মনে হ'চ্ছে তাকে আর তার কথার ফাঁকে ফাঁকে চীৎকার ক'রে উঠছে জনতা।

কাছে যেতেই সব কথা কানে গেলো এদের।

জাতির কর্তব্য ঠিক ক'রে ফেলতে হবে এই মুহূর্তে। আমাদের দেশ আমাদেরই থাকবে। সাদা লোকগুলো পালাচ্ছে দিক্‌-বিদিকে আর তাদের সঙ্গে সঙ্গে পালাচ্ছে ভারতীয়রা। আর যে সব বর্মীরা এদেশের সন্তান হয়েও পালাতে শুরু করেছে—তাদের উদ্দেশে অশ্লীল একটা মন্তব্য করলো পুরোহিত। যারা এগিয়ে আসছে, তাদের সঙ্গে হাত মেলাক সকলে। আমাদের সোনার দেশ বন্ধন-মুক্ত হোক।

সভার শেষে উত্তেজিত জনতা মশাল, সড়কী আর বর্শা নিয়ে চীৎকার ক'রে উঠল। অদম্য বন্যার স্রোতের মত ছিট্‌কে পড়ল তারা নানাদিকে। চীৎকার ক'রে ব'লল: দেশের স্বাধীনতার পথে যারা বাধা, সরিয়ে দাও তাদের এই মুহূর্তে। দেশের শত্রু নিপাত হোক। আমাদের দেশ আমাদের হোক।

সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনলো ঘোষ আর মা তান। পিছনে ছিলো পুরোহিত আর টমাস। রীতিমত কাঁপতে শুরু করে ঘোষ। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমে তার কপালে, আর বারবার ঠোঁটটা শুকিয়ে আসে।

এখানেও শুরু হ'লো এই ব্যাপার। ক্ষেপে গেলো না কি সমস্ত দেশের লোক?

হ্যাঁ, দেবে স্বাধীনতা তোমাদের: বিড় বিড় ক'রে উচ্চারণ করে টমাস, তোমাদের স্বাধীন করবার জন্যই এত দূর থেকে এত খরচ ক'রে আসছে তারা। নির্বোধ জাত কোথাকার: দাঁতে দাঁত চেপে কঠিন একটা শপথ করে টমাস: উচ্ছন্নে যাক দেশটা।

পলকে যেন বজ্রপাত হয় সেখানে। টমাসের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে দাঁড়ায় মা তান : দেশটা উচ্ছন্নে গেলে তোমাদের ভারী সুবিধা হয়—না মিস্টার টমাস, এখানকার নিরীহ লোকদের ভুলিয়ে কাজ গুছিয়ে নিতে? পিঠ চাপড়ে বেশী দিন কিন্তু ভুলিয়ে রাখা যায় না কোন জাতকে। কাকেই বা বল্‌ছি। নিশ্বাস ফেলে মা তান, তোমাদের অবস্থা তো আরও সঙ্গীন। স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেও ভুলে গেছো তোমরা।—উত্তেজনায় থর থর কাঁপছে মা তান আর মশালের স্বল্প আলোয় কেমন যেন দেখাচ্ছে ওকে।

ভয় পেয়ে যায় ঘোষ। মা তানের দুটো হাত ধরে ঝাঁকনি দেয় আর বলে : মা তান! মা তান!

একটু উত্তেজিত হ'যে পড়েছিলাম, ক্ষমা করো আমাকে। মিষ্টি হাসে মা তান, যা বলা উচিত নয় আমাদের, তাই ব'লে ফেলেছি।

সারাটা রাত দারুন অস্বস্তিতে কাটে ঘোষেব। মা তানের মুখে কিসের যেন ছায়া ও দেখতে পেয়েছে। যে ছায়া ছিলো খোলা দা আর বর্শা হাতে বর্মীদের কঠিন আব হিংস্র মুখে—অবিকল সেই ছায়া যেন।

মা তানের মুখের দিকে ঘোষ তাকিয়ে তাকিয়ে বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়ে। এই মেয়েকে সে বুঝি কোনো দিনই চেনে না। সমস্ত বর্মীর মত কঠিন উত্তেজিত এই মুখ। কেমন ভয় ভয় করে ঘোষের।

ভোর হ'তেই তবু বোঝায় ঘোষ : চলো মা তান, আমরা চ'লে যাই আমাদের দেশে। বিয়ের পরে তুমি তো ব'লেছিলে বাঙালীর বৌ সেজে বাঙলায় যেতে ভারী ইচ্ছা হয় তোমার।

কেমন ভাবে যেন হাসে মা তান। হাসে আর বলে : তখন তো নিয়ে যেতে চাও নি কিছুতেই। কিন্তু তোমার মা আর বাবা জানেন তো আমাদের বিয়ের কথা?

এ কী বলছে মা তান! চমকে ওঠে ঘোষ। অবিশ্বাসও করছে না কি ওকে। চলুক না মা তান ওর দেশে, বাবা আর মা বুকে জড়িয়ে ধরবেন ওকে। বাড়ির বৌকে ফেলে দিতে পারে না-কি কোনো বাঙালী মা আর বাপ, আত্মীয় আর বান্ধব?

সত্যি! খিল খিল করে হেসে ওঠে মা তান। নিষ্প্রাণ আর কৃত্রিম হাসি। পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা একটা অনুভূতি নামে ঘোষের। প্রকৃতিস্থ আছে তো মা তান!

বিশ্রী ভাবে দিনগুলো কাটতে লাগলো ঘোষের। যেমন ক'রেই হোক পালাতে হবে এদেশ থেকে। বেঘোরে প্রাণটা দেবে না কি পবের দেশে!

মা তান কিন্তু কিছুতেই বাগ মানে না। কেমন যেন হ'য়ে গেছে ও। প্রত্যেক কথায় ঝকঝকিয়ে ওঠে শাণিত বিদ্রূপ, আর কী তীক্ষ্ণ কথার ধার!

কী চমৎকার দেশ আমাদের : বোঝাতে চেষ্টা করে ঘোষ, ছায়ায় ঢাকা ছোট ছোট গ্রাম আর কতো পুকুর আর বিল। কতো সুন্দর দেশ!

তাই বুঝি? কপট বিস্ময়ে ভুরু দুটো ঊর্ধ্বে তোলে মা তান : তাই বুঝি?—ও বলে নিরুত্তাপ কণ্ঠে, অমন সোনার দেশ ছেড়ে কেন আসো বলো তো এই পোড়া দেশে তোমরা? এখানে থাকতে খুব কষ্ট হয় তো তোমাদের!

এতো তীব্র বিদ্রূপ কোথায় এতোদিন জমানো ছিলো মা তানের! ব'সে ব'সে ভাবে ঘোষ। ভাবে আর এক সময়ে হাল ছেড়ে দেয়। কিসের ছোঁয়া লাগলো মা তানের! এতো বদ্‌লে গেলো কি ক'রে সে?

ফিস্ ফিস্ ক'রে পরামর্শ চলে টমাসের সঙ্গে। সারা বিকাল ধ'রে নদীর ধারে ব'সে থাকে ঘোষ আর টমাস। কি এক মতলব যেন দুজনের। তারপর একদিন চাপা হাসি দেখা যায় দুজনের মুখে।

সন্ধ্যাবেলা মা তানের হাত দুটো জাপটে ধরে ঘোষ। কেন এমন করছে মা তান! চলুক দেশে তার সঙ্গে, কোনো অনাদর হবে না তার। আর কিছুদিন পরে এখানেও হট্টগোল শুরু হবে। তখন—তখন কী উপায় হবে!

এগিয়ে আসে মা তান। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ঘোষের দিকে। চেয়ে থাকে আর বলে আস্তে আস্তে : লক্ষিটি, তুমি থেকো-না এইখানে। চলো আরো ভিতরে চলে যাই আমরা—অন্য কোনো গাঁয়ে। কোন ভয় নেই তোমার। সমস্ত বিপদ থেকে বাঁচাবো আমি তোমাকে। এই সময়ে এদেশ ছেড়ে যেতে ব'লো না আমায়। যারা দেশ ছেড়ে পালায়, শুনলে তো তাঁদের সম্বন্ধে কি বল্লেন সে-রাতে মঠের পুরোহিত। আমায় তুমি আপন ভাবতে পারলে, আর আমার দেশকে পারলে না আপনার ভাবতে?

এতো কথার উত্তর দেয় না ঘোষ। শুকনো গলায় কেবল বলে—বেশ, কাল ভোরেই চলো আমরা আরো ভিতরের দিকে চলে যাই। তারপর তোমার কথামত সেখানে গিয়েই থাকা যাবে।

সত্যি থাকবে?—আনন্দে ঝলমল করে ওঠে মা তানের চোখ দুটো। হাসে আর এগিয়ে আসে মা তান। অনেক দিন পরে মাথাটা রাখে ঘোষের বুকের ওপর। স্বপ্নাবিষ্টের মতই আপনার মনে বলে, তুমি আর আমি—আর স্বাধীন আমাদের দেশ আর আমার জাত ভাইরা।—আবেশে চোখ বোঁজে মা তান।

আব্‌ছা অন্ধকারে আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ঘোষ। অঘোরে ঘুমোচ্ছে মা তান। হাতড়ে হাতড়ে সুটকেশটা সে খুঁজে নিলো—এই সুটকেশের তলাতেই কাপড় জড়ানো আছে নগদ টাকাগুলো। আস্তে সুটকেশটা তুলে নিয়ে

ঘরের ঝাঁপটা খুলে বাইরের অন্ধকারে এসে দাঁড়াল। ঘরের ভিতরে কে যেন পাশ ফিরল একবার ঝাঁপ খোলার শব্দে। উৎকর্ণ ঘোষ শুনতে পেল, স্বপ্ন বিজড়িত পরিচিত কণ্ঠ : গং বাজাও, তারা এসে গেছে—স্বাধীন আমাদের বর্মা-ডোবামা-ডোবামা-।

দ্রুতপদক্ষেপে এগিয়ে চললো ঘোষ। অন্ধকারে আরো একটা ছায়া এলো এগিয়ে। লম্বা আর ছিপ্ছিপে চেহারা।

কি, তৈরী তো ?—অস্ফুট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো টমাস।

হাঁ, তৈরী বৈ কি। চলো আর দেরী নয়। ওদিকে সব ঠিক তো ?

নিশ্চিন্ত থাকতে পারো তুমি। কিন্তু তোমার বিবির কি খবর ? খুব ঘুমোচ্ছে নিশ্চয় ?

হাসে ঘোষ। অন্ধকারে ঝিলিক দিয়ে ওঠে ওর সাদা দাঁতের সারি : সে বিষয়ে তুমিও নিশ্চিন্ত থাকতে পারো টমাস। বর্মার দুহিতা স্বাধীন বর্মার স্বপ্নে মশগুল এখন। ডোবামা-যত সব বাজে সেন্টিমেণ্ট।

ছোট্ট একটা পানসী বাঁধা ছিলো ঘাটে। লাফিয়ে উঠে পড়ে দুজনে। টমাস এগিয়ে গিয়ে মাঝিকে কি যেন বলে ফিস্ ফিস্ ক'রে। কালো জলের বুকে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ, আর ওপরে নক্ষত্র-ছিটানো মধ্য-রাত্রির আকাশ।

সুটকেশ খুলে নোট-গুলো কোটের পকেটে রেখে দেয় ঘোষ এইগুলো তার পথের সুহৃদ—তারা স্বদেশের দক্ষিণা। হাত দিয়ে মাঝে মাঝে অনুভব করে সেটা আর ভাবে : কত দূরে বাঙলা ? কত দূরে ? সেই ছায়া-ঢাকা গ্রাম—সেই গোবর-নিকানো পল্লী গৃহ ?···দীর্ঘ দিনে কতো বদলে গেছে না জানি সান্ত্বনা, আর তার কোলের ছোট ছোট ছেলে দুটিও···।

অস্পষ্ট কুয়াসার মধ্যে দেখা যায় কম্পমান আর মৃদু একটা লাল আলোর বিন্দু। প্রোম থেকে স্টীমারে ভারতীয়দের চালান দেওয়া হচ্ছে নিরাপদ উপকূলে। অন্ধকারের ওপারে—ঘোষ দুই চোখ বিস্ফারিত করে দেখ্ছে—ওইখানে সেই বাংলা, তার গ্রাম, তার গৃহ, তার স্বদেশ !

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

Harinarayan Chattopadhyay

গণতন্ত্রের নতুন অভিযান

হিটলারের পরাজয়ের ফলে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে যে সব নতুন আন্দোলন দেখা দিয়েছে, সেগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকের মনে অনেক রকম সন্দেহ উদ্ভূত হয়। গত মহাযুদ্ধের পরেও ইয়োরোপে গণ-আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই সেগুলোর পরিসমাপ্তি দেখে এবার অনেকেই বিশ্বাস করেন না যে, বর্তমান আন্দোলন বেশী দিন টিকতে পারবে। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, ইয়োরোপ আসলে তিনটি প্রধান শক্তির কবলে—ইংলণ্ড, আমেরিকা ও সোভিয়েট রুশ। যে সমস্ত নতুন নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হ'চ্ছে, এগুলো তাদেরই তাঁবেদার—এদের কোনও স্বাধীন অস্তিত্ব নেই। এমন কি অনেক সোভিয়েট-সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের মুখেও শুনতে পাওয়া যায় যে, ইয়োরোপ তো সোভিয়েটের কবলে প'ড়ে যাচ্ছে। এবার তাঁরা বরং অস্থির হ'য়ে ওঠেন যে, কেন এখনও লাল ঝাণ্ডার প্রভাব বিস্তার ক'রে সোভিয়েট-ইয়োরোপ গঠন করা হ'চ্ছে না।

ইয়োরোপের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে হ'লে প্রথমেই আমাদের জানা উচিত, হিটলারের হাতে যে রাষ্ট্রগুলি পড়েছিল তাদের রূপ এবং তাদের ধ্বংসস্তূপের উপর জনগণের যে নতুন আন্দোলন গ'ড়ে উঠছে, তার শক্তি, প্রভাব ও কর্মপন্থা।

১

ফরাসী বিপ্লব থেকে আরম্ভ ক'রে দেড়শত বছর ধ'রে যে সব রাষ্ট্র ইয়োরোপে গ'ড়ে উঠেছে সেগুলোকে বলা হয়, বুর্জোয়া নেতৃত্বে গঠিত রাষ্ট্র। সামন্তপ্রথা ভেঙে চুরমার ক'রে দিল জনগণের আন্দোলন, কিন্তু সেই আন্দোলনের নেতা ছিল ধনিক সম্প্রদায়, এবং সেই সময় শ্রমিকশ্রেণীর কোনও প্রভাব বা অভিজ্ঞতা ছিল না। কৃষকশ্রেণীও সামন্ত প্রভাবেই সুপ্ত ছিল। তাই, গণতন্ত্রের জন্য যে সংগ্রাম উনবিংশ শতাব্দীতে চলে তা'তে বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্ব ও প্রভাবই সব দিক থেকে দেখতে পাওয়া যায়। ধনতন্ত্রের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির উদয় হয়, এবং ক্রমে ক্রমে সারা ইয়োরোপে তাদের আধিপত্য আমরা দেখতে পাই। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠা গ'ড়ে ওঠে; এবং অনেক স্থানে, বিশেষ ক'রে পূর্ব ইয়োরোপে, সাম্রাজ্যবাদ ঠিক আমাদের দেশের মতই গণ-আন্দোলনকে খর্ব ক'রে সামন্তপ্রথাকেই বজায় রাখলে। যে ধনতন্ত্রের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগে সামন্তপ্রথা ভেঙে গণতন্ত্রের সূচনা হয়, সেই ধনতন্ত্রই যখন সাম্রাজ্যবাদী রূপ গ্রহণ করল তখন সে গণতন্ত্রকে দাবিয়ে রেখে সামন্তপ্রথাকেই বাঁচিয়ে রাখল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ঠিক এই অবস্থাই ইয়োরোপে দেখতে পাওয়া যায়। সেই মহাযুদ্ধে যখন বিরাট জার্মান, অষ্ট্রিয়ান ও রুশ সাম্রাজ্য ভেঙে গেল, তখন একমাত্র

রুশেই তা বলশেভিকদের নেতৃত্বে সোজা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারল। কিন্তু অন্যত্র সেই অবস্থা দেখা দিল না। জার্মান ও অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যবাদের পদানত জাতিগুলি অবশ্য জেগে উঠল, এবং সারা ইয়োরোপে গণ-বিক্ষোভের এক অপূর্ব প্রকাশ দেখতে পাওয়া গেল; একদিকে রুশের শ্রমিক ও কৃষক বিপ্লবের সফলতা, অন্যদিকে দেশের মধ্যে যুদ্ধের ফলে দুরবস্থা, এই দুয়ের ফলে এক বিপ্লবী আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

কিন্তু ইয়োরোপের কোনও দেশেই এই বিপ্লব সফল হ'ল না। জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া প্রত্যেক দেশেই এই বিপ্লবের পরাজয় ঘটে। তার প্রধান কারণ, প্রত্যেক দেশেই ধনিক সম্প্রদায় ও সামন্তজমিদার সম্প্রদায় একজোট হয়, এবং বাইরে থেকে তারা ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের খোলাখুলি সাহায্য লাভ করে। কৃষকের মধ্যে দু'এক স্থান ছাড়া কোথাও একটা বিরাট জাগরণ দেখা দেয়নি। শ্রমিক শ্রেণীও পুরাপুরিভাবে সচেতন হয়নি। অনেক সময় তাঁবেদারী সোশ্যাল-ডেমোক্রাট-দের নেতৃত্বে শ্রমিক আন্দোলন বিপ্লবের পথ পরিত্যাগ করে। দেশের সমস্ত শক্তিকে একজোট না-করার ফলে বিপ্লবী শক্তির অপচয় দেখতে পাওয়া যায়। তাই জার্মানীতে রোজা লুক্সেমবুর্গ প্রভৃতি শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী নেতৃবর্গকে জার্মান ধনিকসম্প্রদায় প্রকাশ্যে হত্যা করে। ইটালীতে শ্রমিক নেতৃত্বের বিভেদের সুযোগ নিয়ে মুসোলিনীর উদয় হয়। পোল্যাণ্ডে গণ-আন্দোলনকে পোলিশ জমিদারবা অবর্ণনীয় অত্যাচারে ধ্বংস করে এবং তাদের সাহায্য করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ। অবশেষে পিল্‌সুদ্‌স্কির নেতৃত্বে পোলিশ প্রতিক্রিয়াপন্থীরা সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায়। বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী ও ফিনল্যাণ্ডেও এইভাবে বিপ্লবের অবসান ঘটে।

তাই আমরা দেখতে পাই যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইয়োরোপে যে সমস্ত নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হ'ল সেগুলিতে ধনিক-সম্প্রদায় ও জমিদারদের একাধিপত্য ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যে বজায় থাকে। একদিকে তারা সোভিয়েটের বিরুদ্ধে এই সব রাষ্ট্রগুলিকে প্রস্তুত করে—অস্ত্রশস্ত্র, ঋণ ইত্যাদি দিয়ে সেই সব রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলিকে সবল ক'রে রাখে; অন্যদিকে দেশের মধ্যে গণ-আন্দোলনকে, বিশেষ ক'রে শ্রমিক আন্দোলনকে, সম্পূর্ণভাবে খর্ব ক'রে রাখে। এই দুই কাজের জন্যই সেনাবাহিনীর প্রয়োজন। তাই দেখা যায় যে, এই সকল রাষ্ট্র-গুলিতে, বিশেষ ক'রে পূর্ব ইয়োরোপে, দেশের দুরবস্থা সত্ত্বেও বিরাট সৈন্যবাহিনী গ'ড়ে তোলা হয়েছে। এমন কি জার্মানীকে যদিও নিরস্ত্র করা হ'ল, তবু ভিতরে ভিতরে জার্মান সমরপতিদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে, এবং ভিতরে ভিতরে বিদেশী অস্ত্র-ব্যবসায়ীরা গোপনে তাদের অস্ত্র বিক্রয় করতে থাকে।

১৯২৯ সালে অর্থনৈতিক সংকটের ফলে ধনতান্ত্রিক জগতে এক নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়। সংকট এতই দুরূহ হ'য়ে পড়ে যে, বিপ্লবের সম্ভাবনা নানাদিক থেকে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এবার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা সোজাসুজি ফ্যাশিজ্‌মের সাহায্য নিল। গণতন্ত্রের মুখোসটুকুও জার্মানীকে খুলে ফেলে দিতে হ'ল, এবং পুঁজিপতি ও জমিদারদের প্রতিনিধি হিসাবে হিটলার জার্মান গণতন্ত্র ভেঙে দিয়ে দেশবিদেশ

জয় করার প্রস্তাব খোলাখুলি জানাল। ১৯১৯ সালে যে সমস্ত উপায়ে বিপ্লব ধ্বংস করা হয়, এবারেও সেই সব উপায় আরো নৃশংসভাবে অবলম্বন করা হয়, এবং ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ ফ্যাশিস্টদের খোলাখুলি সাহায্য করে যাতে—একদিকে ইয়োরোপকে বিপ্লবের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে এবং অন্যদিকে বিপ্লবের ঘাঁটি সোভিয়েটকে ধ্বংস করতে পারবে। পূর্ব ও দক্ষিণ ইয়োরোপের ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলিও সেইভাবে ফ্যাশিজ্‌মের পথ অনুসরণ করল।

কিন্তু হিটলারকে সাহায্য ক'রে ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ সারা ইয়োরোপে হিটলারী সাম্রাজ্যবাদেরই পথ সুগম ক'রে দিল। ইয়োরোপে গণ-জাগরণের ভীতি ও সোভিয়েটের শক্তি বৃদ্ধি—এই দুইয়ের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য হিটলারের প্রতিটি দাবী মেনে নিতে নিতে তারা এমন অবস্থায় উপস্থিত হ'ল যে, সোভিয়েট ধ্বংসের পূর্বে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস এবং সারা ইয়োরোপ অধিকার ক'রে ফ্যাশিজ্‌ম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করে। আফ্রিকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আক্রমণ—এমন কি ইরাক ও ইরাণ পর্যন্ত নাৎসিদের প্রস্তুতি: অন্যদিকে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের সঙ্গে বোঝাপড়া—এই সবের ফলে ব্রিটিশ ধনিক সম্প্রদায় তার নিজের অস্তিত্ব বাঁচাবার জন্য হিটলারের বিরুদ্ধে মরিয়া হ'য়ে সংগ্রাম চালাতে লাগল।

নাৎসি-পদানত ইয়োরোপে এক নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়। হিটলারী শাসনে প্রত্যেক দেশের পুরানো, প্রতিক্রিয়াশীল তাঁবেদারী ধনিক ও জমিদার সম্প্রদায় নাৎসিদের খোলাখুলিভাবে সাহায্য করল। জনগণের উপর নাৎসি অত্যাচারের চরম রূপ যখন দেখা দেয়, তখন তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এবার শুধু শ্রমিকশ্রেণী এগিয়ে এল না, তার সঙ্গে এল কৃষক, কারণ নাৎসিলুণ্ঠনে কৃষককেও বাদ দেওয়া হয় না। বুদ্ধিজীবী ও এমন কি ধনিক সম্প্রদায়ের মধ্যেও দেশভক্ত অংশটুকু এসে যোগ দিল প্রতিরোধের দলে। শ্রমিকশ্রেণীরও এই বিশ বছরে রাজনৈতিক চেতনা প্রখর হয়েছে, সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের স্বরূপ তারা ধরতে পারে। বিপ্লবে জনগণের অন্যান্য অংশের সঙ্গে একজোট হবার ভাবও শ্রমিক শ্রেণী ও তাদের নেতা কমিউনিস্টদের কাছ থেকে এলো। তাই জাতীয় ঐক্যের যে নতুন সংহতি গ'ড়ে উঠল, তার মধ্যে সব শ্রেণীর দেশভক্তই এগিয়ে এল, এমন কি চার্চের প্রতিনিধিরাও। বিশ বছর আগে চার্চ ছিল সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল, আজ ফ্যাশিষ্ট অত্যাচারের ফলে চার্চ পর্যন্ত এসে যোগ দিল জনগণের সঙ্গে।

ইয়োরোপের এই নব জাগরণে সোভিয়েটের অবদান খুব কম নয়। প্রথমত, সোভিয়েটের সমগ্র জনগণের দেশভক্তি সারা ইয়োরোপে এনে দিল এক নতুন প্রেরণা। নাৎসি বাহিনীকে আপন দেশে ক্রমাগত প্রতিরোধ ক'রে পদানত ইয়োরোপের জনগণের মধ্যে সোভিয়েট জাগিয়ে তুল্‌ল এক নতুন প্রশ্ন: যা সোভিয়েট দেশবাসীরা করতে সক্ষম, তা কেন আমরা পারব না? এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হ'ল নাৎসিদের বিরুদ্ধে সারা ইয়োরোপে জনগণের অভিযান। এতদিন পর্যন্ত তারা শুধু দেখে এসেছিল পরাজয়েব পর পরাজয়ের ছবি। কিন্তু এইবার তারা

দেখল পরাক্রান্ত নাৎসিবাহিনীকে বারবার বিপদ্‌গ্রস্ত ও পরাজিত করছে সাধারণ কৃষক ও শ্রমিক এবং তাদের লালফৌজ। এইভাবে তারা ফিরে পেল আত্মবিশ্বাস ও অনুপ্রেরণা। দ্বিতীয়ত, যখন তারা দেখতে পেল যে, শত্রুকে পরাজিত করবার জন্য সোভিয়েট যে-কোন উপায় অবলম্বন করতে বদ্ধপরিকর তখন তাদের নিজেদের মধ্যেও প্রশ্ন জাগেঃ যদি চার্চিল ও স্টালিন তাদের দেশরক্ষার জন্য একজোট হ'তে পারে, তাহ'লে আমরাও কেন আমাদের নিজ নিজ বিরোধ ভুলে একজোট হ'য়ে দেশ স্বাধীন করতে পারব না? তাই আমরা দেখতে পাই যে, প্রত্যেক দেশে জাতীয় ঐক্য গ'ড়ে তোলার পথেও সোভিয়েটের আদর্শ ইয়োরোপের জনগণকে অনুপ্রাণিত করে।

তৃতীয়ত, যখন লালফৌজ ইয়োরোপে এসে পৌঁছায় তখন অধিকৃত দেশগুলির দেশভক্ত বাহিনীগুলিকেও সে সাহায্য করে; এইভাবে তাদের মুক্তি বাহিনী গ'ড়ে তোলে। তার ফলে তারা লালফৌজের সঙ্গে একজোটে আপন দেশকে নাৎসি কবল থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়, এবং ভবিষ্যতের জাতীয় সৈন্যবাহিনী প্রতিষ্ঠা করে।

তাই সবদিক থেকে বিচার করলে বুঝতে পারা যায় যে, হিটলার-পদানত ইয়োরোপে যে নতুন গণ-জাগরণ দেখা দিয়েছে তা বিশ বছর আগেকার বিপ্লবী জাগরণ থেকে অনেকাংশে শক্তিশালী। এ জাগরণের সাথী ও প্রেরণার উৎস হ'য়ে সোভিয়েট যে মুক্তিদাতার ভূমিকা গ্রহণ করেছে তাতে ইয়োরোপে সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তে সমাজতন্ত্রবাদের প্রাধান্যই স্বভাবত বৃদ্ধি পাবার কথা।

২

নাৎসি সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে দেশকে স্বাধীন ক'রেই এই গণ-জাগরণ ক্ষান্ত হয়নি। আপন দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এই আন্দোলন উদ্যোগী হয়। এখানেও আমরা দেখতে পাই—বিশবছর পূর্বের আন্দোলন ও আজকের আন্দোলনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য।

প্রথমত, প্রত্যেক দেশে সর্বদলীয় জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বাধীনতার জন্য নাৎসিদের বিরুদ্ধে যে সকল দল যোগ দিয়েছিল, তাদের সকলকে নিয়েই এই জাতীয় সরকার। এর মধ্যে ধনিক সম্প্রদায়ের লোকও আছে, আবার শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী ও চার্চের প্রতিনিধিও আছে। বিশবছর আগে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল তাতে যোগ দিয়েছিল শুধু শ্রমিক শ্রেণী; তখন তাই তাদেরই উদ্যোগে অনেক জায়গায় শ্রমিক-সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যে প্রত্যেক দেশের পুঁজিপতি ও সামন্ত জমিদার সম্প্রদায় সেগুলো ভেঙে ফেলে। জনসাধারণ সেই আন্দোলনে সাড়া দিলেও, পুরোদমে এগিয়ে আসেনি। কিন্তু এবার পুঁজিপতি ও জমিদারের দল বেশির ভাগই পূর্বেই নাৎসিদের দিকে চ'লে যায়, তাই এই নবজাগরণে তাদের কোনও স্থান থাকে নি। 'প্রতিরোধ' ও 'মুক্তি সংগ্রামে' সংহত শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীই এবার অগ্রণী হয়, তাই এইসব জাতীয়

সরকারের মেরুদণ্ড হিসাবে তারাই দেখা দিচ্ছে। ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে আজ যে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার তুলনা সোভিয়েটের বাইরে পৃথিবীর কোথাও কখনও দেখা যায় নি।

দ্বিতীয়ত, এইসব জাতীয় সরকারের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার এদের জাতীয় সেনাবাহিনী। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ জনসাধারণের মধ্যে দিয়ে এই বাহিনী গ'ড়ে ওঠে; এখানেও শ্রমিক, কৃষকের প্রাধান্য তাদের লক্ষণীয়। এর নেতৃত্বেও পুরানো প্রতিক্রিয়াশীল দল স্থান পায় না। কারণ তারা নাৎসিদের সঙ্গে সঙ্গে লোপ পেয়ে গিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধেই এই নতুন গণ-বাহিনী গ'ড়ে উঠেছে। বিশবছর পূর্বেকার বিপ্লবে দেখা দিয়েছিল শ্রমিকদের বাহিনী বা রেড গার্ড, এবং তাকে পরাস্ত করবার জন্য ছিল পুরানো প্রতিক্রিয়াশীল প্রবল সরকারী বাহিনী। আজকে শেষোক্ত বাহিনী লুপ্ত হয়েছে নাৎসিদের সঙ্গে, এবং জাতীয় সরকারের শক্তি ও রক্ষী হিসাবে এই জাতীয় বাহিনী আজ বর্তমান।

তৃতীয়ত, জাতীয় জীবনে প্রতিক্রিয়াপন্থী ও দেশদ্রোহীদের স্থান আজ নেই। নাৎসি সাম্রাজবাদকে যারা সাহায্য করেছে বা আসলে যারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বাধা প্রদান করেছে, তাদের একে একে নির্মূল করা হ'চ্ছে। বিশবছর আগে এই সব প্রতিক্রিয়াপন্থীরাই বিপ্লব ধ্বংস করতে এগিয়ে এসেছিল। আজ ইয়োরোপের প্রত্যেক দেশে দেশভক্তদের সর্বপ্রধান সংগ্রাম হ'ল এই সব গোষ্ঠীগুলিকে ধ্বংস করার। মুসোলিনীর প্রাণদণ্ড বা পেতাঁর বিচার, বাদোগ্লিওর বা দারলাঁর পতন কতবড় বৈপ্লবিক ঘটনা তা উপলব্ধি করতে হ'লে মনে করতে হবে—পূর্বেকার বিপ্লবে পরাজিত হয় জার্মান য়ুঙ্কার বা ফ্যাশিস্ট দল নয়, রোজা লুক্সেমবুর্গ, বেলা কুন ও মাটিয়োটির দল। শুধু যে নাৎসিদের তাঁবেদাররাই এবার ধ্বংস হয়েছে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দালালদেরও বিতাড়িত করা হয়েছে, যেমন ইটালীতে বাদোগ্লিও এবং যুগোশ্লাভিয়া ও পোল্যাণ্ডের লণ্ডনস্থ সরকারগুলিকে।

এ'ছাড়াও ভবিষ্যতে গণতন্ত্রের ভিত্তি শক্তিশালী করার জন্য এইসব জাতীয় সরকার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করে।

প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলিকে শুধু ধ্বংস করলেই চলবে না। তাদের মূলে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল তারও পরিবর্তন করতে হ'ল। পুঁজিপতি ও জমিদারদের অর্থনৈতিক সঞ্চয়ের উপরও এইসব জাতীয় সরকার হস্তক্ষেপ করছে। একচেটিয়া ব্যবসা ও মূল শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রসম্পত্তি ব'লে অধিকার করা হ'ল। তার ফলে যদিও ধনতন্ত্রকে ধ্বংস করা হ'ল না, তবু ধনতন্ত্রের যথেচ্ছাচারী প্রসার ও তার সঙ্গে অত্যাচার ও সাম্রাজ্যবাদী প্রভাবের পথ বন্ধ করা হ'ল। এরই সঙ্গে বিশেষ ক'রে পূর্ব ও দক্ষিণ ইয়োরোপের বড় বড় সামন্ত জমিদারী বাজেয়াপ্ত ক'রে কৃষকদের মধ্যে জমি-বিলি শুরু হয়েছে। এ-সব অঞ্চলে জমিহীন কৃষকের উপর অত্যাচার ক'রেই জমিদাররা ক্ষান্ত হত না, তার সম্পত্তি দিয়ে সে প্রতিক্রিয়াকে সাহায্য ক'রে গণআন্দোলন নষ্ট করত। পূর্ব ইয়োরোপের দেশগুলিতে এইভাবে এতদিন পর্যন্ত

মধ্যযুগীয় অত্যাচার চ'লে এসেছে। আজ জাতীয় সরকারের পিছনে কৃষকের স্থান অন্যতম, কারণ দেশকে স্বাধীন করা ও জাতীয় বাহিনীকে শক্তিশালী করার কাজে কৃষকের দান অতুলনীয়ঃ তাই তার ন্যায্য দাবী তাকে দিতে হয়েছে।

বিশবছর পূর্বে যে বিপ্লব ঘটেছিল, তা'তে শ্রমিক-বিদ্রোহ হওয়া সত্ত্বেও পুঁজি-পতিদের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হয় নি। তেমনি সামন্ত জমিদারীগুলিতে কৃষক-বিক্ষোভ দেখা দিলেও তা দমন করায় জমিদারদের খুব বেশি বেগ পেতে হয় নি। এবারে প্রতিক্রিয়ার এই দু'টি ঘাঁটিই জাতীয় সরকারের অধিকারে এল। এবার এইভাবে গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হ'ল।

এইসব রাষ্ট্রগুলির আরেকটি দুর্বলতা এবারকার আন্দোলনে দূর করা হয়েছে। গত যুদ্ধে অষ্ট্রীয়া ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদের পতনে যে সব পরাধীন জাতির মধ্যে জাগরণ দেখা দেয় সেগুলি পরস্পরের মধ্যে কলহ বিরোধ ক'রে আপন আপন শক্তি খর্ব করেছিল। প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদ এই কলহবিবাদের সুযোগ নিয়ে তাদের উপর নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করেছে। এ বিষয়ে হিটলার সিদ্ধহস্ত ছিল। প্রত্যেকটি দেশ আক্রমণ করবার পূর্বে সেখানে এই ভাবে গৃহবিবাদ বাধানোর চেষ্টায় সে কৃতকার্য হয়েছে। কিন্তু এবারে দেখতে পাই যে, প্রত্যেকটি জাতীয় সরকার আপন আপন সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিগুলিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিয়েছে। যুগোশ্লাভিয়াতে এই জাতীয় বিবাদ সর্বদাই রাষ্ট্রকে দুর্বল ক'রে রেখেছিল। কিন্তু নব যুগোশ্লাভিয়াতে ক্রোয়াট, শ্লোভেন, বস্‌নিয়ান ও অন্যান্য জাতিগুলিকে পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার অকাতরে দান ক'রে মার্শাল টিটো যুগোশ্লাভিয়াকে সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী করেছেন, অপরপক্ষে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের পথ বন্ধ করেছেন। ঠিক তেমনিভাবে চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া ও পোল্যাণ্ড আপন আপন জাতীয় সমস্যার সমাধান ক'রে ইউরোপের নব গণতন্ত্রগুলিকে শক্তিশালী করেছে।

বিশবছর পূর্বে বিপ্লবের সময় এই সমস্ত জাতিগুলির একটির বিরুদ্ধে আরেকটিকে লাগিয়ে প্রতিক্রিয়াপন্থীরা বিপ্লব ধ্বংস করেছিল। এমন কি সোভিয়েটের বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডকে নিযুক্ত করবার সময়ও পোলদের মধ্যে পুরানো জারতন্ত্র বা রুশ সাম্রাজ্য-বিরোধী বিদ্বেষকে সোভিয়েট-বিদ্বেষ রূপে নতুন ক'রে জাগিয়ে তুলেছিল।

এই সকল নবপ্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রগুলি যে সোভিয়েটের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন করবে তা' খুবই স্বাভাবিক। সোভিয়েটের আদর্শ, সোভিয়েটের সাহায্য, আপন দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে শ্রমিক ও কৃষকের অপূর্ব অবদান, এবং সাম্রাজ্যবাদের সোভিয়েটবিরোধী কার্যকলাপের আসল রূপ প্রকাশ—এই সব ক'টি কারণে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের নতুন জাতীয় সরকারগুলি সোভিয়েটের নেতৃত্ব মানতে আজ আপনা হ'তেই প্রস্তুত। সাম্রাজ্যবাদের অনুগত হ'য়ে থাকার যে দুর্ভাগ্য তা তারা নাৎসি অত্যাচারের মধ্যে প্রাণে মনে বুঝতে শিখেছে। তাই নতুন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত থেকে তারা নিজেকে বাঁচিয়ে চলবার পথই দেখবে, এবং সেই পথে সোভিয়েটই

যে সবচেয়ে বড় সহায় তাও তারা আজ জানে। নাৎসি কবল থেকে মুক্তিসংগ্রামে সোভিয়েটের নেতৃত্ব তারা ভুলতে পারে নি।

এ কথার প্রমাণ: পূর্ব ইয়োরোপে সোভিয়েট-প্রসারের উত্তর হিসাবে পশ্চিম ইয়োরোপ একটি রাষ্ট্রসমষ্টি তৈরী করবার জন্য ব্রিটিশ সরকার দ্য গলকে অবলম্বন করে। কিন্তু দ্য গল তা' অস্বীকার ক'রে মস্কোতে গিয়ে ফরাসী-সোভিয়েট চুক্তি স্বাক্ষর করে।

চেকোশ্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রপতি ডাক্তার বেনেশ-এর সাহায্যে তারা মধ্য ইয়োরোপে একটি রাষ্ট্র-সমষ্টি খাড়া করবার চেষ্টা করে, কিন্তু বেনেশও তা' প্রত্যাখ্যান করেন, এবং সোভিয়েটের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। অথচ, ১৯৩৮ সালে মিউনিকের সময় এই বেনেশই সোভিয়েটের দিকে না তাকিয়ে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করাতে হিটলারের চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকারের পথ সুগম হয়। বল্কানেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একটি রাষ্ট্র-সমষ্টি গড়বার পরিকল্পনা করে। কিন্তু, বল্কানের প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রেই ব্রিটিশ তাঁবেদাররা আপন আপন জাতীয় সরকারে স্থানই পায় না।

তাই আজ ইয়োরোপের পরিস্থিতি বিশ বছর পূর্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক। আজকে শুধু একটা ক্ষণস্থায়ী গণ-আলোড়ন হয় নি। নাৎসি সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস-স্তূপের উপর গ'ড়ে উঠেছে এক নতুন শক্তিশালী গণতন্ত্র। সাম্রাজ্যবাদী প্রতিপত্তিও আজ বিলীন হ'য়ে যাচ্ছে এই নব ইয়োরোপ থেকে। সোভিয়েটের সাহায্য ও অনুপ্রেরণায় এই ইয়োরোপের জন্ম, সোভিয়েটের নেতৃত্বে এই ইয়োরোপের সম্মুখে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

৩

এইসব নবপ্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রগুলির স্বরূপ ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক সময় মতভেদ দেখতে পাই। অনেকে প্রশ্ন করেন যে, এইসব রাষ্ট্রগুলিতে যখন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, এবং ধনিক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়নি তখন তো ধনতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিপত্তিবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। ধনতন্ত্রকে যখন নির্মূল করা হয় নি, তখন তো ফরাসী বিপ্লবে প্রতিষ্ঠিত ফরাসী গণতন্ত্রের মত এইসব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিও সাম্রাজ্যবাদের পথেই এগিয়ে যাবে। অন্যদিকে, তর্ক করা হয় যে সোভিয়েটের নেতৃত্ব ও প্রভাবে যখন এইসব রাষ্ট্র গ'ড়ে উঠেছে, তখন এখানে সোভিয়েট সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়ায় কি বাধা আছে? যুদ্ধের ধাক্কা সোভিয়েট একটু সামলে নিয়েই এইসব রাষ্ট্রগুলি একে একে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে আত্মসাৎ করবে। তাই, এইসব গণতন্ত্রগুলিকে নামেমাত্র গণতন্ত্র বলা চলে, সমাজতন্ত্রই এসব রাষ্ট্রে অদূর ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রথমে ধরা যাক্ সাম্রাজ্যবাদের প্রসারের কথা।—সত্যিই, এই রাষ্ট্রগুলিতে শুধু শ্রমিক, কৃষক মধ্যবিত্তশ্রেণী নয়, ধনিকশ্রেণীরও স্থান রয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে যে কেউ যোগদান করেছে, তারই স্থান রয়েছে এইসব গণতন্ত্রে। কিন্তু, এই প্রসঙ্গে

দুটি কথা মনে রাখতে হবে। ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে যে সব গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার নেতৃত্ব নিয়েছে ধনিকশ্রেণী, তার সাথী হয়েছে জনগণ—সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে। কিন্তু আমরা দেখেছি আজকে যে আন্দোলনের ফলে এইসব গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল, তার নেতৃত্ব নিয়েছে সচেতন ও সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণী। ধনিকশ্রেণীর একটা বৃহৎ অংশ নির্মূল হ'য়ে গিয়েছে—সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ ক'রে নাৎসি সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার ছিল এই অংশ। তা ছাড়া এই গণআন্দোলন গ'ড়ে উঠেছে নাৎসি সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্তিসংগ্রাম হিসাবে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন হিসাবেই এর প্রতিষ্ঠা। সামন্তপ্রথা উচ্ছেদের সংগ্রাম এক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামেরই অংশ, কারণ সামন্ত জমিদার ও সাম্রাজ্যবাদী দালাল একত্রিত হ'য়ে শোষণ ও পরাধীনতা কায়েম করে। তাই এই নতুন গণতন্ত্র শুধু সামন্তপ্রথা নয়, সাম্রাজ্যবাদও উচ্ছেদ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই কারণেই সোভিয়েটের নেতৃত্ব গ্রহণ করা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক; ব্রিটিশ বা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাধু-প্রতিশ্রুতিও তারা যাচাই ক'রে দেখবে সোভিয়েটের সঙ্গে এসব শক্তির সম্বন্ধ থেকে। এবং বৃটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হ'লেও সোভিয়েটকে স্মরণ করাই তাদের পক্ষে হবে স্বাভাবিক। ১৯৩৯-এর পোলিশ সরকার হিটলারের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শরণাপন্ন হ'ল, কিন্তু তবু লালফৌজকে পোল্যাণ্ডে ঢুকে পোলিশ সীমান্ত রক্ষা করতে অনুমতি দিল না। (১৯৪৫-এর পোলিশ জনগণ সোভিয়েটের সাহায্যে শুধু জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করল না, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পোলিশ তাঁবেদারদের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করল।)

এই সকল নবগণতন্ত্রের অর্থনৈতিক কাঠামো থেকেও দেখা যায় পুঁজিপতি ও জমিদার এবং তার পিছনে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব নয়। মূল শিল্প ও একচেটিয়া ব্যবসাগুলি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সম্পত্তি ব'লে ঘোষিত হয়েছে। সামন্ত জমিদারীগুলি উচ্ছেদ ক'রে কৃষকদের মধ্যে জমি বিলি করাও এইসব রাষ্ট্রের কর্মপদ্ধতির অংশ। রুমানিয়া, পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়াতে কৃষক তার দাবী ইতি-মধ্যেই পেয়েছে। সচেতন ও সংগঠিত কৃষকশ্রেণী আজ গণতন্ত্রের প্রহরী ও পুরোধা দুইই। চেকোশ্লোভাকিয়া, ইটালী ও ফ্রান্সের বিরাট শিল্পগুলি রাষ্ট্রের সম্পত্তি হওয়ার অর্থ, ইয়োরোপ থেকে সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহাসিক ঘাঁটিগুলি ধ্বংস হওয়া।

তবে এই কর্মপদ্ধতি একদিনেই সফল হবে না। এর জন্যও গণ-আন্দোলনকে ক্রমাগত সংগ্রাম ক'রে যেতে হ'চ্ছে। সৈন্যবাহিনী, সরকারী আমলাতন্ত্র ও ব্যাঙ্ক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদী দালালের অন্ত নাই। জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা হ'তেই এগুলো নিশ্চিহ্ন হয়নি; বরং জাতীয় সরকার ও তার পিছনে ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলনই ক্রমে ক্রমে এইসব গোষ্ঠীগুলিকে নির্মূল করছে। যেমন,—ইটালীতে বাদোগ্লিওর নেতৃত্ব থেকে শুরু ক'রে আজ সোশ্যালিষ্ট ও কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফ্রান্সে জিরোর নেতৃত্ব থেকে শুরু ক'রে আজ বামপন্থীদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তবু বলা চলে না যে সংগ্রাম শেষ হয়েছে,

বরং বলা চলে সংগ্রামের আদিপর্ব শেষ হয়েছে মাত্র। আজও ফ্রান্সের পুঁজিপতিদের কুখ্যাত 'দুইশত পরিবার' বর্তমান, ফরাসী সৈন্যবাহিনীতে এখনও প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃবর্গ কিছু কিছু র'য়ে গিয়েছে। ফরাসী সাম্রাজ্যে এখনও গণতান্ত্রিক অধিকার বিস্তার করা হয় নি। এবং আমরা আরও দেখতে পাই যে,—এই সকল দুর্বলতার সুযোগ নেবার জন্য অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদ উদ্গ্রীব হ'য়ে অপেক্ষা করছে। যেমন দেখা গেল সিরিয়াতে গণ-বিক্ষোভের সুযোগ নেবার চেষ্টা করছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, এবং গ্রীসে প্রতিক্রিয়াশীলদের সাহায্য করছে ব্রিটিশ সৈন্য। এইসব ঘটনা থেকে এইটেই প্রতিপন্ন হয় যে গণতন্ত্রের সংগ্রাম যেখানে যত শক্তিশালী হয়েছে সেখানেই সাম্রাজ্যবাদের সুযোগ নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে, এবং যেখানেই গণতন্ত্র এখনও দুর্বল সেখানেই সাম্রাজ্যবাদ হস্তক্ষেপ করবার চেষ্টা করছে। তাই আমরা আরও দেখতে পাই যে, ইয়োরোপের এই নব-গণতন্ত্রের উদয়ে পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদের প্রসার হ'চ্ছে না, বরং এই অভিযান যতই এগিয়ে চলেছে ততই সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার অবসান আগতপ্রায়।

এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আর একটা দিক আছে। সোভিয়েটের প্রভাবে যদিও এই রাষ্ট্রগুলির উদয়, তবু বলা চলে না যে এগুলো দিয়ে ইয়োরোপে সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদের বিস্তার হ'চ্ছে। যদিও সোভিয়েটের সাহায্যে এগুলির জন্ম তবু সোভিয়েট স্থাপন করাই এগুলির উদ্দেশ্য নয়। কারণ, এগুলিতে সব শ্রেণীর লোকের স্থান রয়েছে, এবং সব শ্রেণীর লোকই এই রাষ্ট্রগুলির পরিচালনার ভার নিয়েছে। ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ এইসব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাধিত হয়নি, বরং সামন্ত জমিদারীপ্রথা উঠিয়ে দিয়ে, বাইরের সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য নষ্ট ক'রে দিয়ে, দেশের মধ্যে ধনতন্ত্র ও শিল্প-বিস্তারের পথ সুগম ক'রে দেওয়া হয়েছে। ফ্যাশিস্ট সাম্রাজ্যবাদের শোষণনীতির ফলে ইয়োরোপের বেশিরভাগ দেশই পরাধীন দাসদেশের পর্যায়ে গিয়ে পড়েছিল। নাৎসি পুঁজিপতিরাই সকল শিল্প দখল ক'রে মুনাফা আদায় করছিল। তাদের ধ্বংসে, দেশের ধনতন্ত্র ও শিল্প বিস্তারের সম্ভাবনা বাড়ল, এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় উন্নতির পথ প্রশস্ত হ'ল। তবে এই ধনতন্ত্রের বিস্তারকে অত্যাচারের পর্যায়ে পৌঁছতে দেওয়া হবে না, একচেটিয়া মুনাফাখোরী পুঁজিবাদে এর পরিণতি যাতে সম্ভব না হয় তাই মূল শিল্প যথা কয়লা, লোহা, ইলেট্রিক ইত্যাদি রাষ্ট্রসম্পত্তি হ'য়ে যাওয়াতে ধনতন্ত্রের অবাধ বিশৃঙ্খলা ব্যাভিচারের পথ রোধ করা হয়েছে। ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্র এই সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্থান পাবে না, তার বেশি মাত্রা অতিক্রম করতে দেওয়া হবে না। এইদিক দিয়ে বিচার করলে বুঝতে পারা যায় যে সোভিয়েটের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করা হলেও সমাজতন্ত্র ও শ্রমিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এইসব গণ-আন্দোলনের উদ্দেশ্য নয়। এমন কি, জার্মানীর সোভিয়েট অধিকৃত এলাকাতে সোভিয়েটতন্ত্র না খাড়া ক'রে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনবার জন্যই সোভিয়েট চেষ্টা করছে।

এই কথাটাই সোভিয়েট বন্ধুরাও অনেক সময় ভুলে যান। যুদ্ধে সোভিয়েটেরই প্রধান জয়লাভ হ'ল, ইয়োরোপের অর্ধেক ভূখণ্ডের উপর দিয়ে লালফৌজ অগ্রসর

হ'য়ে গিয়েছে, তাহ'লে তো স্বাভাবিক যে, সোভিয়েট এইসব নব-অধিকৃত অংশগুলিকে নিজের রাষ্ট্রের মধ্যে টেনে নেবে, কিংবা সে-সব দেশে নিজের মত সমাজতন্ত্র বিস্তার করবে। স্বভাবত বিজয়ী শক্তি এই ভাবেই প্রভুত্ব বিস্তার করে। নেপোলিয়ন বা হিটলার এই ভাবেই এগিয়ে গিয়েছিল। এমন কি প্রথম মহাযুদ্ধের পর ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদও তাদের আপন সুবিধা অনুযায়ী ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রগড়ার কাজে হস্তক্ষেপ করেছিল। সোভিয়েটের যারা শত্রু, যেমন, ফ্যাশিস্ট মনোভাবসম্পন্ন মিউনিকওয়ালারা কিংবা সোভিয়েট-বিরোধী মার্কিনী ক্লেয়ার বুথ ল্যুসও, এইজন্যই ইয়োরোপে লাল জুজুর ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু এরা সকলেই ভুলে যায় যে, সোভিয়েট হ'ল সার্থক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। কোনও এক দেশের জনগণ যে ব্যবস্থা নিজেরা স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠা করবে—সোভিয়েট তাই মেনে নেবে। এমন কি, সোভিয়েট বিপ্লবের ঠিক পরেই যখন ফিনল্যাণ্ডকে রুশসাম্রাজ্য থেকে স্বাধীনতা দেওয়া হ'ল তখন সোভিয়েট আপন বিপদ সত্ত্বেও ফিনল্যাণ্ডকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিল—আপন রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ক'রে নেবার জন্য। কামাল পাশার তুর্কীকে কিম্বা সুন্ ইয়াৎ সেনের চীনের গণ-আন্দোলনকে সোভিয়েট অকাতরে সাহায্য করেছে,—যদিও জানত যে, এ-সব আন্দোলন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবার জন্য উদ্যোগী। শুধু একটিমাত্র মাপকাঠি দিয়ে সোভিয়েট এই সব আন্দোলনকে সর্বদা বিচার ক'রে এসেছে যে, এগুলি সত্যিই প্রগতিপন্থী কি না, অর্থাৎ এরা সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কি না।

(তাহ'লে আমরা দেখতে পাই যে, ইয়োরোপের গণ-আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যে সব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারা এক নতুন গণতন্ত্রের সৃষ্টি করেছে। ধনতন্ত্রের অবাধ শোষণ সেই সব রাষ্ট্রে বন্ধ, অপর পক্ষে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ক'রে শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্য বিস্তার করাও এর উদ্দেশ্য নয়। এই নব গণতন্ত্রের বিশেষত্ব হ'ল এই যে এর জন্ম সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে, এবং এর প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় শ্রমিক ও কৃষকের ভূমিকাই প্রধান, যদিও অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে একত্রে তারা জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করেছে।)

(এই নব গণতন্ত্রের প্রভাব শুধু নাৎসি অধিকৃত ইযোরোপেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। হিটলারী সাম্রাজ্যবাদ সারা ইযোরোপ জয় ক'রে যখন পৃথিবী জয়ের অভিযানে বের হয়, তখন অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদকেও এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়, এবং সেই সব দেশের জনগণের দেশ-রক্ষা আন্দোলন এক গণ-আন্দোলনের আকার ধারণ করে। সমগ্র দেশের একটিমাত্র লক্ষ্য—ফ্যাশিস্টদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা। তখন জনগণের প্রচেষ্টায়ই যুদ্ধের জন্য উৎপাদন কার্য চলে, এবং জনগণ অসীম স্বার্থত্যাগ ক'রে ফ্যাশিস্ট সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসে সাহায্য করে। এই সময়ে যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা বশত শিল্পপতিদের একচেটিয়া পুঁজির উপর সরকারী কণ্ট্রোল বসে, মূল শিল্পগুলি যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তার জন্য সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয। এবং মুনাফার বড় অংশ সরকার আদায় ক'রে নেয। সারা দেশের গণ-আন্দোলনের ফলেই পুঁজিপতিদের

স্বার্থের উপর এই সব বিধিব্যবস্থা চালু করা হয়। এই ভাবে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় একটা গণতান্ত্রিক প্রভাব বিস্তার সম্ভব হ'য়ে ওঠে।)

(যুদ্ধের পরেও যাতে জনগণের স্বার্থে জাতীয় ঐক্য বজায় থাকে, শিল্প ও পুঁজির উপর সরকারী কণ্ট্রোল যাতে চালু থাকে, মূল শিল্প ও ব্যাঙ্কগুলি যাতে রাষ্ট্রের সম্পত্তি হয়, শ্রমিক ও জনসাধারণের জীবনধারণের একটা মোটামুটি সংস্থানের ব্যবস্থা রাষ্ট্রের থেকে করা হয়—এই সব দাবী নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতেও আন্দোলন চলে। এবং এই সব আন্দোলনে শুধু শ্রমিকশ্রেণীই তৎপর হয় নি, সঙ্গে সঙ্গে বহু খাঁটি দেশসেবক ও গণতান্ত্রিকও যোগ দিয়েছে। তাদের অনেকে সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদের জন্যও প্রস্তুত, কারণ নাৎসি সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস থেকে এরা বুঝতে পেরেছে যে অন্যদেশের জনগণকে পরাধীন রাখলে আপন স্বাধীনতাও খর্ব হয়। এই সব গণ-আন্দোলনও সার্থক গণতন্ত্রের জন্যই চলছে, জাতীয় ঐক্য, অন্তত প্রগতিশীল শক্তিগুলির ঐক্যে এই আন্দোলনের ভিত্তি।) ব্রিটেনে উইলিয়ম বেভারিজ-এর সামাজিক সংস্থানের উপর বিখ্যাত রিপোর্ট কিম্বা আমেরিকান হেনরী ওয়ালেসের মতামত এই আন্দোলনেরই নির্দেশ দেয়। এবং এই সব আন্দোলনেও প্রধান দাবী হ'ল দেশের মধ্যে জনসাধারণ, বিশেষ ক'রে শ্রমজীবীদের, জীবনধারণের ব্যবস্থা কর, শিল্পের প্রধান লক্ষ্য হবে সামাজিক ব্যবহার, মুনাফা নয়; সাম্রাজ্য উচ্ছেদ ক'রে পরাধীন দেশগুলিকে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ কর; বাইরে সোভিয়েটের সঙ্গে মৈত্রী বজায় রেখে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করতে অগ্রণী হও।

তবে এই ধরনের জাতীয় ঐক্যের প্রধান উদ্দেশ্য হবে, আপন আপন দেশে অত্যাচারের মূল—সাম্রাজ্যলোলুপ অংশগুলিকে পরাস্ত করতে হবে। তাই কিছুদিন আগে আমেরিকান কমিউনিস্ট নেতা আর্ল ব্রাউডার যখন জাতীয় ঐক্যের আওতায় এমন কি বড় বড় একচেটিয়া পুঁজিবাদীদেরও গণ-স্বার্থের স্বপক্ষে গণ্য করলেন, এবং জাতীয় ঐক্যের খাতিরে কমিউনিস্ট পার্টি তুলে দেবার পথ নিলেন, তখন তাঁর পন্থার নিন্দা ক'রে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট নেতা জরে দ্য ক্লো পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেন যে, যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে গণ-স্বার্থ বিরোধী শক্তিগুলি আবার নাড়া দিয়ে উঠবে, এবং এরাই সর্বদা ফ্যাশিস্টবাদের শুরু ও সাহায্য করেছে। অতএব এদের সঙ্গে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা গণতন্ত্রবিরোধী। শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কমিউনিস্ট পার্টির চেষ্টা ও নেতৃত্বেই সেই নতুন গণতান্ত্রিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা ক'রে সার্থক গণতন্ত্রের জন্য এই সব গণতান্ত্রিক দেশেও সংগ্রাম চালাতে হবে। কারণ, দেখা গেছে একচেটিয়া পুঁজিবাদীরাই ধনতন্ত্রের সংকটের সময় ফ্যাশিস্টবাদের জন্মদাতা হ'য়ে ওঠে। ফ্রান্সের অভিজ্ঞতা থেকে যে এই দৃষ্টান্ত খুবই পরিস্কার তা বলা বাহুল্য।

৪

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এই গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুধু যে এই যুদ্ধের অবস্থাতেই দেখা দিয়েছে, তা' নয়। এর সূত্রপাত আমরা দেখতে পাই বহু পূর্বে পরাধীন দাস-

দেশগুলির মুক্তি-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। যদিও ইয়োরোপে ব্যাপকভাবে এই নব-গণতন্ত্রের অভিযান নাৎসি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই প্রথম দেখা দেয়।

পরাধীন দাস-দেশগুলিতে বিশেষত চীনে ও ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য নবগণতন্ত্র, কারণ, নইলে এই সব দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন কখনও সাফল্য লাভ করতে পারবে না। এই সব দেশে যে ধনিক সম্প্রদায় গ'ড়ে উঠেছে তাকে সর্বদাই সাম্রাজ্যবাদের হাতে পরাস্ত হ'তে হয়। পরাধীন জাতির শিল্প বিস্তারের সম্ভাবনা সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করবার চেষ্টা করে। (অথচ পরাধীন দেশের ধনিকশ্রেণী এতখানি শক্তিশালী হ'তে পারে না যাতে তারা নিজেরাই সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করতে পারে। দেশের সমস্ত জনগণ, বিশেষ ক'রে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর নেতৃত্বেই তাদের ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদিকে পরাস্ত করতে পারে।)

দ্বিতীয়ত, পরাধীন দেশগুলির মুক্তি সংগ্রাম আজ গ'ড়ে উঠছে এক নতুন যুগে। পুরানো যুগের গণতন্ত্রকে দেখে তারা যেমন অনুপ্রাণিত হয়েছিল, ঠিক তেমনি সেই গণতন্ত্রের দুর্বলতাও তাদের কাছে পুরোপুরিভাবে ধরা পড়ে গিয়েছে। আমাদের দেশে একদিকে যেমন ব্রিটিশ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল, অন্যদিকে তেমনি ব্রিটিশ গণতন্ত্রের দুর্বলতা—তার সাম্রাজ্যবাদী স্বরূপ—আমাদের দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। ঠিক তেমনি চীনে, সুন্ ইয়াৎ সেন একদিকে যেমন পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের উপাসক ছিলেন, অন্য দিকে তাঁরই নেতৃত্বে ১৯২৪ সালের কুয়োমিন্টাঙের প্রথম সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়েছিল—"The so-called democratic system of certain countries was often abused by the bourgeoisie, and consequently the state machine was converted into a means for oppressing the masses."

এই সব কারণে পরাধীন দাস-দেশের জনগণের চক্ষে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শুধু বুর্জোয়া আধিপত্য বজায় রাখার সম্ভবনা কমে গিয়েছে। বুর্জোয়া শ্রেণীর আপন দুর্বলতা এবং তার সঙ্গে পুরানো গণতন্ত্রগুলিতে বুর্জোয়ার কীর্তিকলাপ এই দুয়ের ফলে পরাধীনদেশের জনগণকে অনেক বেশী সচেতন দেখতে পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েটের দৃষ্টান্তে বিশেষভাবে মধ্য এশিয়াতে মুক্তি ও উন্নতির কথা শুনে সারা এশিয়াতে এক নতুন আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে; চীনের আন্দোলনকে সোভিয়েটের বিরাট অবদান ব'লে সুন্ ইয়াৎ সেন নিজেই স্বীকার ক'রে যান।

তাই আমরা দেখতে পাই যে, আজ ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে যে ভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন গ'ড়ে উঠেছে ঠিক সেইভাবে এবং সেইসব কারণেই এশিয়ার পরাধীন দাস-দেশগুলিতে গণ-আন্দোলন গ'ড়ে ওঠে। এবং দুই আন্দোলনের হাতিয়ারও একই—জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা। বিশেষ ক'রে আমাদের মতন পরাধীন দেশে—যেখানে সাম্রাজ্যবাদ জনগণকে সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত্র ক'রে রেখেছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে কোনও দল বা শ্রেণী সংগ্রাম করতে প্রস্তুত তারই এই জাতীয় ঐক্যে স্থান আছে।

সাম্রাজ্যবাদের আওতায় পরাধীন দেশে দুর্বল ধনিকসম্প্রদায়কে সবসময়েই নির্ভর করতে হয় গণ-আন্দোলনের উপর : গণ-আন্দোলনের চাপে সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে সুযোগ সুবিধা আদায় করাই হ'ল এই বুর্জোয়া শ্রেণীর একমাত্র উপায়। একদিকে সাম্রাজ্যবাদ, অন্যদিকে গণশক্তি—এই দুইয়ের মধ্যে সাম্‌লিয়ে চলতে হয় দাস-দেশের বুর্জোয়া নেতৃবর্গকে। কিন্তু দেখা গিয়েছে যে, জাতীয় ঐক্যের পথ যখনই সে পরিত্যাগ করেছে তখনই তার এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জাতির অবস্থা হ'য়ে পড়ে শোচনীয়।

তাই এখানেও বুর্জোয়া নেতৃত্ব থাকতে পারে ; কিন্তু তার পিছনে যে আসল শক্তি তা' হ'ল জনগণের,—শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত সকলের সমবেত সংহতি। এমন কি দেশের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের একত্রিত শক্তিও প্রয়োজন—নইলে যে অংশ জাতীয় ঐক্যের বাইরে থাকবে সেই অংশ এবং সমস্ত জাতি দুইই দুর্বল হ'য়ে পড়বে, সাম্রাজ্যবাদের প্রচণ্ড আক্রমণ রুখতে পারবে না।

চীনের আন্দোলন আলোচনা ক'রে মাও ৎসেতুঙ্‌ এই নব গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা করেছেন—"a democratic republic of the dictatorship of all anti-imperialist and anti-feudal sections of the people...In other words a republic of the *Three Principles* of the people in their true revolutionary sense as put forward by Dr. Sun Yat Sen, i.e. that of China's great political heritage of unity with the Soviet, with the Communists and for the interests of the workers and peasants."

মাও ৎসেতুঙ্‌ আরও দেখিয়েছেন যে, কি ভাবে—জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে যখনই চীনের নেতৃবর্গ এগিয়েছে তখনই সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের হাত থেকে ক্ষমতা আদায় ক'রে সে-দেশ স্বাধীনতার পথে এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু, যখনই তারা গণ-সংহতির শক্তি দেখে ভয় পেয়েছে, তখনই জাতীয় ঐক্য বারবার ভেঙে দিয়ে নিজের ও জাতির দুয়েরই ক্ষতি সাধন করে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন—"It is simple enough for us to see in China that those who are really capable of leading the people for the overthrow of imperialism and the feudal interest, especially imperialism, will be trusted by the people : because imperialism and the feudal interests are the two main enemies of the people. Today those who are able to defeat Japanese imperialism and put democracy into practice will be regarded by the people as their saviours. If the Chinese bourgeoisie is capable of fulfilling their duty, it certainly deserves every praise. Otherwise, the task inevitably falls on the shoulder of China's proletariat."

এই ভাবেই আমাদের দেশেও স্বাধীনতার আন্দোলন চলেছে। সাম্রাজ্যবাদের

বিরুদ্ধে যখনই আমাদের গণ-শক্তিকে একত্রিত করা হয়েছে তখনই দেশ স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যেতে পেরেছে। আবার যখনই বিভেদ ও মনোমালিন্য উপস্থিত হয়েছে, তখন হাজার চেষ্টাতেও আন্দোলন জয়লাভ করতে পারেনি। ১৯২০ সালে ও ১৯৩০ সালে কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে আন্দোলন গ'ড়ে উঠেছিল তা'তে জাতীয় শক্তি কোথাও ক্ষুণ্ণ অবস্থায় ছিল না। তাই সেই সংগ্রাম দেশকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আমাদের অজানিতে আমরা অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথই অনুসরণ করছিলাম।

১৯২০ সালে গান্ধীজী খিলাফত আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদ-বিদ্বেষকেও জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে একত্রিত ক'রে সাম্রাজ্যবাদকে বিপদ্‌গ্রস্ত ক'রে তুলেছিলেন। কিন্তু আজ আমাদের দেশেরই মুসলমানদের আন্দোলনকে জাতির আন্দোলনের সঙ্গে আমরা যুক্ত করতে পারি নি, এবং সেই কারণে সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করতে পারছি না। ফলে পরস্পরের উপর দোষারোপ ও হতাশারই সৃষ্টি হ'চ্ছে।

১৯৩৪ সালের পর যখন জাতীয় আন্দোলনে ভাঁটা পড়েছিল, তখন যে সমস্ত বামপন্থী চিন্তাধারা কংগ্রেসের মধ্যে প্রবেশ করে তার বিরুদ্ধে পুরানো নেতৃত্ব বাধা দিয়েছিল। কিন্তু শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে কংগ্রেস আন্দোলনকে হাত মেলাবার জন্য জওহরলাল যে ডাক দিয়েছিলেন লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে, তা' জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করেনি, শক্তিশালী করেছিল। আজ দশ বছর পরে কংগ্রেসের আবার সেইরূপ অবস্থা এসেছে; এবং নতুন শক্তি, নতুন চেতনাকে বরণ না ক'রে কংগ্রেস যদি আপন খোলসের মধ্যে ঢুকে থাকবার চেষ্টা করে তাহলে কংগ্রেসও দুর্বল হবে, জাতীয় আন্দোলনও বিপন্ন হবে।

সারা দুনিয়াতে' আজ জাতীয় ঐক্য-প্রতিষ্ঠার পর মুক্তির পথ খুলে যাচ্ছে। আদর্শের বিরাট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সে সব দেশে বিভিন্ন দলের মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠা হয়েছে—শত্রুর বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রাম করতে, দারুণ সংকটে জনগণকে সেবা ক'রে তার বিশ্বাস ও নেতৃত্ব অর্জন করতে। কিন্তু, পাঁচ বছর ধ'রে আমাদের জাতীয় নেতৃত্ব—কংগ্রেস ও লীগ দুইই—অসার অবস্থায় থেকে দুনিয়ার রূপও চিনতে পারছেন না, আপন জনগণকে দারুণ দুর্দশায় এতটুকু সাহায্য করতে অগ্রসর হচ্ছেন না। আপন দল বা আদর্শের ন্যায্যতা প্রমাণ করতেই তাঁরা ব্যস্ত। পৃথিবীর দিকে চেয়ে তাঁরা দেখছেন না যে, বিরোধী দলের সঙ্গেও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে আদর্শের জলাঞ্জলি দেবার প্রয়োজন হয় না, বরং জনগণকে সেবা করলে জনগণের মধ্যে সেই আদর্শেরই বাণী প্রসারলাভ করবে।

নব গণতন্ত্রের ইতিহাসে ভারত ও চীন একদিন প্রথম পথ দেখায়। কিন্তু আজ এই দুই দেশেই জাতীয় অনৈক্য যেন দানা বেঁধে গিয়ে নব গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অশেষ ক্ষতি করছে। তাই আজ আমাদের প্রয়োজন ইয়োরোপের দিকে তাকিয়ে দেখা। তাতে দাস-মনোবৃত্তি প্রকাশ পাবে না, বরং আমাদের মনে করিয়ে দেবে স্বাধীনতার সঠিক পথ কোন দিকে। প্রায় দশবছর আগে জওহরলাল

বলেছিলেন, "We realise then that we cannot isolate India or the Indian problem from that of the rest of the world. To do so is to ignore the real forces that are shaping events and to cut ourselves adrift from the vital energy that flows from them. To do so, again, is to fail to understand the significance of our own problems, and if we do not understand this how can we solve them ?"

আজ দশবছর পরে জওহরলাল কি দুনিয়ার দিকে চেয়ে বুঝতে পারছেন না যে, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা-লাভ করবার একমাত্র উপায় হ'ল জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা,— যে উপায়ে ইয়োরোপের পদানত জনগণ আজ আবার মুক্তিলাভ ক'রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করছে ?

নিখিল চক্রবর্তী

মালদহের গম্ভীরা

গম্ভীরা গানের যেমন একটা বিশেষ ভৌগলিক ক্ষেত্র আছে—সেটা হ'চ্ছে মালদহ জেলা, তেমনি তার একটা বিশেষ কালও আছে—সেটা বৈশাখ মাস। ছোটবেলায় মালদাই আমের জন্যে যেমন জ্যৈষ্ঠ মাসের একটা রোমাঞ্চ ছিল—তার চেয়েও বেশী রোমাঞ্চ ছিল বৈশাখ-শেষের গম্ভীরার জন্যে। শহরের পাড়ায় পাড়ায় অনেকগুলো বাঁশ দিয়ে বিশেষ এক ধরনের কাঠামো তৈরী হয়েছে—তার ওপর পাল দিয়ে ছাওয়া। কাগজের ফুল আঁটবার সুযোগ পেয়েছি তো ভেবেছি জীবনটা সার্থক হ'লো। এক এক পাড়ায় এক একজন মাতব্বর গোছের ছেলেকে কেন্দ্র ক'রে দল গ'ড়ে উঠতো—যারা চাঁদা তোলা থেকে শুরু ক'রে পাল টাঙানো পর্যন্ত সব কাজ করবে।

কয়েকদিন ধ'রে এই অনুষ্ঠান চলে (অবশ্য সব জায়গার জন্যে একই দিনের ব্যবস্থা নয় ; কয়েকদিন ধরে এক পাড়ায় চলে আবার পরে আর এক জায়গায় শুরু হয়—এইরকম)। প্রথম দিন সন্ধ্যায় দলে দলে ছেলে (বেশীর ভাগই নিম্ন মধ্যবিত্তের এবং এই অনুষ্ঠানটিও প্রধানত নিম্ন মধ্যবিত্তের—যোগ দেয় সবাই) দুই দিকের কোমরে দুটো লোহার শিক্ চামড়ার মধ্য দিয়ে ফুঁড়ে বাঁ হাত দিয়ে ধরে—শিক্ দুটোর মাথায় মশালের মত ন্যাকড়া জড়ানো, তা'তে দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলছে। দলে দলে ছেলে সেই কোমরে-বেঁধানো শিকের আগুন নিয়ে ঢাকের তালে এক ধরনের বিশেষ নাচ নাচছে আর মাঝে মাঝে তালে তালে

সেই আগুনে ধূপ ছুঁড়ে মারছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে আগুন লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। এইভাবে তারা প্রথমদিন রাত্রে বাড়ী বাড়ী গিয়ে চাঁদা তোলে এবং বিনা ওজরে যার যা সাধ্য তাই দেয়। এই ধরনের মশাল-নৃত্যের ভয়াল সৌন্দর্য শিশু-মনে যে দোলা দিয়ে গেছে, স্মৃতির মণি-কোঠায় আজও তার কিছু কিছু সন্ধান পাই। প্রাচীন ধর্মানুষ্ঠানে এই ধরনের শিক ফুটানোর আত্মনিগ্রহে—নৃত্যের ভিতর থেকে শিশু-মন যেটা বেছে নিতো, তাতে বিস্ময়ের চেয়ে হর্ষ বেশী, ভয়ের চেয়ে আনন্দ। তাই হাসি ও আনন্দের লহরী তুলে আত্মভোলা শিশুর দল শহরের অলিতেগলিতে সেই সব নাচিয়েদের পেছন পেছন ছোটে।

অনুষ্ঠানের প্রথম দিন হয় 'ছোট তামাসা'। এটা উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। শহরের যত ছোক্‌রার দল আবোল তাবোল এবং তাণ্ডব নাচ নাচে। দ্বিতীয় দিন 'বড় তামাসা'—একটা দেখবার মত জিনিস। নানারকম মুখোস প'রে কেউ শ্মশান কালীর, কেউ রক্ষা কালীর, কারও কারও রাধাকৃষ্ণ বেশ, মাতালের ভূমিকা—যুগল, একক নানারকম নাচ সারা রাত ধ'রে নাচে। রাত্রের এক একটা বিশিষ্ট সময়ে এক একরকম নাচের ব্যবস্থা আছে। সারা রাত জেগে চোখ জবাফুলের মত লাল ক'রে সবাই সে নাচ দেখে। আমরা—ছোটবেলায় যারা নিশাচরের ভূমিকায় অভ্যস্ত হতে পারিনি (অধিকাংশই তাড়ির নেশায় বিভোর হ'য়ে রাত কাটায়) তারা, অন্তত আমি, দিদিমাকে বার বার ক'রে রাত্রে শোবার আগে ব'লে রেখেছি—দিদিমা, ভোরে ডেকে দেওয়া চাই কিন্তু! ভোরে উঠেই (তখনও আবছা অন্ধকার) ঢাকের আওয়াজ লক্ষ্য ক'রে ছুটেছি—কালীর নাচ চলছে—ঢুলু ঢুলু চোখে দর্শকরা তখনও ব'সে ব'সে সেই অনুষ্ঠান দেখছে—সারা উৎসব-ক্ষেত্রটি জুড়ে যেন একটা অলস ঘুমের মাদকতা।

তৃতীয় দিন হ'চ্ছে 'বোলাই', এবং এইটি উৎসবের প্রধান আকর্ষণীয় বস্তু। উৎসব-ক্ষেত্রের সামনেই ছোট্ট একটা মন্দিরে মহাদেব ব'সে আছেন—স্তিমিত নয়ন (ধর্মের দিক দিয়ে গম্ভীরা হ'চ্ছে মহাদেবের আরাধনা—নানা ভঙ্গিতে, নানা কায়দায়)। মহাদেবকে লক্ষ্য ক'রে (অথবা উপলক্ষ্যও বলা যেতে পারে) সারা বছরের সামাজিক এবং রাজনৈতিক পর্যালোচনা ও সমালোচনাই গম্ভীরার বিষয়-বস্তু—অবশ্য অনেক সময় অনেক নিকৃষ্ট এবং অশ্লীল ধরনের মন্তব্যও এসে পড়ে। তাতে একদিকে স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌-এরও যেমন ভূমিকা আছে, তেমনি আছে স্থানীয় রেশনের দোকানের কর্মচারীর ভূমিকা। অবশ্য, যুদ্ধের পর থেকে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় আলোড়নের সাথে সাথে গম্ভীরার কবিদের যে সমাজচেতনাও ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে, সেটা কয়েক বছরের গান শুনেই বেশ বোঝা যায়। তারই কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি।

বস্ত্রসংকট সম্বন্ধে একজন কবি লিখেছেন:

> হায়রে বাপরে একি হ'লো, বস্ত্র-সঙ্কট এসে পড়লো
> (কাপড়) খুঁজে পায় না মৃত ঢাকবার কারণে।

গম্ভীরা-কবিদের রাজনৈতিক চেতনা যে বেশ স্পষ্ট, তা নিচের দুটো লাইন থেকে বেশ বোঝা যাবে :

ধরণী ধরের (কবির নাম) এক কথা, অন্য কোন কথা নাই
তোমার কাছে এই মিনতি—পূর্ণ-স্বাধীনতা চাই।

বস্ত্র-সংকটই এবার গম্ভীরার ওপর বেশী ছাপ ফেলেছে। নিচে আরও কয়েকটা লাইন তুলে দেওয়া গেল :

পুরা কালের দুষ্ট দুঃশাসন কৈল দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ
সে কথা আছে মোদের স্মরণ
মোদের বস্ত্র হরণ করলে দুষ্ট দু'জনাই (আমলাতন্ত্র, মজুতদার)।

চোরা বাজার সম্পর্কেও এবার গম্ভীরায় বেশ ছাপ পড়েছে :

দুঃখের কথা বলবো কি আর, সব জিনিসের চোরা-বাজার
চোরেই কেনে, চোরেই বেচে, ভাল মানুষের কেনা সাধ্য নাই।

এমন কি, বাংলাদেশের এই ৯৩ ধারার কুফল সম্বন্ধেও এঁরা অচেতন নন্।

হায়রে বাপ—হ'ল্যাম দিশ্যাহারা
বাতিল কর তিরানব্বই ধারা
নইলে সব হয়ে যাবে সারা,
লীগ-কংগ্রেস সম্মিলিত
মন্ত্রী পুনর্গঠন করা চাই ॥

বন্দী কংগ্রেস-নেতাদের সম্বন্ধেও এঁরা উদাসীন নন।

শুন ওহে পঞ্চানন, বন্দী আজ কংগ্রেস নেতাগণ,
সদুপায় করহ এখন, তোমার কাছে এই নিবেদন
আমরা তাদের মুক্তি চাই ॥

স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির দুর্নীতি, এবং শহরের অনেক খুঁটিনাটি ঘটনাও এঁদের চোখ এড়াতে পারে না—যেমন, কে কা'র মুখে টর্চ ফোকাস্ করেছে, কে গাঁজার কারবার করে, ইত্যাদি।

গম্ভীরার গানের ভাষার চেয়ে তার গানের সুরে এবং তারই সাথে সাথে তাল রেখে নাচের মাধুর্যই শ্রোতাদের প্রধানত আকৃষ্ট করে। সুরটা একেবারে মৌলিক —বাংলার কোন অঞ্চলের গানে এই ধরনের সুর আছে ব'লে জানি না। এর নাচেরও কোন তুলনা নাই—এও এক ধরনের মালদার নিজস্ব সৃষ্টি।

গম্ভীরার প্রধান ত্রুটি হ'চ্ছে এর অশ্লীল উক্তি এবং নৃত্যভঙ্গি—যা উন্নত রুচিতে সত্যিই বাধে। এই ত্রুটির প্রধান কারণ—এত বড় লোক-কলায় সত্যিকার উন্নত রুচির কোন শিল্পী আজও আকৃষ্ট হন নি। জনগণের নিকৃষ্ট রুচিকে চরিতার্থ করতে গিয়ে আধুনিক সিনেমার মত গম্ভীরাও মসী-লিপ্ত হ'য়ে আছে। মালদহের লোক-কলা, লোক-শিক্ষা, সামাজিক উৎসব প্রভৃতিতে যার এত বড় দান এবং যাদের পরিপুষ্ট করবার মত একটা বিরাট সম্ভাবনা গম্ভীরার মধ্যে রয়েছে, তাকে অপাঙক্তেয় ক'রে রাখার

দায়িত্ব অস্বীকার করি কি ক'রে? সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সম্ভাবনা গম্ভীরার মধ্যে প্রচুর রয়েছে—যাকে কেন্দ্র করে বাংলার একটি বিশিষ্ট অঞ্চলের সামাজিক এবং রাজনৈতিক অগ্রগতি বেশ দানা বেঁধে উঠতে পারে। গম্ভীরার মধ্য দিয়ে শিল্পীর নৃত্যকলা আর কবির কবিত্ব-শক্তির বিকাশের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে, যেমন সুযোগ রয়েছে জনগণের শিল্প-চেতনাকে উঁচু থেকে উঁচু স্তরে নিয়ে যাবার। খুবই দুঃখের বিষয়, মালদহের এতবড় সাংস্কৃতিক সম্পদের উপর সম্প্রতি আমলাতান্ত্রিক জুলুম শুরু হয়েছে। মালদার একজন সর্বশ্রেষ্ঠ গম্ভীরা গায়কের ওপর নিষেধাজ্ঞা এসেছে—সে আর গম্ভীরা গান করতে পারবে না। অপরাধ?—অপরাধ হ'চ্ছে সরকারী দুর্নীতির সমালোচনা।

অমল সান্যাল

পুস্তক পরিচয়

রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা—নীহাররঞ্জন রায়, (দুই খণ্ড, দি বুক এম্পোরিয়াম্ লিমিটেড, ৮৲)

চার বৎসর হ'ল রবীন্দ্রনাথের দেহান্ত হয়েছে। এত বড় মহাকবির প্রতিভার ঠিকমত পরিমাপ করা এখনো সম্ভব নয়। সাধারণ ভাবে এই কথাই আমরা সকলে বুঝি। এখনো সে প্রতিভা আমাদের পক্ষে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়েরই বস্তু; তার বিচার বিশ্লেষণ তাই এখনো সম্ভব নয়। যথার্থ মূল্যনির্ধারণ তো নিশ্চয়ই অসম্ভব। এখনো পর্যন্ত আমাদের পক্ষে যা সম্ভব তা রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয় গ্রহণ, তার নানা দিকের পরিচয় সংগ্রহ। অবশ্য সে প্রয়াসেও কিছু-না-কিছু মূল্যবোধ ও সাহিত্য বিচারের প্রশ্ন উঠে পড়েই। তা পড়বেও; তবু রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয় গ্রহণে তা মুখ্য না হতেও পারে। মুখ্য না হলেই সম্ভবত সাধারণ পাঠকের ও সাধারণ আলোচনার পক্ষে তা সহায়ক হয়।

শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা' এই অর্থেই সার্থক রচনা, এই আমাদের বিশ্বাস। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৪৮-এ; তখনো কবি বর্তমান। দ্বিতীয় সংস্করণ কবির মৃত্যুর তিন বৎসর পরে প্রকাশিত হয়েছে—একবৎসর পূর্বে ১৩৫১-র শ্রাবণে। দ্বিতীয় সংস্করণেও ডাক্তার রায় সাধারণ ভাবে প্রথম সংস্করণের মূল কাঠামো বজায় রেখে চলেছেন। তবে দুই খণ্ডে এবার গ্রন্থ অনেক বেড়েছে; তৃতীয় খণ্ডে ভবিষ্যতে তিনি রবীন্দ্র কাব্যের বাদবাকী বিষয়ের আলোচনা করবেন, জানিয়েছেন। এই দ্বিতীয় সংস্করণে 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা' অনেক পরিশোধিত ও পরিবর্তিত হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক পরিচ্ছেদেই লেখক কিছু-না-কিছু নূতন কথা যোগ করেছেন। কবিতার আলোচনা প্রথম সংস্করণে শেষ

হয়েছিল 'পুষ্পবীতে' পৌঁছে। এই দ্বিতীয় সংস্করণে পরবর্তী কাব্যও আলোচিত হয়েছে। সে জন্য এই পরিচ্ছেদেই লেখককে নূতন লিখতে হয়েছে প্রায় দেড়শ' পৃষ্ঠা। তা ছাড়াও প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে ('কবি রবীন্দ্রনাথ') ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ('রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্ব-জীবন') নীহারবাবু নূতন অনুচ্ছেদ সংযোজন করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডের 'নাটক ও নাটিকা', 'ছোট-গল্প', 'উপন্যাস' প্রভৃতি পরিচ্ছেদেও এরূপ নূতন সংযোজন যথেষ্ট রয়েছে—এ সব বিভাগেও রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের লেখা পর্যন্ত এবার সবই নীহারবাবু আলোচনা করেছেন। দুই সংস্করণ মিলিয়ে দেখ্‌লে আরও দেখা যাবে, সত্য সত্যই প্রথম সংস্করণের আলোচনা মাঝে মাঝে সংশোধিত হয়েছে। কোথাও সে সংশোধন হয়ত শব্দগত। যেমন, 'তত্ত্ব' শব্দটির স্থানে নীহারবাবু দ্বিতীয় সংস্করণে 'প্রত্যয়', 'প্রত্যয়-ভাবনা', 'প্রত্যয়-শাসন' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করেছেন। কোথাও কোথাও অবশ্য নীহারবাবুর সংশোধন অর্থগত। একটি দৃষ্টান্ত হাতের কাছেই পাওয়া গেল: 'কাব্যপ্রবাহের' দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথের পরিবার-পরিবেশের কথা এবার সংযোজিত হয়েছে—'কবির একান্ত স্বতন্ত্র, অন্তর্মুখী, আত্মভাব-পরায়ণ কবি-কল্পনার' মূল কোথায় তা বোঝবার জন্য। এটি শুধু সংযোজন নয়, সংশোধনও। নীহারবাবুর কাব্যালোচনার পদ্ধতিতে কবির 'পরিবার পরিবেশের' হিসাব নেওয়া আবশ্যক ছিল, তাই তিনি এবার তা যোগ করেছেন। এরূপ সংযোজনই উপন্যাস আলোচনায়ও আরও পাওয়া যাবে। তাতে বুঝ্‌তে পারি—এই তিন বৎসরে ডাক্তার রায়ের নিজের গৃহীত আলোচনা-পদ্ধতি সম্বন্ধেও কিছু কিছু ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। হয়ত রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অন্যান্য আলোচনাও এদিকে তাঁকে সাহায্য ক'রে থাকবে; নিজেও তিনি আপনার পূর্বেকার আলোচনা-পদ্ধতির অসম্পূর্ণতা বুঝে থাকবেন।

এই খানেই এ প্রসঙ্গে বলা দরকার—ডাক্তার রায়ের আলোচনা-পদ্ধতি এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। এ পদ্ধতিতে তাঁর প্রত্যয় থাকলে তিনি 'কবি রবীন্দ্রনাথ' নামে পরিচ্ছেদে তাঁকে শুধুমাত্র কবি হিসাবে দেখ্‌তে বল্‌তেন না; 'রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বজীবন' পরিচ্ছেদটি তাঁকে একেবারে নূতন করে ভাব্‌তে ও লিখ্‌তে হত। দুটি প্রবন্ধই ডাক্তার রায়ের বহুদিন পূর্বেকার লেখা—তাঁর নিজের বর্তমান দৃষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্য এসব লেখার এখন বেশি নেই, এ সন্দেহ তাঁর নিজেরও রয়েছে। কিন্তু তাঁর নিজের দৃষ্টি যে কি, সে সম্বন্ধে এখনো ধারণা সুস্পষ্ট হয় নি। এই প্রসঙ্গে তা'ই তাঁকে বলা দরকার। প্রথম সংস্করণে তিনি বলেছিলেন, তাঁর আলোচনা পদ্ধতি কালানুক্রমিক, এবং রবীন্দ্র সাহিত্যকে তিনি বুঝতে চেষ্টা করেছেন "কবির ব্যক্তিজীবন ও সমসাময়িক সমাজেতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে।" নূতন সংস্করণে সেই পদ্ধতির তিনি ব্যাখ্যা করেছেন ('নিবেদন', 'কাব্যপ্রবাহ' পৃঃ ৮৪-৮৭), "ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে রবীন্দ্র 'প্রতিভার বিবর্তন ইতিহাসই" হয়েছে তাঁর লক্ষণীয়। ডাক্তার রায় এই সব কথায় যা বল্‌তে চেয়েছেন, মনে হয় তা এই: তিনি ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে রবীন্দ্র সাহিত্য আলোচনা করেছেন। দুই সংস্করণেই নানা স্থানে তিনি এই মর্মের কথা বলেছেনও

কিন্তু তাঁর এই উক্তিতে বা এই দাবিতেই আপত্তি হতে পারে। 'ঐতিহাসিক দৃষ্টি' বা 'ঐতিহাসিক বোধ' কথা দু'টির সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিষ্কার হওয়া চাই। ঐতিহাসিক দৃষ্টি বা ঐতিহাসিক বোধ বলতে শুধু কালানুক্রমিক (chronological) আলোচনা বোঝায় না। কিম্বা সেরূপ আলোচনাতে 'পরিবার পরিবেশের' কথা যোগ করলেই যে আলোচনাটি 'ঐতিহাসিক পদ্ধতির' আলোচনা হয়ে ওঠে, তাও নয়; বড় জোর তা তখন হয় পারিপার্শ্বিক-গত (Environmentalist) আলোচনা। নীহারবাবুর প্রথম সংস্করণের আলোচনা-পদ্ধতি ছিল প্রধানত কালানুক্রমিক—রবীন্দ্র সাহিত্যের কালানুক্রমিক বিকাশের হিসাব। দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি পারিপার্শ্বিক-গত আলোচনাকে যথাসম্ভব তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। সব ক্ষেত্রে এ হিসাবেও যে তা গ্রাহ্য হবে, তা নয়। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের আলোচনা। সে আলোচনায় তিনি বাহ্যলক্ষণগুলোকে বড় ক'রে তুলেছেন—বঙ্কিম অভিজাত চিত্র এঁকেছেন, রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন মধ্যবিত্ত জীবন, শেষ দিকে মধ্যবিত্ত নরনারীর প্রেমলীলা। কথাটা অর্ধসত্য, বা সিকি সত্য। এ ছাড়া উপন্যাস ও তার পারিপার্শ্বিকগত ব্যাখ্যা যেটুকু ডাক্তার রায় দিয়েছেন, তা সন্তোষজনক হয় নি। 'ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে' দেখলে বাঙলা উপন্যাসের এই ব্যাখ্যা গ্রাহ্য হবে না। 'ঐতিহাসিক দৃষ্টি' সংবন্ধেই ডাক্তার রায়ের ধারণা এখনো পরিষ্কার বুঝা যায় না। তার প্রমাণ তিনি রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কাব্যালোচনায় দেখ্ছেন ১৯৩০ সন থেকে "ঐতিহাসিক চেতনায় কবিমানসের নবজন্ম।" ডাক্তার রায় মনে করেছেন, রবীন্দ্রনাথ 'রাশিয়ার চিঠি' লিখ্ছেন, বালান্তর (১৯৩৭) সংবন্ধে সচেতন হয়েছেন, 'সভ্যতার সংকট' উপলব্ধি 'করেছেন'; অতএব "কবিগুরুর চিত্তে মানুষ ও মানবতার ঐতিহাসিক বোধ জন্মিয়াছিল।" তাঁর এরূপ উক্তির বা সিদ্ধান্তের কারণ—"নবজাতক" গ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রনাথের "বস্তু চেতনার সঙ্গে ঐতিহাসিক বোধের" শুভ পরিণয় লক্ষণীয়। এবং এই প্রত্যক্ষবোধ ও অনুভূতি হইতেই ঐতিহাসিক বোধের জন্ম, এক কথায় বস্তুধর্ম বোধের জন্ম। বস্তুত প্রত্যক্ষবোধ ও অনুভূতিই যখন মননের সঙ্গে যুক্ত হয় তখনই ঐতিহাসিক বোধের সূচনা দেখা দেয়।" কিন্তু ডাক্তার রায়ের এসব কথাও এতই ঝাপসা যে তার পরিষ্কার মানে করা সহজ নয়। এই ঝাপসা কথা ঝাপসা ধারণার বাহক বলেই লেখকের "ঐতিহাসিক বোধ" ও "বস্তুচেতনা" সংবন্ধে ধারণাও পাঠকের পক্ষে ঝাপ্সা থেকে গিয়েছে।

প্রশ্ন হবে 'ঐতিহাসিক বোধ' তা হলে কি? এ প্রসঙ্গে তা আলোচনার স্থান নেই। 'ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে' রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ ভাবে কেউ এখনো বুঝতে চেষ্টা করেন নি। সে দিক থেকে যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে চান তাঁরা বরং অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লেখা পদ্মা সিরীজে ইংরেজী গ্রন্থ 'টাগোর' আলোচনার সঙ্গে একমত হবেন। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় অবশ্য একমাত্র ঐতিহাসিক পদ্ধতিতেও রবীন্দ্রনাথকে বিশ্লেষণ করেন নি—করেছেন তাঁর নিজস্ব দৃষ্টি দিয়ে উচ্ছল বুদ্ধি ও ভাষায়, তা বলা প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের এই মানসিক বিবর্তনকে "ঐতিহাসিক বোধ" বলা অপেক্ষা বলা উচিত—তাঁর বরাবরকার উদার আদর্শবাদের ও মানবতার স্বাভাবিক বিকাশ। ঐতিহাসিক শক্তি নিচযের বিচার বিশ্লেষণের উপর এর ভিত্তি নয়; কবির অন্তরের সুস্থ আদর্শ-নিষ্ঠা ও মানব-নিষ্ঠারই সাক্ষী তাঁর শেষ দশ বৎসরের লেখা ও জীবন। এটিই স্বাভাবিক—সুস্থ গণতন্ত্র যেমন শ্রেণীস্বার্থ ও ব্যক্তি-স্বার্থের মোহ কাটাতে পারলে পরিণত হয় সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে; তেমনি সুস্থ উদারনীতি ও আদর্শ-বাদেরও ফ্যাশিস্ত বর্বরতার যুগে এরূপ পরিণতিই লাভ করবার কথা। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা এ সত্যেরই প্রমাণ পেলাম।

কিন্তু এরূপ 'ঐতিহাসিক দৃষ্টিকে' বা অন্য যে কোনো মতাদর্শের দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হবে, এমন দাবী সাধারণ পাঠকের নয়। তাঁরা রবীন্দ্রসাহিত্যের একখানি পরিচয় গ্রন্থ চান সর্বাগ্রে; সেদিক থেকেই ডাক্তার রায় তাঁদের ধন্যবাদ পাবার অধিকারী। কালানুক্রমিক এবং কতকাংশে পারিপার্শ্বিক-গত আলোচনা হিসাবে তাঁর 'রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা' সার্থক গ্রন্থ। রবীন্দ্রসাহিত্যের বিস্তৃত ও সাধারণ পাঠ্য পরিচয় বেশি নেই। ডাক্তার রায়ের কালানুক্রমিক আলোচনা চমৎকার হয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যের একটির পর একটি স্তর বিশদ রূপে তিনি নির্দেশ করেছেন; স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক নিয়েও যে আলোচনা তিনি করেছেন, তাতেও পাঠক যথেষ্ট উপকৃত হবে। বল্‌তে কুণ্ঠা নেই, বর্তমান পাঠকও তাতে উপকৃত হয়েছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গেই একটি কথা নিবেদন করব—ডাক্তার রায়ের পল্লবিত ভাষাও বাগ্‌-বাহুল্য এদিকে পাঠকের পক্ষে একটি বাধা। বাংলা সমালোচনার ভাষা সাধারণতই অলঙ্কারে ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। কিন্তু এ ঐতিহ্য কাটিয়ে উঠবার দিন এসেছে। সমালোচনার যদি কোনো আদর্শ থাকে তবে তা প্রসাদগুণ; সমালোচনার ভাষা অন্তত হওয়া দরকার স্বচ্ছ, প্রাঞ্জল। এদিকে ডাক্তার রায় অবহিত হলে হয়ত গ্রন্থ এত দীর্ঘ হবে না, এবং সাধারণ পাঠক তাঁর গ্রন্থপাঠে আরও আনন্দ লাভ করবে।

কারণ রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকার নাম সার্থক; বাঙালী পাঠকের সঙ্গে রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয় এই ভূমিকার প্রসাদে সহজ হবে।

গোপাল হালদার

ইংরেজী সংস্কৃতির প্রসার ও প্রচার

The Diffusion of English Culture Outside England. A Problem of Post war Reconstruction by H. V. Routh, M. A., D. Litt. Cambridge University Press.

যুদ্ধের পরে ইংরেজদের প্রতিপত্তির কি হাল হবে তা নিয়ে মাথা ঘামান শুরু হয় যুদ্ধ না থামতেই। ইংরেজদের টনক নড়েছে। ঘর সামলান সহজ; কিন্তু

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির মুখ চেয়ে, সংস্কৃতিকে অশ্বমেধের ঘোড়ার মত বাইরে পাঠান দরকার হ'য়ে পড়ে। অথচ শুধু পাঠালেই হ'ল না। ঘোড়া কোথাও বাঁধা না পড়ে তা দেখবার জন্য সঙ্গে ঘোড়সওয়ারও পাঠাতে হবে। এই সব ঘোড়সওয়ারের আবার শ্রেণীবিভাগ আছে। কূটনীতিজ্ঞ আর লিখিয়ে, ব্যবসাদার আর ভ্রমণকারী, শিক্ষক আর সৈনিক—এঁরা সবাই এই দলে আছেন। তলোয়ার আর বন্দুক দিয়ে এক সময় দেশ জয় করা হ'ত; আজ হ'চ্ছে বোমা আর উড়োজাহাজ দিয়ে। বোমা, বন্দুক আর তলোয়ার দিয়ে দেশ জয় করা যায়; ভয় দেখিয়ে সাময়িক প্রতিপত্তি স্থাপন করা যায়; চিরকাল রাখা যায় না। তার জন্য মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করাটাই সব চেয়ে ভাল উপায়। শিকল দিয়ে না বেঁধে নেশা দিয়ে ভোলানটাই বেশী কাজের। বিদেশে সংস্কৃতি বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা এখানেই।

গত শতাব্দীতে জাতীয়তার জায়গায় আন্তর্জাতিকতা আসি আসি ক'রেও এল না। আশা পুরলো না। তার একটা কারণ হ'চ্ছে যে আন্তর্জাতিক ব্যবসাদারীতে সাধারণত এক দেশ আর এক দেশকে বিশ্বাস করতে শিখলে না। যারা সৌখীন জিনিস রপ্তানী করে, ধান, চাল বা লোহা লক্কড় আমদানী করে, তাদের ভাতে যে-কোন সময় হাত পড়তে পারে। এই ধরনের ভয়ে কোন কোন দেশ বিশেষ বিশেষ ট্যাক্স বসাতে বা সেনাদল রাখতে বাধ্য হ'ল। তারপর আছে ভৌগলিক বৈশিষ্ট—যেমন বেলজিয়মের, গ্রীসের। গ্রীসের পাঁচটি বন্দর হাতে থাকলে পূর্বভূমধ্যসাগরও হাতে থাকে।

তারপর এমন সব দেশ আছে যারা শক্তিতে ক্ষীণ হ'লেও সম্পদে হীন নয়। তাদের ঐশ্বর্যের ওপর প্রতিবেশী দেশের চোখ আছে। তাই প্রথমোক্তরা পারতপক্ষে নিরপেক্ষ থাকতে বাধ্য। নিরপেক্ষ দেশ বলতে এমন দেশ বোঝায়, যার যুদ্ধের সামর্থ নেই অথচ প্রয়োজন আছে। সে-প্রয়োজন আত্মরক্ষার প্রয়োজন। ডাকাতের হাত থেকে বাঁচবার প্রয়োজন। এ-সব ক্ষেত্রে পরস্পরকে তোয়াজ ক'রে রাখা ছাড়া উপায় নেই। মনে যাই থাক, মুখে সবাই—"ভাই ব্রাদার"। "ভাই ব্রাদারি" ভাবটা বজায় রাখতে সংস্কৃতির আদান প্রদান সহায়তা করে।

সংস্কৃতির আদান প্রদান জিনিসটা কিন্তু শাঁখের করাত। যেতেও কাটে, আসতেও কাটে। সংস্কৃতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা বেড়ে যায়। নতুন সমস্যা দেখা দেয়। সাধারণত শিক্ষার ছকটা হ'চ্ছে এই যে, ছাত্রেরা নিজেদের দেশের ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনৈতিক অবস্থা, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদি জানবে। ফলে তারা জানতে পারে দেশের অতীত গৌরবের কথা, বুঝতে শেখে বিদেশী কিভাবে শোষণ করছে বা করবার ব্যবস্থা করছে; ভাবতে শেখে কি ক'রে সে-শোষণ বন্ধ করা যায়। বিদেশী ওস্তাদ যদি বাণ মারে, দেশী ওস্তাদ তার কাটান দেবার অস্ত্র শেখে, শাদা চামড়ার দায়িত্ব পালন করতে ইংরেজরা এ-দেশে নতুন ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা করলে। আমরা পেলাম সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাত্মা গান্ধীকে।

দেখা গেছে অপেক্ষাকৃত অগৌরবের দিনে কোন কোন জাতি হয়তো খুব বড় শিল্প বা সাহিত্য রচনা করতে পারেনি; কিন্তু এই সব যুগে সেইসব দেশে এমন অনেক লোক জন্মেছে যাদের চোখ-কান খোলা। কাজে লাগালে এদের দিয়ে পাহাড় টলানো যায়, জনগণকে জাগানো যায়। দেশের ভাগ্য সময়ে সময়ে হাতের জোরের ওপর যতটা না নির্ভর করে, তার চেয়ে ঢের বেশী নির্ভর করে মাথার জোরের ওপর। সেই মাথার জোর যাতে মাথা চাড়া না দিতে পারে তার বন্দোবস্তের কমতি নেই। ঘরে বাইরে দেশের লোকের মনের ওপর যে সেন্সরের কড়া পাহারা বসান হয়েছে, তা জানতে কি কারও বাকি আছে?

কিন্তু সেন্সরকে ফাঁকি দিয়েই এরা ভাবতে শেখে। নিজেদের উন্নতি চায় বলেই এরা অন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্র বা অন্য বড় রাষ্ট্র কি হালে চলছে তা জানতে চায়। এই সব রাষ্ট্রের কারো হাজার দু-হাজার বছরের ঐতিহ্য আছে। কেউ বা হালফিল গড়ে উঠেছে। বিশেষ ক'রে ছোটগুলির কথাই ধরা যাক। এদের সংস্কৃতি অনেক সময় ধারাবাহিক নয়। এদের শিল্প-ব্যবস্থাও অনেক সময় পরিপূর্ণতা লাভ করেনি। তাছাড়া এদের অনেকেরই এমন এক ভাষা যা বিদেশীরা শিখতে চায় না, জগতের জটিল ভাবধারাকে বেঁধে রাখতে সে-ভাষা সমর্থ নয়। ফলে নিজেদের পরিপুষ্টির জন্য এদের ধার করতে হয়, বিদেশীর ভাণ্ডার থেকে আহরণ করতে হয়।

কিন্তু এদের মধ্যে একবার জ্ঞান বাড়তে শুরু করলে, জাতির কোঠা পেরিয়ে আন্তর্জাতিকতার কোঠায় যাবার লক্ষণ দেখা দিতে পারা বিচিত্র নয়। পোষ্টাপিস বা এরোপ্লেন যেমন দেশের সীমানা মানে না, সংস্কৃতিও তেমনি সীমানা মানতে চাইছে না। খুব ছোট ছোট জাতির ভিতরেও এমন দু-চার জন সংস্কৃতিবান লোক দেখা যায়, যারা "বিশ্বের নাগরিক," বিশ্ব-সংস্কৃতির প্রচারক। এর মূলে অবশ্য রাজনৈতিক কলকাঠির খেলা আছে।

নানান কারণে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রেরা শিখতে চায় বা শিখতে চাইবার ভাণ করে। ঠিক সেই সব কারণেই বিজেতা রাষ্ট্র পরাধীন রাষ্ট্রগুলিকে শেখাতে চায়। নিজের গরজেই স্কুল পাঠশালা খুলে বসে; দেশ থেকে মাষ্টার আমদানী করে। বিদেশের ছাত্রদের দেশে ডেকে নিয়ে গাঁটের কড়ি খরচ ক'রে শেখায়।

ফরাসী, আমেরিকান, জার্মান ইতালীয়ানরা এ কাজে বেশ পাকা। ইংরেজরা বলছে যে, তারাই সবচেয়ে পরে এ কাজে নেমেছে। ওদের একটা গর্ব ছিল—আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মালিক। আমরা আবার বিজ্ঞাপন দেব কি?

ক্রমে বিদেশ থেকে সাবধানী বাণী আসতে লাগল। কনসাল, এজেণ্ট, ভ্রমণ-কারীরা বলতে লাগলেন—আমরা মান খোয়াতে বসেছি। সবাই এগিয়ে যাচ্ছে। ইওরোপের অন্য দেশে ইংরেজী বই, ইংরেজী ছায়া-ছবি, ইংরেজী সাময়িক পত্রের প্রচলন কমছে। বিদেশে আমাদের সাহিত্য, আমাদের টেক্‌নলজি শেখাবার মত লোক নেই, আমাদের ভাষা শেখাবার মত লোক বাইরে পাঠান হ'চ্ছে না। এ-কথায় কাজ হ'ল। কিন্তু সে-কাজের সঙ্গে দূরদৃষ্টি ছিল না।

প্রশ্ন উঠতে পারে,—লোক থাকলে, পয়সা ছড়ালে, ইংরেজী, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়াটা আবার শক্ত কি? কাজটা শুনতে সোজা, কিন্তু এতে ভ্রম না হওয়াই বিচিত্র। কেন তা জানতে গেলে, প্রথমে দেখতে হবে ইংরেজী সংস্কৃতিটা কি?

তাকি শুধু পুরানো যুগের কবি ও নাট্যকারদের কাব্য ও নাটক, পুরাণ, দর্শন আর উপন্যাস? এদের পিছনে যে-সব সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, ইংরেজদের ঐতিহাসিক বিবর্তনের যে ফল রয়েছে, সংস্কৃতি কি শুধু তাই? তা হ'লেও বিপদ বাড়ে বই কমে না। শিক্ষক দেখেন যে, প্রাচীন কাব্য নাটক ছাত্রেরা পড়তে চায় না ব'লে আমরা কি বিংশ শতাব্দীতে বসে পুরানো যুগের গোলক ধাঁধায় পথ হারাব?

যাঁরা দেশ বিদেশে ইংরেজী সংস্কৃতি প্রচারের কাজ হাতে কলমে করেছেন তাঁদের কিন্তু অভিজ্ঞতা এই যে, সংস্কৃতি আয়ত্ত না করতে চাইলেও, ইংরেজী ভাষাটা লোকে শিখতে চায়। এর কারণ এই যে, এক সময় ইওরোপের অনেক দেশে ইংরেজী শেখার স্থযোগ কম ছিল। তাই লোকের অপূর্ণ ইচ্ছা জমে উঠে তীব্র হয়েছে। না করা কাজের জন্য শিক্ষক লাভবান হচ্ছেন। ছাত্র উন্মুখ। অশেখা বিদ্যার জন্য ছাত্রের পিপাসা বেড়েছে। শিক্ষক শেখালেই সে গ্রহণ করবে।

সে যাই হোক, ইংরেজী শেখাবার লোক কিন্তু কম। শিক্ষক বাহিনী তৈরী করবারও সময় নেই। বাইরে উর্বর জমি রয়েছে। ফসল না ফলালে, আগাছায় ভ'রে যাবে। অথচ কিসানের অভাব। শিক্ষক তৈরীর কাজটা দুরূহ। সে সমস্যার সমাধানের জন্য ইংরেজরা বোধ করি একটা বিশেষ পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র খুলতে বাধ্য হবে।

এক সময় ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষা ইওরোপে সর্বত্র লোকে জানত। নতুন ইংরেজী ভাষা তাদেরই স্থান গ্রহণ করুক, ইংরেজরা এই চায়। তার জন্য ছাত্রদের স্কলারশিপ দাও, ইংরেজী বই, ইংরেজী ফিল্মকে দেশ বিদেশে দিগ্বিজয়ে পাঠাও। আন্তর্জাতিক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ক'রে বিদেশের এমন ছাত্রদের সেখানে এনে রাখো যারা ইংরেজী প্রতিষ্ঠানকে জানার চেয়ে, ইংরেজী আদর্শকে জানতে চায়।

নতুন শিক্ষক তৈরীর জন্য লণ্ডনে থাকবে এক কেন্দ্রীয় দপ্তর, সেখান থেকে বিশেষভাবে শিক্ষিত শিক্ষক সম্প্রদায়কে দেশবিদেশে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু বিদেশে যে-সব ছোটখাট প্রতিষ্ঠান খোলা হবে, তাদের ওপর বিদেশী সরকারের সন্দেহ দৃষ্টি থাকা বিচিত্র নয়। কারণ বুকে বসে দাড়ি ওপড়ায়—এ কোন দেশ চায়? সংস্কৃতি বিস্তারকে অনেক সময় ঘর ভাঙার কাজে লাগান হয়েছে। এদিক দিয়ে ভুক্তভোগীর সংখ্যাও তো কম নয়।

এখন কথা হ'চ্ছে, এই সব প্রতিষ্ঠান কাদের হাতে থাকবে? বৈদেশিক দপ্তরের হাতে? কিন্তু শিক্ষা তো আর কূটনীতি নয়। সাংস্কৃতিক 'এক্সপেরিমেণ্ট' চালাতে যে দরের লোক দরকার কূটনীতিজ্ঞ মহলে সে লোক নেই। সরকারী কর্মচারীদের

মনের দরজা খোলা নয়। নতুন ভাবধারার সেখানে প্রবেশ নিষেধ। তবে একটা গুণ এঁদের আছে সেটা অধ্যবসায়। কমলি ছাড়লেও এঁরা ছাড়েন না। তার উপর এঁদের ধারণা যে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের ভুল হ'তে পারে, এঁদের পারে না। শিক্ষাব্রতীর উপযুক্ত মনোভাব এ নয়।

সেরা শিক্ষকরাই বা দেশ ছেড়ে বিদেশে যাবেন কেন? কেন মরতে বিদেশে এমন কাজ নেওয়া যাতে না আছে আত্মবিকাশের উপায়, না আছে দেশী শিক্ষা ব্যবস্থার আবহাওয়া। উপরন্ত হয়তো আছে বৈদেশিক দপ্তরের "গোপনীয় রিপোর্ট" আর লাগানি ভাঙানি। এই জিনিসটি এড়াবার জন্য ও প্রথম শ্রেণীর লোক আমদানীর জন্য বিশেষ প্রলোভন দেখান দরকার। অনেকে বলবেন, দেশে শিক্ষকতা যারা গ্রহণ করেনি এমন ভাঁল ছেলেও তো আছে। তারা বিদেশেই বা মাষ্টারি নিয়ে যাবে কেন? আই-সি-এসের মত চাকরি ছেড়ে মাষ্টারি! চাকরি যদি করতেই হয় তো বুকে নেব আই-সি-এসের চাপরাস। শিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।

তা-ছাড়া বিদেশে যাবার পর পণ্ডিতেরা সময় সময় বড় আস্বাচ্ছন্দ্যকর অবস্থার সৃষ্টি করে। আবহাওয়ার প্রভাবে কেউ কেউ বা "দেশী আদমি" বনে যায়। কেউ কেউ বা আবার সোশ্যালিজমের বুলি আওড়ায়। আবার শাঁখের করাত।

ইংরেজী ভাষা শেখাটার ব্যবহারিক প্রয়োজন আছে। জাপানের কাণ্ডটাই দেখুন না কেন। চটপট ইংরেজী শিখলে, সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে কাপড়ের ব্যবসাটা একচেটে করবার জন্য উঠে প'ড়ে লাগল। শাঁখের করাত আর বলে কাকে?

কিছুদিন আগে পর্যন্ত ইংরেজরা মনে করত যুদ্ধের পর তারাই হবে ইওরোপে সেরা জাত। ১৯৪৫ সালে কথাটা অনেকটা ব্যঙ্গের মত শোনায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তি হবার মত দুর্ভোগ যাতে ইংলণ্ডের না হয় তার জন্য সব ইংরেজ উঠে পড়ে লেগেছে। সাবধান বাণীরও অন্ত নেই। কাগজ খুললেই তা চোখে পড়বে।

তারপর মুক্তিপ্রাপ্ত দেশগুলির কথা। এখন এরা ব্রিটেনের মুরুব্বিয়ানা সইতে মোটেই রাজি নয়। ইওরোপে এই মুরুব্বিয়ানার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া দেখাও দিয়েছে।

এই সব দেশের লোক ইংরেজী শিখলেও শিখবে দরকারে পড়ে—প্রাণের টানে নয়। অথচ বিরোধিতার আবহাওয়া থেকে নিশ্বাসবায়ু সংগ্রহ ক'রে বাঁচা সংস্কৃতির পক্ষে শক্ত। তাই শিক্ষকদের দায়িত্ব হবে কঠিন ও কঠোর।

ইংরেজদের মতে এই সব শিক্ষকদের আগামী কালের হিউম্যানিজমের পুরোহিত হ'য়ে মনুষ্যসমাজের বিবেককে পরিচালিত করতে হবে। আগামী কালের সংস্কৃতি যেন আগামী কালের সভ্যতার যথাযোগ্য সমালোচনা করতে পারে, বিজ্ঞানের কষ্টি পাথরে সভ্যতাকে যাচাই ক'রে, বুদ্ধি ও হৃদয়ের তুলাদণ্ডে আইডিয়াকে ওজন ক'রে নেয়। এ-সবের মধ্যে কথার মারপ্যাচ যথেষ্ট। তবে ইংরেজরা আত্মরক্ষা ও আত্ম-প্রাধান্যের খাতিরে সমস্যাটাকে বিচার করছে; স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরিকল্পনাও খাড়া করেছে। সরকারী আশীর্বাদ সে পরিকল্পনা এখনও পায় নি। কিন্তু যিনি খসড়া

করেছেন তিনি অভিজ্ঞ ব্যক্তি। সংস্কৃতি বিস্তারের সময় যে-সব সমস্যা দেখা দেয় তাদের সম্বন্ধে পুরাদস্তুর ওয়াকিফ্‌হাল, এঁর নাম এচ. ভি. রুথ। ইনি এথেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন; শিক্ষা ব্যাপারে ব্রিটিশ কাউন্সিলে পরামর্শদাতা হিসাবেও কাজ করেছেন। সুতরাং তাঁর মতামত যে ইংরেজদের স্বার্থসিদ্ধির পক্ষে মূল্যবান হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পরিমল চট্টোপাধ্যায়

বৃটিশ নির্বাচন ও ভারতবর্ষ

[এই প্রবন্ধেব লেখক একজন ব্রিটিশ সৈনিক। ইউবোপেব নানা ফ্রণ্টে যুদ্ধ ক'বে তিনি এখন যুদ্ধ করছেন বর্মায়। ইংবেজি সাহিত্যে ও শিল্পে তাঁব অধিকাব জন্মগত, দেশ-বিদেশেব রাজনীতিব সঙ্গে পরিচয় তাঁব প্রত্যক্ষ। এখানে তিনি ব্রিটিশ নির্বাচনেব দুটি বিষয়ই আলোচনা কবেছেন; লেবর পার্টি কি ক'বে জিত্‌ল, আব এ জয়ে ভাবতবর্ষের লাভালাভ কি। ইউবোপে বা বিশ্বরাষ্ট্রনীতিতে লেবর পার্টিব জয়ের কি প্রভাব, তা এখানে আলোচিত হয় নি—তা সংক্ষেপে আলোচনা করা যায় না বলেই। সম্পাদক, পবিচয়।]

ব্রিটেনের এবারকার সাধারণ নির্বাচনের সব চেয়ে বড় জিনিস হইতেছে মধ্যশ্রেণীর নির্বাচন কেন্দ্রগুলিতে শ্রমিক ভোটের আধিক্য। লণ্ডনের কতকগুলি মধ্যশ্রেণী-অধ্যুষিত অঞ্চলে শ্রমিকদল পূর্বাপেক্ষা শতকরা পঞ্চাশটি ভোট বেশি পাইয়াছে। ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক রূপ সম্পর্কে ব্রিটিশ মধ্যশ্রেণীর মনে যে 'লাল জুজুর' ভয় ছিল তাহা কাটিয়া গিয়াছে। অর্থ ও ক্ষমতার লোভে মুষ্টিমেয় অতিধনীর দল জাতির স্বার্থকে প্রতারণা করিয়া এতদিন একান্তভাবে নিজের নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। সেই নীতির সহিত জনসাধারণের স্বার্থের ভেদ রেখা স্পষ্ট ও সুগভীর, যুদ্ধের গতিপথে উহা ব্রিটেনের মধ্যশ্রেণী উপলব্ধি করিয়াছে। ইউরোপের প্রায় সকল দেশের মধ্যশ্রেণীর মত তাহারাও জনসাধারণের স্বার্থের সহিত তাহাদের নিজেদের স্বার্থকে গ্রথিত করিয়া লইয়াছে। ইংল্যাণ্ডের নির্বাচনী ব্যবস্থায় এই মধ্যশ্রেণী একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

শ্রমিকদলের জয়লাভের দ্বিতীয় কারণ—সমস্ত নিম্নমধ্যশ্রেণী অঞ্চলের, বিশেষত বার্মিংহাম ও ল্যাঙ্কাসায়রের মোটা মজুরীর ওস্তাদ কারিগরদের ভোট। ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্য দিয়া জাতির এই অংশ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে এবং এই ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে রাজনৈতিক কার্যও হইয়াছে ভাল। ইহাদের মোট ভোটের মধ্যে শ্রমিক ভোটের সংখ্যাধিক্যের মূল কারণ ইহাই।

তৃতীয় কারণ—সৈনিক শ্রেণীর ভোট। উহা কোন বিশেষ নির্বাচনকেন্দ্রে আবদ্ধ নয় বলিয়া, ইহার স্বরূপ নির্ধারণ করা কঠিন। কিন্তু কতকগুলি অঞ্চলে ব্যাপারটা বুঝা

যায়। যেমন, পূর্ব উপকূলের সকল শহরগুলিতে মাছ ধরিবার অনেক আড্ডা আছে; সেখানকার প্রায় প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক পুরুষকেই নৌ সৈন্যদলে ঢুকানো হইয়াছে। এখানে শ্রমিকদল সমর্থিত হইয়াছে। এইরূপ সুবিধাই হইয়াছে সেই সকল অঞ্চলেও যেখানে শিল্প অত্যাবশ্যকীয় শিল্পাঞ্চলের পর্যায়ে পড়ে না (যেমন পটারিজ্)। সেখানে খুব কম লোকই সামরিক কার্য হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। এই সকল অঞ্চল পূর্বে টোরী-দলের ঘাঁটি ছিল। এবার এখানকার মোট ভোটের গড়ে শতকরা ৩০ ভাগ পাইয়াছে শ্রমিকদল; মানে, সমস্ত দেশের মোট ভোটের গড়ে শতকরা দশ ভাগ বেশী ভোট। সেনাবাহিনী হইতে শ্রমিক ভোটের সংখ্যাধিক্যের প্রধান কারণ, যুদ্ধকালে সৈনিক জীবনের সাম্যবোধ জাগিয়াছে এবং যুদ্ধের মধ্য দিয়া কিভাবে জনগণ মুক্তিলাভ করিতেছে সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিয়াছে। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও একটি বড় কারণ আছে; উহা জন্মিয়াছে, 'সেনাবাহিনীতে রাজনৈতিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা'। এই শিক্ষাদান জুনিয়র অফিসরদের দায়িত্ব। কিন্তু, বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে রক্ষণশীলদলীয় অফিসারদের তাহাদের অধীনস্থ সাধারণ সৈনিকদের অপেক্ষা রাজ-নৈতিক জ্ঞান কম; তাই তাহারা প্রায়ই এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে চালু করিবার চেষ্টা করে না, করিতে গেলেও সৈনিকরা শ্রদ্ধার সহিত তাহাদের কথা শোনে না। ফলে ব্যবস্থাটি চালু করিবার ভার আসিয়া পড়ে বামপন্থী অফিসারদের উপর; তাহারাও বিশেষ উৎসাহের সহিত কাজে লাগিয়া যান। একের পক্ষে অন্যের ভোটদানের ব্যবস্থাও (Proxy Voting System) সম্ভবত লেবর ভোটের সংখ্যা বাড়াইয়াছে। যে সকল সৈনিকের রক্ষণশীল দলকে ভোট দিবার কথা, তাহারা রাজনীতিতে এতই উদাসীন যে তাহাদের 'প্রতিভূ'দের তাহারা কোন নির্দেশই দেন নাই। কিন্তু লেবর পার্টির সমর্থকগণ ছিলেন নিজেদের রাজনৈতিক কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন, তাই তাহাদের 'প্রতিভূ'গণ যাহাতে লেবর পার্টিকে ভোট দেন সে সম্পর্কে তাঁহারা বিশেষ সতর্ক ছিলেন। সামরিক কর্তৃপক্ষ অনেক স্থানে সময়মত কাগজপত্র পাঠান নাই বলিয়া সকল মতের বিশেষত শ্রমিক মতের, সৈনিক শ্রেণীর ভোট অবশ্য কিছুটা নষ্ট হইয়াছে।

অবশ্য বিভিন্ন দলের ভোট সংখ্যার উপর উহা খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তথাপি রক্ষণশীলতার এই বনিয়াদী ঘাঁটিগুলিতে টোরিনেতাগণের প্রচণ্ড পরাজয় হইতেই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, রক্ষণশীল দলের রাজনৈতিক প্রভুত্ব চিরদিনের মত শেষ হইয়া যাইতেছে। রক্ষণশীলদলের প্রার্থীরা সাধারণত অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল, গ্রাম্য জমিদার ও ব্যবসায়ী। ইহাদের পরাজয়ের কারণ, ইহারা কোনদিনই কিছু করে নাই, ভবিষ্যতে করিবে বলিয়াও কেহ বিশ্বাস করে না। কিন্তু ব্রাণ্ডেন ব্রাকেন, হোর বেলিশা, আমেরি, র‍্যণ্ডল্ফ্‌ চার্চিল, লর্ড ওরুম্স্‌লি প্রমুখ টোরীনেতৃবৃন্দ তো কিছু করিয়াছেন; কিন্তু তাহারা কি কতটুকু করিয়াছেন তৎসম্পর্কে নির্বাচকমণ্ডলীও স্পষ্টভাবেই তাহাদের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছে। ব্র্যাণ্ডেন ব্রাকেনের নির্বাচন কেন্দ্রে তাহার ২৩,০০০ ভোট খোয়া গিয়াছে অর্থাৎ ১৯৩৫ সালে যাহারা

তাঁহাকে ভোট দিয়াছিল তাহদের শতকরা ৮০ জনের ভোট এবার তিনি আর পান নাই। বার্মিংহামের টোরি ঘাটিতে আমেরি হারাইয়াছেন ১৪,০০০ ভোট; অর্থাৎ নির্বাচকগণের শতকরা ৬০ জনের ভোট তিনি পান নই। ইওরোপের কুইসলিং বা বিশ্বসঘাতক দেশদ্রোহীদের সহিত এই সকল লোকদের নাম লোকের মনের উপর যে ভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে তাহা কোনদিন মুছিবার নহে—তাহাদের রাজনৈতিক মৃত্যুই এবার হইয়াছে।

আমেরির শোচনীয় পরাজয়ের কথা উঠিলেই তাহার নির্বাচন প্রতিযোগিতাকে বিশ্লেষণ করিতে হয়। এই নির্বাচনে ভারতবর্ষে বিশেষ কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। ভারতীয় সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া রজনী পাম দত্ত নির্বাচন সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। তাহার অভিযানের প্রারম্ভেই যে 'সোব' পড়িয়া যায় তাহাতে আমেরি শঙ্কিত হইয়া ওঠেন। এই জন্যই এবং রক্ষণশীলদলের সাধারণ নির্বাচনস্বার্থকে রক্ষা করিবার জন্যই আমাদের সম্মুখে ওয়েভেল নাটকের মূক অভিনয়ের অবতারণা করা হয়। ভারতীয় নেতা এবার হটাৎ কেন যে, ওয়েভেলের আন্তরিকতা সম্পর্কে এত নিঃসন্দেহ হইয়াছেন তাহা আমি কিছুতেই বুঝিতে পারি না। ওয়েভেল তো আমেরির নির্দেশ মতই কার্য করেন। অবশ্য যদি কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে একটা চুক্তি হইয়া যাইত তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে বড় বিপদের কথা হইত, ভারতবর্ষের পক্ষে হইত খুবই ভাল। কিন্তু ওয়েভেলের মারফৎ দলগত প্রতিনিধিত্বের অথবা সাধারণ নির্বাচনের ভিত্তিতে প্রস্তাব না আসিয়া প্রস্তাব আসিল সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে। যতদূর সম্ভব বিভেদ সৃষ্টি করাই যে ইহার উদ্দেশ্য, তাহা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট। যে মুহূর্তে ব্রিটেনে ভোটগ্রহণ শেষ হইয়া গেল সেই মুহূর্তেই ওয়েভেল জিন্নার নিকট এমন একখানি চরমপত্র দিলেন যাহা জিন্নার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ফলে অশোভনীয় ভাবে আলোচনা অকস্মাৎ শেষ হইয়া গেল। ব্রিটিশের একজন নির্লজ্জ তাঁবেদার মুসলমানগণের প্রতিনিধিত্ব করিবেন, ইহা লীগ কি ভাবে গ্রহণ করিতে পারে বুঝি না। একজন কংগ্রেসী মুসলমানকে লইতেও হয়ত লীগ শেষ পর্যন্ত রাজী হইতে পারিত। কিন্তু তৎপরিবর্তে লীগের তালিকায় একজন খয়ের খাঁকে জুড়িয়া দেওয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহ্যের নির্লজ্জ পুনরভিব্যক্তি মাত্র। সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে ওয়েভেলের একটি মাত্র বিবৃতিতে সত্য ও আন্তরিকতা ছিল—যদিও তাহা কেহ বিশ্বাস করে নাই: আলোচনা নিষ্ফল হইবার জন্য একমাত্র তিনিই দায়ী। ওয়েভেল পরিকল্পনার ফল হাতে হাতে ফলিল; স্পারক্রকে ব্রিটিশ নির্বাচনের পৃষ্ঠপট হইতে ভারতীয় সমস্যা একেবারে মুছিয়া গেল। রজনী পাম দত্ত তলাইয়া গেলেন। কিন্তু হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও আমেরি তাঁহার কলঙ্কলিপ্ত রাজনৈতিক অতীতকে চাপা দিতে পারিলেন না। মিউনিকের বিশ্বাসঘাতকদের সহিত তাঁহার সন্দেহজনক চলাফেরার কাহিনী ও ক্লাইভডেন হাউসে বসিয়া জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরের সহিত তাঁহার দেশদ্রোহী চক্রান্তের কথা কিছুতেই লোকের মন হইতে মুছিয়া ফেলা যায় নাই। বার্মিংহাম জনসাধারণের ভোটের প্রচণ্ড চাপে পৃথিবীর একটি সব চেয়ে কুটিল রাজনৈতিক জীবনের অবসান হইয়া গেল।

রক্ষণশীল দলের পরাজয় লিবারেল ও কমনওয়েলথ্ দলেরও পরাজয়। লিবারেল দল মধ্যশ্রেণীর ভোটের উপর নির্ভর করিয়াছিল, আশা করিয়াছিল এমন একটি সংখ্যাগৌরব তাহারা লাভ করিতে পারিবে যাহার ফলে রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ভারকেন্দ্র তাহারাই নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে। কিন্তু প্রগতিশীল মধ্যশ্রেণীর মন হইতে লাল জুজুর ভয় কাটিয়া গিয়াছে। লোকে স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছে, যদি কোন দুর্বল কোয়ালিশন দল মন্ত্রীসভা গঠন করিয়া শাসনভার গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন দলের সংখ্যাশক্তি এমন হয় যাহাতে স্থায়ী ঐক্যের সম্ভাবনা কম থাকে, তবে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় কিম্বা স্বদেশের পুনর্গঠন কার্যে সেইরূপ মন্ত্রীসভা কোন পাকা ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারিবে না। দ্রুত যুদ্ধসমাপ্তি ও বিধ্বস্ত স্বদেশের আমূল পুনর্গঠনই হইতেছে ব্রিটিশ জনসাধারণের প্রথম ও প্রধান প্রযোজন ও অভিপ্রায়। লিবারেল দল নিজেদের আশার কুহকে ভুলিয়া মরিয়াছে। বিভারেজ ও সিনক্লেয়ার-তাহাদের এই দুই নেতার পরাজয়ে তাহাদের দলের পরাজয় একেবারে সম্পূর্ণ হইয়া গেল। বিভারেজের সোস্যাল ইনসিওরেন্স পরিকল্পনা সর্বশ্রেণীর লোকের নিকটেই জনপ্রিয় হইযাছে। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদপত্রকে (United Nations Charter) আক্রমণ করিয়া তিনি তাহার নিজের পাযে নিজে কুঠারাঘাত করিয়াছেন; কারণ এই সনদের উপরেই বিশ্বশান্তির সমস্ত আশা নির্ভর করিতেছে। স্যার আর্চিবল্ড সিনক্লেয়ার তাহার পৈত্রিক জমিদারী কায়েতনেসে যে কেন হারিয়া গেলেন সে রহস্য তাহার প্রজারাই ভাল জানে। কেবলমাত্র উত্তর ওয়েল্‌সের পাহাড়ে লয়েড জর্জের প্রেতাত্মা লিবারেল দলকে নিশ্চিহ্ন বিলুপ্তির হাত হইতে এখনও কোনমতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

১৯৪০ সালের মে মাস হইতে 'কেয়ারটেকার' গভর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়া পর্যন্ত শ্রমিক ও লিবারেল দলের উৎসাহী কর্মীরা কোয়ালিশন গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোন প্রকার কাজ করিবে না,—এই চুক্তির সুযোগ লইয়া কমনওযেল্‌থ দল গড়িয়া ওঠে। এই দলের মধ্যে ঐ প্রগতিবাদী কর্মীরা তাহাদের অবরুদ্ধ কর্মপ্রেরণার একটা পথ খুঁজিয়া পায; টোরী প্রভাবিত কোয়ালিশন গভর্ণমেণ্টের দ্বিধা-দুর্বলতার বিরুদ্ধে তাহারা সংগ্রাম শুরু করেন। আজ এই দলের অধিকাংশ সভ্যই আবার শ্রমিক দলে ফিরিযা আসিয়াছেন; কারণ ঐ কর্মসূচীই তাহারা শ্রমিক দলে থাকিয়া বেশী ভালোভাবে কাজে লাগাইতে পারিবেন। নির্বাচকমণ্ডলীও তাহাতে সম্মত হয়।

শ্রমিক দলের জয় লাভে কমনওয়েলথ দলের দান কম নহে। কারণ, সন্ধিচুক্তি বলবতী থাকা কালে যখন শ্রমিক দলকে নিজের নীতি সম্পর্কে নীরব থাকিতে হইয়াছে, তখন কমনওয়েলথ দল মধ্যশ্রেণীর বহু সহস্র প্রগতিশীল ব্যক্তিকে শ্রমিক দলের মধ্যে আনিয়াছে। কমনওয়েলথ তাহার কাজ করিয়াছে, ভালভাবেই করিয়াছে।

শ্রমিক দলের এই অপ্রত্যাশিত প্রচণ্ড জয়লাভে শ্রমিকনেতারা নিজেরাই বিস্মিত হইয়া গিয়াছে। ব্রিটেনের প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ-বক্তার মত শ্রমিক শ্রেণীও নিজেদের কয়েক সপ্তাহ নির্বাচন অভিযানের মাপে শ্রমিক শ্রেণীর সাফল্যের পরিমাপ করিয়াছিল। কিন্তু নির্বাচনে যে বিরাট ধস্ নামিতে দেখা গেল, তাহা শুধু কয়েক সপ্তাহের প্রচারকার্যের ফল হইতে পারে না। যুদ্ধের পাঁচটি বৎসর রক্ষণশীল দলের সহিত শ্রমিকদলের রাজনৈতিক সন্ধির ফলে শ্রমিক দলের কাজকর্ম একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। সামান্য যে কয়টি জনসভা হয় তাহাতে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে শ্রমিক দলের নেতারা তাহাদের টোরী সহকর্মীদের কৃতকর্মের সমর্থন করেন। কোন দলগত প্রচারকার্য সেই সময়ে করিতে দেওয়া হয় না। শ্রমিক দলের স্থানীয় কার্যাবলী একেবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। তাহা হইলে, কোথা হইতে আসিল এই প্রচণ্ড বিপুল শ্রমিক সংখ্যাধিক্য—যাহার ফল দেখিয়া ভবিষ্যদ্বক্তারা একেবারে হতবাক হইয়া গিয়াছেন?

এই শ্রমিক সাফল্যের আংশিক দায়িত্ব কমনওয়েলথ দলের। তাহারাই মধ্যশ্রেণীর মধ্যে ও মজুর শ্রেণীর একটি বড় অংশের মধ্যে রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা জাগাইয়া রাখিয়াছিল। আর কৃতিত্ব অবশ্য কমিউনিস্টদের। তাহারা মধ্যশ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট সমর্থন লাভ করিয়াছে; ওয়েষ্টমিনিস্টারের নির্বাচনের ফল তাহার প্রমাণ। মজুরপ্রতিষ্ঠানগুলিতে তাহারা রাজনৈতিক চেতনা জাগাইয়া রাখিয়াছে, শ্রমিক শ্রেণীর কর্মসূচীকে প্রচার করিয়াছে, এবং শ্রমিকশ্রেণী যখন নিষ্ক্রিয় থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল সেই পুরা পাঁচটি বৎসর শ্রমিক দলের জয়লাভের জন্য তাহারাই কাজ করিয়াছে। সর্বোপরি, তাহারা যুদ্ধসংক্রান্ত কার্যে রত মজুরদিগকে ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া শ্রমিক দলের আওতায় আনিয়াছে। এই শ্রেণীর মজুরদের বৃহত্তম অংশ সঙ্ঘবদ্ধ হয় ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিয়নের মধ্যে। একজন প্রখ্যাত কমিউনিস্ট এই ইউনিয়নের জাতীয় অর্গ্যানাইজার। ট্রেড্ ইউনিয়ন কন্‌ফারেন্সগুলিতে কমিউনিস্ট-আনীত প্রস্তাবগুলি এই ইউনিয়ন ও অন্যান্য অনেক ইউনিয়ন সকল সময়েই সমর্থন করিয়া থাকে। সত্য কথা বলিতে গেলে, কমিউনিস্টরাই প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান ইউনিয়নগুলিতে প্রবেশ করিয়া তাহাদের রাজনৈতিক স্বার্থকে সম্মুখে আনিয়া ধরিয়া শ্রমিক দলের জয়লাভের ভিত্তি রচনা করিয়াছে। কমিউনিস্টদের প্রভাবকে বিচার করিতে হইবে এই মাপকাঠি দিয়া। তাহারা যে মাত্র দুইটি আসন অধিকার করিয়াছে তাহার দ্বারা তাহাদের কার্য ও প্রভাবকে বিচার করিতে গেলে ভুল হইবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে কমিউনিস্টদের মুখপত্র 'ডেলি ওয়ার্কার'ই একমাত্র সংবাদপত্র যাহা শ্রমিকদের প্রচণ্ড জয়লাভ বিষয়ে খাঁটি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছে। যদি তাহারা এ বিষয়ে নিশ্চিত না হইত তবে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করা তাহাদের পক্ষে বিপজ্জনক হইত; কারণ কমিউনিস্টরা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইতে চাহে না।

কারণ যাহাই হউক না কেন, শ্রমিকদল সংখ্যাধিক্য লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের

কাছে এই জয়লাভের তাৎপর্য কি? আমাদের মনে যেন কোন ভ্রান্তি বা মোহ না থাকে। ব্রিটিশ ধনতন্ত্রী ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ গেলে ব্রিটেনে সমগ্র ধনতন্ত্রী ব্যবস্থা ধ্বসিয়া পড়িবে। ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীনতাদানের নীতি; ভারতবাসীদের স্বয়ং শাসনের, যেথান হইতে খুসী পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকারদানের নীতিই ব্রিটেনে পরিপূর্ণ সমাজতন্ত্রের নীতি। মনে রাখিতে হইবে, নূতন শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের কার্যস্থচী কোন ক্রমেই পরিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক কার্যস্থচী নহে। ইহা হইতেছে পুনর্গঠন ও সংস্কারের কার্যস্থচী—কয়লা, ব্যাঙ্কিং ও অস্ত্রোৎপাদন প্রভৃতি যে সকল শিল্প ও প্রতিষ্ঠানগুলি যুদ্ধের সময়ে ব্যক্তিগত অধিকারে থাকিবার ফলে জাতীয় দুর্বলতার প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাদের এখন জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করাই শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের কার্যস্থচীর লক্ষ্য। এই কর্মস্থচীর বলেই সে নির্বাচন সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছে; ইহা হইতে বেশী অগ্রসর হইলে সে নির্বাচকমণ্ডলীর সমর্থন লাভ করিবে কিনা সন্দেহ। অতএব যাঁহারা মনে করেন কংগ্রেস কিংবা লীগকে (যাহার যেমন রুচি) জিয়াইয়া শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের মাথায় স্বাধীনতা চাপাইয়া দিবেন তাহাদের ভুল শীঘ্রই ভাঙ্গিবে। জিজ্ঞাসা এই—তবে শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট হওয়ায় লাভ হইল কি? লাভ হইল এইটুকু যে, রক্ষণশীল দল তাহাদের কার্যের জন্য জবাবদিহি করিত বৃহৎ ব্যবসায়ীদের নিকট—যাহাদের অর্থে ও সমর্থনে তাহারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। সেই ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ যদি 'টোরি' গভর্ণমেণ্টকে চাপ দিত তবে বৃহৎ ব্যবসায়িগণ গভর্ণমেণ্টের যে কোনরূপ নির্যাতননীতি সর্বান্তকরণে সমর্থন করিত। কিন্তু এবার শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের নিকট ভারতবর্ষ যদি-সম্মিলিত দাবী উত্থাপিত করিতে পারে, তবে গভর্ণমেণ্টকে ভারতীয় নীতি সম্পর্কে ব্রিটেনে মজুর সাধারণের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। শ্রমিকদলের বিগত সম্মেলনে ব্রিটিশ শ্রমিকেরা ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেখিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছে। এখন কাজের ভার ভারতবর্ষের উপর। সত্য কথা বলিতে কি, আজ ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা ব্রিটিশ শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের পক্ষে যতটা সহজ তাব চেয়ে অনেক সহজ ভারতবর্ষের পক্ষে ব্রিটিশ ধনতন্ত্রকে ধ্বংস করা। কিন্তু ভারতবর্ষ কবে শ্রমিকদের হইয়া শ্রমিকদের শত্রু ধ্বংস করিয়া দিবে —তাহার জন্য ব্রিটিশ সোসালিস্টরা বসিয়া থাকিতে রাজী নহে। ভারতবর্ষেরও উচিত নহে ব্রিটেন হইতে আর একটি 'প্ল্যান' আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকা। ব্রিটেনে শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট হওয়ায় সুবিধা এইটুকু হইয়াছে যে, সম্মিলিত ভারতীয় দাবীকে প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা এই নূতন গভর্ণমেণ্টের নাই। কিন্তু কোন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টই কোন দিন স্বেচ্ছায় কংগ্রেস কিম্বা লীগের স্বার্থ পূর্ণ করিয়া দিবেন না। ব্রিটিশ জনসাধারণ এবার সাম্রাজ্যবাদিগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা ধূলিসাৎ করিয়া ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে তাহাদের নিজেদের কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছে, এবার ভারতবর্ষের পালা।

পত্রিকা-প্রসঙ্গ

কবিতা।— সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু।

'কবিতা' কাগজটির বয়স দশ বছর। পত্রিকার পক্ষে এই বয়স বেশি নয় বাংলা দেশের বেশির ভাগ খ্যাতনামা পত্রিকাই 'কবিতার' তুলনায় প্রবীণ। কিন্তু দশ বছরের মধ্যে 'কবিতা' বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে নিজের একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে নিয়েছে। এই সাফল্যের কারণ 'কবিতা'র প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদকের সাহিত্যানুরাগ, অধ্যবসায় ও অবশ্য সাহস—কেননা এই জাতীয় অভিনব কাগজের পরিকল্পনা সাহস ছাড়া সম্ভব হ'ত না।

কিন্তু 'কবিতা' সুপ্রতিষ্ঠিত কাগজ হ'লেও উচ্চশ্রেণীর পত্রিকা কিনা তাতে বিশেষ সন্দেহ আছে। তবে, এর দায়িত্ব সম্পাদকের নয়; কেননা কবিতার খোরাক যাঁরা জোগান, উচ্চশ্রেণীর কবিতা তাঁরা যদি কদাচিৎ রচনা করেন বুদ্ধদেব বসুকে তার জন্যে দোষী করা সঙ্গত হবে না। বরঞ্চ, বহু অপ্রতিষ্ঠ অনভ্যস্ত অল্পবয়স্ক কবিকে তিনি পরিণতির পথে অগ্রসর হ'তে সাহায্য করেছেন, শুধু তাদের রচনা প্রকাশ ক'রে নয়, তাঁর কাজের আওতায় কাব্যের আবহাওয়াকে জাগিয়ে রেখে। কিন্তু বুদ্ধদেব বাবুর উৎসাহিত সমর্থন সত্ত্বেও সাম্প্রতিকী বাংলা কবিতা পরিণতির পথে কেন বেশিদূর অগ্রসর হ'তে পারেনি তার আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়।

এই প্রসঙ্গে এই কথাও স্মরণীয় যে বুদ্ধদেব বাবু স্বয়ং এই সাম্প্রতিক কবিদের অন্যতম ও একদা তিনি প্রাণপণ প্রয়াস করেছিলেন সাম্প্রতিক সাহিত্যে বিশেষ একটি ধারা প্রবর্তন করতে। এই প্রয়াসের অত্যন্ত প্রকট ও সমারোহসহকারে ব্যক্ত উদ্দেশ্য ছিল রোম্যান্টিক রবীন্দ্রযুগ থেকে রিয়্যালিষ্টিক রবীন্দ্রোত্তর যুগে উত্তীর্ণ হওয়া। দুঃখের বিষয়, অভীপ্সিত রিয়্যালিজ্‌ম্‌-এর সন্ধানে তখনকার 'অতি আধুনিক' নামে পরিচিত লেখকসম্প্রদায় সাহিত্যের রাজপথ ছেড়ে অলিতে গলিতে কিশোরসুলভ যৌনবোধের উগ্র প্রেরণায় এমনই দিশেহারা হ'য়ে পড়লেন যে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রকাশ্যে তাঁদের তীব্র তিরস্কার না ক'রে পারেন নি। সুখের বিষয় বাংলা সাহিত্যে সেই যুগ বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। কিন্তু

> পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছ একী, সন্ন্যাসী,
> বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।

আজ কবিতার পাতার পর পাতায় ধ্বনিত হচ্ছে তরুণ প্রেমের বিদেহী বিলাপ। সুরুচি বা সুনীতির দিক থেকে এতে আপত্তিকর কিছু নাই, কিন্তু আমাদের কানের পক্ষে কাব্যের এই 'চিরন্তন' সুর একটু একঘেয়ে হ'য়ে পড়েছে।

বুদ্ধদেব বাবুর কথায় ফেরা যাক্‌। সাহিত্যের অলিগলিতে অনির্দিষ্ট ভাগ্যান্বেষণের রোমাঞ্চকর চেষ্টা তিনি বহুদিন ছেড়ে দিয়েছেন—বাইরের চাপে না, সম্পূর্ণ নিজের তাগিদে। এই তাগিদেই তিনি আশ্রয় নিয়েছেন সাহিত্যের রাজপথে বৃহৎ

বৃক্ষের ছায়ায়, অর্থাৎ যে-রবীন্দ্রনাথকে পাশ কাটিয়ে একদিন তিনি স্ব-সমুখ শক্তিতে উদ্যত হয়েছিলেন সাহিত্যজগতে নব নবতর রাজ্যখণ্ড জয় করতে, সেই রবীন্দ্রনাথেরই কাব্যের আওতায়। এই নিরাপদ আশ্রয়ে তিনি আজ প্রায় স্থাণু হ'য়ে বসেছেন।

ইতিমধ্যে বাংলার সাহিত্যে নতুন হাওয়া বইতে শুরু করেছে। বুদ্ধদেব বাবু সযত্নে এই হাওয়া থেকে গা বাঁচিয়ে প্রচার করেছেন শিল্পসৃষ্টির অনাদি ও অকৃত্রিম চিরন্তনতা। কিন্তু তবু এই হাওয়ায় যারা আলোড়িত হ'য়ে নতুন ছাঁদের রচনায় উৎসাহিত হয়েছে তাদের তিনি অবহেলা করেননি, বরঞ্চ উৎসাহই দিয়েছেন, এমন কি মাঝে মাঝে তাদের আঙ্গিক পর্যন্ত কিছু কিছু আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করেছেন—চিরন্তনী ভাবধারার কাঠামোর মধ্যে যতটা সম্ভব। সময়ে সময়ে মনে হয় এই কাঠামোই হয়েছে বুদ্ধদেব বাবুর কফিন, তাঁর সাহিত্যিক সমাধি ঘটেছে এরই অতলস্পর্শ অন্ধকারে। কিন্তু অতটা বললে বোধ হয় একটু বাড়াবাড়ি হবে। বুদ্ধদেব বাবু সম্বন্ধে বরঞ্চ এই কথা বলা চলে যে উনি জনৈক অতি-সাবধানী ক্রিশ্চান পাদরির মতন পণ করেছেন: I will tread the narrow path betwixt vice and virtue. প্রগতিকে উনি খুব উৎসাহের সঙ্গে বরণ করতে পারেননি, কিন্তু প্রতিক্রিয়াকেও উনি কখনো আমল দেননি। এই জন্য বুদ্ধদেব বাবুর কাছে আমরা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমাদের কৃতজ্ঞতার এমন কি শক্তি আছে যে বুদ্ধদেব বাবুকে বাংলা সাহিত্যে সম্মানের আসন দিতে পারে? ইতিহাসকে যারা উপেক্ষা করে ইতিহাস তাদের মনে রাখে না।

যাই হোক, বর্তমান বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব বাবুর দান মহৎ না হ'লেও একেবারে নগণ্য নয় ও এই দানের পরিচয় পাওয়া যায় একাধিক ক্ষেত্রে। কিন্তু 'কবিতা' কাগজের সম্পাদনে বুদ্ধদেব বাবুর যে কৃতিত্বের প্রমাণ পাই, তাঁর স্বরচিত কবিতায় তা' ক্রমশ ক্ষীণতর হচ্ছে। কবিতার চৈত্র (১৩৫১) সংখ্যায় বুদ্ধদেব বাবুর 'পশ্চিম' কবিতাটি প'ড়ে মনে হ'ল রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় অনুকরণ আরো বছর কুড়ি আগে হয়তো এতটা অসহ্য মনে হতনা। আরো মনে হ'ল, প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী সংকীর্ণ পথে বুদ্ধদেব বসুর স্বচ্ছন্দবিহার বোধ হয় আর বেশি দিন সম্ভব হবেনা, তাঁর পদস্খলন আরম্ভ হয়েছে, অতঃপর বিশেষ সাবধান না হ'লে নিজেকে সমালানো দায় হবে। কেননা

হে পশ্চিম, তোমার সভ্যতা
দু'চারি শতাব্দীমাত্র খেলা ক'রে কালের প্রাঙ্গনে
হলো দেউলিয়া।

চিন্তাসম্পদে একেবারে দেউলে না হ'লে ভাবী যুগের প্রাক্কালে এই মত নির্বিবাদে ব্যক্ত করা তাঁর পক্ষে কখনই সম্ভব হ'ত না।

কিন্তু 'কবিতা' পত্রিকায় শুধু কবিতা ছাপা হয় না। কবিতার সমালোচনাও এই পত্রিকার বিশিষ্ট অঙ্গ ও এই অঙ্গের সৌষ্ঠব ও সমৃদ্ধির জন্য বুদ্ধদেব বাবু পাঠকদের কৃতজ্ঞতাভাজন। বুদ্ধদেব বাবুর সমালোচনার রীতি হয়তো মামুলি, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী

সম্ভবত তিনি অর্জন ক'রেননি। কিন্তু তবু তাঁর মতামত মূল্যবান, কেননা কবিতার মূল্য নির্ধারণে পুরোনো মাপকাঠি এখনো একেবারে বাতিল হয়নি। মতামতের সংকীর্ণতা সত্ত্বেও কবিতার বিচারে বুদ্ধদেব বাবুর নিরপেক্ষতা ও নতুন কবিতার সমাদরে তাঁর অসীম আগ্রহ সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয় বললে খুব মিথ্যা বলা হবেনা। শুধু নতুন কবিদের না, রবীন্দ্ররচনাবলীর সমালোচনায় বুদ্ধদেববাবু কবিতার একাধিক সংখ্যায় যে বৈদগ্ধ্যের ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন তা' সত্যি বিরল। বিস্তারিত ভাবে রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনা ক'রে বর্তমান বাংলার অন্য কোন লেখক বোধ হয় এতখানি সাফল্য অর্জন করেননি। অন্তত সমালোচনা বিভাগের উৎকর্ষের জোরে 'কবিতা' কাব্যরসিকদের সমর্থন দাবি করতে পারে।

হিরণকুমার সান্যাল

সংস্কৃতি-সংবাদ

রবীন্দ্র-স্মৃতি ভাণ্ডার

২২শে শ্রাবণ এল। রবীন্দ্রনাথের চতুর্থ স্মৃতি-বার্ষিকী দেশের সর্বত্র সুষ্ঠুরূপে পালিত হবে, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই। এই উপলক্ষে 'রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডারের' জন্য বাঙালী মাত্রই যথাসাধ্য অর্থ সংগ্রহ করবেন, এও আমরা আশা করি।

মামুলি ভাবে এ কথা বলে কোনো লাভ নেই যে, রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি তিনিই সংরক্ষণ ক'রে গিয়েছেন তাঁর কীর্তিতে। এ সত্য আমরা সকলেই জানি। রবীন্দ্র-প্রতিভার সঙ্গে বাঙালী মাত্রেরই পরিচয়সাধন কর্তব্য, এ কথাও আমরা মানি। কিন্তু এ যুগে এরূপ পরিচয়ও অনেকাংশে নির্ভর করে যথোচিত উদ্যোগ আয়োজন ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের উপর। আর সে সবের জন্য আর্থিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, এ সত্য বিস্মৃত হ'লে চলবে না। অবশ্য অর্থের সংস্থান হ'লেই কোনো প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়, তা নয়; কিন্তু প্রত্যেক আয়োজনের পেছনে অন্তত অর্থের সংস্থান থাকা চাই।

'রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডারের' কর্তৃপক্ষের বিবৃতি অনুসারে আমরা জেনেছি—এ পর্যন্ত বাঙলাদেশ থেকে মোট সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছে। আরও ৫ লক্ষ টাকা, মানে মোট দশ লক্ষ টাকা বাঙলাদেশ থেকে সংগৃহীত হ'লে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ধনিক ও গুণীরাও সাহায্যার্থে অগ্রসর হবেন। বাঙলাদেশ থেকে নিশ্চয়ই আরও ৫ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। যতদূর জানি, এমন সৌভাগ্যবান অনেকেই আছেন যাঁরা ইচ্ছা করলেই কবির স্মৃতিতে এক-এক লক্ষ টাকা দিয়ে কৃতার্থ হ'তে পারেন। কিন্তু আমরা চাই বাঙলাদেশের সাধারণ লোকই তাদের নিজের শক্তিতে কবির স্মৃতিরক্ষায় যত্নশীল হোক; 'রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডার'

শুধু জন কয়েকের কীর্তি না হ'য়ে বাঙালী সাধারণের কীর্তি হোক; আর সে ভাণ্ডারের প্রয়োগ-পরিকল্পনায়ও বাঙালী সাধারণই প্রধান অংশ গ্রহণ করুক।

সাধারন বাঙালী হিসাবেই আমরা তাই নিবেদন করছি—আমাদের রবীন্দ্র নাথের স্মৃতিভাণ্ডারে আমরা আমাদের অর্ঘ্য যেন দান করি। এইটিই ২২শে শ্রাবণের আমাদের পবিত্র দায়িত্ব।

গোপাল হালদার

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব সম্প্রতি সম্পন্ন হইয়া গেল। উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এ বৎসর এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে উৎসবকে স্থানাভাবে তিন দিনে খণ্ডিত করিতে হইয়াছিল। এ ব্যবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নহে, ইহাতে এই গৌরবময় অনুষ্ঠানের মর্যাদা বহুল পরিমাণে ম্লান হয়। এই সম্পর্কে ভাইস-চানসেলর ডাঃ রাধাবিনোদ পাল মহাশয় যে ক্ষুব্ধ আবেদন জানাইয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালী তাহার অনুমোদন করিবে।

যে অনুষ্ঠান প্রতি বৎসরই প্রতিপালন করিতে হয় তাহার আয়োজন ও পরিচালনার মধ্যে স্বভাবতই খানিকটা ধারাবাহিকতা থাকিয়া যায়। বিভিন্ন চানসেলর ও ভাইস-চানসেলর মহোদয়গনের বার্ষিক বক্তৃতায় এই সনাতনত্বের ছাপ সহজেই চোখে পড়ে। অবশ্য, প্রতি বৎসরই এমন কতকগুলি বিষয় ও ঘটনা থাকে যে সম্বন্ধে উল্লেখ করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে, ইহাদের নির্বাচনেই বিশিষ্ট বক্তাগণের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়।

বর্তমানে আমাদের দেশে স্বায়ত্তশাসনের সমস্যা উগ্র হইয়া উঠিয়াছে নানা ঐতিহাসিক কারণে। দেশেব শিক্ষিত শ্রেণীর সহিত সেই দেশের শাসন ব্যবস্থার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। গভর্ণর কেসি সাহেব তাঁহার চানসেলরী বক্তৃতায় এ সমস্যার আলোচনা এড়াইতে পারেন নাই। তিনি সংখ্যাযোগে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন বাঙলাদেশের শাসনভার তো এদেশীয় লোকেরই হাতে। বাঙলা সরকারে মাত্র শতকরা সাড়ে আটজন ইওরোপীয়ান। শুধু তাহাই নহে; যাহারা মাসে পাঁচশত টাকা বেতন পাইয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে শতকরা বাইশ জন মাত্র বিদেশীয়, বাকী সকলেই ভারতীয়। এই যুক্তি দিয়া লাট সাহেব বোঝাইতে চাহিয়াছেন যে, বাংলাদেশ তো প্রকারান্তরে স্বাধীন বলিলেই হয়। স্নতরাং আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের কোনোই অর্থ নাই। তাঁহার বোধ হয় ধারণা আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন এখনও সেই স্তরে আছে যখন কংগ্রেস রাজ সরকারে ভারতীয়ের দাবী পেশ করিয়াই তুষ্ট থাকিত। যে শাসন ব্যবস্থায় দেশের অর্থনৈতিক শোষণ চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়িয়া গিয়াছে। দেশরক্ষার সামরিক দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে দেশবাসীর অনায়ত্ত। শিক্ষার প্রসার রুদ্ধ। শিল্পীকরণ স্তম্ভিত।—এই শাসন ব্যবস্থার প্রকৃত দায়িত্ব কোথায় ও কাহার হস্তে। এই অন্তর্ভেদী প্রশ্নের উত্তর চানসেলর সাহেব স্নকৌশলে পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন। শাসনকর্তা

হিসাবে তিনি সুনিপুণতার খ্যাতি পাইতে পারেন। কিন্তু সর্বোচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ নেতা হিসাবে শ্রদ্ধা অর্জন করিবার যোগ্যতা তাঁহার কতটুকু!

ভাইস-চানসেলর মহাশয়কেও তিন দিন ধরিয়া অনেক অধীত ও অভ্যস্ত সাধু উক্তির পুনরাবৃত্তি করিতে হইয়াছে। কিন্তু দেশের বর্তমান সমস্যার চাপ তাঁহাকেও রেহাই দেয় নাই। যে উপাধি বিতরণ সভায় দুই শত মহিলা গ্রাজুয়েট উপস্থিত, যাহার মধ্যে আবার সাত জন পদক প্রাপ্তা—সেখানে শিক্ষিতা নারীর সামাজিক কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু মত প্রকাশ করিতেই হয়। ভাইস চানসেলর পাল মহাশয়ের মতে মহিলা গ্রাজুয়েটদের মনে রাখা উচিত যে, তাঁহারা "প্রথমে নারী পরে গ্রাজুয়েট।" পুরুষের সহিত একই শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও তাঁহাদের কর্মক্ষেত্র স্বতন্ত্র। "তাঁহারা যেন এক মুহূর্তের জন্যও না ভাবেন যে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র ঘরকরনার কর্তব্য হইতে তাঁহারা অব্যাহতি পাইয়াছেন। ভারতীয় নারীত্বের চিরাচরিত আদর্শ হইতে যেন তাঁহাদের জীবন বিচ্যুত না হয়—এই সব কথায় মনে হইতে পারে যে, পাল মহাশয় নারীর উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী নহেন; দৈনন্দিন সংসার চালাইতে যেটুকু বিদ্যার প্রয়োজন নারীর পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। কিন্তু নারীও সামাজিক জীব। নারীত্ব সত্ত্বেও তাহার সামাজিক সত্তা আছে, শিক্ষার সুযোগ পাইলে নারীও পুরুষের মতো জ্ঞানবিজ্ঞানের সেবায় সামাজিক কর্তব্য প্রতিপালন করিতে পারে। নারীপুরুষ নির্বিশেষে যাহারই প্রতিভা আছে তাহাকে পথ খুলিয়া না দিলে সমাজ পঙ্গু হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মনীতি ও ঐতিহ্য হইতেও এইসব কথারই সাক্ষ্য মিলে। পাল মহাশয়ের অভিভাষণেও উহার বিরোধী কোনও আভাস আছে বিবেচনা করা হয়ত যুক্তিসঙ্গত নয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নারী শিক্ষা বলিতে শুধু মাত্র গার্হস্থ্য শিক্ষা বোঝে না এবং শিক্ষাকে গার্হস্থ্য কর্তব্যের পরিপন্থীও মনে করে না। জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে যে সব মহিলা নিজেদের শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাঁহাদেরকে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করিতে বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিধা করে নাই। এই বৎসরও সমাবর্তন উৎসবে পাল মহাশয় বিশ্ববিদ্যালযের পক্ষ হইতে সেইরূপ সম্মান দান করিয়াছেন দুই জন মহিলাকে—শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চোধুরাণীকে ও শ্রীমতী অসীমা মুখোপাধ্যায়কে।

ইন্দিরা দেবী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের ১৮৯২ সালের গ্রাজুয়েট, ফরাসীভাষায় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। বাঙলাদেশেব গার্হস্থ্য পরিচালনায় ফরাসীভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান কতটা প্রয়োজন তাহার বিচারের ভার পাল মহাশয়ের উপর ছাড়িয়া দেওয়া গেল। কিন্তু ফরাসীভাষা হইতে যে উপাদেয় অনুবাদগুলি ইন্দিরা দেবীর কলম হইতে নিঃসৃত হইয়াছে কোন্ সাহিত্যামোদী বাঙালী পাঠক তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিবে। "নারীর কথা"-য় ইন্দিরা দেবী যে স্বাধীন চিন্তাশীলতার, নির্ভীক মতামতের, স্বতন্ত্র প্রকাশভঙ্গীব পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে পূর্বকথিত নারীত্বের আদর্শের সমর্থন রহিয়াছে।

শ্রীমতী অসীমা মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা ডি. এস-সি। আমরা তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। তাঁহার বিজ্ঞান সাধনা অব্যাহত থাকিয়া দিনে দিনে সমৃদ্ধ হইয়া উঠুক এই কামনা করি। রসায়নের যে বিশিষ্ট বিভাগে তাঁহার গবেষণা চলিতেছে—ভারতের ওষধিসমূহ (Indian Medicinal Plants) ও রামন স্পেক্‌ট্রা (Raman Spectra)—তাহার গুরুত্ব ভারতবাসীর নিকট সহজেই অনুমেয়। তিনি আজ যে গৌরবের অধিকারিণী, তাহা নারী বলিয়া নহে, বৈজ্ঞানিক বলিয়া। বৈজ্ঞানিক বলিয়াই তাঁহাকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সকলে অভিনন্দন জানাইবে।

নীরেন্দ্রনাথ রায়

প্রফেসর ম্যামলক ও জেনারেল স্থভোরভ

সোভিয়েট স্থহৃদ সমিতির উদ্যোগে দু-খানি বিখ্যাত সোভিয়েট ছবি ইতিমধ্যে ক'লকাতায় কয়েকবার দেখানো হয়েছে। পরে আরও কয়েকখানি নতুন ছবি দেখাবার প্রতিশ্রুতিও তাঁরা দিয়েছেন। কিন্তু এমনও আবার শুনিয়েছেন যে, চিত্রগৃহের মালিকদের সহযোগিতার অভাবে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা অনেক সময় তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। এতে চিত্রামোদিদের তরফ থেকে ব'লতে পারি, পুডোভকিন শ্রেণীর বিশ্ববিখ্যাত প্রযোজকদের ছবি দেখতে না পাওয়া দুঃখের কথা, দুর্ভাগ্যের কথা। ব্যবসা হিসেবে তাঁরা নিজেরাও এই ছবিগুলি পরিবেশনের ভার নিতে পারেন। আমাদের সংস্কৃতিমান জনসাধারণকে এ বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ রাখা বা অন্ধকারে রাখা নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য নয়। প্রগতিশীল এই শিল্পটি সাধারণের জীবনের কত কাছাকাছি আসতে পেরেছে, তার ঝোঁক বা তার প্রয়োগক্ষেত্র জনজীবনের বৃহত্তম ক্ষেত্রে কতখানি অগ্রসর হ'চ্ছে—তার নিদর্শন সোভিয়েটের এই ছবিগুলি।

ভাবালুতা ভরা একটা রোমান্টিক হৃদয় আবেদনকে কেন্দ্র ক'রে ছবির পর ছবিতে সময় ভুলানো, মন ভুলানো প্রচেষ্টা এই প্রগতিশীল শিল্পটির বৃহত্তম ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ ক'রে রেখেছিল। হলিউডী প্রভাবের দীর্ঘদিনকার এই ইতিহাস। তবে সে ইতিহাসেরও মোড় ফিরেছে। জনসাধারণের বৃহত্তম জীবনের ক্ষেত্রে সোভিয়েট পদ্ধতির শিল্প-স্থষ্টি হলিউডের দৃষ্টিকেও প্রসারিত ক'রেছে। এর পরিচয় পাওয়া যায়—তাদের কয়েকখানি দলিল চিত্রে, যেখানে সত্য ও বাস্তব সংহত, স্বাভাবিক, সাবলীল। এই কিছুদিন আগে স্থরকার সপাঁর জীবন সম্বন্ধে যে ছবিটি দেখানো হ'য়েছিল—তার যে আবেদন, তার যে শিল্প নৈপুণ্য ও সার্থকতা, তা শুধু স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষের মানসকেই বিচলিত ক'রবে না, আমাদের মতো পরাধীন দেশের জনমানসেও ঢেউ তোলে, বৃহত্তর সুখ-দুঃখের ক্ষেত্রে আলোড়ন আনে। এইখানেই তো শিল্প সার্থক। জেনারেল স্থভোরভের সৈনিক জীবনের আবেদন

স্বরকার সর্পা থেকে অবশ্য স্বাভাবিক ভাবে আলাদা, অন্য জাতের। পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ জুড়ে বলশেভিকরা যখন রাশিয়ার ইতিহাস নতুন ক'রে আবিষ্কার ক'রতে শুরু ক'রলো—তখন থেকেই তারা ব্যারাকে ব্যারাকে ঝুলিয়ে দিল তিনখানি ছবি—একখানি আলেকজাণ্ডার নেভ্‌স্কির, দ্বিতীয়টি জেনারেল স্থভোরভ, তৃতীয় ফিল্ড মার্শাল কুটুসোভ। স্থভোরভ থেকেই সূত্রপাত রুশবাহিনীর বীরত্বের দীক্ষা। নিজে তিনি ছিলেন রাশিয়ার জাতবিদ্রোহী—ব্যক্তিগত ভাবে চিনতেন প্রত্যেকটি সৈনিককে, জানতেন রুশ সৈনিকের আত্মা—পোষাক পরা দাস কৃষকের মন। তখন অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ। আধুনিক, যুদ্ধকলার বহু কিছুর সূত্রপাত হ'লো স্থভোরভ থেকেই। শুধু প্রতিভাশালী সেনাধ্যক্ষ হিসেবেই নয়—রাশিয়ার জাতীয় প্রেরণা হিসাবেও সোভিয়েট সেনার কাছে স্থভোরভ চিরস্মরণীয়। জাতীয় প্রেরণার একটি বলিষ্ঠ প্রাণকেন্দ্রকে আঁকতে গিয়ে পুডোভকিনের দৃষ্টি তুচ্ছ একটি মানুষের সলজ্জ কন্যাপ্রীতিটুকু থেকেও এড়ায় নিঃ দেখি—জেনাবেলেসিমো স্থভোরভ চোরের মত আড়ালে গিয়ে মেয়ের ফটোতে চুমু খাচ্ছেন—আর চকিত দৃষ্টি তুলে দেখছেন, কেউ দেখতে পেল কি না। এই স্থভোরভ—অতি সাধারণ, সৈনিক চাষাভূষোর মাঝখানে পিতৃপ্রতিম মানুষটি—উদ্বুদ্ধ ক'রছেন তাঁর বাহিনীকে: সন্ততিদের ভাবী কালের দিক-নির্দেশ ক'রে যেতে হবে।

জীবন চিত্র বা দলিল চিত্রের সংযম ও বাস্তব নিষ্ঠা নতুন সৃষ্টিতেও এনে দিয়েছে এক সংযত বাস্তববোধ, সহজ কাহিনীর ব্যাপ্তি এগিয়ে এসেছে জনজীবনের অত্যন্ত কাছাকাছি। বিখ্যাত ব্রিটিশ প্রযোজক ব্যাসিল রাইটের এই উক্তি—জনগণের শিল্প সোভিয়েট ছবি, জনগণের জন্যেই তার সৃষ্টি—একথার সার্থকতা ভালো ক'রেই উপলব্ধি হয় প্রফেসর ম্যামলকে। তখন তৃতীয় রাইখের কাল। হিটলার সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের ধাপ্পা দিয়ে সমস্ত ক্ষমতা আয়ত্ব ক'রেছেন নিজে—তাঁর স্বরূপ উদ্ঘাটন ক'রতে কমিউনিস্টরা যখন উঠে প'ড়ে লেগেছে তখন থেকে শুরু হ'লো দলন, তাদের বিরুদ্ধে দেওয়া হ'লো রাইখস্টাগ দাহনের অপবাদ। পাশাপাশি মিটিং-এ মিটিং-এ প্ররোচিত মারপিট আর জেল-গারদ। জার্মানীর রূপ বদলে গেল এক লহমায়। এরই মাঝখানে বিজ্ঞানপ্রিয়, কর্মপ্রিয় ডাক্তার ম্যামলক বিভ্রান্ত হ'য়ে গেলেন। জাতে তিনি ইহুদী—হিটলারের ইহুদী বিদ্বেষ তাঁকে অপমানিত লাঞ্ছিত ক'রে নিয়ে এলো নির্জন সাধনার গণ্ডী থেকে বাইরে। দেখলেন, সাম্যবাদী ছেলে তাঁর ঘর ছেড়ে কোথায় উধাও, আর হিটলারের জার্মানী মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের ঘৃণাকে, জাতির বিরুদ্ধে জাতির হিংসাকে শাণিত ক'রে তুলছে। ম্যামলকের চরিত্র বা তার ক্রমপরিবর্তনের চেয়ে এতে ঝোঁক রয়েছে একটা কালের আবহাওয়াকে ফুটিয়ে তোলার দিকে। তৃতীয় রাইখের প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বটাই এর মূল বিষয়। যার ফলে হৃদয়াবেগ-প্রধান ছবিতে অভ্যস্ত বাঙালী মন সহজেই ম্যামলক, তাঁর ছেলে বা ছেলের মানসীর মধ্যে নির্বিবাদ বিচ্ছিন্নতায় ক্ষুণ্ণ হয়। শেষ দৃশ্যে অধ্যাপক ম্যামলক হিটলারী বাহিনীকে জার্মানীর অতীত ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে

গিয়ে মারা গেলেন বন্দুকের গুলিতে। কোনো আবেগ নেই—একটা কালো ছায়া সমস্ত মানুষগুলোকে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিল। যেন এক মুহূর্ত কারুর ভাববার, কিছু ব'লবারও অবকাশ নেই। কঠিন সামরিক নিষ্পেষণে নিঃশব্দে সকলে অন্ধকারে সরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। সময় উপাদানের প্রগতিশীল ধারা জনজীবনের গোটা অংশটা জুড়ে যে ভাবে তাকে ভাঙছে, গড়ছে আর এগিয়ে যাচ্ছে—তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রফেসর ম্যামলকের কাহিনী সার্থক সৃষ্টি এবং এই জাতীয় ছবি ভাবী কালের হুঁশিয়ারীও।

সুশীল জানা

'পরিচয়ের' শারদীয় সংখ্যা ও অন্যান্য সংখ্যার জন্য আমরা বিশেষ আয়োজন করতে চাই; অবশ্য কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি পেলেই তা সম্ভব। নইলে, এখন পর্যন্ত কাগজের সম্পর্কে যা কড়াকড়ি আছে তাতে এ সংখ্যা 'পরিচয়ের' অপেক্ষাও আমাদের পৃষ্ঠা সংখ্যা ভবিষ্যতে কমাতে হবে। বিশেষ অনুমতি না পেলে 'পরিচয়' সম্পর্কে আমাদের আয়োজন সার্থক হবে না। সে ক্ষেত্রে পাঠক ও বিজ্ঞাপন দাতাদের নিকট মার্জনা ভিক্ষা করা ছাড়া আমাদেরও আর গত্যন্তর নেই।

'পরিচয়ের' এ সংখ্যার মুদ্রণকালে কয়েকটি গুরুতর ত্রুটি ঘটেছে। দ্বিতীয় কবিতাটি অনুবাদ করেছেন নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, তাঁর নামই বাদ পড়েছে। তা ছাড়া কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে, ১০ম পংক্তিও একটু ভুল ছাপা হয়েছে। পংক্তিটি এইরকম হবে: "লিখেছ যবে না ঝরাপাতার, তুষার পড়ার দিন।" প্রথম কবিতাটিতে কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের নামও ভুলভাবে মুদ্রিত হয়েছে। অবশ্য মুদ্রণে সেরূপ সামান্য ত্রুটি অন্যত্রও আছে।

সম্পাদক, পরিচয়

পঞ্চদশ বর্ষ—১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা
আশ্বিন, ১৩৫২

কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে

কয়েকদিন পরেকার কথা—সন্ধ্যেবেলা বসে আছি, বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, আমাদের রাত্রের খাওয়া শেষ, কাজেই আরিয়াম ও এণ্ড্রুজ চলে গেছেন নিজেদের বাসায়; শুতে যেতে তখনও অনেক দেরী—আমরা দুজনে কবিকে ধরলাম একটা গল্প বলুন। বল্লেন "আচ্ছা, লাগো। এরকম কাজ আগেও ঢের করেছি। কুচবেহারের মহারাণী সুনীতি দেবীর একটা নেশা ছিলো আমার মুখে গল্প শোনা। গল্পগুচ্ছের 'দুরাশা' গল্পটা, সেই যাতে ক্যাল্‌কাটা রোড আছে—ওঁকেই মুখে মুখে বলেছিলুম। এরকম আরো অনেক গল্প তিনি আমার কাছে আদায় করেছিলেন, যেগুলো পরে গল্পগুচ্ছতে ছাপা হয়েছে—যেমন 'মাষ্টার-মশাই,' 'মণিমালা' ইত্যাদি। তাঁর আবার ভুতের গল্প বেজায় পছন্দ ছিলো, কাজেই কেবলি জিজ্ঞাসা করতেন, আপনি ভুত দেখেছেন? সত্যি রবিবাবু, আপনি বলুন না যে ভুত দেখেছেন কিনা। যতো বলি যে, না, এখনও তাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি, ততোই বলেন এ কখনো হ'তেই পারে না; বলতেই হবে আজ একটা ভুতের গল্প। এইরকম সব দিনেই বাধ্য হয়ে কঙ্কালকে সর্ব্বাঙ্গে গহনা পরাতে হয়েছে, মাষ্টারমশায়কে ঠিকে গাড়ীর ভিতর আত্মহত্যা করাতে হয়েছে—নইলে ভুতের গল্প কোথায় পাই বলো? যেদিন 'মাষ্টারমশাই'টা বানিয়েছিলুম সেদিন ভারি মজা হয়েছিলো। রাত্রে আলিপুরে 'Woodlands'-এ মহারাণীর কাছে খাবার নেমন্তন্ন। খাবার পরে সেই এক কথা "রবিবাবু, আজ আপনাকে একটা ভুতের গল্প বলতেই হবে।" "বললুম ঠিক ভুত, কি আর কিছু জানিনে, তবে এর আগের বারে যেদিন আপনাদের বাড়ি খেতে এসেছিলুম সেদিন ফিরে যাবার সময় এক অদ্ভুত কাণ্ড! চারিদিক থেকে অমনি 'কি' 'কি' প্রশ্ন। আমি ধীরে-সুস্থে আরম্ভ করলুম যে, নাটোরের মহারাজা আর আমি তো বেরোলুম আপনাদের বাড়ি থেকে হেঁটে—পথে একটা ঠিকে গাড়ী জোগাড় ক'রে নেবো স্থির করেছিলুম। একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ময়দানের ভিতর দিয়ে এসে চৌরঙ্গীতে পড়া গেলো। ঠিকে গাড়ীর আড্ডায় দুখানামাত্র গাড়ী—একখানা নাটোর নিলেন, অন্যখানাতে আমি চড়ে বসে জোড়াসাঁকো নিয়ে যেতে বল্লুম। গাড়োয়ানটাতো স্ট্যাণ্ড ছেড়ে কিছুতেই যাবে না; বলে বারোটা বাজে বাবু, আর আমি ভাড়া খাটবো না। শেষে পুলিশের ভয় দেখানোতে অগত্যা যেতে রাজী হোলো। বল্লুম, ময়দানের ভিতর দিয়ে

চলো। চলেছি তো চলেইছি, রাস্তা আর শেষই হয় না। কেবলি একই জায়গায় গাড়ী ঘুরে আসছে চক্কর দিয়ে। যতোই চেঁচিয়ে গাড়োয়ানকে বকি, কিছুই ফল হয় না। খানিক পরে হঠাৎ মনে হোলো সামনের সিট-এ কে যেন বসে রয়েছে—স্পষ্ট কেউ নয়, শুধু জল্‌জলে বড় বড় চোখ দুটো আর একটা হাসি যেন দেখতে পাচ্ছি। ব্যাপারটা কি রকম একটু ঘোরালো মনে হোলো। যাই হোক, সারারাত এমনি ঘুরে ঘুরে প্রায় যখন ভোর হয়ে এসেছে তখন হঠাৎ গাড়ীখানা আবার স্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়ালো। গাড়োয়ানটাকে খুব বকাবকি করলাম। সে বোল্‌লো, কি কোরবো বাবু, আমি তো আপনাকে বারণ করেছিলুম আমার গাড়ী নিতে। রাত বারোটার পরে আমি আড্ডা থেকে গাড়ী বের করলেই আমার এই দশা হয়—কে যেন আমাকে ঐ রাস্তায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়, তারপর আবার ভোরবেলা এখানে ফিরে আসি। আমি সেদিন তাকে খুব শাসিয়ে গেলুম, থানায় তার নামে নালিশ কোরবো বলে। জোড়াসাঁকো থানাতে যখন এজাহার দিতে গিয়েছি তখন পুলিশ দারোগাটি হঠাৎ চম্‌কে উঠে বোল্‌লো, 'কতো নম্বর গাড়ী বল্‌লেন? ও, ঐ নম্বর? আপনি ওটা সম্বন্ধে কিছু জানেন না?' আমি তো অবাক! জানবো আবার কি? গাড়োয়ানের দুষ্টুমিই তো জানি, আর সেই কথা বল্‌তেই তো এখানে এলুম। দারোগা হেসে বল্লে, 'না মশায়, দুষ্টুমি নয়। ও গাড়ীতে কিছুদিন আগে একটা লোক রাত বারোটার সময় গড়ের মাঠের মাঝখানে আত্মহত্যা করেছিল,—গাড়োয়ানকে বলেছিল গঙ্গার ধারে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যেতে, তারপর গাড়ীর মধ্যে নিজে কাজ সেরেছে। সেই থেকে ঐ গাড়ী বারোটার পরেই আড্ডা থেকে বেরোলে আর নিজের গন্তব্যস্থানে পৌঁছুতে পারে না, সারারাত গড়ের মাঠে ঘুরে ঘুরে শেষকালে ভোরবেলা গাড়ীর আড্ডায় ফিরে আসে। কিন্তু সারাদিন আর কোনো মুস্কিল নেই। সেই জন্যেই গাড়োয়ানটা রাত বারোটার কাছাকাছি ভাড়া খাটতে চায় না; অথচ ভুতুড়ে গাড়ী নাম হলে দিনেও ভাড়া হবে না বলে একথা কাউকে বল্‌তেও নারাজ।' এতক্ষণ মহারাণী প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে আমার গল্প শুন্‌ছিলেন—বড় বড় চোখ উৎকণ্ঠায় একেবারে আরো বড়ো হ'য়ে গেছে। আমি থামতেই বল্‌লেন, 'রবিবাবু, সত্যি?' আমি গম্ভীর মুখে উত্তর করলুম, না, সত্যি নয়।" ঘরসুদ্ধ সবাই হো হো ক'রে হেসে উঠলো। মহারাণী ছেলেমানুষের মতো দুঃখিত হয়ে কেবলি বল্‌তে লাগলেন 'রবিবাবু, এ গল্পটা কেন সত্যি হোলো না? সত্যি হলে বেশ হোতো।' তিনি বড় আশা করেছিলেন যে, এতদিন পরে একটা জ্যান্ত ভুতের গল্প আমার কাছ থেকে পেলেন। ওঁর যে কী রকম ভুত বিশ্বাস করতে আগ্রহ ছিল তা বল্‌তে পারিনে। এমনি করে ওঁর জন্যেই আমার কয়েকটা ছোটো গল্প মুখে মুখে তৈরী হয়ে উঠেছিলো। আজ আবার তোমরা ধরেছো, দেখি এটা কি রকম হয়।"

"ধরো গল্প শুরু করা যাক—টিং টিং টিং টেলিফোন বেজে উঠেছে, বাড়ির একটি মেয়ে গিয়ে ধরলো টেলিফোন—ও প্রান্ত থেকে যে কথা কইছে তার গলা অচেনা, ছেলেটি কিছুতেই নামও বল্লে না। খানিকটা কথা হবার পর হঠাৎ টেলিফোন থেমে গেলো। মেয়েটি তো অবাক! কে, কী বৃত্তান্ত, কিছুই জানে না, অথচ কথা বল্‌বার পর থেকে বুকের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়েছে। পরদিন আবার ঘণ্টা। ক্রমে এমন হোলো যে মেয়েটি রোজ অপেক্ষা ক'রে থাকে বিকেল বেলা টেলিফোন বাজবে বলে। যে ছেলেটি কথা বলে সে

কিছুতেই নাম ঠিকানা বলে না। শুধু এইটুকু বলেছে যে সেও কখনো মেয়েটিকে দেখেনি, তবু তার কথা এত শুনেছে যে, আলাপ না ক'রে থাকতে পারলো না। মেয়েটির বাড়িতে যে সে আসতে চায় না তার কারণ পাছে দেখা হলে তার এই ভালোলাগাটুকু চলে যায়, তাই সে দূরে দূরেই রইলো। টেলিফোনের ভিতর দিয়ে এই যে পরিচয় সেইটুকুতেই সে খুশি থাকবে। মেয়েটির কথা কার কাছ থেকে শুনেছে তাও সে কিছুতেই বলতে রাজী নয়। এইরকম ক'রে টেলিফোনের আলাপ যখন বেশ জমে উঠেছে এমন সময় হঠাৎ একদিন ছেলেটি বোল্লো যে সে বিদেশে চলে যাচ্ছে কাজেই আর গল্প করা হবে না। কিছুদিন পরে মেয়েটি শিলং পাহাড়ে চেঞ্জে গেলো। সেখানে একদিন গাড়ীর আকস্মিক দুর্ঘটনা, যে ভদ্রলোক সাহায্য করলেন তাঁর গলা শুনে মেয়েটি চম্‌কে উঠলো, তিনিও বুঝলেন কাকে সাহায্য করেছেন। টেলিফোনের ভিতর দিয়ে তাদের এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিলো যে পরস্পরকে চিনতে একটুও দেরী হোলো না" ইত্যাদি। গল্পটা মোটেই এ রকম ছোটো নয় এবং এতো শুক্‌নো তো নয়ই। মোটামুটি যা ঝাপ্‌সাভাবে মনে আছে আমি তাই শুধু বল্‌লাম। মোটকথা আমরা দুজনেই অত্যন্ত জেদ্ ধরলাম এটা লিখে ফেলবার জন্যে। কবি কিছুতেই রাজী নন। আমরা যতো অনুরোধ করি উনি ততোই বলেন, "আমি তো এই বল্লুম; এখন তোমরা লিখে রাখো। রানীর সঙ্গে তো আমার একটা বোঝাপড়া হয়েই ছিলো বিলেত থেকে চলে আসবার সময় যে, ও একটা গল্প লিখবে, আর তার বদলে আমিও দেশে ফিরে একটা গল্প শুরু কোরবো। আমার কথা আমি রেখেছি—বিচিত্রাতে কুমুর গল্পটা শুরু করেছি, কিন্তু রানীর কথা রানী রাখেনি—আজ পর্য্যন্ত কোনো গল্পের নাম নেই।" আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন "এই তো প্লট দিলুম, এইবার তোমার প্রতিজ্ঞা রাখো। এত ক'রে বলছি, লাগো, কুছ পরোয়া নেই, লিখে তো ফেলো, তারপর আমি কথা দিচ্ছি যে তাকে এমন ক'রে ঘসে মেজে দেবো যে কার সাধ্যি তোমার লেখা বলে চিন্‌তে পারে। সবাই বল্‌বে ঠিক যেন রবিঠাকুর বেনামে লিখেছে। হাসছো? বিশ্বাস হচ্ছে না? এ কাজ আমি আগেও অনেকবার করেছি। অনেক দিন আগে আমাদের খামখেয়ালি নামে এক ক্লাব ছিলো। তার নিয়ম ছিলো সভ্যদের সকলকেই পালা ক'রে এক একবার এক একটা গল্প লিখ্‌তে হবে। আমার ভাইপো সমরের একবার পালা—সে তো ব্যাকুল হয়ে পড়লো—'রবিকা, কি করি?' সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লুম, তুমি একটা লেখো আমি ঘসে মেজে ঠিক করে দেবো।' 'পোষ্যপুত্র' গল্পটা যখন সমর পড়ল ক্লাবে কারোই বুঝতে বাকি রইলো না ব্যাপারটা কি হয়েছে। সমর যা লিখে দিয়েছিলো তার আগাগোড়া কিছুই আমি বাকি রাখিনি। গল্পটা পড়ে সমর তো মহা খুশি, কিন্তু বারবার বল্‌তে লাগলো 'এটা আমার লেখা বলা অন্যায় হবে রবিকা।' বল্‌লুম, 'চুপ করে যাও না, এতে হয়েছে কি?' ঐ গল্পটা সমরের নামেই আমার কাগজে ছাপিয়েছিলুম।"

অধ্যাপক বললেন, "হ্যাঁ, আমি জানি; কারণ আমি পুরোনো পত্রিকা সব ঘেঁটে আপনার লেখা যখন সংগ্রহ করছিলুম সেই সময় এটা আমার চোখে পড়ে। অনেক প্রবন্ধে ও গল্পে আপনার নাম না থাকলেও আমি ইণ্টারনাল এভিডেন্স থেকে আপনার লেখা উদ্ধার করবার চেষ্টা করছিলুম বলে আমার বুঝতে বাকি ছিলো না যে, সমরবাবুর নামে ছাপা হলেও ওটা আপনারই লেখা। পরে আমি ঐ গল্প এবং আরো অনেক

অনামা প্রবন্ধের নিচে আপনাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছিলুম।” কবি হেসে বললেন, “হ্যাঁ, আমার মনে আছে। অনেক লেখা নিয়ে তুমি একদিন আমাকে জেরা করেছিলে।” আমি কবিকে বললাম, “আচ্ছা, এ রকম করে অন্যলোককে দিয়ে লিখিয়ে আপনার লাভ কি? তার চেয়ে গোড়া থেকেই তো নিজে শুরু করা ভাল।”

“না গো, একটা ‘চান্স’ দিতে চাই তোমাকে জগদ্বিখ্যাত হবার। সবাই যখন আজকাল লিখছে তখন তুমিই বা লিখবে না কেন? স্বয়ং সাহিত্যসম্রাট তোমার সহায়, অতএব ভয় কি? এইবার লাগো, কি বলো?”

আমি হাসতে হাসতে উত্তর করলাম “আপনি তো চান্স দিচ্ছেন জগদ্বিখ্যাত হবার কিন্তু ভালোমন্দ কিছু একটা খাড়া ক’রে আপনার হাতে না দিলে আপনি ঘষা মাজা করবেন কাকে? আমার যে সেটুকু ক্ষমতাও নেই। তবে বুদ্ধিটুকু আছে বোঝবার যে, জগদ্বিখ্যাত হবার চেষ্টা করলেই ভুল হবে। তার চেয়ে চুপ করে থাকাই ভালো।”

“বাঃ, এ কিন্তু তোমার ভারি অন্যায়। বিলেত থেকে চলে আসবার সময় আমাকে যখন কথা দিয়েছিলে যে আমি একটা নতুন গল্প লিখলে তুমিও এবার একটা লেখবার চেষ্টা করবে তখন সে কথা তোমার রাখা উচিত। ফাঁকি দিয়ে আমাকে আসরে নাবিয়ে দিলে আর নিজে চুপ করে আছো আজও। আমার আচ্ছা গেরো হয়েছে। এমনি হয় তো বেশ আছি, হঠাৎ কুমুর ভাবনা থেকে থেকে আমাকে অস্থির করে তুলছে। কেবলি ভয় যে মধুসূদন কখন কী একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। কুমুর জন্যে আমার আর উৎকণ্ঠার সীমা নেই। এর উপরে তোমরা আবার আর একটা ঘাড়ে চাপাতে চাচ্ছো?” আমাদের দুজনেরই সেই এক কথা—“এত ভালো একটা গল্প কিছুতেই হারিয়ে যেতে দেওয়া উচিত হবে না।”

“আচ্ছা, আজকে তো শুয়ে থাকা যাক; কাল আবার যখন একটা গল্প বলব তখন আবার গোলমাল করতে থাকবে এটার চেয়েও সেটা আরো ভালো হয়েছে বলে। লিখতে আর আমি পারবো না, সে কিন্তু আগেই বলে দিচ্ছি। একে রাজকীয় আতিথ্যে প্রায় অনাহারে শুকিয়ে মরছি, তার উপর আবার গল্প লেখার পরিশ্রম? এই বুঝি তোমাদের দয়ামায়া?” সেদিনকার রাত্রের সভা এইখানেই ভঙ্গ হোলো।

পরদিন সকালে একটা খাতা জোগাড় ক’রে কবির লেখবার টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখলাম। খাতাখানা রাখতে দেখে কবি একটু হেসে চোখ টিপে বললেন, “বুঝেছি, তোমার মতলব ভালো নয়, কিন্তু আমি আর ভুলছিনে তোমার কথায়। দিব্যি চা-রুটি খেয়ে এই কৌচের উপর লম্বা-আ-আ করে পা ছড়িয়ে দিয়ে চিৎ হয়ে পড়বো আর পাখীর ডাক শুনবো—কে নড়ায় দেখি আমাকে এখান থেকে। অনেক কষ্টে কুমুকে প্রায় শেষ ক’রে এনেছি; কোনোমতে বাকীটুকু লিখে ফেলতে পারলেই বাস্, আমার ছুটি। ঠিক এই সময়ে আবার একটা নতুন গল্প? সে কিছুতেই হচ্ছে না। তোমাকে সঙ্গে এনেছি আমাকে একটু যত্ন করবে, শুশ্রূষা করবে, থেকে থেকে বলবে ‘এইবার আপনি বিশ্রাম করুন,* দিনের বেলায় বিছানার উপর গিয়ে চি-ই-ৎ হয়ে পড়ে থাকুন’ ইত্যাদি।

* দিনের বেলা বিশ্রাম করা নিয়ে চিরকাল কবিকে জেদ করেছি, তাই উনি সর্ব্বদাই দিনে ঘুমানো নিয়ে আমাকে ঠাট্টা করতেন।

কেমন তাই নয়? ওঃ!, দিনের বেলা ঘুমোতে তোমার কি ভালোই না লাগে। তাই আমিও সারাটা দিন ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিই এই তোমার ইচ্ছা। কিন্তু কাল রাত থেকে হঠাৎ তোমার এ কী রকমের বুদ্ধি হলো বলো তো? কেবলই ষড়যন্ত্র করছ বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে যে কী ক'রে বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাবে। উনি দেখতে দিব্যি ভালোমানুষটি, কিন্তু সকাল বেলা উঠেই আমার বিপদ ঘটাবার চেষ্টায় তোমার হাতে খাতাটি জুগিয়ে দিয়েছেন তো? কাল রাত থেকে দেখছি যুগলের খালি পরামর্শ চলেছে।"

যতক্ষণ চা খাওয়া না হোলো কিছু বল্লাম না। খাওয়া শেষ হলে যেই চেয়ার ছেড়ে উঠে তাড়াতাড়ি কৌচের উপর বসতে যাবেন ঠিক সেই সময় পিছন দিক থেকে এসে ঠেলে ধরতে আর বসতে পারলেন না, হো হো ক'রে হেসে উঠ্লেন; তখন একেবারে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে লেখ্বার টেবিলের সামনে উপস্থিত করাতে বাধ্য হয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন। হাসির পালা আমার। বকতে লাগলেন, "আঃ, কী করো? ভারি জেদী মেয়ে। এক এক সময় তুমি সত্যিই অত্যাচার করো আমার উপর," বকছেন, আর হাসছেন ততোধিক। বল্লেন, "কখন থেকে মনে মনে ঠিক ক'রে আছি গল্প করতে করতে অন্যমনস্ক ক'রে দিয়ে হঠাৎ গিয়ে কৌচের উপর পা তুলে দেবো, তখন আর নড়ায় কার সাধ্য! কিন্তু দেখেছো প্রশান্ত, রানীর অত্যেচার? ঠিক সময়মতো এসে আমাকে ধরেছে। একটু শাসন করো না ওকে। এবেলা কর্ত্তৃপক্ষ কিছু বলছেন না। আসলে ওঁরও যে এতে সায় আছে।"

অধ্যাপক তো মহাখুশি শেষ পর্য্যন্ত ওঁকে খাতার সামনে এনে বসাতে পেরেছি বলে। এখন কোনোমতে চার পাঁচটা লাইনও শুরু হলে হয়—তারপর আর ভাবনা নেই, আপনিই গড় গড় ক'রে এগিয়ে যাবে।

অবশেষে কবি আবার, "আঃ, তুমি বড় জ্বালাতন করো," বলে খাতাটা টেনে নিয়ে বস্লেন। আগেই ঠিক হয়েছিলো, সেদিন আরিয়াম ও আমরা দুজন সকাল বেলা উতকামণ্ডে যাবো; ফিরতে সন্ধ্যে হবে, তাই এণ্ড্রুজ সাহেব সারাদিন কবির কাছে থাকবেন।

আমরা তো চলে গেলাম। যাবার সময় চেয়ারের পিছন থেকে উঁকি দিয়ে দেখে গেলাম তিন চার লাইন মাত্র লেখা হয়েছে। সন্ধ্যেবেলা যখন ফিরেছি কবি প্রথম কথা বল্লেন, "হয়েছে খানিকটা। এখন বুঝ্তে পারছি সহজেই এগোবে। প্রথম কয়েক লাইন একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চল্ছিলো, তারপর থেকে একেবারে আপনিই এগোচ্ছে। গল্পের পাত্র পাত্রীদের সঙ্গে এখন বেশ কথাবার্ত্তা চল্ছে আমার—জানি এরকম হলে আর কোনো ভয় নেই।"

যতোটুকু লেখা হয়েছিলো রাত্রে খাবার পরে আমাদের পড়ে শোনালেন। যে গল্প আমাদের আগের দিন বলেছিলেন—দেখি তার কোনো চিহ্নমাত্র নেই এই "অমিট্ রাএ'র" কাহিনীতে। ভাষা একেবারে নতুন রূপ নিয়েছে, লেখাটা যেন ঝল্মল্ করছে। আমাদের দুজনের মন খুশিতে ভরে উঠলো। বল্লাম "এ গল্পের ক্রেডিট্ কিন্তু সম্পূর্ণ আমার। আমি নিতান্ত জেদ্ করেছিলাম বলেই এমন একটা অপূর্ব্ব লেখার সৃষ্টি হোলো। আপনার বৈজ্ঞানিক তো কিছুতেই ওরকম জোর ক'রে ধরে এনে আপনাকে চেয়ারে বসাতে পারতেন না। হয়তো দুচার বার "লিখুন", "আপনার কিন্তু লেখা উচিৎ" বলেই বাধ্য হয়ে শেষ পর্য্যন্ত

থেমে যেতেন। বড় জোর সাহিত্যের দিক থেকে আপনার কর্ত্তব্যের দোহাই পাড়তেন আর আপনি উত্তর করতেন "পস্টারিটির জন্যে আমার তো ভারি ভাবনা। ঢের সাহিত্য তোমাদের দিয়েছি, এইবার আমার একটু আরাম করবার পালা"—ব্যস্, হয়ে যেতো "অমিট্ রাএ'র" জীবন্তসমাধি। আমি যে আপনার উপর সহজে অত্যাচার করিনে এ কথা আপনাকে মান্‌তেই হবে; তা না হলে নির্ভয়ে আমাকে নিয়ে এতদিন ঘুরে বেড়াতে পারতেন না—দুদিনেই প্রাণ হাঁপিয়ে উঠতো। কিন্তু আজকে কেন জানি না মনে হয়েছিলো জেদ্ না করলেই অন্যায় হবে। প্রমাণ তো হোলো আমার ধারণাই ঠিক? নইলে আপনি এই অসুস্থ শরীর নিয়ে নিজে ইচ্ছে ক'রে যখন শুতে চাচ্ছেন—যে শোওয়া নিয়ে আমার সঙ্গে আপনার কতো ঝগড়া—তখন আমি আপনার হাত ধ'রে লিখ্‌বার টেবিলে টেনে আনি?"

"আচ্ছা, আচ্ছা; ভারি তোমার বুদ্ধি? সারাদিন কষ্ট ক'রে লিখলুম আমি আর এখন ক্রেডিট্ নিচ্ছেন উনি।"

আমাদের সকলের হাসি থাম্‌লে আবার বল্লেন, "সত্যের খাতিরে একথা বল্‌তেই হবে যে তুমি অত জেদ্ না করলে সত্যিই আমি এ গল্প লিখতুম না। যেমন অনেক গল্প কুঁড়েমি ক'রে হারিয়ে ফেলেছি এটাও তাই করতুম। এখন কিন্তু লিখতে বেশ লাগছে, কারণ, ওদের যে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।"

সেদিন রাত্রেও আর একটা গল্প মুখে মুখে বল্‌লেন—এম্‌নি ক'রে চার সন্ধ্যায় চারটে গল্প বলা হোলো। কিন্তু 'অমিট্ রায়' ছাড়া আর কোনোটা লিখবার জন্যে ফের আব্দার করলাম না। কারণ তখনও 'যোগাযোগ'টা লেখা চল্‌ছে। কখনও এটা লেখেন, কখনও ওটা। অথচ দুটো একেবারে দু'জগতের—

কি করে একই সঙ্গে লেখা দুটো চলেও ভাষা একটুও মিশ খেয়ে যায় না তা ভেবে পাইনে। আশ্চর্য্য ব্যাপার!

রোজ হয় দুপুরে নয় রাত্রে পড়ে শোনাতেন যতোটা করে লেখা হোতো। আমরা উৎসুক হয়ে অপেক্ষা ক'রে থাকতাম 'অমিট্ রায়' ও 'লাবণ্যের' জন্যে।

কুন্নুরে এই সব কারণে কবির মন বেশ খুশিতে ছিলো, কিন্তু আর থাকা চল্‌লো না। একদিন সন্ধ্যেবেলা বললেন, "প্রশান্ত, কালই আমার পালাবার ব্যবস্থা করো। আর বেশি দিন এখানে থাক্‌লে ভবিষ্যতে আমি না খেয়ে মরে যাবো। এখানে ক্রমাগত এত খাবার দেখে দেখে আমার সমস্ত দিন কি রকম গা কেমন করছে। আরো কিছু দিন এরকম চল্‌লে জীবনে কোনো জিনিস আর মুখে তুলতে পারবো না।"*

কুন্নুরে সেদিনকার কথার পরে আবার আমরা গোছগাছ শুরু করলাম। মহারাজা ক্ষুণ্ণ হলেন কবি অত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছেন বলে—যদিও আমরা বোধ হয় দিন দশেক ছিলাম।

* কবির মৃত্যুর ঠিক আগের ক'মাস যখন খাবারে অত্যন্ত অরুচি হয়েছিলো আমার তখন কুন্নুরের কথা মনে পড়ে যেতো, "ভবিষ্যতে আমি না খেয়ে মারা যাবো।" কবিরাজমশাই সেই সময় একদিন আমাকে বলেছিলেন, যেমন করেই হোক গুরুদেবকে কিছু কিছু খাওয়াতে না পারলে চল্‌বে না। এই অরুচি জিনিসটাকেই আমরা ভয় পাই। শেষপর্য্যন্ত ওঁদের সেই ভয়েরই জয় হোলো।

এদিকে সাহেব মান্দ্রাজে খবর নিয়ে ইতিমধ্যে জেনেছেন যে একটা ফরাসী জাহাজ ২।৪ দিনের মধ্যেই ছাড়বে—কবি সেটাতে করেই অনায়াসে পশ্চিমে পাড়ি দিতে পারবেন।

জাহাজ কলম্বো হয়ে যাবে। কবি অধ্যাপককে বললেন, "প্রশান্ত, রানীর এত বেড়াবার সখ। চলো, তোমরা দুজন আমার সঙ্গে কলম্বো পর্য্যন্ত না হয় গিয়ে তারপর ওখানে যা যা বেড়াবার আছে, যেমন নিউরেলিয়া, ক্যাণ্ডি ইত্যাদি ঠাণ্ডা জায়গায় বাকি ছুটিটা কাটিয়ে তারপর ক'লকাতা ফিরে যাবে। এত দূরই যখন তোমরা এসেছো তখন আরো যে ক'টা দিন সঙ্গে থাকা যায় থেকে তার পর আমাকে পশ্চিমে যাত্রা করিয়ে দিও।" আমি তো খুব খুশি—আরো বেড়ানো হবে মনে করে; কারণ সিলোনটা তখনও আমার দেখা হয়নি। বিলেত যাবার সময় যদিও কলম্বো থেকেই জাহাজে চড়েছিলাম কিন্তু পৌঁছেছিলাম সেখানে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে, কাজেই শহরটা একটু ঘোরা ছাড়া আর কিছুই দেখিনি। অধ্যাপক কবির কথায় বললেন, "আমাদের তো যেতে আপত্তি নেই কিন্তু আপনার সঙ্গে যাবার জায়গা হবে কি না সন্দেহ; কারণ এখন গ্রীষ্মের সময় প্রায় প্রত্যেক জাহাজই তো ভর্ত্তি থাকে। তবে মান্দ্রাজে খবর নিয়ে দেখি আপনার জাহাজে আর একটা ক্যাবিন খালি আছে কি না।"

কুনুর থেকেই টেলিগ্রাম ক'রে জানা গেলো কবির ক্যাবিন ছাড়াও আরও একটা 'ল্যুক্স' (Luxe) ক্যাবিন খালি আছে। এণ্ড্রুজ সাহেব মান্দ্রাজ থেকে ট্রেনে কলম্বো পর্য্যন্ত যাবেন—পথে নাকি তাঁকে কয়েক জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে যেতে হবে; কাজেই আমরা অনায়াসে জাহাজের খালি ক্যাবিনটা দখল ক'রে যেতে পারবো কলম্বো পর্য্যন্ত।

আবার সেই মান্দ্রাজ যাত্রা। এমন হিসেব করে কুনুর থেকে বেরোনো হোলো যাতে মান্দ্রাজে আর এক রাতও না কাটাতে হয়। গরমের বিভীষিকা তখনও আমাদের মন থেকে ঘোচেনি।

পাহাড় থেকে কবিকে নিয়ে মোটরে নাবাই স্থির হোলো; এবারে আর এণ্ড্রুজ তাতে আপত্তি করলেন না। তিনি ও আরিয়াম চলে গেলেন—অগ্রদূত হয়ে জিনিসপত্র নিয়ে ট্রেনে। আগেই বলেছি কবি বরাবরই ট্রেনের চেয়ে মোটরে চলাই বেশি পছন্দ করতেন, তাই বিদেশেও কতো সময় আমরা লম্বা লম্বা পথ ট্রেনের বদলে মোটরেই গিয়েছি।

কুনুরে স্যার শঙ্করণ নায়ার কবির সম্বর্দ্ধনায় একটা মস্ত আনন্দ-সম্মিলনের আয়োজন করেছিলেন। কুনুরে খুব বেশি লোক না থাকলেও গণ্যমান্য সকলেই সেদিন এসেছিলেন। স্যার য্যালবিয়ান্ ব্যানার্জ্জি এবং আরো দুচারজন বাঙালী যাঁরা ছিলেন সকলেই আগ্রহের সঙ্গে এসে কবিকে ঘিরে বসলেন। খুব খুশি—অপ্রত্যাশিতভাবে কুনুরে কবিকে পেয়েছেন বলে। সেই পার্টিতেই স্যার শঙ্করণ শুনলেন যে দু'চার দিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ নেবে যেতে ইচ্ছুক। তখনি ছেলের উপর হুকুম হোলো যেন তাঁর নিজের মোটরে রবীন্দ্রনাথকে নিচে নিয়ে গিয়ে মান্দ্রাজের গাড়ীতে চড়িয়ে দিয়ে আসা হয়। এই ছেলে কোচীনের রাজকুমারীকে বিয়ে করেছেন।

দু' তিন দিন পরে যেদিন আমরা রওনা হলাম মিঃ পালট তাঁর বাবার প্রকাণ্ড মোটরে খুব যত্ন করেই কবিকে মেটুপালম্ স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিশক্তির কোনো বাধা তখনও ঘটেনি, কাজেই নীলগিরি পাহাড়ের নিবিড় সবুজ বন আর তার ভিতর দিয়ে দিয়ে ছায়াঘন রাস্তা—খুব উপভোগ করেছিলেন পথটা। মনে আছে প্রায় যখন পাহাড়তলিতে এসে পৌঁছনো যায় তার একটু আগেই একটা সুপুরি গাছের প্রকাণ্ড বন,—মোটরে নামবার সময় উপর থেকে সেটা সুন্দর দেখায়। সুপুরি গাছের শাখাগুলো যেন বড় বড় ফুলের মতো ফুটে রয়েছে। কবি মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে চেয়ে বললেন, "কী চমৎকার! যেন বড় বড় সবুজ পদ্মফুল—ট্রেনে এলে তো এমন করে দেখতে পেতুম না।"

মেটুপালম্-টা পাহাড়তলির ছোট্টো স্টেশন। বিকেলে পৌঁছলাম যখন তখন ঠিক সূর্য্যাস্ত হচ্ছে, তার গায়ে দূরে নীলগিরি পাহাড় সত্যিই নীল দেখাচ্ছে। দৃশ্য অতি মনোরম হলেও গরমের কষ্টে সেদিকে মন দিতে পারছিলাম না।

স্টেশনের ছোট্টো ওয়েটিংরুমে আমাদের বসিয়ে মিঃ পালট কবির জন্যে স্পেন্সার থেকে কেক্, রুটি, চা প্রভৃতি নিয়ে এলেন। আমরা খাওয়া আরম্ভ করার আগেই তিনি হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য। খাবার নিয়ে খানিকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে আমি যখন তাঁকে ডাকতে গিয়েছি প্ল্যাটফর্মে, দেখি তিনি আমাদের জন্যে এত সব আয়োজন ক'রে দিয়ে নিজে শালপাতায় মোড়া কয়েকটা মান্দ্রাজী ফুলুরী ও পিতলের গেলাসে করে 'ব্রাহ্মণ কফি' কিনে খাচ্ছেন। আমাকে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "আমার চায়ের চেয়ে কফি এবং কেকের চেয়ে এইসব খাবারই বেশি ভালো লাগে, তাই আমি বাইরে এসে খাচ্ছি।" কবিকে গিয়ে ব্যাপারটা বলতে তিনি বললেন, "দক্ষিণ ভারতে দেখেছি বাইরে লোকে যতোই সাহেব সাজুক আসলে তাদের খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি সব বিষয়ে খুবই দেশী ভাবটা বজায় রেখেছে। আমাদের দেশের এই রকম ধনী ঘরের ছেলে যার বাইরে এত পোজিসন সে রিফ্রেশমেণ্ট রুমের খাবার না খেয়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে শালপাতার ঠোঙায় ফুলুরী কিনে খাচ্ছে ভাবা শক্ত হোতো। আমাদের বড্ড বেশি সাহেবীআনাতে পেয়ে বসেছে।"

রাত্রে ট্রেনে চড়ে ভোরবেলা মান্দ্রাজ পৌঁছনোর মধ্যে আর উল্লেখযোগ্য ঘটনা কিছু ঘটেনি; শুধু এণ্ড্রুজ সাহেবকে এবারেও অনেকগুলো জরি দেওয়া কর্পূরের মালা পরতে হয়েছিলো।

এবারে আডিয়ারে না গিয়ে স্যার শঙ্করণ নায়ারের জামাই ও মান্দ্রাজের D. P. I. মিস্টার ক্যাণ্ডেতের বাড়ি ওঠা হোলো। সাহেব গিয়ে কবির যাত্রার আয়োজন ক'রে এলেন। সেইদিনই বিকেলে জাহাজ ছাড়বে শোনা গেলো। কবি জিজ্ঞাসা করলেন, এবারে ক্যাবিন ইত্যাদি সব ঠিক মতো পাওয়া গিয়েছে তো? এণ্ড্রুজ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন "Gurudev, you will travel like a prince. এতো ভালো ক্যাবিন তুমি কখনও ছাখোনি।" আমি আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলাম, "স্নানের ঘর?" "হ্যাঁ সে সব ঠিক আছে, এবারে আর কিছু ভাবতে হবে না। একেবারে ঘরের সঙ্গে লাগাই সব কিছু পাবেন।"

ক্যাবিন মোটে দু'খানা খালি পাওয়া গেছে, দু'খানাই ল্যুক্স ক্যাবিন, কাজেই খুব নাকি জাঁকজমকের সঙ্গে সাজানো; এবারে আর গুরুদেবের কোনো কষ্ট হবে না। আগেই বলেছি এণ্ড্রুজ ট্রেনে কলম্বো যাচ্ছেন, সেখান থেকে কবির জাহাজে তাঁর সঙ্গ নেবেন। আমরা দু'জন নেমে পড়ে বাড়িমুখো ফিরে আস্‌বো।

ইতিমধ্যে রথীবাবুর শরীর বেশি খারাপ হওয়াতে প্রতিমাদি তাঁকে নিয়ে আগেই পশ্চিম রওনা হয়ে গেছেন—এণ্ড্রুজ এবং আরিয়ামকে সঙ্গে নিয়ে কবি পরে যাচ্ছেন।

যে জাহাজখানা ঠিক হোলো তার নাম আমার এখন মনে নেই। তবে ফরাসী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জাহাজ এটা বেশ মনে আছে। কাজেই অসম্ভব ভিড়, কারণ মেল জাহাজ নয় বলে ভাড়া অপেক্ষাকৃত সস্তা।

জিনিসপত্র নিয়ে সাহেব ও আরিয়াম আগেই বাড়ি থেকে রওনা হয়ে গেলেন। আমরা কবিকে নিয়ে সময়ের ঠিক আধঘণ্টা আগে জাহাজঘাটে উপস্থিত। অভ্যর্থনা-সম্বর্দ্ধনার পালা শেষ হোলো, জিনিসপত্র বুঝে নিচ্ছি, খেয়াল গেলো স্নানের ঘরটা দেখে নিতে। ইচ্ছে যে, কবি ঘরে ঢোকবার আগেই মুখ ধোবার জিনিসপত্র কাপড়জামা সব ঠিক জায়গায় গুছিয়ে রাখি।

সাহেব আমাকে স্নানের ঘর যেটা দেখিয়ে দিলেন সেখানে ঢুকেই আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো—ঠিক কুন্নুরের পুনরোক্তি, তবে এবারে অবস্থা আরো শোচনীয়। জায়গাটা স্নানেরও না, কিছুই না, শুধু ক্যাবিনের সংলগ্ন ছোট্টো একটা ফালি ঘর, জাজীমপাতা, দেয়ালের গায়ে কয়েকটা মাত্র পেগ লাগানো আছে কাপড় ঝোলাবার জন্যে। এটা আসলে বাক্স প্যাঁটরা রাখবার জায়গা। তখন জাহাজ ছাড়তে মোটে পাঁচ মিনিট দেরী—সাহেব বললেন, "আর এখন তো কোনো উপায় নেই। তোমরা যা হয় ব্যবস্থা কোরো, আমি চললাম।" বাকি দু'জন পুরুষ সঙ্গীকে ডেকে নিয়ে এলাম। অবস্থা দেখে তাঁরাও হতভম্ব। ব্যবস্থা কি কোরবো? নিরুপায়ভাবে তিনজন পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করছি আর ভাবছি, কবি তো কখনও সকালে উঠে সকলের মতো গলিতে কিউ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না—এসব বিষয়ে যে ওঁর অত্যন্ত সঙ্কোচ। হবে এই, যে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ ঘরে বসে থাকবেন সমস্ত দিন। কলম্বো পৌঁছুতে চার পাঁচ দিনের কম লাগবে না, কারণ এটা মেল জাহাজ নয়। এই ক'দিন কী ক'রে কাটবে? করবার আর কি আছে? জাহাজ তো ছেড়ে দিয়েছে—কাজেই যা হবার তা হবেই। এরকম অবস্থায় পড়লে কবি অনেক সময় হাসতে হাসতে একটা বাউল গান গেয়ে উঠতেন—

"হরিমন বলিতে অলস কোরো না রসনা,
যা হবার তাই হবে,
দুখ পেয়েছো না আরো পাবে,
ভবের তরঙ্গ বেড়েছে বলে কি
ঢেউ দেখে না' ডুবাবে?"

গানটা মনে পড়লো, কিন্তু সঙ্গে হাসি এলো না। তিনজন খানিকক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে থাকবার পর চৈতন্য হোলো যে, দেখা যাক কোনো উপায় করা যায় কি না। আরিয়াম ও অধ্যাপক ক্যাপ্টেনকে সমস্তটা বুঝিয়ে বলাতে তিনি বল্লেন ঐ ছোট্টো ঘরটাতেই একটা তোলা ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারেন। বারে বারে যাতে পরিষ্কার ক'রে নিয়ে যায় সে ব্যবস্থাও ক'রে দেবেন। এটা তবু মন্দের ভালো পরামর্শ। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বিপদ হোলো কবিকে নিয়েই, তিনি কিছুতেই এত হাঙ্গাম করাতে রাজী নন। তারা ঐ সকলের সামনে দিয়ে ঘর পরিষ্কার ক'রে নিয়ে যাবে, জাহাজের অন্য যাত্রীরা চেয়ে চেয়ে দেখবে—এ কিছুতেই

হতে পারে না। কোনো মতেই ওঁকে রাজী করানো গেলো না। সেই এক কথা—"তোমাদের যদি চলে তবে আমারও চলবে। যেটা হয়নি সেটা হয়নি; অবস্থাটা মেনে নাও, ব্যস্।" তখন তো ওঁর শরীর ইদানীংকার মতো কাবু ছিলো না; জেদ্ ক'রে সব কিছুই করতে পারতেন।

প্রথম দিন ভোরবেলা উঠেই জাহাজের সরু গলি বেয়ে গিয়ে দেখেন দরজা বন্ধ। সেই যে ফিরে এসে কাজে বসে গেলেন আর সারাদিনের ভিতরে ওদিক মাড়ালেন না। মহা বিপদ। খাওয়া-দাওয়াও বন্ধ হোলো। অবশেষে আমরা তিনজন পরামর্শ করলাম যে কবির আগে আমরা কেউ গিয়ে প্রথম ঘরটা দখল করলে অন্য একজন গিয়ে তাঁকে ডেকে আনবে, এবং তিনি এলে দরজা খুলে বেরিয়ে আস্‌বো। এতে তবু খানিকটা সঙ্কট কমানো যাবে। তাই করা হোলো। তিন দিন ধরে কোনো গতিকে জাহাজটা পার ক'রে দিতে পারলে বাঁচা যায়। তারপর কলম্বো পৌঁছলে পরেকার কথা পরে।

অত্যন্ত নোংরা ষ্টীমার, অসম্ভব ভীড়। গ্রীষ্মকাল, তাই ঘরে কেউ থাকৃতে চায় না। সারা দিনরাত ধরে ডেক্‌টা সকলে মিলে দখল ক'রে বসে আছে। কাজেই কবি কোনো সময়ে ঘর থেকে এক পাও বাইরে যেতে চাইতেন না। তবে সৌভাগ্যক্রমে ক্যাবিনটা সত্যিই খুব বড় এবং খোলা; অত্যন্ত আরামের উপযোগী ক'রে সাজানো। উপরের A. ডেক্-এর ঘর; বড় বড় জান্‌লাগুলো খুলে রেখে দিলে ঘরের মধ্যে বসে বসেই দিব্যি সমুদ্র দেখা যায়, কাজেই বাইরে না গিয়েও বেশ চালিয়ে দেওয়া যায়। এই লুক্স ক্যাবিনের জাঁকজমক দেখেই তো আমাদের সাহেবের চোখ ভুলেছিলো—অন্য ব্যবস্থার কথা আর মনেই আসেনি। ধরেই নিয়েছিলেন যে, আগাগোড়া সবটাই এই জাঁকজমকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবে।

জাহাজের নানারকম অসুবিধার জন্যে কবি সেই কুনুরের না-খাওয়াটাই বজায় রাখলেন। পানীয় তো পারতপক্ষে খেতে চাইতেন না। অনুযোগ করলে বলতেন, "খেতে আমার গা কেমন করে"—এর উপরে আর কথা নেই।

এই ফরাসী জাহাজের আর একটা কথা না বলে পারছিনে; সেই কারণেও কবি বিকেলের আগে ঘর থেকে এক পা বাইরে আস্‌তে চাইতেন না। ইংরেজদের চেয়ে কন্টিনেন্টের লোকেরা জীবনযাত্রাটাকে অনেক সহজ ক'রে নিয়েছে জানি কিন্তু সেটা যে কতোটা সহজ তা এই জাহাজে না গেলে কখনও ধারণা করতে পারতাম না। 'পি এ্যাণ্ড ও' অথবা 'ওরিয়েন্ট' লাইনের জাহাজে দেখেছি—সকালবেলা ড্রেসিংগাউন না পরে নিজের ঘর থেকে কেউ বেরোয় না, তাও শুধু স্নানে যাবার সময়। কিন্তু এখানে দেখি রাত্রে ডিনারের আগে কেউ রাত-কাপড় ছাড়ে না। স্ত্রী পুরুষ সকলেই দিব্যি 'ডেক্'এ ঘুরে বেড়াচ্ছে, খাবার ঘরে খেতে যাচ্ছে, বসে গল্প করছে; শুধু রাত কাপড় পরা, পায়ে চটী দেওয়া—একটা ড্রেসিং গাউনেরও বালাই নেই। সকাল থেকে চুল উস্‌কোখুস্‌কো, মুখ হাত ধোয়া নয়, ঐ রকম এলোমেলো পোষাক—কি ক'রে যে ওরা সারাদিন ঐ ভাবে কাটাতো তা জানিনে। দেখে কবি ভারি বিরক্ত হতেন। অথচ রাত্রে খেতে যাবার আগে সবাইর সাজের কী বাহার।

দুদিন পরেই পণ্ডিচেরী—সেইখানেই প্রথম জাহাজ থাম্‌লো। কবির শরীর ইতিমধ্যেই

নানা অনিয়মে আরো খারাপ হয়ে উঠেছে। তবু শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারলেন না। অরবিন্দ চিঠি লিখে লোক দিয়ে জাহাজে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যে, কবি যেন নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে যান, বহু দিন দেখা হয়নি বলে তাঁর কবির সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে। বছর দুই আগের থেকেই শ্রীঅরবিন্দ লোকজনের জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন, কারো সঙ্গেই দেখা করেন না; শুধু বছরে কয়টা বিশেষ দিনে নাকি সকলকে একবার ক'রে দর্শন দেন। কিন্তু কবির বেলায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হোলো —নিজেই দেখা করবার জন্যে আহ্বান করলেন।

কবি খুশি হয়েই যাবার জন্যে তৈরী; আমরা তিনজনেও ওঁর সঙ্গ নিলাম। এখন সমস্যা—এই রকম অসুস্থ শরীরে জাহাজের মই সিঁড়ি দিয়ে কি ক'রে কবিকে নৌকোতে নাবানো যায়। জাহাজের কর্তৃপক্ষ একটা মজার পন্থা বের করলেন। প্রকাণ্ড একটা পিপের ভিতর দুখানা মোড়া পেতে দেওয়া হোলো—একটাতে কবি আর অন্যটাতে আমি —ডেকের উপরেই পিপেটাকে আনবার পর আমরা দুজনে গিয়ে মোড়ায় বসবামাত্র সেই পিপে ক্রেনের মুখে তুলে নিয়ে আমাদের শূন্যে ঝোলাতে ঝোলাতে সমুদ্রের জলের উপর একটা ছোট্টো ডিঙি নৌকোতে নাবিয়ে দিলো। আমরা পিপে শুদ্ধুই পার হয়ে ডাঙায় গিয়ে উঠলাম।

যখন ক্রেনের মুখে আমরা শূন্যে ঝুলছি তখন জাহাজে কী অসম্ভব সোরগোল। সব যাত্রীরা রেলিংএর ধারে ভিড় ক'রে এসে দাঁড়িয়েছে আর হাসির স্রোত বয়ে চলেছে। ছোটো ছেলেরা হৈ হৈ ক'রে চ্যাঁচাচ্ছে, উৎসাহে হাততালি দিচ্ছে ও মায়ের হাত ধরে টানাটানি করছে। ক্রেনে ক'রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শূন্যে ঝুলছেন এ ছবি কল্পনা করা শক্ত। কবি নিজেও হেসেছিলেন কম নয়। "হাতি, ঘোড়া, গরুকে এমনি ক'রে নাবায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও গরু ঘোড়ার সামিল হয়ে ক্রেনে ক'বে নাববে এ কি কখনও কেউ ভেবেছিলো?" বলে নিজেও যতো হাসেন ছেলেরাও তত হাততালি দেয়। বহুদিন জাহাজে একঘেয়ে জীবনের পর সেদিন তাদের সত্যিকারের একটা আনন্দের খোরাক জুটেছিল। এ দৃশ্যের একটা ফটো পরে আরিয়াম আমাকে দেখিয়েছিলেন—কে তুলেছিলো জানি না—আমি এক কপি চেয়েছিলাম কিন্তু পাইনি। থাকলে রবীন্দ্রনাথের খুব একটা মজার ছবি পাওয়া যেত।

"অরবিন্দ আশ্রমে" কবি দোতলায় সোজা তাঁর কাছে চলে গেলেন, আমরা নিচে সব ঘুরে দেখে বেড়ালাম। শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় একটা ঘরে আমাদের নিয়ে গিয়ে বসালেন—অনেক কথাবার্ত্তা হোলো। শুনলাম ওখানে কোনরকম বাঁধাবাঁধি নেই, যে-যার ইচ্ছে মত নিজের নিজের কাজ ক'রে যেতে পারে। কেউ সাহিত্যচর্চ্চা করছে, কেউ ছবি আঁকছে ইত্যাদি।

কবি প্রায় ঘণ্টাখানেক শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রে নিচে নেমে এলেন। আশ্রমবাসীরা সবাই কবিকে প্রণাম ক'রে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিলেন। দেখলাম খুব বেশি লোক নয়, বোধ হয় জন পঁচিশ ত্রিশ হবে। আশ্রমের যিনি "মা" তাঁকেও দেখলাম আসবার সময়; তিনি কবিকে উপর থেকে সঙ্গে করে নিচে নেমে এসে দরজা পর্য্যন্ত বিদায় দিতে এলেন। পরনে নীলরঙের বেনারসী শাড়ী সোনালী জরির বুটি দেওয়া,

অতি আধুনিক প্রথায় প্রসাধন করা মুখ, চোখে কাজল—না দেখলে মনে মনে ধারণা থেকে যেত যে বাকী লোকজনের মত তিনিও সাজসজ্জা প্রসাধনের প্রতি বিমুখ ও শুধু হাত, থান কাপড়-পরা মানুষ।

কবি জাহাজে ফিরে বললেন, "অরবিন্দকে দেখে খুব আশ্চর্য্য লেগেছে। একেবারে উজ্জ্বল চেহারা—চোখ দুটোর মধ্যে কী আছে, বর্ণনা করা যায় না, এমন আশ্চর্য্য চোখের ভাব। বুঝলুম অন্তরের মধ্যে কিছু একটা পেয়েছেন, তা না হলে চেহারায় এরকম দীপ্তি হয় না। বহুদিন পরে ছাখা—খুশি হলুম দেখে।"

এই সাক্ষাৎ এত বেশি মনকে নাড়া দিয়েছিল যে সমস্ত দিন কারো সঙ্গে বড় একটা কথাবার্ত্তা বললেন না। দেখি সারাদিন ধরে বসে বসে কি লিখছেন। যখনই ঘরে যাই তখনই দেখি টেবিলের উপর ঝুঁকে বসে ;—বিকেলে চায়ের আগে লেখাটা শেষ হোলো। আমাদের পড়ে শোনালেন "অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার"—বললেন, "বহুদিন পরে ছাখা, এবারও ওঁকে নমস্কার জানিয়ে গেলুম।" এই প্রবন্ধটা সে সময়কার প্রবাসীতে ছাপতে পাঠিয়ে দিলেন।

(ক্রমশঃ)

রানী মহলানবিশ

ভারতীয় সমাজপদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর বাঙ্গলার ত্রিপুরা জেলার রাজা লোকনাথের (১৬) তাম্রশাসনে দৃষ্ট হয় যে তাঁহার পিতৃ ও মাতৃকুলের পূর্ব্বপুরুষেরা ব্রাহ্মণ। কিন্তু তিনি 'করণ' এবং তাঁহার অধীনস্থ সামন্তের নাম প্রদোষ শর্ম্মণ ; ইনি ব্রাহ্মণ। এইস্থলে 'করণ' কায়স্থবৃত্তি না করিয়া ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। তাঁহার সুন্দর অশ্বারোহী সৈন্যদল ছিল এবং তাঁহার অধীন ব্রাহ্মণ সামন্ত 'যজন-যাজন' না করিয়া জমিদারী পরিচালনা করিতেছে! দক্ষিণের কদম্ব রাজবংশের স্থাপয়িতা ময়ূরশর্ম্মণ ব্রাহ্মণ ছিল, কিন্তু এই বংশ পরে ক্ষত্রিয়বৃত্তির পরিচায়ক 'বর্ম্মণ' পদবী গ্রহণ করে। এই বংশের রাজা ককুস্থ বর্ম্মণ গুপ্ত ও অন্যান্য রাজবংশে কন্যাদান করিয়াছেন বলিয়া তালগুণ্ডা লিপিতে (১৭) উল্লেখ করিয়াছেন। এইস্থলে ব্রাহ্মণ ভিন্নজাতীয় বৃত্তি গ্রহণ ও অব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিয়াছেন বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়াছেন। ভাকাটাকদের রাণী প্রভাবতী গুপ্তা সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা (১৮)। ইনি স্বামীর কুলের গোত্র-পরিচয় না দিয়া পিতৃকুলের গোত্র—'ধরণা' স্বীয় গোত্র বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহা কিন্তু স্মৃতিসম্মত কার্য্য নহে। এতদ্বারাই গুপ্ত সম্রাটদের গোত্রের সংবাদ জানা যায়। আর এই গোত্র আর্ষেয় নহে। রাষ্ট্রকূট রাজা

(১৬) Ep. Ind.—Vol. XV. No. 19.
(১৭) Ep. Ind.—Vol. VIII. No. 5.
(১৮) Ibid.—Vol. XV. No. 4.

অমোঘবর্ষ সঞ্জানে আবিষ্কৃত (১৯) খৃঃ নবম শতাব্দীর নিজের লিপিতে বলিতেছেন, গুপ্ত-বংশীয় কলিযুগের দাতা নিজের ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া তাঁহার রাজত্ব ও রাণী কাড়িয়া নেয়; তৎপর এই ঘৃণ্য ব্যক্তি-সেই রাণীর নিকট হইতে এক ক্রোড় ও এক লক্ষ টাকা দলিলে লিখাইয়া লয়। এখানে গুপ্তবংশীয় সম্রাট ২য় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের বিষয় সূচিত হইতেছে। ইনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা রামগুপ্তকে হত্যা করিয়া তাঁহার বিধবা রাণী ধ্রুব দেবীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের সন্তানই সম্রাট কুমার গুপ্ত (২০)। এই লিপি হইতে এই সংবাদ জানা যায়, স্মৃতিসমূহের নিষেধ সত্ত্বেও বিধবার বিবাহ হইয়াছে এবং দেবর কর্ত্তৃক পুত্রোৎপাদনও হইয়াছে। অথচ এই কর্ম্ম গোঁড়া বর্ণাশ্রমীয় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক সম্রাট বিক্রমাদিত্যের দ্বারাই কলিযুগে সংঘটিত হইয়াছে। স্মৃতির নিষেধ তখন কোথায় ছিল? স্মৃতিসমূহে বৌদ্ধদের (পাষণ্ডী) সহিত বাক্যালাপ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু উড়িষ্যার রাজা শুভাকরের নেউলপাড়া দানলিপিতে (২১) 'পরম তথাগত' বৌদ্ধরাজার নিকট হইতে একশত ব্রাহ্মণ দুইটি দান গ্রহণ করিতেছেন দেখা যাইতেছে। 'গৌড় লেখমালা'তে (মুঙ্গের লিপি) দৃষ্ট হয় যে 'পরম সৌগত' বৌদ্ধ সম্রাট ধর্ম্মপাল বলিতেছেন, "বহুমার...দশবল তোমাদিগকে রক্ষা করুক।" তিনি "শাস্ত্রার্থ ভাজা চলতোহনুশাস্য বর্ণান্ প্রতিষ্ঠাপয়তা স্বধর্ম্মে" ছিলেন, অর্থাৎ শাস্ত্রশাসন হইতে ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমূহকে স্ব স্ব শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন।

এই বংশের অপর এক রাজা বিগ্রহপাল (আমগাছি লিপি) বর্ণাশ্রমের আশ্রয়স্থল (চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাশ্রয়ঃ সিতযশপুঞ্জে) বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ইহা হইতে দেখা যায় যে বৌদ্ধরাজগণও বর্ণাশ্রমের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, বৌদ্ধদের সহিত বর্ণাশ্রমীয়দের সামাজিক প্রভেদ বা পার্থক্য ছিল না। এবং বর্ণাশ্রমীয় রাজাদের বৌদ্ধ মন্দিরে দান করিতেও দেখা যায়। সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (২২) বৌদ্ধ মন্দিরের রত্নগৃহে প্রদীপ দেওয়া ও ভিক্ষুদের আহারের জন্য স্বর্ণ 'দিনার' মুদ্রা দান করিতেছিলেন, 'সাহিত্য পরিষদে' সংগৃহীত গুপ্তযুগের লিপিতে দৃষ্ট হয় যে বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ নাথস্বামী ও তাঁহার স্ত্রী রামী জৈন-মন্দিরে দান করিতেছেন; গুজরাটের রাষ্ট্রকূট রাজা সুবর্ণবর্ষ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে জৈন প্রতিষ্ঠানে ভূমিদান করিতেছেন। পুনঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বিজয়নগরের সম্রাট দ্বিতীয় দেবরায় অর্হৎ পার্শ্বনাথের প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির স্থাপন করেন। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে প্রমাণিত হয় যে "মত্তহস্তী দলেনপিনতু গচ্ছেৎ জৈন মন্দিরম্" উক্তির বাস্তবক্ষেত্রে কোন সার্থকতা ছিল না।

আরও অর্ব্বাচীন যুগে যখন জাতিভেদ পাকাপাকিভাবে সৃষ্ট হয় তখন কান্যকুব্জেশ্বর রাজা জয়চন্দ্রের দীক্ষাগুরু ছিলেন ভিক্ষু শ্রীমিত্র (২৩) (বুদ্ধগয়া শিলালিপি)। 'সাহেত মাহেত' লিপিতে দৃষ্ট হয়, এই রাজ্যের গোবিন্দচন্দ্রের রাণী কুমারা দেবী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিনী

(১৯) Ibid—Vol. XVIII No. 26. এই বিবাহ সম্পর্কে Journal of Bihar & Orissa Research Society, Vol 18, Pt. 1. P. 27, জয়সওয়ালের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(২০) C. I. I.—Vol. III. No. 10

(২১) Ep. Ind—Vol. XV. No. 1.

(২২) C. I. I.—Vol. III No 5.

(২৩) Ep. Ind.—Vol. V. Appendix No. 177, P 28

ছিলেন (২৪)। এতদ্দ্বারা দৃঢ়রূপেই প্রমাণিত হয় যে বৌদ্ধমত গ্রহণ করিলেও বর্ণাশ্রমীয় সমাজের বাহিরে যাইতে হইত না।

আবার খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতেও দেখা যায় যে পেশা 'বর্ণগত' ছিল না। মেবারের রুথিরাণী মন্দিরের শিলালিপিতে উল্লেখিত আছে, 'করণিক ব্রাহ্মণ' মহান্তম তাঁহার বাড়ীটি নিত্য প্রমোদিত দেবের মন্দিরকে বিক্রয় করিতেছে (২৫)। আবার উপরোক্ত 'সাহেত মাহেত' লিপিটি 'সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ' কায়স্থ স্বরাদিত্য কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রকারে অন্যান্য লিপিতে [কামৌলি লিপি (৮নং), ধঙ্গদেবের লিপি, হরিব্রহ্মদেবের খালারী লিপি, অর্যুন লিপি নামক পরামর রাজাদের প্রদত্ত অন্যান্য অনুশাসনাদি] দৃষ্ট হয় যে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অনেক অনুশাসন ও প্রশস্তি কায়স্থ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুইটি গোষ্ঠির নামোল্লেখ আছে—মাথুর ও বাস্তব্য। আজ এই দুইটি উত্তর-ভারতের দুইটি কায়স্থ কৌম (tribe)-রূপে পরিণত।

হর্ষবর্দ্ধনের পরে অনুশাসনসমূহে রাজপাদোপজীবীদের তালিকায় 'রাজপুত্র' ও 'কায়স্থ' নামক দুইটি পদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে প্রথমোক্তটি সর্ব্বত্রই 'রাজার ছেলে' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর পরমার্দিদেবের সোমড়া লিপিতে (২৬) দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, চতুর্ব্বেদী, অগ্নিহোত্রী, শ্রোত্রীয় পণ্ডিতগণ, দীক্ষিত, ঠাকুর, রাউত প্রভৃতি দানগ্রহীতাদের নামোল্লেখ আছে। আর এই সঙ্গে কায়স্থ, দূত, বৈদ্য কর্ম্মচারীদেরও উল্লেখ আছে। এই লিপিতে প্রাপ্ত জাতিগুলির বর্ত্তমানের সমাবেশ সেই সময় হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। 'রাউত' (ক্ষত্রিয় উপাধি) ব্রাহ্মণও পাইয়াছে। কিন্তু রাজদত্ত পদগুলি তখনও জাতিবাচক হয় নাই। এই লিপির লেখক নিজেকে "বাস্তব্য বংশ সকলগুণগণনাং বেশ্ম পৃথ্বিধরাখ্যা" বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই লিপিসমূহে "কায়স্থ জাতীয় বাস্তব্য কুলের অমুক" এইরূপ কোন পরিচয় নাই। এইজন্যই অনুমিত হয় যে, কায়স্থ বলিয়া একটা জাতি তখনও বিবর্ত্তিত হয় নাই। কিন্তু 'বাস্তব্য' বলিয়া একটা কুল উদ্ভূত হইয়াছে। তদ্রূপ আদিত্য সেনের লিপির লেখক হইতেছে বিষ্ণুহরির পুত্র তক্ষাদিত্য গৌড় (গৌড়দেশের লোক)। যদিও পরে 'গৌড় কায়স্থ' বলিয়া একটা কায়স্থ কৌমের অস্তিত্ব আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, এইস্থলেও কায়স্থ বলিয়া কোনও একটা জাতির উল্লেখ নাই। বোধ হয়, কায়স্থবৃত্তিধারী বিভিন্ন কুল বা কৌমের লোকেরা একত্রিত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ বংশগত জাতিতে পরিণত হইলে 'কায়স্থ' জাতির উদ্ভব হয়। আর ভারতীয় রীতি অনুযায়ী এই সঙ্ঘের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিল যমলোকের লেখক 'চিত্রগুপ্ত'। সেই জন্যই সব কায়স্থ কৌমের আদিপুরুষ হইতেছেন চিত্রগুপ্ত, এইরূপ কাহিনী পুরাণাদিতে বর্ণিত হয়।

অন্ধকার যুগে 'রাজপুত্র' বা 'রাজপুত' বলিয়া একটা জাতির বিবর্ত্তন হয়। বিভিন্ন লিপিতে ইহাদের উৎপত্তির বিবরণ পাঠে অনুমিত হয় যে, কোন এক সময়ে নূতন ক্ষত্রিয় দল ব্রাহ্মণদের দ্বারা সৃষ্ট হয়। তদনন্তর বশিষ্ঠ ঋষি কর্ত্তৃক অগ্নিকুণ্ডে "অগ্নিকুল" রাজপুতগণের

(২৪) Ep. Ind.—Vol. XI, No. 3
(২৫) Rajputana Museum Report, 1923, P 2
(২৬) Ep. Ind.—Vol. IV, No. 20

উৎপত্তির কাহিনীর পশ্চাতে আজকালকার ন্যায় একটা শুদ্ধি আন্দোলন দ্বারা নূতন ক্ষত্রিয়-কুল সকলের উদ্ভবের কথাই সূচিত হয়। অতঃপর হুনদের ক্ষত্রিয় বলিয়া সাহিত্য ও খোদিত-লিপিতে উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। শতবাহন ও গুপ্তযুগের পূর্ব্বে শক, পারদ ও যবন (গ্রীক্) জাতীয় লোকদের হয় বৌদ্ধ, না হয় বর্ণাশ্রমীয় হিন্দুরূপে পরিচয় দেওয়ার তথ্য লেখমালায় পাওয়া যায়।

এই প্রকারের নূতন জাতিসমূহের উৎপত্তির শেষ প্রশ্ন এই—লিচ্ছবী, বৈদেহ, মল্ল প্রভৃতি ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের দল, যৌধেয়, মালব, অর্জ্জুনায়ন, পুষ্যমিত্র নামীয় 'গণ'সমূহ, বাঙ্গলার বগধ, পৌণ্ড্র, বঙ্গেয়, প্রবঙ্গেয় প্রভৃতি কৌমগুলি, দক্ষিণের অন্ধ্র নামক জাতি বা কৌমলিপিসমূহে উল্লিখিত ভরিক কৌম (২৭); জৈনধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্নগণি (২৮)—যথা, 'আর্য্য' হট্টকিয় কুলের বর্জনগরী শাখার 'ভরণাগণ' (২৯); বৎসলিয় কুলের 'কট্টিয়গণ' (৩০); এবং 'শ্রেণী'সমূহ, 'মগ' ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গেল কোথায়?

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে গুর্জ্জর-প্রতিহার রাজবংশ ও গুর্জ্জর নামক জাতি, রাজপুত জাতি, শেষে জাঠ নামক জাতিদের পরিচয় ইতিহাসে পাওয়া যাইতে থাকে। পূর্ব্বোক্ত কায়স্থদের বিষয়ে যে-অনুমান হইয়াছে, সেই অনুমান দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে, অন্ধকার যুগ হইতে হিন্দু সমাজরূপ কটাহমধ্যে একটা নূতন পাককর্ম্ম হইতেছিল, অর্থাৎ প্রাচীন উপরোক্ত জাতি বা কৌমগুলির নূতন সমীকরণ (Integration) হইতেছিল। এইগুলি নাম পরিবর্ত্তন করিয়া একদল নব-ক্ষত্রিয় বিভিন্ন কুলের 'রাজপুত' জাতিতে বিবর্ত্তিত হইল; বিভিন্ন গণি নব-ক্ষত্রিয় হইল, আবার কেহ বা নব-বৈশ্য হইল। বশিষ্টের (৩১) অগ্নিকুল রাজ-পুত সৃষ্টি করা, সূর্য্যবংশ স্বর্গারোহণ করিলে যশ বিগ্রহের মর্ত্তে আগমন করিয়া গহড়-বাল (৩২) কুল স্থাপন করা, সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের বিলোপের পর বৎস ঋষির চহুমান (চোহান) নামক যোদ্ধৃকুল সৃষ্টি করা (৩৩); আনন্দপুরের মহীদেব ও বিপ্রকুলনন্দন গুহদত্তের বংশে গুহিল পুত্র চিতোরের ব্রহ্ম ক্ষত্রান্বিত (৩৪) রাণাদের উদ্ভব, পরমারদের আবু পাহাড়ের অগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্ভব (৩৫) প্রভৃতি দ্বারা এই প্রমাণিত হয় যে, নানা জাতি ও কুল হইতে বর্ত্তমান রাজপুত জাতির অভিব্যক্তি হইয়াছে। হয়ত ইহাদের সহিত ক্ষত্রিয়ত্বের দাবীকারী বংশগুলিও মিলিয়াছে। গুজার (গুর্জ্জর) এবং জাঠেরাও তদ্রূপ প্রাচীন কৌমদের নাম পরিবর্ত্তনকারী বংশধর। বোধ হয় জাঠেরা এক সময়ে সংস্কৃত সাহিত্যে "জার্ত্তিক" নামে পরিচিত ছিল (চন্দ্র গোমীনের ব্যাকরণে জার্ত্তিক জার্টা নামটি আছে)।

টড হইতে আরম্ভ করিয়া কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনেকে গুর্জ্জর, প্রতিহার, জাঠ ও

(২৭) C. I. I.—Vol. III. No, 59; P 253,
(২৮—৩০) Ep. Ind.—Vol. II, No. 23, P. 205 ; No. 5, P 201 ; No 13, P 202.
(৩১) Ep. Ind.—Vol. 9 P 10 ff
(৩২) Indian Antiquary.
(৩৩) Ep. Ind.—Vol. 12, P 197,
(৩৪) I. A. Vol, 39. P, 186 ff : Ep. Ind,—Vol, 12 P, 10 ff,
(৩৫) Ep. Ind.—Vol. 14, P. 298 ff

রাজপুতদের বৈদেশিক উৎপত্তি প্রতিপন্ন করিতেছিলেন। কিন্তু নরতত্ত্ববিদের মত অন্যরূপ। যেমন প্রাচীন কৌমগুলিই বর্ত্তমানের বিভিন্ন জাতিরূপে প্রকট হইয়াছে, তদ্রূপ বিভিন্ন বিভিন্ন পেশাগত শ্রেণীসমূহই বর্ত্তমানের নানা জাতিতে পরিণত হইয়াছে। ইহারা স্মৃতিতে বর্ণিত অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহজাত বর্ণসঙ্কর সন্তান নহে।

যখন একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নানা জাতির নূতনভাবে সমীকরণ চলিতে থাকে তখন ইহার পশ্চাতে একটা সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন নিশ্চয়ই ছিল বলিয়া অনুমান করিতে হইবে। স্থানীয় রাজশক্তি এই কর্ম্মে নিশ্চয়ই সহায়তা করিয়াছে; তাহা না হইলে আন্দোলন সফল হয় না। হয়ত যে সব কৌম নিজেরাই নব-ক্ষত্রিয় রূপে উন্নীত হইতে চাহিয়াছিল তাহারাই এই আন্দোলনে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের সাহায্য করিয়াছিল এবং তাহাদের দ্বারা নিজদিগের চন্দ্রবংশীয় ও সূর্য্যবংশীয় উৎপত্তিসূচক বংশাবলী লিখাইয়া লইয়াছিল। এই প্রকারেই কতকগুলি টটেমজাত কৌম নিজেদের গো-বংশীয় বা নাগ-বংশীয় অথবা ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির বংশোদ্ভব ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। অথচ নিজেদের উৎপত্তি মানব ও পশুর সংমিশ্রণের ফলে হইয়াছে বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হন না। এই সকল গল্প দ্বারা স্পষ্টই ধরা পড়ে যে, আদিম জাতীয় টটেম-বিশ্বাসী কৌমগুলি হিন্দু হইবার সময় স্বীয় টটেমকে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই; স্বীয় টটেম—পশু ও এক ব্রাহ্মণী বা ক্ষত্রিয়াণীর সহিত সংসর্গ স্থাপন করিয়া নিজেদের নূতন বংশ-পরিচয় দিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

অমিত বললে, "বাইরে বাইরে দুই নক্ষত্র পরস্পরকে সেলাম করতে করতে প্রদক্ষিণ ক'রে চলে, কায়দাটা বেশ শোভন, নিরাপদ, সেটাতে যেন তাদের রুচির টান, মর্ম্মের মিল নয়। হঠাৎ যদি মরণের ধাক্কা লাগে, নিবে যায় দুই তারার লণ্ঠন, দোঁহে এক হ'য়ে ওঠ্‌বার আগুন ওঠে জ্বলে'। সেই আগুন জ্বলচে, অমিত রায় বদ্‌লে গেল। মানুষের ইতিহাসটাই এই রকম। তা'কে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মালা গাঁথা। সৃষ্টির গতি চলে সেই আকস্মিকের ধাক্কায় ধাক্কায়, দমকে দমকে, যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় ঝাঁপতালের লয়ে। তুমি আমার তাল বদলিয়ে দিয়েচ, বন্যা, সেই তালেই ত তোমার সুরে আমার সুর গাঁথা পড়লো।" শেষের কবিতা—রবীন্দ্রনাথ

জয়গান

আমার জয়ের গান টলায়
কলকাতার অথই ঘুমসাগর,
আমার ভেলায় ভিড় জমাট,
উৎসবের আশায় রাত ডাগর।

শতেক দূরের সাত-তলার
দীপমালায় সাজলো লাখ কবর,
কৃষ্ণচূড়ায় ঝড় দাপায় ;
কাল সকালে রট্‌বে জোর খবর।

ঝড়ের ফুৎকার সুর লাগায়
জয়গানের নিখুঁত্‌ মীড় গমক
দোসর বাতাসে ঠাসবুনন :
হৃৎপিণ্ডে অসঙ্কোচ ঠমক।

তাকাই অবাক আজ, হঠাৎ
ছিন্নহার কঠিন ওই গ্রীবার
মরু যে আমার চোখ ধাঁধায়
আর তৃষ্ণা হঠাৎ দুর্নিবার।

আমার কণ্ঠে সেই দহন
রাজধানীর প্রবল মেঘবহর
চিরলো বিদ্যুতের পাখায়।
পাশ ফেরে কি চিরন্তন শহর ?

অনেক আগের ফুলহারের
পাপড়ি ঘিরেছে জলকবর,
লক্ষ কপালে শেষ তবক,
বিষ-শায়কে ছেয়েছে মুখ শবর।

চাকায় চাকায় দেয় কাতার ;
এই দীর্ঘ সরীসৃপ শয়ন
নড়বে মরণ যন্ত্রণায়।
উন্মুখর দিনের গীত বয়ন

আমার ভেলায় ; ঘুমসাগর
কলকাতার কুয়াশা মেঘবরণ
ফেড়েছি আমরা কয়জনেই,
গাই আমরা অথই শোক-হরণ।

অরুণ মিত্র

তিনটি কথা

ছেলেবেলায় শুনেছি তিনটি রক্তাভ কথা
হাজারো ফরাসী পথে পথে প্রাণ দিয়েছে
যার জন্যেঃ সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ;—জানতে চেয়েছি
কেন মানুষ কথার জন্যে মরে।

বয়স বাড়লোঃ বয়স্ক লোকে, কামানো দাড়ি, ছাঁটা গোঁফ,
মাথায় ফুল নিয়ে বল্লেন আমায় তিনটি স্বর্ণাভ কথাঃ
মাতা, গৃহ, স্বর্গ ; আরো প্রবীণেরা
বল্লেন নতমুখেঃ ভগবান, কর্ত্তব্য, অমরত্ব ;
বল্লেন গম্ভীর উদারার স্বরে।
তাঁদের উপদেশ চিহ্নিত হ'লো বছরে বছরে
কালের বিরাট ঘড়িতে
নিয়তি ও ধ্বংস, খাদ্য ও পানীয়ের আবর্ত্তনে।
উল্কায় ঝলকে উঠলো
তাঁদের উপদেশঃ বিশাল রাশিয়া থেকে এলো
তিনটি সন্ধ্যাভ কথা,
শ্রমিকেরা সঙ্গীন তুলে মরতে গেল
যার জন্যেঃ রুটি, শান্তি, জমি।

আমার সঙ্গে দেখা হ'লো এক মার্কিনী নাবিকের,
এক বিপুল দেহ,
কোলে তার একটি তরুণী—
সারা পৃথিবীর বিভিন্ন বন্দরের স্মৃতির আসনে ;
সে বল্লেঃ শেখাতে পারো কেমন ক'রে
এই তিনটি কথা বলতে হয়,—
আর তাতেই আমার চলে যাবে,—
দাও ত এক প্লেট মাংস ও ডিম,
পড়বে কত, আর
ভালো কি বাসো আমায় তুমি ?

কার্ল স্যাণ্ডবুর্গ
অনুবাদক—স্নেহাংশুকান্ত আচার্য

অভিযান

(ছয়)

মদের নেশার উপর কল্পনার উত্তেজনায় নরসিংয়ের ঘুম এল না। চিন্তার আগুন মাথার মধ্যে যেন আজ রাবণের চিতার মত অ-স্তিমিত এবং অনির্ব্বাণ হয়ে উঠেছে।

রাম এবং নিতাই দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

মদ খেয়ে নিতাইয়ের অবস্থাটা হয়—পুকুর থেকে বেরিয়ে নদীতে-পড়া মাছের মত; সব আড়ষ্টতা কেটে গিয়ে সে অতিমাত্রায় সহজ এবং সুস্থ হয়ে ওঠে। ক্ষুধা খোলে, তৃপ্তির সঙ্গে খায়, তারপরই বিছানাটি পেড়ে একটি বিড়ি ধরিয়ে "কালী দুর্গা শিবো হরি, জয়ো জয়ো মুকুন্দ মুরারি, জয় বাবা বুড়ো শিব, জয়ো মাতা মঙ্গলচণ্ডী" বলে শুয়ে পড়ে। মিনিটখানেক পরেই মৃদু নাসিকাধ্বনির আভাস পাওয়া যায় তার শ্বাস-প্রশ্বাসে। আরও মিনিটখানেক পরে সশব্দ হয়ে ওঠে রীতিমত। ট্যাক্সি নিয়ে ভাড়ায় গিয়ে অনেক সময় অনেক রাত্রিই পথে কাটাতে হয়, সেখানে গাছতলায় শিকড়ে মাথা দিয়ে মাটির উপরে শুয়েও ঠিক এমনি ঘুম ঘুমায় সে। মদ না পেলেই সে আরামের বিছানায় শুয়েও চার প্রহর রাত্রির অন্তত আড়াই প্রহর জেগে থাকে, পাশ ফেরে আর মৃদুস্বরে ডাকে—ঘুমুলেন নাকি সিংজী? রামা রে।

রামাটা সাধারণতই ঘুমকাতুরে। আজ কিন্তু প্রথমটা সে অন্য রকম শুরু করেছিল। নেশায় বকতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু অত্যন্ত অকস্মাৎ লজ্জাবতী লতা যেমন স্পর্শ পেলে প্রায় মুহূর্ত্তের মধ্যে এলিয়ে যায় ভেঙ্গে প'ড়ে—তেমনি ভাবে ঘুমিয়ে পড়ল। বকছিল, সহসা এক সময় কয়েক সেকেণ্ডের জন্য চুপ করলে; তারপর দু'চারটি কথা বললে মৃদুস্বরে, তারপরই চুপ ক'রে গিয়েছে। হাঁ ক'রে ঘুমুচ্ছে।

দুটো বাতির একটা জলছে। প্রায় আধখানা পুড়ে এসেছে।

মদের নেশায় বড় বড় চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে, স্থিরদৃষ্টিতে চোখ চেয়ে নরসিং বসে আছে। তাদেরই গ্রামের হাড়ির ছেলে ওই জোসেফ। আজ কে বলতে পারে সে কথা! লোকটার কথাবার্ত্তা চালচলন রীতিমত ভদ্রলোকের মত। আর সে হ'ল গিরবরজার সিংহবাড়ির ছেলে। তার পূর্ব্বপুরুষ ওই ওদের ছায়া মাড়াতে ঘৃণা করত। তাদের উচ্ছিষ্ট ওরা প্রসাদ বলে খেত। ওরা সিংহবাড়ির নোংরা ময়লা পরিষ্কার করত! ভাবতে ভাবতে নরসিং রীতিমত হিংস্র হয়ে উঠল। এই ঘরের মধ্যে সে হিংস্রতা বিচিত্র রূপে তার মনে আত্মপ্রকাশ করলে। হঠাৎ তার মনে হল: হাঁ করে রামা ঘুমুচ্ছে, ওর গলাটা টিপে ধরলে কি হয়? তার জীবনের একটা পোষ্য, তার স্ত্রীর ভাই। স্ত্রী মরে গিয়েছে ওর সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি?

তার স্ত্রী ছিল তার মামীর ভাইঝি।

মামীকে প্রথমজীবনে সে ভয় করত, তারপর তার উপর নরসিংয়ের বিজাতীয় আক্রোশ জন্মেছিল। খানিকটা সেই আক্রোশের বশেই সে মামীর ভাইঝিকে বিয়ে করেছিল।

বাবুদের বাড়িতে ভাতের বন্দোবস্ত ক'রে তাকে তার মামা ইমামবাজারে রেখে এল। ওদিকে তার মামী গোপনে লোক পাঠিয়ে নিয়ে এল তার ভাইঝিকে। তার এই রোগা শরীরে সে আর একা পারছে না, একজন সাহায্য করবার লোক চাই, সেবা করবার লোক চাই।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মামীর উপর খানিকটা আক্রোশে খানিকটা বাবুদের বাড়ির মেজবাবুর দৃষ্টান্তে তার মনে অঙ্কুরিত হয়ে উঠল অত্যন্ত ক্রুর একটি বাসনা।

মেজবাবু ছিল ঝড়। তাকে সে যত ভালবাসে, তত ঘৃণা করে, তত ভয় করে। মেজবাবুর কথা মনে হলেই সে মনে মনে বলে—সেলাম হুজুর। সঙ্গে সঙ্গেই অকারণে রাম অথবা নিতাইকে কঠিন আক্রোশে গাল দিয়ে ওঠে, শূয়ার কি বাচ্চা কোথাকার!

নিতাই বলে, কি? রাম ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে মুখের দিকে। নরসিং গভীর মনোযোগ দেয় হাতের কাজের উপর। কখনও বা নিতাইকে উত্তর দেয়, কিছু না।

মেজবাবু ছিল ঝড়।

বছর দেড়েক পরে হঠাৎ একদিন এল সেই মোটর বাইকে চেপে। ইমামবাজারে নতুন ক'রে কয়লার ডিপো খোলা হবে; কয়লার ব্যবসার ভার মেজবাবুর উপর; কয়লার ব্যবসা বাড়ানো হবে। ক'লকাতা আপিস থেকে ব্যবস্থা ক'রে দু'তিন গাড়ী কয়লাও পাঠানো হয়ে গিয়েছে। 'বিল্‌টি' অর্থাৎ রেল রসিদ সঙ্গে নিয়ে এসেছে মেজবাবু। মেজবাবু মোটর বাইক থেকে নেমে মাথার টুপিটা এমন কায়দা করে ছুঁড়ে দিলে যে, চাকার মত পাক খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে টেবিলটার উপরেই চুপ করে গিয়ে বসে গেল। তারপর হাঁকলে, গাড়ীটা ওঠারে।

সন্ধ্যাবেলা নরসিংয়ের ডাক পড়ল। ইজিচেয়ারে মেজবাবু বসে আছে, এক হাতে বিলিতী মদের গ্লাস অন্য হাতে সিগারেট, মদের গ্লাসটা বাঁ হাতে ছিল। আজও নরসিং যখন মদ খায় তখন বাঁ হাতে ধরে মদের গ্লাস, ডান হাতে থাকে সিগারেট। বড়বাবু তাকিয়ার উপর বুক দিয়ে শুয়েছিল; তার গ্লাসটা সামনে নামানো ছিল। আশ্চর্য্য; দু ভাই একসঙ্গে বসে মদ খেত।

মেজবাবু বললে, তোকে আর পড়তে হবে না। কয়লার ডিপোতে থাকবি তুই। বুঝলি!

সেদিনও নরসিং মনে মনে পড়ার স্বপ্ন দেখত। লেখাপড়া যেমন ক'রে হোক শিখবে, মানুষ হবে। দিদিয়া যে বলত মানুষের মনের মধ্যে অজগরের মাথার মণির মত যে 'মতি' —গজমতির চেয়েও যা দুর্লভ, যা হারিয়ে গিরবরজায় সিংহদের এই দুর্দ্দশা তাকেই সে ফিরিয়ে আনবে। যে 'মতি' অন্ধকারের মধ্যে চাঁদের মত আলো দিয়ে পথ দেখায়, যে 'মতি' হাতে থাকলে জল দু'ভাগ হয়ে পথ দেয়, দিদিয়া বলেছে সে 'মতি' ফিরে পাওয়া যায়— লেখাপড়া শিখে মানুষ হলে। লেখাপড়াটা অবশ্য তার কাছে অত্যন্ত কঠিন ঠেকছে, এখনও পর্য্যন্ত কিছুতেই বইগুলোর ভিতরের জিনিসগুলি আয়ত্বে আনতে পারছে না। প'ড়ে বুঝতে পারে না; বুঝতে পারে না বলে প্রাণপণে চীৎকার ক'রে সে মুখস্থ করতে চায়। তার পড়ার চীৎকারে পাড়ার লোকে বিরক্ত হয়; অনেকে তিরস্কার করে, সে তা অম্লানবদনে সহ্য করে। কিন্তু আজকের মুখস্থ কাল ভুলে যায়, এই তার দুঃখ। তবু

সে আশা ছাড়ে নাই। দেড় বৎসর বাবুদের বাড়িতে রয়েছে, এর মধ্যে ছ'মাস অন্তর তিনটে পরীক্ষা হয়েছে, কোনটাতেই সে পাশ করতে পারে নি। চতুর্থ বারের পরীক্ষায় পাস করবার জন্য এবার সে উঠে-পড়ে লেগেছে। ভেবেছিল মেজবাবু এলে তাকে সে ধরবে তিনি বলে দেবেন তাঁদের ইংরিজী-নবীশ কেরানীবাবুকে—সে লেখাপড়ার একটু আধটু বুঝিয়ে দেবে। কিন্তু মেজবাবুর মুখে উল্টো কথা—পড়া ছেড়ে চাকরী করার কথা শুনে তার বুকের ভিতরটা চমকে উঠল।

মেজবাবু গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে বললে—বুঝলি ? এক চুমুকে গ্লাসের প্রায় অর্দ্ধেকটা শেষ হয়ে গেল। সে দিনের ছবি স্পষ্ট ভাসছে নরসিংয়ের চোখের উপর। চুমুক দিয়ে মেজবাবু মুখ দিয়ে খানিকটা নিশ্বাস ছাড়লে ; বিস্বাদের কটুতা এবং গন্ধের উগ্রতা খানিকটা বেরিয়ে যায় এতে।

বড়বাবু বললে—একটু একটু সিপ. কর। এভাবে ঢক ঢক ক'রে খেয়ো না।

মেজবাবু সিগারেটে টান দিয়ে বললে—সাপের ছুঁচো খাওয়ার মত একটু একটু ক'রে গেলা ও আমার পোষায় না।

বড়বাবু হেসে বললে—সাপে ইঁদুর খায়, ছুঁচো খায় না।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে মেজবাবু বললে—এক্সকিউজ্ মি। ওটা আমার ইচ্ছাকৃত ভুল। ইঁদুরের গায়ের গন্ধ নাই। এ বস্তুটার গন্ধের সঙ্গে মিল রাখবার জন্যে ছুঁচো বলেছি। এবং সাপে যখন একবার কোন জিনিস ধরে তখন নাকি ওগরাতে পারে না। ছুঁচো হলেও খেতে হয়। এও তাই। ওয়াইন্—উয়োম্যান্—

বড়বাবু বাধা দিয়ে বললে—ষ্টপ। চোখের ইঙ্গিতে বড়বাবু নরসিংকে দেখিয়ে দিলে।

আই সি। মেজবাবু গ্লাসে চুমুক দিয়ে বাকীটা শেষ ক'রে বললে—এখানে নতুন ক'রে কয়লার ডিপো হচ্ছে, সেই ডিপোতে তোর চাকরী হ'ল। বুঝলি।

নরসিংয়ের হৃদস্পন্দন আবার সভয়ে দ্রুতগতি চলতে আরম্ভ করলে।

আবার মেজবাবু বললে—বুঝেছিস ?

সহজ কথা, তবু নরসিং নির্বোধের মত প্রশ্ন করলে—আজ্ঞে ?—ঐ ভঙ্গির মধ্যেই নিহিত ছিল তার অতি দুর্বল এবং ভীত চিত্তের অস্বীকারের ভাব।

মেজবাবু কিন্তু এটা ভাবতে পারে না, তার কথা কেউ, অন্ততঃ তার অনুগৃহীতের মধ্যে কেউ, অস্বীকার করতে পারে এটা তার কল্পনারও অতীত। সে এটাকে সম্মতি ধরে নিয়েই বললে—হ্যাঁ। কাল সকালেই যাবি আমার সঙ্গে। কাজকর্ম্ম আমি বুঝিয়ে দেব। প্রথম কিছুদিন আরও একজন ওয়াকিবহাল লোক থাকবে, সে ডিপো চালু ক'রে দেবে। ভয় নাই তোর।

নরসিং এবার সাহস সঞ্চয় ক'রে বললে—পড়ার কি হবে ?

পড়া ? মেজবাবুর কপাল ভ্রূ খানিকটা কুঁচকে উঠল, ঠোঁটের একপাশ ঈষৎ বেঁকে খানিকটা ধারাল হাসি বেরিয়ে এল।

বড়বাবু প্রশ্ন করলে—তুই পড়বি ? তিনটে পরীক্ষার একটাতেও তুই পাস করতে পারিস নি। তোকে পড়ার জন্যে ভাত—

হাতের ইসারা ক'রে বড়বাবুকে থামিয়ে দিয়ে মেজবাবু বললে—দেখ, বাঁদরকে শেখালে

সে কসরৎ ক'রে বাজী দেখাতে পারে, কিন্তু গাধাকে ঠেঙিয়ে মারলেও মোট বওয়া ছাড়া গাধাকে দিয়ে আর কিছু হয় না।

নরসিংয়ের মনে হল, জেঠা মাধব সিংয়ের লাঠির চেয়েও মেজবাবুর কথা ভয়ানক।

মেজবাবু বললে—লেখাপড়ায় তুই গাধা। ও তোর হবে না। শেষ পর্য্যন্ত চাপরাশী-গিরি করবি। মোটই বইতে হবে তোকে। তার চেয়ে ডিপোর কাজ শেখ। এর পর গলার স্বর পালটে গেল মেজবাবুর, বললে—যা, যা বললাম তাই করতে হবে।

অসহায়ের মত নরসিং চলে এল।

উপায় ছিল না। গিরবরজায় বাড়িতে শুধু জেঠা মাধব সিং নয় বাবা পর্য্যন্ত তার মুখ দেখবে না প্রতিজ্ঞা করেছে। ধরণী রায় হতে পারে তার মামা, কিন্তু মানে অনেক ছোট। বাড়ি থেকে পালিয়ে সে তার বাড়ি-ভাত খায় পোষ্য হয়, তারপর সে বাবুদের বাড়ি বিনা মেহনতে নিমক খায়, দেনো ভাত খায়; তার মুখ কি দেখতে হয়—না আছে?

নরসিং শুনেছে মাধব সিং বলে—মর্ গেয়া, উ বাচ্চাঠো মর্ গেয়া।

বাবা চুপ ক'রে থাকে।

গিরবরজার সিংহ বাড়ির অমূল্য ধন 'মতি' ফিরিয়ে আনতে এসে মাঝপথে যাদুকরের মন্ত্রের চোটে সে জানোয়ার বনে গেল।

তবু মেজবাবুকে সেলাম। হাজার সেলাম। দুনিয়ায় রোজকারের পথ মেজবাবুই খুলে দিয়েছে। ডিপোর চাকরী—বেশ চাকরী। মণ—আধমণ—দশসের—পাঁচসের—আড়াইসের বাটখারা নিয়ে কারবার। কয়লা বিক্রী করা—খসড়া খাতা লেখা—মজুরটাকে দিয়ে চালনায় কয়লা চেলে নিয়ে ধুলো গুঁড়ো বার ক'রে রাখা—আর বসে থাকা। পাঁচ আনা মণ দাম্। মণ করা এক সের মারতে পারলে একটা আধলা বেরিয়ে আসে। গুঁড়োর সঙ্গে ধুলো মিশিয়ে বেচলে মণে আসে দুটো পয়সা। দিনে চার আনা হয়। সমস্ত রোজকারটাই গোড়ায় উদ্যোগ ক'রে করত নিতাইয়ের বাবা। ভাগ দিতে চাইলেও নিত না নরসিং।

তারপর—কেমন ক'রে কবে থেকে যে সে নিতে আরম্ভ করলে—সে নরসিংয়ের মনে নাই। পেতলের বাটিতে তেল তো তেল—ঘি রাখলেও কিছুদিন পর সবুজ রঙের কলঙ্ক জন্মায়, পেতলের বাটি থেকেই জন্মায়—কিন্তু ঘিয়েও লাগে। কয়লার ডিপোটা পেতলের বাটির চেয়েও খারাপ, লোহার বাটি। কয়লার ডিপোর পাশে কয়লা ছিটকে পড়ত, কুড়িয়ে সংগ্রহ করতে আসত ছোট জাতের গরীবগুণার মেয়েরা। গিরবরজার এ জাতের মেয়েদের সঙ্গে এখানকার এদের কোন তফাৎ নাই। ওখানে আগে সিংহরা রাত্রে মদ খেয়ে ঝোঁক চাপলে চ'লে যেত ওদের পাড়ায়। দরজায় লাথি মেরে ডাক দিত। ঘুমন্ত দম্পতীর ঘুম ভেঙে যেত; দরজা ভাঙার ভয়ে বেরিয়ে আসত পুরুষটি—এবং দূরে অন্ধকারে কোন স্থানে সিংহ-মশায়ের নির্গমন সময়ের অপেক্ষা করত। ঘুমিয়ে যেত সেই-খানেই। কখনও আলো ফুটলে ঘুম ভাঙত, কখনও রাত্রেই ঘুম ভাঙত স্ত্রীর আহ্বানে। এখন আর অবশ্য সে দিন নাই। তবুও রেওয়াজটা আছে—দু পক্ষই অভ্যাস ভুলতে পারে নাই; জোয়ান সিংহ বাড়ির ছেলেরা শিস দিয়ে বেড়াবার অজুহাতে ওদের নাড়া দিয়ে

আসে, মেয়েদেরও দেখা যায় গাছের আড়ালে, গলির মুখে। মাঠে মেয়েরা কাঠ ভাঙতে যায়, সিংহ বাড়ির ছেলেরা ভাবুকের মত মাঠের ধারে বসে থাকে। এখানেও ঠিক তাই। আগে এখানকার বাবুরাও সিংহদের মত দরজায় লাথি মারত। চাপরাশীরা এসে খবর দিয়ে নিয়ে যেত বাবুদের বা'র বাড়িতে। এখনও চাপরাশীদের এ সব কাজ করতে হয়। এখানকার মেয়েরাও এখন গোপনে গাছতলায়, গলির মুখে দেখা করে। স্টেশনে, ডিপোয়, বাজারে নানা কাজের ছুতায় যায়—তার প্রধান উদ্দেশ্য এইটা।

নিতাইয়ের বাপ নোটন, সে ওদের সঙ্গে রসিকতা করত। প্রথম প্রথম ভাল লাগত না নরসিংয়ের। তারপর ক্রমে ক্রমে বেশ লাগতে লাগল।

একদিন ভট্ ভট্ শব্দ ক'রে ফটফটিয়ায় চেপে এল মেজবাবু। কাল রাত্রে বাড়ি এসেছে। হিসাবপত্র ঠিক ঠাক ক'রে, কয়লার ডিপো যতখানি পরিষ্কার করা চলে পরিষ্কার ক'রে, নরসিং বসেছিল। সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল।

মেজবাবু নামল। নেমেই বললে, বাঃ।

খুশি হ'ল নরসিং। পরিষ্কার করার ফল পেলে সে হাতে হাতে।

মেজবাবু বললে, ওটা কে রে নোটনা? বেশ দেখতে তো! বাঃ।

নোটন বললে, ওটা কুঞ্জ ডোমের বেটার বউ।

ডাক ওটাকে।

হেসে নোটন বললে, আজ্ঞে, ওটা ভারী ভীতু। নতুন বউ।

মেজবাবু এবার পিছন ফিরে কয়লার দিকে ফিরল, বেশ ভাল ক'রে চারিপাশ ঘুরে দেখলে। তার পর হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে মেয়েটার হাত খপ ক'রে ধরে বললে, পুলিশে দে এটাকে। কয়লা চুরি করছে। টেনে মেয়েটাকে নিয়ে সে ডিপোর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। মেয়েটার সঙ্গে ছিল আরও দুটো মেয়ে, তারা হাসতে লাগল। নোটনও হাসতে আরম্ভ করলে। মেয়ে দুটো বললে, বাবুর কাছে আজ ফি জনায় একটাকা ক'রে লোব। হঁ্যা।

নরসিং প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে গেল, তারপর অকস্মাৎ মনে হ'ল—পায়ের ডগা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কি যেন সন্ সন্ ক'রে চলছে। কান দুটো গরম হয়ে উঠেছে, চোখ দপদপ করছে। বুকের ভিতরটা ঢিপ-ঢিপ করছে না, কিন্তু যেন দুলছে। নিশ্বাস ঘন হয়ে উঠেছে, গরম হয়ে উঠেছে বৈশাখী সন্ধ্যার বাতাসের মত।

বেরিয়ে এল মেজবাবু।

নোটন টপ ক'রে ঘরের দরজাটায় শিকল দিয়ে দিলে। একটা বাইসিক্লে সাহেবী টুপী মাথায় দিয়ে আধরশি দূরে একজন কেউ এসে পড়েছে।

মেজবাবু নোট কেস্ থেকে একখানা পাঁচ টাকার নোট বার ক'রে নরসিংয়ের হাতে দিয়ে বললে, নে। নোটনকে দিলে একখানা পাঁচ টাকার নোট।

নোটন মৃদুস্বরে বললে, সঙ্গের মেয়ে দুটো বলছে, দু টাকা লেবে।

দুটো টাকা ফেলে দিয়ে মেজবাবু ফটফটিয়ার প্যাডেলে ধাক্কা দিয়ে চড়ে বসল। দেখতে দেখতে উড়ে চলে গেল যেন। নরসিংহের মাথার মধ্যে, সর্ব্বাঙ্গে আগুন জ্বলে উঠল মুহূর্ত্তে। সে শিকলটা খুলে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিল। কোণে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা।

এগিয়ে যেতে পায়ে কিছু একটা ঠেকল; সেটা মেজবাবুর কাঁধে ঝুলানো থাকে, গরম চা ঠাণ্ডা হয় না, ঠাণ্ডা জল গরম হয় না বাইরের উত্তাপে; কিন্তু ওটা থেকে গন্ধ উঠছে অন্য জিনিসের। বিলিতী মদের।

নরসিং খপ ক'রে সেটাকে খুলে ঢক ঢক ক'রে মুখে ঢেলে দিলে।

সেদিন নরসিংয়ের চিরদিন মনে থাকবে। চিরদিন!

নরসিং দাঁতে দাঁত ঘষে প্রায় চীৎকার ক'রে গর্জ্জন ক'রে উঠল—শূয়ারকি বাচ্চা! হারামজাদা!

রাম নিতাই অঘোরে ঘুমুচ্ছে; রামটা গোঙাচ্ছে, নিতাইটার কষ বেয়ে বীভৎসভাবে লালা গড়াচ্ছে। নরসিং চঞ্চল হয়ে খানিকটা নড়ে চড়ে বসল। তারপর উঠে ঘরের কোণে বোতল দুটো ছিল, বোতল দুটো নেড়ে চেড়ে দেখলে। একেবারে খালি; এক ফোঁটাও প'ড়ে নাই। গ্লাসের জল খানিকটা সে বোতলে ঢেলে তাই খানিকটা খেলে।

মামীর ভাগ্নীটাকে এর আগে সে অনেকবার দেখেছে। ওই রামার মতই দেখতে ছিল সে। কিন্তু সে ছিল যেন কাদায় গড়া মানুষ। যত ভীরু তত ছিল তার সহ্যগুণ। হঠাৎ এইবার তার চোখে সে যেন নতুন চেহারা নিয়ে দাঁড়াল।

মামীর উপর আক্রোশে, মেজবাবুর দৃষ্টান্তে সে মনে মনে···।

আবার সে চেঁচিয়ে গর্জ্জে উঠল—রামা, শূয়ারকি বাচ্চা!

উঠে দাঁড়িয়ে নিতাইয়ের পিঠে একটা লাথি মারলে। নিতাই একটা শব্দ করলে শুধু একবার, অর্থহীনভাবে চোখ মেলে একবার তাকালে; তারপর পাশ ফিরে শুলে।

নরসিং বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

শুখনরামের গদীর সামনে পাকা ইঁদারা; একেবারে লোহার হুক দিয়ে আঁটা শেকলে ঝুলানো বালতী রয়েছে ইঁদারার পাড়ের উপর। বালতীটা ফেলে দিলে ইঁদারার জলে। সশব্দে গিয়ে পড়ল বালতীটা। সবল বাহুর টানে বালতীটা টেনে তুলে, বালতীর জল সে হড়-হড় ক'রে মাথায় ঢাললে।

জান্‌কী, জান্‌কী, আমার পাপ তুই ক্ষমা করিস। জান্‌কী, তার সোনার জান্‌কী!

খানিকক্ষণ সে পায়চারী ক'রে ফিরল রাস্তার উপর। তারপর সে এসে ঘরের মধ্যে ঢুকল। বাতিটা নিভে গিয়েছে, ঘর অন্ধকার। অন্ধকারেই ঠাওর ক'রে সে এসে নিজের জায়গায় শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পর আবার সে উঠল। দেশলাই জ্বেলে নতুন বাতিটা দেখে নিয়ে সেটাকে জ্বেলে নিলে।

যো হো গেয়া—সো হো গেয়া, যানে দো। ফিন্ শুরু করো।

শ্যামনগর পাঁচমতিয়া সার্ভিস। আট মাইল পথ। সে কাগজ পেন্সিল বার ক'রে বসল এবার। আট মাইল পথ; সকালে এগারটা পর্য্যন্ত দুবার যাবে দুবার আসবে। রাত্রে দুবার যাওয়া, দুবার আসা। আটবার। আট আটে চৌষট্টি মাইল। গাড়ীটা পুরানো, রাস্তা খারাপ। গ্যালনে ষোল মাইল ধরাই ভালো। চৌষট্টি মাইলে চার গ্যালন তেল। আঠার আনা গ্যালন হিসেবে—সাড়ে চার টাকা। মোবিল হাফ গ্যালন—দু'টাকা।

টায়ার বছরে একটা হিসেবে চারটে ; চার পঁচিশ একশো। টিউব চারটে ; চার আটে বত্রিশ। এ ছাড়া বছরে একশো টাকা একটা মেরামতি খরচ।

কাঁকি-কোকিল ডাকছে। থাক হিসেব। হিসেব কষে দেখে কাজ করতে গেলে আর খোলা হয় না সার্ভিস। চোখে সে যে হিসেব রাস্তায় বসে দেখে এসেছে সেইটাই বড় হিসেব।

রাম-নিতাইকে সে ঠেলা দিলে।

শ্যামনগর পাঁচমতিয়া সার্ভিস। ভাড়া সিট্ পিছু আট আনা।

(ক্রমশঃ)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ইয়েনান

[জাপানী সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে চীন মুক্ত হয়েছে। সোভিয়েটের সঙ্গে সন্ধিবলে জাপানের ভবিষ্যৎ আক্রমণ থেকেও চীন আজ বিপদমুক্ত। অথচ চীনের ভাগ্য গঠন করবার অধিকারী আজ চীনের পঞ্চাশ কোটি নরনারী। তবু সে ভাগ্য নির্ভর করছে একটি জিনিসেব উপর—কুয়োমিনটাং নেতৃবর্গ ইয়েনান নেতৃবর্গের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে সত্যকার চীনা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন কি না। সমস্ত এশিয়াব ভবিষ্যতও বহুলাংশে নির্ভর করে এই চীনেব সমস্যা সমাধানের উপর।

ইয়েনানেব সংবাদ চুংকিং-এর মারফৎ আমরা পাইনা—এখনো পাচ্ছি না। অথচ সমস্ত বিপ্লবী জগতে এমন বিস্ময়কব সংগঠন আব বড় নেই। ইয়েনানের কথা আমাদের পক্ষে আবার আরও বেশি লক্ষণীয়। এখানে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হচ্ছে তা রচিত হয় যুদ্ধ শেষের পূর্বে—এটুকু পাঠকের পক্ষে জানা দবকার। সম্পাদক, পরিচয়।]

"রেড ষ্টার ওভার চায়না" লিখে এডগার স্নো দেশ-বিদেশে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছেন। রাশিয়ার যুদ্ধফ্রণ্টে গেরিলা-বাহিনীর কাছ থেকে বইখানার প্রশংসা শুনে তিনি লজ্জিত হয়েছেন। কিন্তু এই বইটা লিখেও তিনি কম বিপদে পড়েননি। চীন-জাপান যুদ্ধারম্ভের পর চীনের যেখানেই তিনি গিয়েছেন সেখানেই যুবক-যুবতীরা "রেড ষ্টার ওভার চায়না" হাতে ক'রে এসে তাঁকে জিগ্যেস করেছে—"কোন পথে ইয়েনান? কি ক'রে ইয়েনানের শিক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করা যায়?" চীনের একটি শহরের শিক্ষাসচিব তাঁর ছেলেকে ইয়েনানের রাজনৈতিক ও সামরিক শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্ত্তি ক'রে দেবার জন্যে এডগার স্নো-কে অনুরোধ করেন। কিন্তু এডগার স্নো আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গিয়েছিলেন হ্যাঙ্কাউ-এর এক ব্যাঙ্কারের অনুরোধে—তিনিও তাঁর ছেলেকে ইয়েনানে পাঠাতে চাইলেন। এডগার স্নো তাঁকে বললেন—"ইয়েনানে আপনার ছেলেকে মাটিতে ঘুমোতে হবে, নিজের জামাকাপড় পরিষ্কার করতে হবে, নিজের খাবার তৈরী করতে হবে।" উত্তরে সেই ব্যাঙ্কার বললেন, "আমি তা জানি, কিন্তু এখন যে অবস্থায় সে আছে সে-রকম অবস্থায়ই যদি সে

থাকে তবে ভবিষ্যতে তাকে জাপানীদেরই দাস হয়ে থাকতে হবে।" এডগার স্নো আরো বলেছেন—"যদি আমি সাংঘাই, হাঙ্কাউ বা চুংকিং-এ ইয়েনান শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য রিক্রুটিং অফিস খুলতাম তবে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই কযেক ব্যাটালিয়ন সৈন্য আমি অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারতাম।"

চীনের জনসাধারণের সম্মুখে আজ দু'টি পথ উন্মুক্ত—একটি কুয়োমিনটাং-সরকারের পথ, আর একটি কমিউনিস্টদের পরিচালিত পথ। কুয়োমিনটাং-সরকার জনগণের উপর অত্যাচার করতে আজও দ্বিধা করে না। কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় আসে তাদের দ্বিধা, সঙ্কোচ—তাই কোনোমতে, প্রায় নিষ্ক্রিয়ভাবে, সশস্ত্র প্রতিরোধ তারা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কমিউনিস্টরা জাগিয়ে তুলেছে জনগণকে, উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছে তাদের দেশপ্রেমে, দেশরক্ষার কাজে। তাই আজ কমিউনিস্ট-শাসিত অঞ্চলেই জন-প্রতিরোধের আবর্ত্তে জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্র ঘুরপাক খাচ্ছে।

ইয়েনান কমিউনিস্টদের এই পথের পরিচালনার কেন্দ্রস্থল। ইয়েনান শুধু কমিউনিস্ট-শাসিত অঞ্চলের রাষ্ট্রকেন্দ্র নয়,—ইয়েনান আজ গেরিলা-বাহিনীদের প্রধান ঘাঁটি। শেনসি থেকে পূর্ব্ব দিকে পীত সাগর পর্য্যন্ত এবং হোনান ও হোপেই প্রদেশের পীত নদী থেকে উত্তরে সুদূর মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত জনপদের জাপ-বিরোধী কার্য্যকলাপ ইয়েনান থেকে পরিচালিত হয়। জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধের শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে এবং গণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় ইয়েনান আজ চীনের যুবক-যুবতীদের কাছে তীর্থস্বরূপ। চীনের গোকি "লু-সুন"এর কথায়—"The road to YENAN is for China's youth the road to life."

চীনের সাম্প্রতিক ইতিহাসে ইয়েনান শুধু জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধের প্রধান কেন্দ্র নয়, চীনের নতুন সভ্যতারও প্রাণকেন্দ্র। কিন্তু চীনের প্রাচীন ইতিহাসেও ইয়েনানের একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। সুঙ-বংশের রাজত্বকালে অর্থাৎ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইয়েনান ছিল বিদেশী বর্ব্বরদের আক্রমণ থেকে চীনকে রক্ষা করবার প্রধান দুর্গ। আরো প্রাচীন ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায় যে উত্তর পশ্চিম চীনই চীনের আদি সভ্যতাব প্রধান উৎস। ইযেনানের উচ্চ ভূমিতেই চীনের সভ্যতার, চীনের সংস্কৃতির উৎপত্তি। সে সভ্যতা, সে সংস্কৃতি প্রথমে বিস্তৃত হয়েছে ইয়াংশি নদীর তীরে তীরে; তার পরে দক্ষিণ চীনে। আজ চীনে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। ইয়েনান আজ নতুন সভ্যতার, নতুন সংস্কৃতিরও উৎপত্তিস্থান।

কমিউনিস্টদের আপ্রাণ চেষ্টায় ইয়েনানে গড়ে উঠেছে নতুন জীবনধারা, নতুন সভ্যতা, নতুন সংস্কৃতি। সেই সভ্যতা, সেই সংস্কৃতি উত্তর-পশ্চিম চীন থেকে বিস্তৃত হচ্ছে মধ্য চীনে, দক্ষিণ চীনে। চীনের আদি সভ্যতার উৎপত্তিস্থল ইয়েনান আজ পরিণত হয়েছে রেনেশাঁস আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্রে।

রাজনীতিক্ষেত্রে চুংকিং-এর পরই ইয়েনানের স্থান। সিয়ান ঘটনার পূর্ব্বে ইয়েনান ছিল মার্শাল চাঙসুয়েলিয়াঙের অধীনে। তখন সোভিয়েট-চীনের রাজধানী ছিল ইয়েনান থেকে একশ 'লি' দূরে অবস্থিত "পাও-আন" শহরে। সিয়ান ঘটনার অবসানের পর মার্শাল

চাঙ চীনের লালফৌজের হাতে ইয়েনান ছেড়ে দেন। তখন কমিউনিস্টরা সোভিয়েট-চীনের রাজধানী "পাও-আন" থেকে ইয়েনানে স্থানান্তরিত করে।

আধুনিক ইয়েনানকে গুহার শহর আখ্যা দেওয়া অত্যুক্তি নয়। পাহাড়ের দু'ধার কেটে কেটে কুড়ি মাইল পর্য্যন্ত গড়া হয়েছে শত শত গুহা। সে গুহায় বাস করে চল্লিশ হাজার চীনবাসী। গভর্ণমেন্টের অফিস, কারখানা, হাসপাতাল, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়—সমস্তই গুহায় অবস্থিত। জাপানী বোমার আক্রমণ থেকে এই গুহাগুলি সুরক্ষিত। আর গুহা কাটাতে খরচও অল্প—সাধারণতঃ কুড়ি ফুট লম্বা এবং কুড়ি ফুট চওড়া একটি গুহা তৈরী করতে কুড়ি টাকার বেশি প্রয়োজন হয় না। গ্রীষ্মকালে এই গুহাগুলি ঠাণ্ডা এবং শীতকালে গরম। সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারীরা এই গুহাতেই বাস করে। কিন্তু ইয়েনানের এই হচ্ছে একটা দিক। ইয়েনানের গুহার অঞ্চল ব্যতীত রয়েছে আর একটি অঞ্চল। কো-অপারেটিভ ষ্টোর, ছোট ছোট শিল্প-প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, বই-র দোকান, 'ইনডাস্কো'র কারখানা, রেস্তোরাঁ প্রভৃতিতে সে-অঞ্চল মুখরিত। অষ্টম রুট্ আর্ম্মির রাজনৈতিক বিভাগ, সৈন্যদের বিদ্যায়তন "কাঙটা", মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয় "নু-টা", কলাভবন "লু-সুন ইস্থ সহিনান"-ও এই অঞ্চলে অবস্থিত। বিশেষ ব্যবস্থার ফলে এই অঞ্চলও জাপ-বোমার আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত।

জাপ-প্রচারকেরা ইয়েনানকে এশিয়ার বলশেভিকদের আবাসভূমি বলে থাকে। তাদের মতে আজ সমগ্র চীনেই বলশেভিকবাদ বিস্তৃত হচ্ছে এবং এই বলশেভিকবাদের উৎস হচ্ছে ইয়েনান। চীনের কুয়োমিনটাং-সরকারও ইয়েনানকে চীনে কমিউনিজম্ প্রচারের কেন্দ্র হিসাবে দেখে থাকে—দীর্ঘ দিন যুদ্ধের ফলেও ইয়েনানকে জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধের কেন্দ্র হিসাবে দেখতে কুয়োমিনটাং সরকার পারেনি; কমিউনিজম্-ভীতি কুয়োমিনটাং-সরকারের দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে। তাই জাপানের বিরুদ্ধে সমস্ত সৈন্যদলকে নিযুক্ত না ক'রে একটা অংশকে কুয়োমিনটাং-সরকার সর্ব্বসময়ের জন্য নিযুক্ত রাখছে ইয়েনানের নিকটবর্ত্তী সিয়ান-অঞ্চলে। সুবিধানুযায়ী কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করাই এই বাহিনীর কাজ। কুয়োমিনটাং-সরকারের কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ এতদূর প্রবল হ'য়ে উঠেছে যে, জাপ-সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে নিযুক্ত সৈন্যবাহিনীকে পর্য্যন্ত সরকার উঠিয়ে নিয়ে আসছে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য। এছাড়া কুয়োমিনটাং-জেনারেল "হুৎসুঙমান" তাঁর সেনাদল নিয়ে ইয়েনানের প্রবেশপথ আগ্‌লে আছেন; যখন চীনের যুবক-যুবতীরা ইয়েনানের শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে ইয়েনানে প্রবেশ করবার চেষ্টা করে তখন তাদের তিনি গ্রেফ্‌তার ক'রে তাঁর নিজস্ব সামরিক বিদ্যালয়ে নিয়ে আসেন। এই সামরিক বিদ্যালয়টি একটি বন্দীশালা ছাড়া আর কিছু নয়। এ ছাড়া রয়েছে সিয়ান অঞ্চলে কুয়োমিনটাং-সরকারের "লেবর ক্যাম্প"। সিয়ান কর্ত্তৃপক্ষের মতে বিরুদ্ধবাদী রাজনৈতিক কর্ম্মীদের শিক্ষার প্রভাবে কুয়োমিনটাং-মতাবলম্বী ক'রে তোলাই এই "লেবর ক্যাম্পের" উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ কমিউনিস্ট-শাসিত অঞ্চলের জনগণকে গ্রেফ্‌তার ক'রে এই ক্যাম্পে আটক রাখা হয়। কর্ত্তৃপক্ষের মতে দু'বছরের বেশি কাউকেই এই ক্যাম্পে রাখা হয় না—প্রথম বছরে দেওয়া হয় রাজনৈতিক শিক্ষা, দ্বিতীয় বছরে দেওয়া হয় হাতে-কলমে শিক্ষা। কিন্তু অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে যে, ক্যাম্পের অধিবাসীর অনেকেই তিন চার বছর যাবৎ ক্যাম্পে আছেন। নাৎসী জার্ম্মানীতে বিরুদ্ধবাদী রাজনৈতিক

দলকে সায়েস্তা করার জন্য হিটলার যে রকম ক্যাম্পের প্রতিষ্ঠা করেছিল সিয়ানের এই লেবর ক্যাম্পটিও ঐ পর্য্যায়ভুক্ত। প্রত্যক্ষদর্শী এপস্টাইন-এর কথায়—"This concentration camp is a somewhat Dachan (হিটলারের ঐ ক্যাম্পকে বলা হতো Dachan).

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইয়েনান থেকে যে ভাবধারা চীনে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে তা কমিউনিজম্ নয়, তা হচ্ছে জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধের ভাবধারা। ইয়েনান অভিমুখে চীনের রাজপথ বিপদমুক্ত নয়, কিন্তু শত বাধাবিঘ্নও চীনের যুবক-যুবতীদের ইয়েনানে শিক্ষালাভের সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। ইয়েনানের জাপ-বিরোধী সামরিক ও রাজনৈতিক বিদ্যায়তন থেকে প্রতি বৎসর দশ সহস্র যুবক-যুবতী শিক্ষালাভ ক'রে জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধ-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করছে।

১৯৪৪-এ ইয়েনানে প্রবেশ ক'রে এপস্টাইনের সর্ব্বপ্রথম চোখে পড়েছে জনগণের কর্ম্ম-কুশলতা। তাদের জাপবিদ্বেষ, যে গণতান্ত্রিক অধিকার তারা পেয়েছে, যে আর্থিক উন্নতি তাদের হয়েছে—সে সব রক্ষা করবার জন্য তাদের দৃঢ় সংকল্প। আর একটি জিনিস তাঁর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—কমিউনিস্ট-শাসিত অঞ্চলের, বিশেষ ক'রে ইয়েনানের, জনসাধারণ বুঝেছে যে, অদূর ভবিষ্যতেই জাপানের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির যে প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ হবে সেই প্রতি-আক্রমণে কমিউনিস্ট-বাহিনী ও গেরিলারা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করতে চায় এবং তার জন্য তারা নিজেদের প্রস্তুত করছে।—কুয়োমিনটাং-বাহিনীর শিবিরে জাপ-বাহিনীর কাছ থেকে অধিকৃত অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়। কিন্তু ইয়েনানে এসে এপস্টাইন দেখলেন, প্রত্যেকটি চীনা সৈনিকের হাতেই জাপ সৈনিকের কাছ থেকে অধিকৃত একটি রাইফেল বা একটি পিস্তল বা একখানি তরোয়াল। এ থেকেই স্পস্ট হয়ে উঠে, কি ভাবধারায় ইয়েনান আজ উদ্বুদ্ধ।

সুন্‌ইয়াৎসেনের সান্-মিন নীতির তিন প্রস্তাবকে (পূর্ণ স্বরাজ, গণতন্ত্র এবং জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি) কার্য্যকরী করবার জন্য কমিউনিস্টরাই অগ্রণী। পূর্ণ স্বরাজের জন্যই জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধে কমিউনিস্টরা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করছে—দেশরক্ষায় তাদের দান অশেষ। গণতন্ত্র ও জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি—এই দু'টি প্রস্তাবকেও কার্য্যকরী করতে কমিউনিস্টরা অগ্রসর হয়েছে।

মাঞ্চুবংশের শাসনকালে চীনের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে Face, Fate, Favour—এই তিনটির প্রাধান্য ছিল প্রবল। চীনে সাধারণতন্ত্র সংস্থাপিত হবার পরও সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এই তিনটির প্রভাব কমেনি। কিন্তু ইয়েনানে Face, Fate ও Favour—এই তিনটির একটিরও কোনো প্রাধান্য নেই।

চীনে গণতন্ত্র প্রসারের প্রধান কেন্দ্র ইয়েনান। কমিউনিস্টদের চেষ্টায় গঠিত প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্ট-শাসিত অঞ্চলে শ্রেণীনির্ব্বিশেষে ১৮ বৎসরের বা তার বেশি বয়স্ক প্রত্যেক নরনারীর ভোটাধিকার আছে। এই সকল অঞ্চলে জনসাধারণের ভোটে নির্ব্বাচিত "জন-পরিষদ"ই সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান—এই পরিষদই গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাচিত করে। প্রত্যেকটি প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্টে—গ্রাম থেকে আরম্ভ ক'রে শহরে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত কার্য্যই পরিচালিত হয় স্থানীয় "জন-পরিষদ" দ্বারা। এই পরিষদই নির্ব্বাচিত ক'রে স্থায়ী স্থানীয় সরকার।

জনসাধারণের ভোটে এই গবর্ণমেণ্টের প্রত্যেকটি পদ দখল করা কমিউনিস্টদের পক্ষে কষ্টকর নয়। কিন্তু কুয়োমিনটাঙের এক পার্টি, এক নেতা ও এক নীতির সঙ্গে কমিউনিস্টদের কর্ম্মপন্থার পার্থক্য বিশাল। আজ চীনে কমিউনিস্টদের প্রধান লক্ষ্য যুদ্ধজয়, এবং তার জন্য প্রয়োজন গণতন্ত্রের প্রসার। তাই প্রান্তীয় গবর্ণমেণ্টে কমিউনিস্টরা সমস্ত পার্টির সঙ্গেই সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসছে। অবশ্য এই সহযোগিতা কুয়োমিনটাঙের তথাকথিত সহযোগিতার শ্লোগানের মতো নয়। ঐই সহযোগিতার শ্লোগানকে কার্য্যকরী ক'রে তোলবার জন্য কমিউনিস্টরা প্রবর্ত্তন করেছে "Three-Thirds System." এই ব্যবস্থার মূলকথা হচ্ছে যে, কি স্থানীয়, কি প্রাদেশিক, কি কেন্দ্রীয়—কোনো গবর্ণমেণ্টেই কমিউনিস্টরা এক-তৃতীয়াংশের বেশি আসন দখল করবে না, বাকী দুই-তৃতীয়াংশ আসন অন্যদল—তা সে দল যদি কুয়োমিনটাংও হয় তাতেও কোনো আপত্তি নেই—এবং জনসাধারণের জন্য রাখা হবে। যদি ভোটের ফলে দেখা যায় যে, কমিউনিস্টরা এক-তৃতীয়াংশের বেশি আসন পেয়েছে তাহলে পদত্যাগ ক'রে সেই আসন অন্যদলের বা অ-দলীয় জনগণের প্রতিনিধি দ্বারা পূরণ করা হবে। এই ব্যবস্থা কমিউনিস্টরা নিষ্ঠার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রে থাকে। ১৯৪১-এ শেনসি-কানসু-নিঙসিয়া প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্টের "রেসিডেণ্ট কমিটি" নির্ব্বাচনের সময় দেখা গেল কমিউনিস্টরা তাদের নীতি সম্পূর্ণভাবে বজায় রেখেছে। রেসিডেণ্ট কমিটির সভ্যসংখ্যা ছিল ১৬ জন এবং এদের মধ্যে কমিউনিস্ট সভ্যসংখ্যা ৬ জনের বেশি হওয়া উচিত নয়। কিন্তু ভোটারগণ পূর্ব্বেই স্থির করেছে যে, কমিউনিস্ট-দেরই তারা ভোট দেবে। এ জন্য অনেক কমিউনিস্টকে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হ'তে নিষেধ করা হয়। কিন্তু ভোটের শেষে দেখা গেল তবুও কমিউনিস্টরা একটি আসন বেশি পেয়েছে। সুতরাং কমরেড "সু-তেহ-লি" নির্ব্বাচিত হয়েও পদত্যাগ করেন, যাতে অ-কমিউনিস্ট "পেন-ওয়েন-পুয়ান" নির্ব্বাচিত হ'য়ে কমিটিতে যেতে পারেন।

এই সব জন-পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচনে জনসাধারণ আগ্রহের সঙ্গে অংশ গ্রহণ ক'রে থাকে—তাদের ভোটাধিকার তারা পুরোমাত্রায় ব্যবহার করে। ইয়েনান ভ্রমণকালে এপস্টাইন এই জন-পরিষদ সম্বন্ধে যে তথ্য সংগ্রহ করেন তাতে দেখা যায় যে, ১৪টি জিলার শতকরা ৭০ ভাগ লোকই নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছে। এই ১৪টি জিলার জন-পরিষদে মোট ৯৯৬৭ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়েছেন, তন্মধ্যে ৫৫৪৯ জন অর্থাৎ শতকরা ৫৫ ভাগ হচ্ছে গরীব চাষী; ২৪৩৫ জন অর্থাৎ শতকরা ২৪ ভাগ মধ্যস্তরের চাষী; ৬৯০ জন অর্থাৎ শতকরা ৭ ভাগ অবস্থাপন্ন চাষী; ৫০২ জন অর্থাৎ শতকরা ৫ ভাগ দিনমজুর; ৩৯৪ জন অর্থাৎ শতকরা ৪ ভাগ শ্রমিক এবং বাকী সব হচ্ছে জমিদার, জোতদার, ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক। এর মধ্যে মাত্র ২৪৭৭ জন অর্থাৎ শতকরা ২৪ ভাগ হচ্ছে কমিউনিস্ট; অ-দলীয় হচ্ছে ৭১৩৮ জন অর্থাৎ শতকরা ৭১ ভাগ এবং ৩৫২ জন অর্থাৎ শতকরা ৩·৭ ভাগ হচ্ছে কুয়োমিনটাং সভ্য। বিভিন্ন জিলায় গভর্ণমেণ্ট পরিচালনার জন্য যে জিলা-কমিটি জন-পরিষদ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয় তাতে দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রেই সভ্য-সংখ্যার দিক থেকে কুয়োমিনটাঙেরই সংখ্যাধিক্য। যেমন সুই-তেহ জিলা-কমিটিতে ১১ জন সভ্যের মধ্যে ৭ জন কুয়োমিনটাং সভ্য, ৩ জন কমিউনিস্ট এবং ১ জন কোন দলভুক্ত নন। অবশ্য এই সব কুয়োমিনটাং সভ্যের সঙ্গে চুংকিং-এর কুয়োমিনটাং দলের যোগাযোগ আদৌ নেই—এঁরা চুংকিং সরকারের

কার্য্যাবলীর সমালোচনা ক'রে থাকেন। গৃহযুদ্ধের পূর্ব্বে চীনে যখন কুয়োমিনটাং ও কমিউনিস্ট পার্টির সম্মিলিত ফ্রণ্ট গড়ে উঠেছিল তখন কুয়োমিনটাঙের যে নীতি ছিল সেই নীতি-ই এঁরা অনুসরণ ক'রে চল্‌ছেন এবং এঁদের মধ্যে অনেকে সেই সময় থেকেই কুয়োমিনটাঙের সভ্য।

চীনের অনধিকৃত অঞ্চলে একমাত্র শেনসি-কানস্থ-নিঙসিয়া প্রান্তীয় অঞ্চলেই এই নতুন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত—সমগ্র চীনের মধ্যে শুধু এই অঞ্চলেই জন-পরিষদ জনসাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত (অবশ্য জাপ-অধিকৃত অঞ্চলের যে অংশ কমিউনিস্ট-বাহিনী পুনরধিকার করতে সক্ষম হয়েছে সেখানেও এই নতুন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই কমিউনিস্টরা প্রধান কাজ হিসাবে গ্রহণ করেছে)। কেন্দ্রীয় জন-পরিষদই প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্টের সমস্ত আইন প্রণয়ন করে এবং যখন জন-পরিষদের অধিবেশন বন্ধ থাকে তখন জন-পরিষদের নির্ব্বাচিত কমিটির উপর-ই গভর্ণমেণ্ট-পরিচালনার সমস্ত ভার ন্যস্ত থাকে।

এই নতুন গণতন্ত্রের ফলে প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্টের জনসাধারণের জীবনযাত্রায় এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন এসেছে—এই অঞ্চলের চীনবাসীর সঙ্গে কুয়োমিনটাং-শাসিত অঞ্চলের চীনবাসীর পার্থক্য বিশাল। এই অঞ্চলের চীনবাসীরা নতুন জীবন লাভ করেছে—আজ তারা স্পষ্টভাষী, শাসকদের সম্বন্ধে তাদের কোন ভয় নেই কারণ তারাই শাসকদের নির্ব্বাচিত করেছে, রাষ্ট্রপরিচালনার কার্য্যে তারা কোনরূপ সমালোচনা করতে দ্বিধা করে না, তারা উদ্‌বুদ্ধ হ'য়ে উঠেছে নতুন ভাবধারায়, জরাজীর্ণ পুরাতন আচারনীতিকে তারা সমধিস্থ করেছে, দেশের এবং দশের উন্নতিসাধনের পথে সমস্ত বাধাকেই অতিক্রম করতে তারা বদ্ধপরিকর। নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে তারা বুঝেছে দেশ তাদের, রাষ্ট্র তাদের—তাদেরই মতামতে পরিচালিত হবে দেশের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা।

জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি ব্যতীত চীনের উন্নতি অসম্ভব। একথা স্থন্‌ইয়াৎসেন বুঝেছিলেন। তাই তাঁর সান্‌-মিন নীতির তৃতীয় প্রস্তাব ছিল জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি। কিন্তু এ প্রস্তাব কার্য্যকরী করতে কুয়োমিনটাং অগ্রসর হয়নি—অগ্রসর হয়েছে একমাত্র কমিউনিস্টরা। তাই চীনে জনসাধারণের অবস্থার যথার্থ উন্নতি একমাত্র প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্ট-শাসিত অঞ্চলেই দেখা যায়।

জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে চীনের প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্টের আর্থিক শক্তি দু'টি জিনিসের মধ্যে নিহিত: চীনবাসীর সহজ সরল জীবনযাত্রা, তাদের খাদ্যদ্রব্যের সহজ চাহিদা এবং সে চাহিদা পূরণে তার আর্থিক স্বচ্ছলতা ও আত্মনির্ভরতা। চীনদেশ ভারতের ন্যায় কৃষি-প্রধান—তাই জন-প্রতিরোধের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় রাখবার অর্থ, প্রথমতঃ সৈন্যবাহিনী ও জনসাধারণের খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা পূরণের জন্য কৃষিকার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা এবং দ্বিতীয়তঃ জনসাধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় শিল্প-সামগ্রী ও সৈন্যদের সমর-সম্ভার উৎপাদনের জন্য শিল্প-ব্যবস্থায় যথোপযুক্ত উন্নতিবিধান। এ কার্য্য সুসম্পন্ন করতে কমিউনিস্টরাই প্রথমে এগিয়ে আসে। কমিউনিস্টরা শুধু গেরিলা রণ-কৌশলের স্রষ্টা নয়, যুদ্ধকালীন আর্থিক সংগঠনের তারাই পথপ্রদর্শক।

প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্টের অধীনস্থ জনপদে দেশীয় শিল্প, কলকারখানা প্রভৃতি না থাকায় জাপানীদের প্রথমে খুব সুবিধে হয়েছিল; তারা তাদের সস্তা শিল্পসামগ্রী দিয়ে এই সকল

জনপদের অধিবাসীদের শোষণ করতে আরম্ভ করে। রণক্ষেত্রে যদিও কমিউনিস্টবাহিনী জাপ্-বাহিনীর অগ্রগতি প্রতিহত করছিল, কিন্তু জাপানীদের এই আর্থিক অভিযানে কমিউনিস্টদের গেরিলা রণকৌশলের ভিত্তি কেঁপে ওঠে। কারণ কমিউনিস্টদের গেরিলা রণ-কৌশলের ভিত্তি হচ্ছে প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্টের অধীনস্থ জনপদসমূহ। সুতরাং সেখানকার অধিবাসীদের যদি জাপানীরা সস্তা পণ্যসামগ্রী দিয়ে ভুলিয়ে তাদের প্রতিরোধশক্তিকে খর্ব্ব করতে আরম্ভ করে, তবে গেরিলা-বাহিনীদের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার, তা কমিউনিস্টরা ভালোভাবেই বুঝেছিল। তারা তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছিল যে, চীনা কৃষকরা দেশ-রক্ষার জন্য সে পর্য্যন্তই যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করবে যে-পর্য্যন্ত তারা তাদের শ্রমে উৎপন্ন পণ্যের বিনিময়ে তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী, যথা—কাপড়, জুতা, তামাক, জ্বালানী, তেল, কৃষিকার্য্যের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি কিনতে পারবে। কিন্তু যখন অধিককালের জন্য এ সব জিনিস তারা বাজারে পায় না, তখন তাদের প্রতিরোধশক্তি ধীরে ধীরে দুর্ব্বল হতে থাকে, তাদের সমস্ত আশা নির্ম্মূল হতে আরম্ভ করে। সে-সময়ে যদি সস্তা জাপানী জিনিসের আমদানী হয় তবে তো আর কথাই নেই। তাই যখন রণক্ষেত্রের সীমানা অতিক্রম ক'রে জাপানী সস্তা পণ্যদ্রব্য প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্টের অঞ্চলে প্রবেশ করতে আরম্ভ করল, তখন কমিউনিস্টরা দেখল, জাপানী পণ্যদ্রব্যের আমদানী জোর ক'রে বন্ধ করলে ফল ভাল হবে না; জাপানীদের এই আর্থিক অভিযান প্রতিহত করবার জন্য চাই দেশব্যাপী শিল্পোন্নতির প্রসার ও জনগণের আর্থিক চাহিদার পূরণ। জনসাধারণের চাহিদা ছাড়া আরো কতকগুলি সমস্যা তখন উপস্থিত হয়েছিল। রণক্ষেত্রে সৈন্যদেরও রীতিমত রসদ ও নিত্যব্যবহার্য্য সামগ্রী পাঠাতে হচ্ছিল। ১৯৩৯-এ আবার জাপ-অধিকৃত অঞ্চল থেকে চীনারা দলে দলে প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্টের শাসিত অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয়। কমিউনিস্টরা দেখল যে, এই সকল জনসাধারণকে যদি আশ্রয় ও কাজ না দেওয়া যায় তবে তারা জাপ-অধিকৃত অঞ্চলে ফিরে গিয়ে জাপানের কলকারখানায় মজুর হিসাবে কাজ ক'রে তার রণ-সম্ভার বৃদ্ধি করবে। ইতিমধ্যে প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্টের অধিকৃত অঞ্চলের প্রাকৃতিক ধনসম্পদ অব্যবহার্য্য হয়ে পড়েছিল; সেগুলি ব্যবহার করবার মত কোন ব্যবস্থাই ছিল না। চীনের কেন্দ্রীয় সরকারও এ বিষয়ে কমিউনিস্টদের বিশেষ কোন সাহায্য করেনি। চীনের সাতটি প্রদেশের অনেক অঞ্চলেই গেরিলা-বাহিনীর অধিকারে এবং সামরিক দিক দিয়ে এই সকল অঞ্চলই যুদ্ধের প্রধান কেন্দ্রস্থল। এই সকল অঞ্চলে শিল্পোন্নতির জন্য মূলধনের অভাব দেখা দিয়েছিল। এই অঞ্চলের আর্থিক অবস্থা তখন এমন স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল যে মাওৎসেতুঙ ঘোষণা করেন—"আমাদের সম্মুখে আজ মাত্র তিনটি পথ উন্মুক্ত: অনাহারে মৃত্যু, জাপানের নিকট আত্ম-সমর্পণ, আর নয় সমস্ত শক্তি নিয়োগ ক'রে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি"। শেষোক্ত পথটিই কমিউনিস্টরা গ্রহণ করে।

চীনে অন্তর্যুদ্ধের সময় (১৯২৭—'৩৬) কমিউনিস্টরা যুদ্ধকালীন অর্থনীতি হিসাবে ক্ষুদ্রাকারে সমবায় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের যথোপযুক্ততা উপলব্ধি করেছিল। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ও তারা সেই অর্থনীতিই প্রয়োগ করল। "ইয়েনান"কে কেন্দ্র ক'রে প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্ট-শাসিত অঞ্চলসমূহে কমিউনিস্টরা সমবায় শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করল। যদিও তাদের মূলধন খুবই অল্প ছিল, তবুও তাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টার ফলে এই কাজ অনেক দূর

অগ্রসর হয়। এই সকল সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণতঃ দুই প্রকারের: পণ্য উৎপাদনকারীদের সমবায় সমিতি, আর পণ্য ব্যবহারকারীদের সমবায় সমিতি। এই সকল সমবায় সমিতিগুলি এমনভাবে পরিচালিত যে, এগুলিকে জনসাধারণের প্রকৃত গভর্ণমেণ্ট আখ্যা দেওয়া অসঙ্গত নয়। এই সকল সমবায় সমিতিগুলির সভ্য সংখ্যা এক লক্ষ পরিবারের অধিক। সমবায় সমিতিগুলির চতুষ্পার্শ্বে সমস্ত গ্রাম্য জীবনকে কমিউনিস্টরা আথিক শক্তি হিসাবে কেন্দ্রীভূত করেছিল। কৃষিক্ষেত্রে কমিউনিস্টরা এক নতুন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করে—সে-ব্যবস্থাকে বলা হয় "শ্রম-বিনিময়" (Labour Exchange) ব্যবস্থা। সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠনের পূর্ব্বে (১৯৩৭) কমিউনিস্টরা তাদের শাসিত অঞ্চলে জমিদারদের জমি চাষীদের মধ্যে বিলি ক'রে দিয়েছিল—সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠনের পর যেথানে জমিদার আবার ফিরে এসেছে সেখানে শুধু তার জীবন ধারণোপযোগী জমি তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। চাষীদের দুঃখ লাঘব করার জন্য খাজনার হার কমানো হয়েছে এবং তাদের কৃষিঋণ দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। চীনের এই অঞ্চলের চাষীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছে যে উপার্জ্জিত ফসল লুট করবার সামর্থ্য আর জমিদারদের নেই—তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য রয়েছে তাদের নিজেদের সরকার। তাই চাষীদের "ফসল বাড়াও" আন্দোলনে উৎসাহিত করা কমিউনিস্টদের পক্ষে সহজ হয়ে উঠেছে। এক একটি গ্রামে তাই ফসল বাড়াবার জন্য গড়ে উঠেছে এক একটি "শ্রম-বিনিময়" গ্রুপ। এই "শ্রম-বিনিময়" গ্রুপগুলি চাষীদের সমবায় সমিতি—চাষীরা নিজেরাই ভোট দিয়ে এই সমিতির প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত করে। এই সমিতির মারফৎ-ই গ্রামের সব চাষী একত্র হয়, চাষের নিজ নিজ যন্ত্রপাতি এক জায়গায় জড় করে এবং সবাই মিলে গ্রামের সমস্ত জমি চাষ করে। ফলে অনেক সময় ও খরচ চাষীদের বেঁচে যায় এবং সেই সময় তারা নতুন জমি আবাদের কাজে ব্যয় করে—প্রান্তীয় সরকার এই সব অনাবাদী জমি জমিদারদের না দিয়ে চাষীদের মধ্যেই বিনা খাজনায় প্রথমে বিলি ক'রে দেয়। ফসল কাটা শেষ হলে গ্রামের চাষীদের সাধারণ সভা ডাকা হয় এবং সেই সভায় নিজেদের মধ্যে ফসল ভাগ করা হয়। ফসল ভাগ করার ভিত্তি হচ্ছে প্রত্যেকের কতখানি জমি চাষ করা হয়েছে, কতদিন সে কাজ করেছে এবং কয়টা গরু বা ঘোড়া চাষের জন্য সে দিয়েছে। এই ভাবে একত্র চাষ-আবাদের ফলে চাষীদের জীবন-ধারণের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে—একমাত্র-ইয়েনান অঞ্চলেই আজ প্রত্যেক চাষী পরিবারের দু'বছরের খাদ্যদ্রব্য মজুত আছে। এই "শ্রম-বিনিময়" ব্যবস্থায় যে সমস্ত অনাবাদী জমিতে চাষীরা ফসল ফলাতে আরম্ভ করেছে সে-জমিগুলি সেই গ্রামের সাধারণ সম্পত্তি হিসাবেই গণ্য হচ্ছে। এক একটি গ্রামে এই "শ্রম-বিনিময়" ব্যবস্থায় যে চাষী চাষ-আবাদে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দেয় এবং তার কর্ম্মকুশলতা দিয়ে অন্য চাষীদের চাষ-আবাদে সাহায্য ক'রে থাকে অর্থাৎ গুণে, কার্য্যদক্ষতায় যে চাষী শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত হয়, তাকে সমস্ত চাষীরা একত্র হয়ে গ্রামের "শ্রম-বীর" (Labour Hero) বলে ঘোষণা করে। প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্টের গ্রামে গ্রামে আজ আর জমিদার বা ধনীর সম্মান এবং আধিপত্য নেই, আজ গ্রামে সম্মানিত হয় শ্রম-বীর যে সেই চাষী, তার প্রভাবই গ্রামে বিস্তৃত।

প্রত্যেকটি জিলার সমস্ত শ্রম-বীরেরা প্রতি বৎসর একত্রে একবার মিলিত হন—সেখানে তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান করেন এবং এ ভাবে প্রত্যেকটি গ্রামের "শ্রম-

বিনিময়" ব্যবস্থা অন্য গ্রামের অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। এমন কি, প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্ট যখনই ফসল উৎপাদন সম্বন্ধে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করে তখন তারা প্রথমেই আলোচনা করে চাষীদের সঙ্গে এবং গ্রামের শ্রম-বীরেরা তখন গভর্ণমেণ্টের প্রত্যেকটি সভায় উপস্থিত থাকেন এবং নিজেদের বক্তব্য বলেন। কমিউনিস্ট পার্টির কৃষি-নীতি স্থির করবার পূর্ব্বে মাও-সেতুং বিখ্যাত "শ্রম-বীর" কৃষক "উমান-ইউ"র সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কৃষি-নীতি লেখেন এবং লেখার পর "উমান-ইউ"র সমালোচনা চেয়ে পাঠান। অথচ দশ বৎসর পূর্ব্বে এই "উমান-ইউ" ছিলেন একজন জমিহীন ভিক্ষুক—দুর্ভিক্ষে তাঁর স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি মারা যায়। আজ তিনি একজন অবস্থাপন্ন কৃষক এবং কৃষিকার্য্যে তিনি একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক।

"শ্রম-বিনিময়" ব্যবস্থার ফলে যে শুধু গ্রামের চাষীরা-ই একত্রে কাজ করছে তা নয়; ফসল কাটার সময় গ্রামের সকলেই চাষীদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছে। ইয়েনান ভ্রমণকালে এডগার স্নো একদিন গভর্ণমেণ্টের ব্যাঙ্কে গিয়ে দেখেন, ব্যাঙ্ক বন্ধ—ব্যাঙ্কের সকলেই ফসল কাটায় চাষীদের সাহায্য করতে গিয়েছে। রণক্ষেত্রের সম্মুখভাগের অঞ্চলে সৈন্যরা আসছে চাষীদের সাহায্য করতে। পূর্ব্বে একজন চাষীকে ফসল কাটা, ফসল ঘরে আনা, বাছা এবং গুদামে রাখা—সব কাজ একাই করতে হ'ত। ফলে অনেক সময় চাষী তার সমস্ত ফসল ঘরে আনতে পারত না জাপ-দস্যুদলের অতর্কিত আক্রমণের জন্য। কিন্তু শ্রম-বিনিময় ব্যবস্থায় সৈন্যদের সাহায্যের ফলে চাষীদের অবস্থা এদিক থেকে অনেক উন্নত হয়েছে। পূর্ব্বে যেখানে ছ সপ্তাহে চাষীকে এ কাজগুলি করতে হ'ত এখন শ্রম-বিনিময় ব্যবস্থায় সৈন্যদের সাহায্যে সে কাজ সম্পন্ন হয় পনের দিনে। চাষীর ফসল আর বেশি জাপ-দস্যুদের খপ্পরে পড়তে পারে না। এই ব্যবস্থায় অনেক অনাবাদী জমি চাষেরও সুব্যবস্থা হয়েছে এবং সৈন্যদের সঙ্গে জনসাধারণের মৈত্রীবন্ধন সুদৃঢ় হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ "সিঙসিয়েন" জিলার উল্লেখ করা যেতে পারে।—১৯৪০-এ জাপ-দস্যুরা ফসল কাটার সময় এই জিলা আক্রমণ ক'রে ১৩৮৪ জন চাষীকে হত্যা করে, ৬৬৭৯ পিকাল্‌স্ ফসল এবং ৪৬৬টি গরু-ঘোড়া লুট ক'রে নেয়। কিন্তু শ্রম-বিনিময় ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হবার পর ঐ জিলার ফসল কাটার সময় জাপ-দস্যুরা মাত্র ৪৮ জনকে হত্যা করতে পেরেছে, ২৪৭ পিকাল্‌স্ ফসল ও ৮৩টি গরু-ঘোড়া লুট ক'রে নিতে সক্ষম হয়েছে; কারণ জাপ-দস্যু আসার অনেক পূর্ব্বেই ফসলের অধিকাংশ মাঠ থেকে তোলা হয়েছে। এই জিলার লোক সংখ্যা ৯৫,০০০। ১৯৪০-এ সৈন্যদের সাহায্যের জন্য এসেছিল মাত্র ২,৪০০, কিন্তু ১৯৪৩-এ এই সংখ্যা এসে দাঁড়ালো ২৬,০০০-এ। এই জিলার অধিবাসীরা বুঝেছে যে সৈন্যেরা তাদেরই আপন জন, তাই তাদের সঙ্গে জাপ-দস্যুর বিরুদ্ধে খণ্ড লড়াইতে অংশ গ্রহণ করতেও এরা এগিয়ে আসছে—১৯৪০-এ সে রকম খণ্ড লড়ায়ের সংখ্যা ছিল ২৪৫। কিন্তু ১৯৪৩-এ সে সংখ্যা হ'য়ে দাঁড়ালো ৩,১০০। আর শ্রম-বিনিময় ব্যবস্থায় ফসল উৎপাদন এমন ভাবে বেড়েছে যে জাপ-দস্যুদের লুটের পরও চাষীর ভাগ্যে খাদ্য-সামগ্রী অতীত দিনের তুলনায় অনেক বেশি জুটছে।

সংক্ষেপে, প্রান্তীয় গভর্ণমেণ্টের শাসনে জনসাধারণের অবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে—এই অঞ্চলের দুর্ভিক্ষে খাদ্য-সামগ্রীর অভাব আজ অতীত দিনের ইতিহাস; খাদ্য-

সামগ্রীর দিক থেকে এই অঞ্চল আজ আত্ম-নির্ভরশীল। তাই এ অঞ্চলে না আছে বেকার সমস্যা, না আছে পথে ঘাটে ভিক্ষুকের দল। প্রায় দু'লক্ষ একর অনাবাদী জমিতে ফসল ফলানো হয়েছে, "ফসল বাড়াও" আন্দোলনে সাহায্য করছে ছাত্র, সৈনিক, সরকারী কর্ম্মচারী, ব্যবসাদার, কেরানী প্রভৃতি। এই জন্যই এই অঞ্চলের চীনবাসীরা সুদীর্ঘ আট বৎসর যুদ্ধের ফলেও দমেনি—দেশরক্ষার পুরোধায় তারাই আজ দাঁড়িয়ে।

উত্তর-পশ্চিম চীনে গণতন্ত্রের প্রসার ও জনসাধারণের জীবিকার সংস্থান—এই দুই কার্য্যেই কমিউনিস্টদের শক্তি সীমাবদ্ধ থাকেনি। জনসাধারণের শিক্ষার দিকেও তারা বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে। অবশ্য সে শিক্ষা হচ্ছে জনসাধারণের জীবনযাত্রার পথে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের কার্য্যকরী শিক্ষা। এ শিক্ষার মধ্যে রয়েছে জাপ-প্রতিরোধের জন্য সামরিক শিক্ষা, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জাতি-সমস্যা সমাধান কি ভাবে করা যেতে পারে তার শিক্ষা, মেয়েদের শিক্ষা, সাধারণ বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সাহিত্য প্রভৃতি। ফলে আজ ইয়েনান নতুন সভ্যতা, নতুন সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে চীনবাসীর নিকট এ শহরটি ছিল অজ্ঞাত, আর আজ উত্তর-পশ্চিম চীনের এই ছোট্ট শহর ইয়েনান সমগ্র চীনের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র।

ইয়েনানের সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনার মূলে রয়েছেন 'চাঙসার' বৃদ্ধ শিক্ষক "সু-তেহ-লি"র অক্লান্ত পরিশ্রম। সোভিয়েট-চীনের তিনিই ছিলেন শিক্ষা-সচিব—পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তিনি কমিউনিস্ট হন। তাঁর আগমনের পূর্ব্বে উত্তর শেনসিতে মাত্র ১২০টি স্কুল ছিল—অবশ্য এই স্কুলে শিক্ষার কোন সুব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু "সু-তেহ-লি"র নেতৃত্বের ফলে ১৯৩৯-এর শেষভাগে এই উত্তর শেনসিতে আমরা দেখি ৭৭৩টি প্রাইমারী স্কুল, ৭৮টি আদর্শ প্রাইমারী বিদ্যালয় এবং ১৬টি উচ্চ প্রাইমারী স্কুল। ১৯৪১-এ প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা বেড়ে ১৩৪১-এ এসে দাঁড়াল। কুয়োমিনটাং-শাসিত অঞ্চলের যে কোন প্রদেশের তুলনায় এই অঞ্চলের জনশিক্ষা অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছে। পূর্ব্বে শেনসি অঞ্চলে মাত্র সিয়ান শহরেই ছিল উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা। কিন্তু এখন ইয়েনানেই রয়েছে চারটি হাই স্কুল, তিনটি কলেজ, হাতে কলমে শিক্ষার জন্য একটি শিল্প-সমবায়ের স্কুল, একটি টেকনিক্যাল স্কুল এবং একটি কলাভবন। এই কলাভবনটি সমগ্র চীনে যত কলাভবন আছে তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ভারতের ন্যায় চীন দেশেও সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমস্যা রয়েছে এবং সে-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা কুয়োমিনটাং করতে পারেনি, পেরেছে কমিউনিস্টরা। আমাদের ধারণা চীন দেশে একটি জাতিরই বাস, কিন্তু ভারতের ন্যায় চীন দেশও বহুজাতির দেশ। চীনে রয়েছে উত্তর-পশ্চিম চীনের মুসলিম, তিব্বতী, মঙ্গোলিয়ান, মাঞ্চুরিয়ান এবং আদিম অধিবাসীদের মধ্যে লোলোস ও মিয়াওস। এদের জাতি-সমস্যা উপেক্ষা করার নয়। কমিউনিস্টরা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে এদের সবাইকে জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধের সংগ্রামে একত্রিত করেছে। এদের সমস্যা আলোচনা, এদের সংস্কৃতির বিকাশের জন্যে ১৯৪০-এর শেষ ভাগে ইয়েনানে স্থাপিত হয়েছে "সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিদের বিদ্যায়তন।" এই বিদ্যায়তনের ছাত্র-ছাত্রীসংখ্যা ৫০০। এই ছাত্রছাত্রীদের ভিতর আছে মুসলিম, তিব্বতী, মঙ্গোলিয়ান, মাঞ্চুরিয়ান, লোলোস এবং মিয়াওস। এই বিদ্যায়তনের শিক্ষাকোর্স দু'ভাগে বিভক্ত—

সাংস্কৃতিক শিক্ষা এবং রাজনৈতিক-সামাজিক শিক্ষা। প্রথম ভাগে ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়; দ্বিতীয় ভাগে শিক্ষা দেওয়া হয় মার্ক্সবাদ। জাতি-সমস্যা ও চীন-বিপ্লবের বিভিন্ন সমস্যার উপর বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে মার্ক্সবাদ শেখানো হয়। শিক্ষার বাহন হিসাবে বিভিন্ন জাতির নিজ নিজ ভাষাকেই ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই সমস্ত শিক্ষার মূলে রয়েছে সেই এক স্বর: "জাপ আক্রমণ প্রতিরোধে আমরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবো।" এই বিদ্যায়তনে দু'বৎসর শিক্ষা দেওয়া হয়। ভর্ত্তির সময় প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে অঙ্গীকার করতে হয় যে, শিক্ষা সমাপনান্তে নিজ নিজ প্রদেশে গিয়ে প্রত্যেকেই ফ্যাশিস্টবিরোধী সংগ্রামকে তীব্রতর ক'রে তুল্‌বে।

"একমাত্র সশস্ত্র জনগণই জাতীয় স্বাধীনতার যথার্থ শক্তিস্তম্ভ হতে পারে"—লেনিনের এই উক্তির সার্থকতা আমরা দেখি চীনের কমিউনিস্টদের কার্য্যকলাপে। আজ চীনের কোটি কোটি নরনারী বিশ্বাস করে যে, জাপানের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়ের আশা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে কমিউনিস্ট-বাহিনীর উপর। কমিউনিস্টরা-ই সমস্ত জনগণকে জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত ক'রে তুলছে। এই প্রস্তুতির প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে ইয়েনানের "প্রতিরোধ বিশ্ববিদ্যালয়" (বা জাপ-বিরোধী সামরিক-রাজনৈতিক বিদ্যায়তন)। চীন ভাষায় এই বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হয় "কাঙটা"। ইয়েনানেই "কাঙটা"র কেন্দ্রীয় কলেজ স্থাপিত, আর তার ছ'টি শাখা আছে জাপ-অধিকৃত অঞ্চলের বিভিন্ন সীমান্তে। ইয়েনানের কলেজের ছাত্রসংখ্যা ২০০০, আর ছ'টি শাখার ছাত্রসংখ্যা হচ্ছে ৮০০০। ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত ইয়েনানেই ছিল একমাত্র কলেজ এবং সে-কলেজে প্রবেশলাভের জন্য চীনের সমস্ত প্রদেশ থেকে ছাত্রছাত্রী আস্‌তে আরম্ভ করে, কিন্তু কুয়োমিনটাঙের শাসক-সম্প্রদায় ইয়েনান-গামী ছাত্রছাত্রীদের পথিমধ্যে গ্রেফ্‌তার ক'রে নিজেদের "লেবর-ক্যাম্পে" বন্দী ক'রে রাখ্‌তে থাকে। এ জন্য কমিউনিস্টরা স্থির করে যে, ইয়েনানের সীমানার বাহিরে জাপ-অধিকৃত অঞ্চলের সীমান্তে "প্রতিরোধ-বিশ্ববিদ্যালয়ের" শাখা স্থাপন করা হবে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনের যুবক-যুবতীরা পায় রাজনৈতিক ও সামরিক শিক্ষা। রাজনৈতিক শিক্ষার মূল কথা অবশ্য কমিউনিজম্‌; কিন্তু কমিউনিস্টদের আদর্শ ও কর্ম্মপন্থার সঙ্গে সম্মিলিত ফ্রণ্ট ও সান্‌-মিননীতির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যারও ব্যবস্থা রয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে টেকনিক্যাল সামরিক শিক্ষা বাদে আর যে শিক্ষা ছাত্রছাত্রীরা পায় তার প্রধান কথা হ'ল—"আমাদের সৈন্য-বাহিনী হচ্ছে সশস্ত্র রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনাকল্পে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাফল্য-মণ্ডিত করবার জন্য একটা প্রতিষ্ঠান। আর রাজনৈতিক নেতৃত্বই বৈপ্লবিক বাহিনীর প্রেরণা, চিন্তাধারা, জীবনযাত্রা ও কর্ম্মধারার উৎস। সৈন্যগণ জনগণেরই হাতিয়ার, সৈন্যবাহিনী আর জনসাধারণ একই পরিবারের সভ্য—পরস্পরের সুখ-দুঃখের তারা অংশীদার। আমাদের বাহিনীর দৃষ্টি সর্ব্বদা নিবদ্ধ থাকবে জনগণের স্বার্থের দিকে।"

"কাঙটার" পর ইয়েনানের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে "মু'টা"—মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়। ২০৯টি গুহায় এই বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। ছাত্রীসংখ্যা ৪০০-এর উপর—তন্মধ্যে আছে বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন প্রদেশের মেয়ে। শানটুং, হোনান, হোপেই, সানসি, কিয়াংসু, শেচুয়ান, শেনসি, কোয়াংটুঙ, হুনান, হুপেই, মাঞ্চুরিয়া থেকে, এমন কি সুদূর চিংহাই ও সিকিয়াং থেকেও মেয়েরা এসে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছে।

ছাত্রীদের মধ্যে শতকরা ৬০জন ১৯ থেকে বিশ বছরের; আর বাকী সব ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। এদের অধিকাংশই অবিবাহিতা। যুদ্ধের সময় বিভিন্ন প্রদেশের মেয়ে নিয়ে দেশের এক কোণে এ রকম একটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করা সত্যই বিস্ময়জনক। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে কি ভাবে শত বাধাবিঘ্নের মধ্যে জাপ-অধিকৃত অঞ্চলের শতশত মাইল অতিক্রম ক'রে এই সব মেয়েরা এসেছে ইয়েনানের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-লাভের জন্য। শিক্ষার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা না থাকলে এ অসম্ভব। পৃথিবীর নারী জাগরণের ইতিহাসে এই রকম দৃষ্টান্ত বিরল।

এই সব ছাত্রীদের অধিকাংশই শ্রমিক-কৃষকের মেয়ে; আর বাকী সব এসেছে মধ্য-শ্রেণী থেকে—অবশ্য দু'চারজন যে ধনিকশ্রেণী থেকে আসেনি, তা নয়। কিন্তু শিক্ষার দিক থেকে এরা বিভিন্ন স্তরের—এদের ভিতর খুব অল্প সংখ্যকেরই আছে নিজ নিজ প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা; কেহ কেহ প্রাইমারী স্কুল থেকে উত্তীর্ণ হ'য়ে মধ্যস্কুলে শিক্ষালাভ করছিল, কিন্তু অধিক সংখ্যকই হচ্ছে, উচ্চ প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষায় শিক্ষিত। তাই "য়ু'টা"র শিক্ষা ব্যবস্থায় রয়েছে তিনটি স্তরবিভাগ।

প্রথম স্তরে দেখি যারা লিখতে পড়তে জানে না। তাদের জন্য আছে বিশেষ ক্লাশের ব্যবস্থা—এখানে তারা শেখে চীনের ভাষা, সামাজিক সমস্যা, স্বাস্থ্যনীতি, রাজনৈতিক ও সামরিক সাধারণ জ্ঞান এবং কমিউনিস্ট পার্টির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। তারপর এক বছর পর এদের মধ্যে যারা উন্নত হয়েছে তাদের প্রমোশন দেওয়া হয় দ্বিতীয় স্তরের ক্লাশে—সেখানে তারা শিক্ষা পায় সামাজিক ইতিহাস, অর্থনীতি, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সমস্যা, সান্-মিননীতির তিন প্রস্তাব, সামরিক সমস্যা, জন-স্বাস্থ্যের সমস্যা এবং প্রাথমিক দর্শনশাস্ত্র। এই দ্বিতীয় স্তরের পর হ'ল উচ্চতর রিসার্চ্চ ক্লাশ। প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষা যারা সমাপ্ত করেছে বা ঐ শিক্ষার সমপর্য্যায়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যাদের আছে তারাই এই রিসার্চ্চ ক্লাসে যোগ দিতে পারে। এই ক্লাশে ছাত্রীদের সাধারণতঃ শিখতে হয় অর্থনীতি, মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদ, দর্শনশাস্ত্র, দেশবিদেশের বিপ্লবের ইতিহাস এবং একটি বিদেশী ভাষা। এ ছাড়া সাহিত্য, সঙ্গীত, বুক কিপিং, সর্টহ্যাণ্ড, জার্নালিজম্, সেলাই প্রভৃতি শিখবারও ব্যবস্থা রয়েছে। এই ক্লাসে কতকগুলি বাঁধাধরা বুলি শিখিয়ে দেওয়া হয় না। এখানে এমনভাবে ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রদেশে বা জাপ-অধিকৃত অঞ্চলে ফিরে গিয়ে সমবায়-সমিতি পরিচালনা, শিক্ষা বিস্তার, প্রচার কার্য্য এবং রাজনৈতিক কার্য্য সুষ্ঠুভাবে করতে পারে।

এই তিনটি ক্লাশের সাথে সাথে চীনের সামাজিক সমস্যা এবং মহিলা আন্দোলন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া হয়। এই সব ক্লাশের মূলে রয়েছে মার্ক্সিস্ট দৃষ্টিভঙ্গী। চীনের কোনো প্রদেশেই মেয়েদের এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা দেখা যায় না। যদিও কমিউনিস্ট কর্ম্মীরা এই শিক্ষাব্যবস্থাকে যথোপযুক্ত মনে করে না—তাদের মতে এ হ'ল যুদ্ধকালীন শিক্ষা মাত্র—তবুও এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত এবং এর উদ্দেশ্য কতগুলি পি, এইচ, ডি উপাধিধারিণী সৃষ্টি করা নয়। অবশ্য উত্তর শেনসিতে মেয়েদের শিক্ষার জন্য যে কোনো প্রকারের বিদ্যালয় স্থাপনই হচ্ছে সামাজিক জীবনে বিপ্লবের সৃষ্টি করা। কারণ কমিউনিস্টদের আগমনের পূর্ব্বে এই অঞ্চলের

মেয়েদের গরুভেড়ার ন্যায় ভাড়া দেওয়া হ'তো এবং পুরুষেরা ঘরে বসে বসে সেই ভাড়ার টাকা গুনতো। সেই উত্তর শেনসির একটি শহরে, ইয়েনানেই আজ মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রেণীনির্ব্বিশেষে সমস্ত মেয়েদেরই প্রবেশ-অধিকার আছে। কিন্তু প্রবেশের জন্য চাই সবল স্বাস্থ্য, জীবনযাত্রায় সহযোগিতার মনোভাব এবং নারীজাতির মুক্তির জন্য জাতীয় সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার দৃঢ় সঙ্কল্প। অবশ্য প্রবেশলাভের প্রথম সুবিধা পায় শ্রমিক-কৃষকের মেয়েরা, জাপ-বিরোধী কার্য্যে নিযুক্ত মেয়েরা আর যারা জাপ-অধিকৃত অঞ্চলের সীমান্তে অবস্থিত সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা পেয়েছে তারা; কিন্তু ছাত্রীরা অধিকাংশই কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যা নয়। বিদ্যালয়ে এমন ব্যবস্থা আছে যাতে প্রয়োজনবোধে অতি সহজেই ১০০০ ছাত্রীরও শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। ছাত্রীদের ভিতর মৈত্রীবন্ধন শুধু সুদৃঢ় নয়, আদর্শস্থানীয়—তাদের নৈতিক চরিত্র আমেরিকার যে কোনো মেয়ে স্কুলের নৈতিক চরিত্র থেকে উন্নত।

বিদ্যায়তনে, খেলাধুলা, ড্রিল, ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত রয়েছে। বিদ্যায়তনের প্রধান দরজা বেয়নেটধারী মেয়ে-শান্ত্রী দ্বারাই সুরক্ষিত। ছাত্রীরা নিজেরাই তাদের খাদ্যদ্রব্যের কিয়দংশ উৎপন্ন করে—বিদ্যায়তনের অদূরবর্ত্তী উপত্যকায় প্রত্যেক ছাত্রীকে প্রতিদিন ভোরবেলা ২ ঘণ্টা চাষ-আবাদের কাজ করতে হয়। থাকা, খাওয়া, বই-র দাম, পড়ার খরচ সমস্তই গভর্ণমেণ্ট দেয়—ছাত্রীদের শুধু আন্‌তে হয় নিজ নিজ বিছানা ও জামা-কাপড়। ছাত্রীদের মধ্যে বিবাহিতার সংখ্যা অল্প। বিবাহিতার মধ্যে যাদের ছেলেমেয়ে আছে তারা সেই সব ছেলেমেয়ে নিয়েই বিদ্যায়তনে আসে। এই সব ছেলেমেয়েদের লালন-পালনের ব্যবস্থাও আছে এবং সে-কাজ ছাত্রীরা নিজেদের মধ্যে ভাগ ক'রে নিয়ে সম্পন্ন করে।

এই বিদ্যায়তনে শিক্ষালাভের পর অধিকাংশ ছাত্রীই চলে যায় গ্রামে গ্রামে শিক্ষা বিস্তারের মহান ব্রত নিয়ে। আর বাকী যারা থাকে তাদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট অংশ চলে যায় তাদের নিজ নিজ গ্রামে বা শহরে সেখানকার গণ-সংগঠন পরিচালনা করতে। আবার ছাত্রীদের একটি অংশ এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে সামরিক শিক্ষার জন্য "প্রতিরোধ-বিশ্ববিদ্যালয়ে" ভর্ত্তি হয়। অবশ্য এদের ভিতর অনেকেই partisan warfare-এ বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছে।

এই হচ্ছে "হু'টা"—এডগার স্নো'র মতে মেয়েদের এরকম বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর আর কোথাও নাই। তিনি এই বিদ্যায়তনকে আখ্যা দিয়েছেন "College of Amazons."

ইয়েনানের শিক্ষা-ব্যবস্থার আর দু'টি জিনিস উল্লেখযোগ্য—মেডিক্যাল কলেজ এবং সায়েন্স কলেজ, মেডিক্যাল কলেজটি দু'ভাগে বিভক্ত—একটিতে ডাক্তারী শিক্ষা দেওয়া হয়, আর একটিতে শিক্ষা দেওয়া হয় কি ভাবে ঔষধ তৈরী করতে হয়। সায়েন্স কলেজটিও দু'ভাগে বিভক্ত—প্রস্তুতির ক্লাশ এবং কলেজ। প্রস্তুতির ক্লাশে পড়ানো হয় বীজগণিত, বিশ্লেষণমূলক জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং ইংরেজী—দু'বছরে এই কোর্স শেষ করা হয়। কলেজে আছে চারটি বিভাগ—জীববিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, মণিকবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা। প্রত্যেকটি বিভাগেই বিশেষজ্ঞ হবার ব্যবস্থা রয়েছে। কলেজের আবার আছে তিনটি ফ্যাক্টরী—(১) যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানা (২) কাঁচের কারখানা (৩) Alcohol-এর কারখানা।

এ ব্যতীত জীববিদ্যা-বিভাগে আছে একটি ফার্ম্ম। বিজ্ঞান শিক্ষার দিক থেকে ইয়েনানের কর্ত্তৃপক্ষ বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি—যুদ্ধকালীন অবস্থায় একটি বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা করা সহজ নয়। বিশেষ ক'রে যখন বই ও লেবরেটরীর সাজ-সরঞ্জাম ইয়েনানে আমদানী করা কষ্টকর। এ দিক থেকে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ইয়েনান কর্ত্তৃপক্ষের সামান্য প্রচেষ্টাও প্রশংসনীয়।

ইয়েনানের ডাক আজ শুধু শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; ইয়েনানের ডাক আজ গিয়ে পৌঁছেচে শিল্পী, লেখক, সঙ্গীতজ্ঞদের কাছে। তাই ইয়েনান আজ চীনের বিভিন্ন প্রদেশের শিল্পী, লেখক, সঙ্গীতজ্ঞদের মিলনক্ষেত্র। বিপ্লবী চীনের নতুন সংস্কৃতির গোড়াপত্তন হয়েছে ইয়েনানে। প্রাচীনকালে চীনের শিল্পীরা মিলিত হ'ত সুঙ, মিঙ এবং চিঙ সম্রাটদের রাজদরবারে। আজ তাঁরা মিলিত হচ্ছেন ইয়েনানের "লু-স্থন" কলাভবনে। চীনের নতুন সাহিত্যের অগ্রদূত ছিলেন "লু-স্থন"। সাধারণ চীনা জীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ, আর সমাজচেতনা ছিল অকৃত্রিম। চীনবাসীরা "লু স্থন"কে বল্‌তো চীনের গোর্কি। কমিউনিস্টরা তাঁর স্মৃতিকে স্মরণীয় করবার জন্য ইয়েনানের কলাভবনের নাম করেছে "লু-স্থন" কলাভবন। এই কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরা চীনে নতুন শিল্পকলা, নতুন সাহিত্য, নতুন সঙ্গীত, নতুন অঙ্কনবিদ্যার প্রবর্ত্তন করছে—তাদের প্রতিটি কাজে ফুটে উঠ্‌ছে জনসাধারণের অবস্থা। এদের চিত্রাঙ্কনে আমরা পাই কৃষকদের জীবনযাত্রার অভিব্যক্তি, এদের সাহিত্যে আমরা পাই জনগণের প্রতিরোধের সুর। এই প্রতিরোধের সুরের অভিব্যক্তি হচ্ছে কলাভবনের রচিত গানে ও নাটকে। 'মার্শাই' সঙ্গীতের রচয়িতার সমপর্য্যায়ভুক্ত "লু-চি"র "We are the people in oppression", "নী-এরে"র, "The March of the Manchurian Volunteers" এবং তেহ্‌হাঙসান গ্যেরিলাদের গান এনে দিয়েছে চীনবাসীর প্রাণে প্রতিরোধের দুর্জ্জয় প্রেরণা, নাটক রূপান্তরিত হচ্ছে গণ-নাট্যে, গ্রামে গ্রামে কলাভবনের প্রেরণায়ই গড়ে উঠেছে প্রতিরোধের গণ-নাট্য সঙ্ঘ।

বিভিন্ন প্রদেশের ৫০০ শিল্পী এসে সমবেত হয়েছেন এই কলাভবনে—ইয়েনানের পার্শ্ববর্ত্তী একটি গ্রাম পরিবর্ত্তিত হয়েছে শিল্পীদের কলোনিতে। শুধু চীনের যুবক-যুবতীদের কাছেই নয়, চীনের শিল্পীদের কাছেও ইয়েনান আজ প্রাণতীর্থ।

এই হচ্ছে ইয়েনান।

জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে এশিয়ায় বলশেভিকবাদ প্রচারের প্রধান ঘাঁটি,

কুয়োমিনটাং শাসকদের কাছে Cultural Banditry-র প্রধান কেন্দ্র;

আর চীনের কোটি কোটি জনসাধারণের কাছে নতুন জীবনধারা, নতুন সভ্যতা, নতুন সংস্কৃতি ও জাপ প্রতিরোধের কেন্দ্রস্থল।

এই ইয়েনানই আজ এনে দিয়েছে চীনের জনগণের জীবনে নতুন ঊষার আলো। তাই ইয়েনান আজ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে জনসমাবেশের প্রধান কেন্দ্র।

সুধাংশু দাশগুপ্ত

বিজিত

দূর থেকেই আজ তাঁকে জানালাম নমস্কার। দূর থেকেই এতদিন দেখে আস্‌ছি, এ দেখাও সম্ভবত অনেককালের জন্যেই আজই শেষ হয়ে এল।

সেলের আঙ্গিনার উন্মুক্ত দ্বারের মাঝখানে বসে চেয়ে আছেন উনি আমাদের দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে। মুখে তাঁর কৌতুকময় হাসি, কাঁচাপাকা গোঁফদাড়ির মাঝেও সে হাসি উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ। তাই লোকটি আমার কাছে প্রথম দিন থেকেই একটা বিস্ময় হয়ে আছেন।

লৌহবলয় আর লৌহদণ্ডগুলি বাজছে ঝন্ ঝন্ ঝন্। সমবেত অনেকগুলি ভাঙ্গা বেড়ির কারাসঙ্গীত। আমাদের প্রায় পঞ্চাশ জন লোকের পায়ে পায়ে বাজছে এই অপূর্ব্ব সঙ্গীতের ঐক্যতান। সেলের দ্বারপ্রান্তে উপবিষ্ট লোকটি আমাদের এই ঐক্যতানেই কৌতুক বোধ করছেন।

দূরে আর একজোড়া বেড়ি বেজে উঠল। নির্জ্জন কক্ষ থেকে বের ক'রে আনা হচ্ছে রূপেশচন্দ্রকে। মাথার উপরে ঝুটিবাঁধা দীর্ঘচুল, মুখে ঘন কালো তরল দাড়ি গোঁফ, সুন্দর সুগঠিত দেহ রূপেশচন্দ্রের পায়ের বেড়িতে আর লৌহদণ্ডে উঠছে যে ঝঙ্কার, তাতে মনে হয় এমনি ক'রেই ওঠে বুঝি বীর বিদ্রোহীর রণসঙ্গীত।

জয় সচ্চিদানন্দ! সাবাস্—জীতা রহো! সেলের দ্বারপ্রান্ত থেকে শব্দ উঠল। চেয়ে দেখলাম ওই লোকটির মুখে চোখে যেন একটা অপূর্ব্ব আনন্দের হাসি ফেটে পড়ছে।

কামারশালার দ্বারে গিয়ে ভিড় ক'রে দাঁড়ালাম। তখনো ঠিক ঠিক বুঝতে পারিনি, সেদিন অপরাহ্নে কেন আমাদের এ আহ্বান। শুধু অনুমান করছিলাম, জেলখানার শাসন-না-মানা, সরকার সেলামে অস্বীকৃত অনমনীয় দুর্দান্ত এই বন্দীদলের এখানকার অবস্থানকাল হয়তো শেষ হয়ে এল।

সত্যিই তো! কামারশালার বাটালির ঘা' হাতুড়ীর আঘাতে পড়তে লাগল আমাদের পায়ের বেড়ির ওপর। ক'দিন আগে যে বেড়ি এই কামারশালায়ই পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই কামারশালায়ই আবার তা' কাটা হচ্ছে। তা' হলে সত্যিই এখান থেকে যাত্রা আমাদের আসন্ন—আজই। ওই প্রৌঢ় নবাগত বন্দীর সঙ্গে, পণ্ডিতজী বলে দূর থেকে যিনি আমাদের সঙ্গে নীরব পরিচয় স্থাপন করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আর হল না অথচ তাঁকে জানবার কতো না ছিল কৌতূহল!

কর্ম্মশেষের ঘণ্টা অনেক আগেই বেজে গেছে। বন্দীরা হাত মুখ ধুয়ে ফিরে এসে সারি বেঁধে বসে আহারও সেরেছে, এবার ব্যারাকে ব্যারাকে প্রবেশের পালা। কিন্তু আজ সমস্ত রাজবন্দীরা বুঝি ব্যারাকে প্রবেশ করবে না, তারা এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে আমাদের। ঘিরে দাঁড়িয়েছে আমাদের অভিনন্দন জানাতে নয়, বিদায় অভিনন্দনেও মানুষের মুখে ফুটে উঠে না এমন একটা অব্যক্ত বেদনা, কাতর বিমর্ষতা; অভিনন্দনে কারো দু'চোখে টল টল করে না অশ্রুরাশি, মুখের হাসিতে দেখা দেয় না আর্ত্ততা। তাদের সমস্ত বেদনা দলভাঙ্গার। এ দল ভাঙ্গা হচ্ছে নিশ্চয়ই কঠোর শাসনে এদের বাগে আনবার জন্য।

এতদিন যারা ছিলাম অগ্রবর্তী, যারা ছিলাম বয়স্ক, আমরা এগিয়ে গেছি ওদের সামনের অভিশাপ মাথা পেতে নিতে। সবকিছুর দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করেছি, পায়ে শিকল পরেছি, পিঁজরায় আবদ্ধ থেকেও ওদের প্রাণে জাগিয়ে রেখেছি সাহস, প্রতিক্ষণে নীরব ভাষায় মুখর হয়ে ওদের আমরা জানাচ্ছিলাম, আমরা আছি। কিন্তু আজ?

১৯৩০ সালের সে অপূর্ব্ব বিদায়বেলাটি আজও ভুল্‌তে পারিনি—এই পনর বছরের ব্যবধানেও। এমনিই আরো কয়টি বিদায়লগ্ন আমার জীবনে জীবন্ত গাঁথা হয়ে আছে। সে-বেদনাময় স্মৃতি আমাকে আনন্দ দেয়, আর আনন্দ দেয় ওই বন্দী কিশোরদের পরম আত্মীয়তা। তাদের প্রণাম, তাদের আলিঙ্গন, অশ্রুসজল ভাষাহীন প্রাণের আবেদন, লোকাচার-শিষ্টাচার নয়—এ যেন নবযুগের জাগ্রত মানুষের বেদনার বাণী। মনে হয়, তাঁর উদ্দেশ্যে গেয়ে উঠি—

দেশ দেশ নন্দিত করি,
মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ
আসন তব ঘেরি'।

বালক অমল এসে প্রণাম ক'রে কাছে দাঁড়াল, তার মাথাটি সস্নেহে কোলের কাছে টেনে নিলাম। তার চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল দীপ্ত কিন্তু তার ঠোঁট দু'টি আবেগে কাঁপছে। সে বল্‌লে, তার মধুর কম্পিত কণ্ঠে প্রাণের সমস্ত দৃঢ়তা ঢেলে দিয়ে, আমরা সরকার-সেলাম কিছুতেই দেব না।

এ কি আমরা বড়রা ছেড়ে যাচ্ছি বলে অভিমান না দৃঢ়সঙ্কল্পের প্রতিজ্ঞাবাণী। বল্‌লাম, নিশ্চয়ই না, সেলাম আমরা দেব না। আমরা তো সেলাম দিতে আসিনি অমল, আমরা এসেছি দেশের মানুষকে সেলাম না-দেওয়ার শিক্ষা দিতে, দেশ থেকে এই আত্মসমর্পণর আনুগত্যের নিদর্শনটি তুলে দিতে।

দূরে কার খড়মের শব্দ বেজে উঠ্‌ল, খট্ খট্ খট্। কে? ফিরে চাইলাম। এই তো সেলের সেই পণ্ডিতজী আসছেন। খোলা গা'। মাথায় ঝাঁকড়া কাঁচাপাকা দীর্ঘ চুল, মুখে বিশৃঙ্খল বড়ো বড়ো দাড়ী গোঁফ। চোখে যেন আরক্ত ভ্রূকুটি। অধর-ওষ্ঠ দৃঢ়সম্বদ্ধ। আধ ময়লা জেলের ধুতি কোমরে কাছুনি মেরে আঁটসাট ক'রে পরা। পায়ে খড়ম। কাছে এসেই দুই বাহু উর্দ্ধে তুলে উচ্চারণ করলেন, জয় সচ্চিদানন্দ।

পণ্ডিতজীকে নমস্কার করলাম, বললাম, আমরা চল্‌লাম পণ্ডিতজী! তিনি আবার বললেন হাসিমুখে, জয় সচ্চিদানন্দ! কুছ চিন্তা নেহি গোবিন্দবাবু!

আমি বাধা দিলাম, আমার নাম বিমল!

পণ্ডিতজী বাংলা ও হিন্দীতে মিশ্র এক অদ্ভুত ভাষায় বল্‌লেন, নেহি, নেহি, বিমল কি, নির্ম্মল শুদ্ধ তো আমরা সবই আছি। আপ গোবিন্দবাবু। গোবিন্দ-সারথি।

পাশে বন্ধু দাঁড়িয়েছিলেন, তিনিও নমস্কার করলেন। পরিচয় দিলাম—কিন্তু পণ্ডিতজী বাধা দিলেন, আরে এ তো আচ্ছা নয়? ও সনাথবাবু—সনাথ।

পণ্ডিতজী—পণ্ডিত গঙ্গাদয়াল দীক্ষিত। কবে কোন অতীত দিনে পশ্চিমের রায় বেরেলি অঞ্চল থেকে এই অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ সন্তান আমাদের দেশের শহরে—দূরবর্তী পার্ব্বত্য

অঞ্চলের কোন এক চা-বাগান বহুল স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ছোটখাট ব্যবসা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন। কিন্তু এই লোকটি অর্থোপার্জ্জন করেছিলেন অতি সামান্যই—আর খ্যাতিও মোটেই নয়, তবে রাজদ্বারে কুখ্যাতি সামান্য অর্জ্জন করেন নাই। পণ্ডিতজী অদ্ভুত। কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক ছিল না, বাইরের থেকে তাঁকে কেউ জানবার সুযোগও কখনো পায়নি—এমনি স্বাভাবিককালে তিনি নিজেকে সাধারণ মানুষের মতোই দৈনন্দিন কাজে নিমগ্ন ক'রে রাখ্‌তেন—কিন্তু যখনই কোন আন্দোলনের জোয়ার আস্‌ত, স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের আহ্বান আস্‌ত, তখনই তিনি যেন অধৈর্য্য হয়ে উঠ্‌তেন। দিকে দিকে ছুটে বেড়াতেন কুলিমজুরদের মাঝে। বল্‌তেন, ডাক্ এসেছে, পরাধীন ভারতবাসীদের সাড়া তো 'দেনেই হোগা' ১৯২১-শে তাই করেছেন পণ্ডিত দেও শরণের সহচর ও সহকর্ম্মীরূপে। ১৯২২-শে জেল থেকে বেরিয়ে ১৯৩০ পর্য্যন্ত আর কোন সাড়া নেই, কারণ হয় তো কারো কোন আহ্বানও নেই। ১৯৩০-শে যেই আহ্বান আস্‌ল, অমনি পণ্ডিতজী হয়ে উঠ্‌লেন চঞ্চল। কুলীমজুরদের মধ্যে ছড়াতে লাগলেন বিদ্রোহের বাণী, আর তারই ফলে একদিন এসে অবরুদ্ধ হলেন কারাগারে।

সন্ধ্যার পরক্ষণে আমাদের যাত্রা শুরু হল। দল বেঁধে লটবহর কাঁধে-বগলে ক'রে ব্যারাকগুলির পাশ দিয়ে আমরা ১১ জন চলেছি গেটের দিকে। তৃতীয় শ্রেণীর ৪০ জন আগেই বেরিয়ে গেছেন, কারণ তাঁরা পৌছবেন রেলওয়ে স্টেশনে পায়ে হেঁটেই। আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিজাত—যাব মোটরে চড়ে। আজ আর আমাদের পায়ের বেড়ি বাজছে না, মনে হচ্ছে, কতো না দুর্ব্বহ ভার নেমে গেছে। পাশেই ব্যারাকগুলিতে শব্দহীন কয়েদী জনতা, বেড়ার ফাঁক দিয়ে শত শত চক্ষু আঁধারে দৃষ্টি মেলে আছে আমাদের দিকে। আমরা যেন স্পষ্ট তাদের দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছি; তার মধ্যে কতগুলো চোখ বেদনার অশ্রুতে ভরে আছে।

গেটের বাইরে দু'সারি অস্ত্রধারী পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, বন্দুকের মাথায় সঙ্গীন চড়িয়ে। হাসি এল, আমাদের জন্যে এ বিপুল আয়োজন, অথচ আমরা স্বেচ্ছায় ধরা দিই, সাগ্রহে কারাবরণ করি!—কিন্তু শুধু এ অস্ত্রসজ্জাই নয়, আমাদের জন্যে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন-সজ্জাও অপেক্ষা করছিল। হাতে পরলাম লৌহবলয়, কোমরে রজ্জুর বাঁধন আর দু'জন আর পাঁচ জনকে একটি ক'রে একই বন্ধনে জুড়ে দেওয়া হল।

জেলার এগিয়ে আস্‌লেন, চোখে মুখে তাঁর এক কৃত্রিম নম্রতা। তিনি বল্‌লেন, কি করব, উপরালার আদেশে আপনাদের দূর দেশে পাঠাতে হল।

তিনি একটু থাম্‌লেন, আমরাও রইলাম নির্ব্বাক।

জেলার আবার বল্‌লেন, তবে যেখানে যাচ্ছেন, সেখানে ভালই থাক্‌বেন।

এবার কৃপেশচন্দ্র তার বলিষ্ঠ সুঠাম দেহখানি খাড়া ক'রে তুল্‌লেন। জেলখানার সবগুলি কঠোর শাস্তিও তাঁকে ভেঙ্গে দিতে পারেনি। তেমনি তাঁর তেজ ও নির্ভীকতা। কৃপেশচন্দ্র বল্‌লেন, হ্যাঁ, ভালই থাক্‌ব। আমি ওখানকার কথা জানি। আমরা সম্ভবতঃ পশুর রাজ্য থেকে মানুষের রাজত্বে যাচ্ছি।

জেলার মুখ ফিরালেন। তাঁর মুখেচোখে কুটিল ভ্রূকুটি ফুটে উঠল কি না দেখতে পেলাম না।

ভেতরের দিকের গেটের ছোট দরজার ফোকর দিকে একখানা মুখ উঁকি মারল,—পণ্ডিতজীর কাঁচাপাকা চুল-দাড়ি-গোঁফে ভরা মুখ। তারপর তাঁর সমস্তটি দেহ ভেতরে এসে ঋজু হয়ে দাঁড়াল, পায়ে সেই খড়ম, সেই খালি গা, মুখে সেই জয় সচ্চিদানন্দ!

দু'জন ওয়ার্ডার অতিকষ্টে টেনে নিয়ে এল পণ্ডিতজীর বোঝা—প্রকাণ্ড সে বোঝা—শিল নোড়া থেকে আরম্ভ ক'রে বাল্‌তি ঘটী পর্য্যন্ত তাঁর গৃহস্থালীর অনেক কিছু আছে তাতে—আর আছে নৈমিত্তিক হোমের উপাদান।

রেলওয়ে ষ্টেশনে যাবার পথে নদীর খেয়া ঘাটে আর রেলওয়ে ষ্টেশনে বিরাট সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর মাঝেও পণ্ডিতজীর এই প্রকাণ্ড শিলনোড়ার ভারী বোঝা টানতে হয়েছিল পুলিসের ছোট সাহেবকে। নইলে পণ্ডিতজী তাঁর সঙ্গে রজ্জুতে গ্রন্থিবাঁধা আরো পাঁচজনের গতি বন্ধ ক'রে রাখেন। পথে যখন অন্য দলের ৪০জন বন্দী যাত্রী ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে মুক্ত অবাধভাবে ছুটাছুটি ক'রে বেড়াচ্ছিল আর আমরা তেমনি রজ্জুবদ্ধ ভাবে বসেছিলাম কামরার একপাশে ঠাসাঠাসি হয়ে, তখন সিপাই মাষ্টারকে পণ্ডিতজী বলছিলেন তাঁর কোমরের বাঁধ আরও শক্ত ক'রে বাঁধতে। হাতের কব্জীতে আবদ্ধ হাতকড়ি নেড়েচেড়ে বলছিলেন, আর কি হাতকড়ি নেই? তাঁর মনে হচ্ছে এ হাতকড়ি মরচে-ধরা হঠাৎ কখন ভেঙ্গে যাবে—তখন তাঁর মত ডাকু, ভেগে যেতে কতক্ষণ? ওই ৪০ জন ভিন্ন-স্থানের যাত্রী, ওদের সিপাহীরা বুঝেছে ওরা কখনো পালাবে না, পালায় না—আর আমাদের? পায়খানায় যেতে হলে তেমনি থাকি আমরা গ্রন্থিবাঁধা—রজ্জুর একদিক নিজেই সিপাহীর হাতে দিয়ে পণ্ডিতজী বলেন, জোরসে পাকড়ো। দ্বিতীয় দিনের ভোরে কোন একটি জংশনের খোলা ওয়েটিংরুমের ইঁটে বাঁধান ভূমিশয্যা থেকে উঠার পর সেই ষ্টেশন মাষ্টারের ভৎর্সনার পর যখন আমাদের কর্ত্তা সিপাহী সর্দ্দারটি আমাদের হাত-কোমরের বাঁধন মুক্ত করতে গেল তখন পণ্ডিতজী গম্ভীরমুখে মাথা নেড়ে বাধা দিতে লাগলেন এ প্রেমবন্ধন, লোহার কঙ্কন তাঁকে বড়ো মায়াপাশে বেঁধেছে।

নতুন দেশ, সত্যিই অপ্রত্যাশিতের দেশ, অভিনব। এখানকার প্রবেশ-দ্বারে পেলাম অভ্যর্থনা ও সহৃদয়তা। ভিতরে বহু রাজবন্দী আছেন সারি বেঁধে নবাগতদের অভিনন্দন জানাবার জন্যে। আমরা অভিভূত হয়ে পড়লাম। এরা এতখানি স্বাধীন। রান্নাশালে তখন তাড়াহুড়া পড়ে গেছে, আমাদের একটা কিছু খেতে দিতেই হবে। দু'জন রাজবন্দী ইঁদারা থেকে পাম্প ক'রে রিজার্ভারে জল তুলতে লেগে গেছেন। আমাদের তাড়াতাড়ি স্নান করতে হবে। আমাদের স্বদেশবাসী সেখানকার পুরাতন প্রবাসীরা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছেন, কিন্তু আমরা উত্তরে একটি প্রশ্নই করছি, এ কি বন্দীশালা? রাত্রে ব্যারাকে যখন দস্তরমত সভা ক'রে আমাদের অভিনন্দন জানান হল, তখন নবাগতদের পক্ষে আমিই বলেছিলাম, উত্তর দেবার ক্ষমতা এখনও অর্জ্জন করিনি। এখনো ভাবছি, এটাও তো রাজার তৈরী একই মেসিন? আর আমাদের দেশের মানুষই তো সবগুলি মেসিন চালাচ্ছে, তবে এ প্রভেদ কেন?

পরদিন একটা নতুন চিন্তা শুধু আমারই নয়, নবাগত সবার মনই ভারাক্রান্ত ক'রে তুলল। এখানকার কারা-প্রাচীরাবদ্ধ জগতে অবাধ গতিবিধি আর নিরুপদ্রব সীমাবদ্ধ স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবর্ত্তে আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীরা কারা-আইনের সব-কিছুর কাছেই মাথা নুইয়ে

এসেছেন। এঁরা সেলামে আপত্তি করেননি। এই জেলের কর্তারা রাজবন্দীদের এমনি জয় করেছেন, আর রাজবন্দীরা? এঁরা বলেন, কংগ্রেসের নির্দ্দেশ—মহাত্মাজীর অনুজ্ঞা কারাবিধি ভঙ্গ করা চলবে না, সংগ্রাম আমাদের কারাগারের বাইরে, ভেতরে নয়।

কিন্তু আমরা যে সংগ্রাম ক'রে এসেছি? উচ্চকণ্ঠে গর্ব্বিত ভাষায় বলে এসেছি, না—তোমাদের শাসন মানব না, তোমাদের হুকুমে তোমাদের কাছে মাথা নোয়াব না? আমরা কি ভুল করেছি?

ওই অমল! কচি কোমল মুখে রাজ্যের দৃঢ় সঙ্কল্প টেনে এনে কম্পিত কণ্ঠে বলেছে, সেলাম আমরা কিছুতেই দেব না বিমলদা!

ছুটে চললাম পণ্ডিতজীর কাছে।

জেলের এককোণে একটি সেলে হয়েছে তাঁর স্থান আর খোলা মাঠে কিছুটা জায়গা জুড়ে তাঁর রান্না ও হোমের জায়গা। জায়গাটি ইতিমধ্যে চাঁছাছোলা পরিষ্কার হয়ে গেছে, সেখানে তৈরী হয়েছে একখানি চুল্লি। অগ্নিহোত্রী পণ্ডিতজী নিত্যস্নান ক'রে এসে ধুনি জ্বালিয়ে বসেন, আরম্ভ করেন হোম। ঘি-চিনি, নারকেল, বাদাম, পেস্তা আরো কত কি সেই ধুনির আগুনে পুড়িয়ে তবে পণ্ডিতজীর নৈমিত্তিক হোম সমাপ্ত হয়। তিনি হোম শেষে দাঁড়িয়ে ধুনিতে শেষবার ঘি ঢেলে দেন এক অদ্ভুত মন্ত্রে—বিনাশায় স্বাহা। এই মন্ত্রোচ্চারণ যদি যাদের বিনাশ-কামনায় নিত্য পণ্ডিতজী ক'রে থাকেন তাদের কানে পৌঁছত তা হলে নিশ্চয়ই পণ্ডিতজীর এ হোম বন্ধ হয়ে যেত, জেলকর্ত্তারা হোমের এতসব উপাদানও জোগাতেন না। হোম শেষে সুরু হয় তাঁর রান্না, তারপর সেখানে বসেই আহার ও অনুরক্ত মহান প্রসাদ-বিতরণ।

সেদিন গিয়ে দেখি, পণ্ডিতজী উত্তেজিত কণ্ঠে জমাদারদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তারই সাত গোষ্ঠীর শ্রাদ্ধ সপিণ্ডকরণের মন্ত্র আওড়াচ্ছেন। সে মন্ত্র বলছে, হতভাগ্য জীব! তুমি কয়েদীদের পেট নিংড়ে নিংড়ে নিজের ভুঁড়ি বাড়াচ্ছ, তুমি ডাকু, তুমি খুনি, ১৯২১ সালে পণ্ডিত দেওশরণকে হত্যা করেছ। তোমার পূর্ব্বপুরুষ মানুষ ছিল না। এ পুরুষে তুমি হয়েছ পশু, পরপুরুষে হবে ক্রিমিকীট।

জমাদারও একেবারে চুপ ক'রে ছিল না, সেও অবোধ্য কণ্ঠে দুর্বোধ্য গ্রাম্য হিন্দীতে চীৎকার ক'রে অনেক কিছু বলে যাচ্ছিল। তার বক্তব্য যতটুকু বুঝলাম, পণ্ডিতজী দেওশরণকে অনশনে উদ্বুদ্ধ করে নিজে আলু সেদ্ধ খেয়ে খেয়ে অনশন করতে লাগলেন, তাঁর মৃত্যুর জন্যে তিনিই দায়ী—ধড়িবাজ পণ্ডিতজী! বড়া ফেরেব্বাজ।

আমাকে মাঝে পড়ে এ দ্বন্দ্বযুদ্ধ থামাতে হল সত্য, কিন্তু মনটা একটুখানি ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ল। পণ্ডিতজীর প্রতি সারা অন্তঃকরণ ক্রমশঃ শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়ে উঠছিল কিন্তু—

কমলাকান্তও আজই বলেছেন, পণ্ডিতজী সোজা পাত্র নন।

শান্ত হয়ে বসে পণ্ডিতজী বললেন, কি খবর গোবিন্দবাবু!

আমি বললাম, আপনার খবর নিতে এলাম।

পণ্ডিতজী হোমদ্রব্যগুলি একটি পাত্রে মেশাতে মেশাতে বললেন, সেলাম তো দেনেহি হোগা গোবিন্দবাবু! সচ্ কি না? বিদ্রূপে তাঁর হাসি চৌচির হয়ে ফেটে পড়ল।

আমি কিছুক্ষণ থেমে প্রশ্ন করলাম, আমরা যদি দিই, আপনি কি করবেন?

দুইবাহু ঊর্দ্ধে তুলে পণ্ডিতজী বললেন, জয় সচ্চিদানন্দ !

দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল,—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে না, অথচ আইনতঃ তা ঘটতে বাধ্য। তিনি 'হেল্‌থ' পান করবেন তবে আমাদের অবস্থান কায়েম হবে। কিন্তু তিনি বিনা সেলামে কি ক'রে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন ? তাও তো আইন!

আমরা যেন কয়েকটি অবোধ শিশু। ক্রমাগত আমাদের বোঝান হচ্ছে, কতো নীতি-কথা, কতো কি উপদেশ, উচ্চ রাজনীতি, স্ট্র্যাটেজি, এক্সপিডিয়েন্সী কিছুই বাদ যায়নি।

দুর্দ্দমনীয় বিদ্রোহী রূপেশচন্দ্র এখন শান্ত, রোজ প্রভাতে উঠে কোমরে গামছা বেঁধে জলের পাম্পে গিয়ে হাজির হন, অবিরাম জল টানা চলে। বন্ধুবর সনাথবাবু তাসে আর গল্পগুজবে মশ্গুল। মাধববাবু আমার যুক্তিতেও বলেন, তাই তো ঠিক। আবার ওদের যুক্তি শুনেও বলেন, সত্যই তো। আমিও স্বভাবতই নিরুপদ্রব, শান্তিকামী, মাঝে মাঝে নীরবে ভাবি—কি প্রয়োজন আর হাঙ্গামায়। মনে মনে তাই ওদের যুক্তিগুলি আউড়ে যাই, মন্দ কি ! যুক্তিগুলি তো দুর্ব্বল বলে মনে হয় না।

আবার ভাবি, বৃটিশ সরকার যদি ভারতবাসীর জন্য সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারত, তাহ'লে কি চিরদিনই আমরা পরাধীন থেকে যেতে প্রস্তুত হতাম না ?

আমাদের অন্তরে চল্‌ছিল প্রচণ্ড সংঘর্ষ। আমাদের অতীত আর বর্ত্তমান জেল-জীবনের কঠোরতা-কোমলতায় বর্ত্তমানের কাছে আমরা ক্রমশঃ অজ্ঞাতেই যেন আত্মসমর্পণ কর-ছিলাম। বাধা ছিল শুধু, যাদের সেখানে রেখে এসেছি—যারা আজো হয় তো সইছে দারুণ নির্য্যাতন।

একজন বন্ধু এসে বললেন অফিস থেকে, সুখবর আছে বন্ধু ! সরকার 'সরকার সেলাম' তুলে দিয়েছেন।

জয়ের আনন্দে মুখ ভরে উঠেছিল, কিন্তু সব শুনে আবার বিমর্ষ হয়ে গেল।

বন্ধু বললেন, দ্বিতীয় বিভাগের বন্দীদের 'অপিসারস্ সেল্যুট' দিতে হবে। জমাদার হাঁকবে, অফিসারস্—স্যালুট্ ! আমরা শুধু হাত তুলে সরকারকে নয়, অফিসারদের অভিনন্দন জানাব।

কি পরিবর্ত্তন ! বাংলা ভাষা হয়েছে ইংরেজী, আর উচ্চারণ হয়েছে মূক, মনসা।

কিন্তু একদিন আমরা পরাজয় স্বীকার করলাম—সহস্র কঠোরতা, নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনার কাছে নয়, আরাম, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের কাছে।

জেলের ভিতরের গেট খুলে গেল, আমরা প্রবেশ করলাম অফিসগৃহে। ওই দূরে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বসে আছেন, দেশী পার্ব্বত্য সাহেব—খৃষ্টান। প্রশান্ত সৌম্য মূর্ত্তি।

জমাদার হাঁকলে, অপছার, সেলুট ! আমরা সেলাম জানালাম কপালে হাত ঠেকিয়ে। যাঁরা নিজেকে এ বলে প্রবোধ দিয়েছিলেন, আমি আগেভাগেই গুডমর্ণিং বলব, অথবা নমস্কার—তাঁরাও সকলেই সেলাম জানালেন। আমি যেন অপরাধ কিছু করিনি জোর ক'রে এ ভাবটুকু ফুটিয়ে তোলবার জন্যে সোজা হয়ে সরল দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কিন্তু মন আমার লজ্জায় আনত হয়েই রইল, আমার শক্তি ছিল না তাকে ঋজু ক'রে তোলার।

পণ্ডিতজী ছিলেন সকলের পিছনে। হঠাৎ জমাদারের হাঁক শোনা গেল, পণ্ডিতজী!

চেয়ে দেখলাম, পণ্ডিতজী তখনও দূরে গেটের কাছে একাকী দাঁড়িয়ে আছেন, চোখে মুখে তাঁর এক অদ্ভুত ভাব।

সাহেবের আহ্বানে ধীরে ধীরে পণ্ডিতজী এগিয়ে এলেন, পায়ের খড়ম বাজিয়ে, খোলা গায়ে, সংগ্রামশীল দৃপ্ত ভঙ্গীতে।

জমাদার আবার 'অপছার সেলুট' হাঁকতে যাচ্ছিল, সাহেবের ইঙ্গিতে বুটের গোড়ালি বাজিয়েই সে থেমে গেল।

সাহেব কিছুক্ষণ পণ্ডিতজীর দিকে চেয়ে রইলেন, পণ্ডিতজীও। আমরা সবাই নীরব।

স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে সাহেব বললেন, পণ্ডিতজী! নমস্কার! নমস্কার!

এই বার পণ্ডিতজী দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলে একটু দ্রুত এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, জয় সচ্চিদানন্দ!

সাহেব প্রশ্ন ক'রে জানতে লাগলেন, কোথায় কোন জেলায় পণ্ডিতজীর বাড়ি, এখন তিনি কোথায় থাকেন, কি করেন। উত্তর দিতে লাগলেন পণ্ডিতজী।

সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, কতদিন আছেন সেখানে?

পণ্ডিতজী বললেন, প্রায় তিরিশ বছর।

সাহেব বলে যেতে লাগলেন, পঁচিশ বছর আগে আমিও ছিলাম সে অঞ্চলে—তখন আমি নতুন এসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জন। একদিন সংবাদ পেলাম কুলিবস্তির পাশে এক বাজারে একজনের গৃহে একটি শিশু মৃত্যুশয্যায় শায়িত। রোগে তার চোখ দু'টিও যেতে বসেছে। লোকটি দরিদ্র—সম্বলহীন, ছেলেটিকে হাসপাতালে নিয়ে আসাও সম্ভব নয়। আমি ছুটে গিয়েছিলাম সেখানে—সে ছেলেটিকে বাঁচিয়েও তুলেছিলাম। জানি না সে ছেলেটি এখনো বেঁচে আছে কি না, আর তার বাবাই বা কোথায়। আপনি বলতে পারেন?

বেঁচে আছে, বেঁচে আছে সাহেব।—পণ্ডিতজীর দু'চোখ জলে ভরে এসেছে। তার দেহ যেন অকস্মাৎ নুয়ে পড়েছে। তিনি দু'হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকিয়ে ধরলেন, মুদ্রিত চোখে বলতে লাগলেন, সে বেঁচে আছে, আমিই তার বাবা, সাহেব! আমার—কম্পিত কণ্ঠে পণ্ডিতজী বলতে লাগলেন, নমস্তে, নমস্তে, নমস্তে।

সেদিন হোমাগ্নির সম্মুখে পণ্ডিতজীকে দেখলাম, আসন ক'রে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন, মুদ্রিত চোখে দরবিগলিত অশ্রুধারা, যুক্ত করে যেন তিনি কা'র কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী

পুস্তক-পরিচয়

সীমান্তের কবি

রুদ্র বসন্ত, ডিহাং নদীর বাঁকে, ভানুমতীর মাঠ, জলডম্বরু-পাহাড়, রক্ত-সন্ধ্যা, শেষ চূড়া। অশোকবিজয় রাহা। মীরা বাজার, শ্রীহট্ট।

অনেক কাব্য-সাধনার ইতিহাস অজ্ঞাত থেকে যায়। কবি-সাহিত্যিকদের জনপদ থেকে বহুদূরে অনেক স্বকীয় প্রতিভা দীপ্ত হয়ে উঠে অগোচরেই রয়ে যায় বিজ্ঞপ্তির সুযোগের অভাবে। কবি অশোকবিজয় রাহার 'রুদ্র-বসন্ত, ডিহাং নদীর বাঁকে' এবং বিশেষ ক'রে তাঁর শেষ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ পড়ে এই কথাই মনে হচ্ছিল। তিনি পূর্ব সীমান্তের কবি—শিলেট, শিলং-এর পাহাড় নদীবর্ম্মের কবি। আসলে, অশোকবাবুর কাব্য-সাধনার ধারা সমসাময়িক সকল সার্থক কবিদেরই কাব্য-সাধনার ধারা। কিন্তু তিনি তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল ও স্বতন্ত্র। তাই আজকের দিনে তাঁর কাব্যালোচনার সার্থকতা ও মূল্য অনস্বীকার্য্য।

রবীন্দ্রকাব্যের প্রভাব যে কালে অব্যবহিত ঐতিহ্য হিসাবে অনিবার্য্য, সে কালে আধুনিক কবি-কর্ম্মীর প্রথম কাব্য-প্রয়াসে রবীন্দ্রানুরণন সঙ্গত ও সম্ভব। কিন্তু অশোক-বিজয়ের কাব্যে রবীন্দ্রানুরণন ছাড়াও একটা নিজস্ব সুরের আভাস পাই 'রুদ্র-বসন্তে' বা বিশেষ ক'রে 'ডিহাং নদীর বাঁকে'তে; যেটা সার্থক পরিণতি পেলো তাঁর পরের কাব্য-গ্রন্থগুলিতে।

কবিকর্ম্মের দিক থেকে 'ডিহাং নদীর বাঁকে'ই সার্থকতর। কিন্তু তাঁর 'রাতের পাড়ি' কবিতাটি পর্য্যন্ত পাই, কি করে একটি অন্তরাশ্রয়ী মন বহিরাশ্রয়ী ও বস্তু-সচেতন হতে চলেছে একটা প্রাণবন্ত ও রমণীয় নৈসর্গিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে, তারই মনোজ্ঞ ইতিহাস। একটি কবি-জীবনের এই ইতিহাস সহানুভূতি নিয়ে অনুসরণ করার শ্রম সার্থক। কারণ কবির পরবর্ত্তী কাব্য-গ্রন্থে—'ভানুমতীর মাঠ'এ—এই অগ্রগতি অব্যাহতই রইল। দেখতে পাই, কবির মনের ভাব-চিত্রের সঙ্গে, শ্রাব্য ও দৃশ্য-চিত্রের শুভ পরিণয়ের ঘটকালী চলেছে নিরন্তর। প্রমাণস্বরূপ 'ভানুমতীর মাঠ' থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারলে খুশি হতে পারতাম। এখানে এসে অশোকবিজয়ের কবিজীবনের প্রথম পর্ব্ব শেষ হয়েছে মনে হয়।

কবির শেষ তিনটি বই—'জল-ডম্বরু পাহাড়', 'রক্ত সন্ধ্যা' ও 'শেষ চূড়া'য় দেখছি নতুন পর্ব্ব—এই গ্রন্থ কয়খানি তাই বিশেষ পর্য্যালোচনার অপেক্ষা রাখে। কারণ, এই কবিতাগুলির পটভূমিকা আমাদের জীবনে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। জার্ম্মানীর রাশিয়ার ওপর আক্রমণ এবং জাপানের বিশ্ব-রণাঙ্গণে অতর্কিত আবির্ভাব এই দু'টি ঘটনার পর বিশ্বের রণ-তন্ত্রীর তারগুলি এক প্রচণ্ড মোচড়ে নতুন সুরে বেজে উঠলো। কবিদের, ভাব-সমাধির বল্মীক-স্তূপ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসবার ডাক এলো। একটা গুরুতর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব নিয়ে তাঁরা হাজির হলেন নিপীড়িত মানব-সমাজের সামনে। এই সাধারণ সত্য আবার পূর্ব্ব সীমান্তের অধিবাসীদের কাছে একটা বাস্তব ও প্রত্যক্ষ সত্য হয়—যুদ্ধ-সীমান্ত ছিল তাদেরই

দুয়ারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে অশোকবিজয়-এর কবি-প্রতিভাকে সকলের সামনে তুলে ধরছি তাঁরই কবিতা-পংক্তি সামান্যভাবে উদ্ধৃত করে। পূর্ব্বের আলোচনার সূত্র ধরে বলতে হয়, কবির সমস্ত কাব্য-প্রয়াসের ভিতর দিয়ে একটা জিনিস খুব স্পষ্ট হয়ে উঠে আসে, তাঁর কাব্যে ধ্বনি-বর্ণবহুলতার একটা রসঘন মূর্ত্তি, Condensation ও intensity ফুটিয়ে তোলবার সাধনা।

"তোমার দেশে আজ এসেছি মেয়ে
এসেই দেখি বনের পাখা বৃষ্টি ঝেড়েছে।
কচি পাতায় সোনালী রোদ খিল খিল,
ডালিম গাছে কাঠবিড়ালীর ছুটোছুটি,
ঢালুর ঘাসে হরিণ শিশুর খেলা।"......(জল-ডম্বরু পাহাড়)

তারপর হঠাৎ এসে পৌছলাম "লাঙল-চষা মাঠে"—একটা নতুন সুরের আভাস ঃ

"দিনের শেষে পশ্চিমে যেই সূর্য গেলো পাটে
পথটা হঠাৎ শেষ হলো এই লাঙল-চষা মাঠে···
হাজার হাজার মজুর গেছে পথ কাটবার কাজে
হাজার হাজার সেপাই শান্ত্রী যাচ্ছে কুচকাওয়াজে।···
আমরা তবু ভেবে পাইনে কিছুই মাথা খুঁড়ে
হঠাৎ কী সব ভেল্কী হয়ে হাওয়ায় গেল উড়ে।···
কপাট দুটি জুড়ে গিয়ে অমনি হল আঁট
দেখা দিল সেই পুরোনো লাঙল-চষা মাঠ।—"

মনের অন্তঃপুরের সুখাসন ছেড়ে এবার বিচলিত মনে উঠে এসেছেন বাইরে—লিখছেন 'বজ্রলিপি'।

সোনার মেঘের গায়ে স্বপ্ন-গম্বুজ ধ্বসে যাবার পর মনোহর স্বর্মাভূমির কবি এক 'রক্ত-সন্ধ্যায়' এসে পৌছলেন, পৃথিবীর রণবিধ্বস্ত হৃদ্‌পিণ্ডের তাল যেন তিনি শুনতে পেলেন—দেশে যুদ্ধ এলো, কবির জীবনেও যুদ্ধ এলো। এক হিংস্র মোচড়ে কবির স্বর-সাধনায় এক চড়া নিখাদের সুর বেজে ওঠে ঃ

বাতাসে বারুদ-গন্ধ, চারিদিক ধোঁয়ায় ঘোরালো
হঠাৎ আকাশ হতে লাখে লাখে ঝরে
ছাতা-খোলা অসংখ্য মুখোস,
টিনে মোড়া কালো কালো মুখ
হাতীর শুঁড়ের মত নাক
অদ্ভুত খোক্কস্ মূর্তি!···
কারা এরা ?
প্রশ্ন থেমে যায়,···" (খোক্কস্ মূর্তি)

কিন্তু এই 'খোক্কস মূর্তি' প্রশ্নের ভিতর দিয়েই কবির এগুবার পথ। পৃথিবীর মানুষের বেদনার মধ্য দিয়ে, আর্ত্তনাদে কাঁপা ধ্বংসের প্রান্তর ও বহু মরুনদী পেরিয়ে কবি উত্তীর্ণ হলেন এক 'কলকণ্ঠ' মুখরিত নতুন দেশে যেখানে—

"আবার নূতন হাতে ঝল্‌কাবে নূতন লাঙল
নূতন ফসল,
লাফ দিয়ে দেখা দেবে মাঠের আকাশ
নূতন প্রাণের ছন্দে নেচে যাবে নূতন হাতুড়ি
সমুদ্রের তীরে তীরে।...
সেদিন বন্দরে যত কাজের চাকায়
লেগেছে খুশির পাখা,
দ্বন্দ্ব নেই জীবনে ও কাজে,
হালে হাত, পালে হাওয়া, তালে তালে নেচে যায় দাঁড়
চারিদিকে কলকণ্ঠ হাসে,
দু' দিকের ঢেউ কেটে কেটে
দূর সমুদ্রের জলে ভেসে যায় মানুষের গান।"

তারপর কবিকে দেখা গেল ভোরের প্রথম আলো-লাগা গন্তব্যের 'শেষ-চূড়া'তে। 'শেষ-চূড়া' কবিতাটি অপেক্ষাকৃত বড়। তাই আমার কাছে অনেক পংক্তি কবির কাব্য সাধনায় সার্থক ও উজ্জ্বল বলে মনে হয়েছে। এই কবিতাটিতে পাহাড়ের শেষ চূড়ায় ওঠবার দুঃসাহসিক প্রয়াস ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অদ্ভুতভাবে ফুটে উঠেছে,—ফুটে উঠেছে এগিয়ে চলার উদগ্র ছন্দ :

মুহূর্তে দুচোখ জ্বলে ওঠে
ঐ চূড়া—ঐ তো সে চূড়া...
আকাশে উঠেছে ঐ চিরজয়ী মানুষের গান
চারিদিকে করতালি বাজে···
হঠাৎ হাওয়ার ফুঁয়ে লাল সূর্য আরো লাল হলো
লাল চূড়া রক্ত-রঙে জ্বলে
চারিদিকে শত শঙ্খ বাজে..."

এর পর 'শেষ-চূড়া'র অন্য দু'টি কবিতা—'সিন্ধু ঈগল' ও 'চিরজীবি' থেকে উদ্ধৃতির প্রয়োজন ততটা নেই। কারণ 'শেষ-চূড়া'র সুরটাই Dominant melody-রূপে সবটাকে ছেয়ে রয়েছে। তবে এটা নিঃসন্দেহেই বলা যায়, অশোকবিজয়ের কাব্য-সাধনা সার্থক হয়েছে। তাঁর সিদ্ধির পথে শুধু কবিদেরই নয়, সমস্ত দেশেরই মঙ্গল। অশোকবিজয়ের কাব্য-প্রতিভাকে অভিনন্দিত করছি। এবং বহুদূর থেকে এই শক্তিশালী কবি-কর্মীর দিকে একজন সহ-কবিকর্মী হিসাবে সানন্দে হাত বাড়াচ্ছি।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

পরিচয়ের নিবেদন

আশ্বিন সংখ্যা প্রায় ছাপা শেষ হচ্ছে, এমন সময় কাগজ নিয়ন্ত্রণের নূতন আদেশ প্রকাশিত হল। পাঠক দেখ্‌তে পাবেন, স্থানাভাবে আমরা পরিচয়ের কয়েকটি নিয়মিত বিভাগ এ সংখ্যায় বাদ দিতে বাধ্য হয়েছি—'সংস্কৃতি-সংবাদ' ও 'পত্রিকা-প্রসঙ্গ' এবার নেই, 'পুস্তক-পরিচয়'ও নিতান্ত ক্ষুদ্র। আমরা জানি, পরিচয়ের এই সব আলোচনা পাঠকগণের বিশেষ প্রিয়। 'পরিচয়' যে দায়িত্ব পালন করতে চায় তা'তে এসব বিভাগ আবশ্যিক বলেই আমরা গণ্য করি। কাগজ নিয়ন্ত্রণের আদেশ নূতন যে সুবিধা দিচ্ছে তাতেও আমাদের ইচ্ছা ও বাঙালী সংস্কৃতি-অনুরাগীদের প্রয়োজনানুরূপ আমরা আয়োজন করতে পারব না। আগামী কার্তিক সংখ্যার বিশেষ ব্যবস্থার কথা অন্যত্র বিজ্ঞাপিত হয়েছে। সেই শারদীয় সংখ্যার জন্য আমরা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিশেষ কোনো সুবিধাই পাই নাই; লেখার দিক থেকেই সংখ্যাটি বিশিষ্ট হবে। এবং সেই সংখ্যা থেকেও কোনো কোনো বিভাগ তাই বাদ পড়বে। কিন্তু সেই সব বিভাগ পরবর্তী-সংখ্যায় যথাসম্ভব স্থান লাভ করবে, পাঠককে সেই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি। তা ছাড়া, কর্তৃপক্ষ সাধারণ ভাবে কাগজের বরাদ্দ বাড়িয়ে দিচ্ছেন, ভারত সরকারের বিশেষ ব্যবস্থায় নূতন নূতন মাসিক পত্রিকা প্রকাশেরও অনুমতি পাওয়া যাচ্ছে, তাই আমরা আশা করি—কাগজের ব্যাপারে যে অসুবিধা 'পরিচয়' ভোগ করছে, তা শীঘ্রই দূর হবে, আমাদের দায়িত্ব প্রতিপালনের পক্ষে এই বাধাও আর থাকবে না। ততদিন পর্যন্ত আমাদের এদিক্‌কার অক্ষমতাকে পরিচয়ের পাঠক-সমাজ মার্জনা করবেন। ইতি সম্পাদক।

পরিচয়

৪র্থ সংখ্যা

শারদীয়া সংখ্যা
কার্তিক, ১৩৫২

বাংলা ছন্দের শ্রেণী

'পরিচয়'-এর শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার মহাশয় জানতে চেয়েছেন ছন্দ সম্বন্ধে আমার ধারণা কি। বিষয়টি বৃহৎ, ছন্দের সমগ্র তথ্য নিয়ে কখনও মাথা ঘামাই নি, সেজন্য সবিস্তার আলোচনা আমার সাধ্য নয়। বৎসরাধিক পূর্বে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্গে ছন্দের শ্রেণী সম্বন্ধে পত্রযোগে কিছু আলাপ হয়েছিল। তাঁকে আমার মতামত যা জানিয়েছিলাম তাই এই প্রবন্ধের ভিত্তি।

ছন্দের মূল উপাদান মাত্রা এবং তাব বাহন syllable। সংস্কৃতে 'অক্ষর' শব্দে syllable ও হরফ দুইই বোঝায়, তা ছাড়া ইংরেজী আর সংস্কৃতের syllable একই রীতিতে নিরূপিত হয় না। এই গোলযোগের জন্য syllable-এর প্রতিশব্দ দরকার। প্রবোধবাবু 'ধ্বনি' চালিয়েছেন, কিন্তু এই সংজ্ঞাটিতে কিছু আপত্তি করবার আছে। Word যদি 'শব্দ' হয়, syllable যদি 'ধ্বনি' হয়, তবে sound বোঝাতে কি লিখব? ব্যাকরণে vowel sound, gutteral sound ইত্যাদির প্রতিশব্দ দরকার হয়। নূতন পরিভাষা স্থির করবার সময় যথাসম্ভব দ্ব্যর্থ পরিহার বাঞ্ছনীয়। বহুকাল পূর্বে কোনও প্রবন্ধে syllable-এর প্রতিশব্দ 'শব্দাঙ্গ' দেখেছিলাম। এই সংজ্ঞায় দ্ব্যর্থের আশঙ্কা নেই কিন্তু শ্রুতিকটু। সেজন্য এখন প্রবোধবাবুর 'ধ্বনি'ই মেনে নিচ্ছি। আশা করি পরে আরও ভাল সংজ্ঞা উদ্‌ভাবিত হবে।

ধ্বনি দুই প্রকার, মুক্ত (open) ও বদ্ধ (closed)। মুক্তধ্বনির শেষে স্বরবর্ণ থাকে, তা টেনে দীর্ঘ করা যেতে পারে, যেমন তু। বদ্ধধ্বনির শেষে ব্যঞ্জনবর্ণ বা ং ঃ বা দ্বিস্বর (diphthong) থাকে, তা টানা যায় না, যেমন উৎ, সং, তঃ, কই, সৌ। সংস্কৃতের দীর্ঘস্বরযুক্তধ্বনি এবং বদ্ধধ্বনি গুরু বা দুই মাত্রা গণ্য হয় (ধী, উৎ), এবং হ্রস্বস্বরান্ত মুক্তধ্বনি লঘু বা এক মাত্রা গণ্য হয় (ধি, তু)। ইংরেজীতে সংস্কৃতের তুল্য সুনির্দিষ্ট হ্রস্ব দীর্ঘ স্বর নেই, কিন্তু বহু শব্দে স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণের

জন্য গুরুধ্বনি হয় (fee)। বদ্ধধ্বনিতে যদি accent পড়ে তবেই গুরু নতুবা লঘু। বাংলা ছন্দের যে সুপ্রচলিত তিন শ্রেণী আছে তাদেরও মাত্রানিরূপণ এক নিয়মে হয় না। ধ্বনির লঘুগুরুতার মূলে কোনও স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক কারণ নেই, তা প্রচল বা convention মাত্র এবং ভাষাভেদে বিভিন্ন।

বাংলা ছন্দের শ্রেণীভাগ এইরকমে করা যেতে পারে—
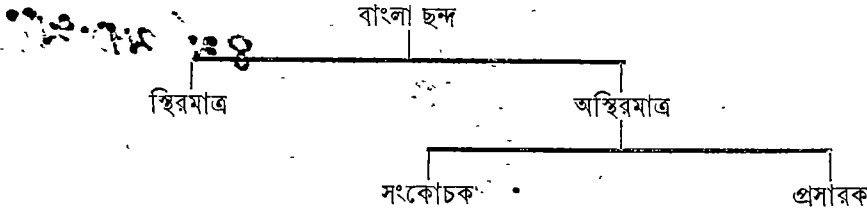
'স্থিরমাত্র'—যে ছন্দে ধ্বনির মাত্রা বদলায় না, যেমন বাংলা মাত্রাবৃত্ত। এতে মুক্তধ্বনি সর্বত্র লঘু, বদ্ধধ্বনি সর্বত্র গুরু। সংস্কৃতে দুই শ্রেণীর ছন্দ বেশী চলে, অক্ষরচ্ছন্দ (বা বৃত্ত) এবং মাত্রাচ্ছন্দ (বা জাতি)। এই দুই শ্রেণীই স্থিরমাত্র। সংস্কৃত মাত্রাচ্ছন্দের সঙ্গে বাংলা মাত্রাবৃত্তের সাদৃশ্য আছে, প্রভেদ এই যে, বাংলায় হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণভেদ নেই। ইংরেজী ছন্দকেও স্থিরমাত্র বলা যেতে পারে, কারণ তাতে accent-এর স্থান সাধারণত সুনির্দিষ্ট। সংস্কৃত অক্ষরচ্ছন্দের সঙ্গে ইংরেজী ছন্দের এইটুকু মিল আছে—ইন্দ্রবজ্রা মন্দাক্রান্তা প্রভৃতিতে যেমন লঘুগুরু ধ্বনির অনুক্রম সুনিয়ন্ত্রিত, ইংরেজী **iambus, trochee** প্রভৃতিতেও সেইরূপ।

'অস্থিরমাত্র'—যে ছন্দে ধ্বনির মাত্রা বদলাতে পারে। এর দুই শাখা—

'সংকোচক'—যে ছন্দে স্থানবিশেষে বদ্ধধ্বনির মাত্রাসংকোচ হয়, অর্থাৎ গুরু না হয়ে লঘু হয়, যেমন বাংলা অক্ষরবৃত্ত। মোটামুটি বলা যেতে পারে, এই শ্রেণীর ছন্দে মুক্তধ্বনি সর্বত্র লঘু, বদ্ধধনি শব্দের অন্তে গুরু কিন্তু আদিতে ও মধ্যে সাধারণত লঘু। 'হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ, অভ্রভেদী তোমার সংগীত'—এখানে -রাজ, -মার, -গীত গুরু, কিন্তু নিস্-, তব্- অভ্-,সং- লঘু। উক্ত নিয়মটি সম্পূর্ণ নয়, বহু ব্যতিক্রম দেখা যায়। 'বীরবর, ভারতমাতা' প্রভৃতি সমাসবদ্ধ শব্দে এবং 'জামরুল, মুসলমান' প্রভৃতি অসংস্কৃত শব্দে আদ্য ও মধ্য বদ্ধধ্বনির সংকোচ হয় না, গুরুই থাকে। এই ব্যতিক্রমের কারণ—যুক্তাক্ষরের অভাব। সে সম্বন্ধে পরে বলছি।

'প্রসারক'—যে ছন্দে বদ্ধধ্বনি সর্বত্র গুরু; আবার স্থানবিশেষে মাত্রা প্রসারিত ক'রে মুক্তধ্বনিকেও গুরু করা যায়। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান'—এখানে মাত্রাবৃত্তের তুল্য সকল বদ্ধধ্বনিই গুরু, অধিকন্তু 'পড়ে' আর 'এল'র শেষধ্বনিকেও টেনে গুরু করা হয়েছে।

সংক্ষেপে—স্থিরমাত্র (মাত্রাবৃত্ত) ছন্দে মুক্তধ্বনি সর্বত্র লঘু, বদ্ধধ্বনি সর্বত্র গুরু। সংকোচক (অক্ষরবৃত্ত) ছন্দে মুক্তধ্বনি সর্বত্র লঘু, কিন্তু বদ্ধধ্বনি কোথাও গুরু কোথাও লঘু। প্রসারক (ছড়াজাতীয়) ছন্দে মুক্তধ্বনি কোথাও লঘু কোথাও গুরু, এবং বদ্ধধ্বনি সর্বত্র গুরু।

এই ত্রিবিধ ছন্দঃশ্রেণীর মধ্যে মাত্রাবৃত্তের নিয়ম সর্বাপেক্ষা সরল, সেজন্য তার আর আলোচনা করব না। অন্য দুই শ্রেণী সম্বন্ধে কিছু বলছি।

'অক্ষরবৃত্ত' নামটি সুপরিচিত, শুনেছি প্রবোধবাবু এই নামের প্রবর্তক, কিন্তু সম্প্রতি তিনি অন্য নাম দিয়েছেন—'যৌগিক ছন্দ'। মাত্রাগত লক্ষণ অনুসারে একেই আমি 'সংকোচক' ছন্দ বলছি। 'অক্ষরবৃত্ত' নামের অর্থ বোধ হয় এই—এতে চরণের অক্ষর অর্থাৎ হরফের সংখ্যা প্রায় সুনিয়ত, যেমন পয়ারের প্রতি চরণে চোদ্দ অক্ষর, মাত্রা সমষ্টিও চোদ্দ। এই অক্ষরের হিসাবটি কৃত্রিম। ছন্দ কানের ব্যাপার, মাত্রাবৃত্ত ও ছড়ার ছন্দে পদ্যের লেখ্য রূপ অর্থাৎ বানান বা অক্ষরসংখ্যার উপর নজর রাখা হয় না, মাত্রাই একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু পদ্যকার যখন সংকোচক ছন্দ রচনা করেন তখন শ্রাব্য রূপ আর লেখ্য রূপকে পরস্পরের অনুবর্তী করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। শব্দ আর অর্থ সমান হলেও 'ঐ'এক অক্ষর, 'ওই' দুই অক্ষর, পদ্যকার সংখ্যার উপর দৃষ্টি রেখে 'ঐ' বা 'ওই' লেখেন। উচ্চারণ একজাতীয় হলেও স্থলবিশেষে শব্দের বানান অনুসারে মাত্রা বদলায় অথবা মাত্রার প্রয়োজনে বানান বদলায়। মাত্রাবৃত্তে 'শর্করা' আর 'হরকরা' দুইই চারমাত্রা, কিন্তু সংকোচক ছন্দে প্রথমটি তিন এবং দ্বিতীয়টি চারমাত্রা। 'সর্দার, বাগ্দেবী' তিন অক্ষর, কিন্তু মাত্রার প্রয়োজনে 'সরদার, বাগ্‌দেবী' লিখে চার অক্ষর করা হয়। যাঁরা পদ্যে 'আজও, আমারই' লেখেন তাঁরাও পদ্যে 'আজো, আমারি' বানান করেন, পাছে অক্ষর বাড়ে। পদ্যকার ও পদ্যপাঠক দুজনেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যুক্তাক্ষরের উপর দৃষ্টি রেখে মাত্রানির্ণয় করেন। এরকম করবার প্রয়োজন আছে এমন নয়। যদি বানান না বদলে 'সরদার'কে স্থানভেদে চারমাত্রা বা তিনমাত্রা করবার রীতি থাকত তবে পাঠকের বিশেষ বাধা হ'ত এমন মনে হয় না। কিন্তু যে কারণেই হ'ক রীতি অন্যবিধ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ 'ছন্দ' পুস্তকে ১৪৩ পৃষ্ঠায় একটি উদাহরণে লিখেছেন—'দিগ্দিগন্তে প্রচারিছে অন্তহীন আনন্দের গীতা।' তিনি প্রচলিত রীতির বশেই অক্ষরসংখ্যা ঠিক রাখবার জন্য 'দিগ্দিগন্তে' লিখেছেন, মাত্রাবৃত্ত লিখলে সম্ভবত 'দিগ্‌দিগন্তে' বানান করতেন।

অতএব শুধু কানের উপর নির্ভর ক'রে অক্ষরবৃত্তের সম্পূর্ণ নিয়ম রচনা করা চলে না, বানান অনুসারে (অর্থাৎ যুক্তাক্ষর ং ঃ ইত্যাদির অবস্থান অনুসারেও) করতে হবে। সেকালের কবিরা অক্ষরসংখ্যার উপর বিশেষ নজর রাখতেন না—'সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে সর্বনাশ। নীচ শূদ্র দিয়ে করে ধর্মের প্রকাশ ॥' (চৈতন্যচরিতামৃত)। এরকম পদ্য এখন লিখলে doggerel গণ্য হবে। বোধ হয় ভারতচন্দ্রের আমল থেকে মাত্রাসংখ্যা আর অক্ষরসংখ্যার সাম্য সম্বন্ধে পদ্যকারগণ সতর্ক হয়েছেন। সম্ভবত তাঁরা সংস্কৃত অক্ষরচ্ছন্দের আদর্শে এই সাম্যরক্ষার চেষ্টা করেছেন। হয়তো আর এক কারণ—পাঠককে কিছু সাহায্য করা। ইংরেজী পদ্যেও syllable-সংখ্যা ঠিক রাখবার জন্য miss'd, lack'd প্রভৃতি বানান চলে, যদিও কানে missed আর miss'd দুইই সমান।

যদি বাংলায় যুক্তাক্ষর উঠে যায় বা রোমান লিপি চলে, তা হলেও সম্ভবত বর্তমান রীতি অন্য উপায়ে বজায় রাখবার চেষ্টা হবে। 'সরদার' লেখা হবে sardar, কিন্তু মাত্রাসংকোচ বোঝাবার জন্য হয়তো 'সর্দার' স্থানে লেখা হবে sar'dar।

প্রবোধবাবু ছড়াজাতীয় ছন্দের নাম দিয়েছিলেন 'স্বরবৃত্ত', এখন তিনি তাকে 'লৌকিক ছন্দ' বলেন। শেষের নামটি ভাল, তথাপি মাত্রাগত লক্ষণ অনুসারে আমি এই শ্রেণীকে 'প্রসারক' বলতে চাই। প্রবোধবাবুর মতে 'এই ছন্দে সাধারণত প্রতি পঙ্‌ক্তিতে চার পর্ব (চতুর্থটি অপূর্ণ), প্রতি পর্বে চার ধ্বনি, এবং প্রথম ধ্বনিতে প্রস্বর (accent) থাকে।' শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁর ব্যাকরণে অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। উদাহরণ—'সামনেকে তুই ভয় করেছিস পেছন তোরে ঘিরবে।' আমি মনে করি, বাংলায় accent থাকলেও ছন্দের বন্ধনে তা অবান্তর। সাধারণত গুরুধ্বনি আর accent মিশে যায়। 'আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে' ইত্যাদি চরণে প্রথম ধ্বনি 'আ', পাঠকালে তাতে accent পড়ে না। '-কাশ'এ accent আছে বলা যেতে পারে, কিন্তু বস্তুত তা গুরুধ্বনি। 'প্রিয়নামটি শিখিয়ে দিত সাধের সারিকারে।…কালিদাস তো নামেই আছেন আমি আছি বেঁচে।' —এই দুই চরণের প্রথম ধ্বনি (প্রি-, কা-) তে accent দেওয়া যায় না। প্রতিপর্বে সাধারণত চার ধ্বনি তা স্বীকার করি। কিন্তু ব্যতিক্রমও হয় ('শিখিয়ে দিত, তিন কন্যে')। এইরকম ছড়াজাতীয় বা লৌকিক ছন্দের একটি লক্ষণ—শেষ পর্ব ছাড়া প্রতি পর্বে ছ' মাত্রা। কিন্তু অন্য শ্রেণীর ছন্দেও ছ' মাত্রা হতে পারে। অতএব এই ছন্দের বিশেষ লক্ষণ আর কিছু। এই লক্ষণ — মাত্রাপূরণের জন্য স্থানে স্থানে মুক্তধ্বনিকে টেনে গুরু করা। রবীন্দ্রনাথ 'ছন্দ' পুস্তকে লিখেছেন—'তিন গণনায় যেখানে ফাঁক, পার্শ্ববর্তী স্বরবর্ণগুলি সহজেই ধ্বনি প্রসারিত করে সেই পোড়ো জায়গা দখল করে নিয়েছে। 'বৃষ্টি পড়ে' ইত্যাদি ছড়ায় 'বৃষ্টি' তিন মাত্রা, শেষের এ-কার প্রসারিত করার ফলে 'পড়ে'ও তিন মাত্রা হয়েছে। এইরকম মাত্রাপ্রসার হয় বলেই এই শ্রেণীকে 'প্রসারক' বলতে চাই।

পদ্যকার বানানের উপর দৃষ্টি রেখে সংকোচক ছন্দ রচনা করেন, হয়তো তার এক কারণ. পাঠককে সাহায্য করা—এ কথা পূর্বে বলেছি। প্রসারকশ্রেণীর লৌকিক ছন্দেও স্থানে স্থানে ধ্বনির মাত্রা বদলায় কিন্তু চিহ্নাদির দ্বারা পাঠককে সাহায্য করবার চেষ্টা হয় নি। এর কারণ—সেকালে এই ছন্দ পণ্ডিতজনের অস্পৃশ্য ছিল, লিখে রাখাও হ'ত না, লোক অতি সহজে মুখে মুখেই শিখত।

রাজশেখর বসু

মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা ক'রব। আশা ক'রব মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে।…আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার পথে সকল বাধা অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হবে তার মহান মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।—রবীন্দ্রনাথ

কৃপাময় সামন্ত

রঘুনাথ বিশ্বাসের আমবাগানের পাশ দিয়ে আসার সময় কৃপাময় সামন্তের সামনে একটা সাপ পড়ল। সংকীর্ণ মেটে পথ, পাশের কচুবন থেকে লেজটুকু ছাড়া সবটাই প্রায় বেরিয়েছে সাপটার, হাত দুই সামনে। পথ পার হয়ে ডাইনে আগাছার জঙ্গলে গিয়ে ঢুকবে। বেশ বড় সাপ, কৃপাময়ের পদক্ষেপের স্পন্দন অনুভব ক'রে ত্রস্ত হয়ে উঠেছে, চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে যাবে। তবে সেই পলকের মধ্যেই লাঠির ঘায়ে ওটাকে মেরে ফেলা যায়। লাঠি উঁচু ক'রে কৃপাময় থেমে গেল। কেন, তা না জেনেই। নাতিকে মারবার জন্যে হাত তুলবার পর আপনা থেকে হাতটা যেমন তার শূন্যে আটকে যায়।

ভোরে সামনে দিয়ে, এত কাছ দিয়ে, সাপ চলে গেলে বোধ হয় কিছু হয়। মঙ্গল অথবা অমঙ্গল। কৃপাময় ঠিক জানে না। চলতে আরম্ভ ক'রে সে ভাবে, চুলোয় যাক, মঙ্গল অমঙ্গলের এসব ইঙ্গিত, সংকেত, নির্দেশ যে পাঠায় সেও চুলোয় যাক। সাপটাকে না মারবার জন্যে কৃপাময় মনে মনে আপশোষ করতে থাকে।

বাগান পেরিয়ে পুব পাড়ার বাড়িগুলি, কয়েকটা কাছাকাছি, কয়েকটা তফাতে তফাতে, এলোমেলোভাবে সাজানো। পাকা বাড়ি চোখে পড়ে মোট একখানা। চারিদিকে বর্ষার-পরিপুষ্ট জঙ্গল বাড়ির বেড়া ঘেঁষে, ঘরের ভিটা ছুঁয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

পাকা বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে নিমের দাঁতন চিবোতে চিবোতে ভূধর সরকার গুনে নিচ্ছিল মাচার লাউ।

'ছেলের চিঠি পেয়েছো নাকি হে সামন্ত ?'

রোজ সে এ প্রশ্ন করে। রোজ কৃপাময়ের পিত্তি জ্বলে যায়।

'আজ্ঞে না। চিঠি পাইনি।'

'এত বিলম্ব করে কেন চিঠি দিতে? চিঠিপত্তর লিখতে তো দেয় জেল থেকে। না স্বদেশী বলে কড়াক্কড়ি বেশি ?'

'কি জানি।'

ভূধরের বুক লোমবহুল, ভুরু ঘন লোমের মোটা আঁটি। সহানুভূতির সকাতর ধীর উচ্চারণে সে বলে, 'ছ্যাকো দিকি ব্যাপার। বলি, তুই একছেলে বাপের, তোর কি স্বদেশী করা পোষায়? কেন রে বাপু, বিয়ে থা করেছিস, ছেলে হয়েছে একটা, কাঁচা বয়েস বৌটার,—আঁ, কি বললে ?'

কৃপাময় কিছু বলেনি, নিজের মন ভূধরের কথা কয়েছে কৃপাময়ের হয়ে। এসব কথায় কৃপাময় মুখ ফুটে সায় দেয় না, আপশোষের আওয়াজও করে না, দুর্বোধ্য ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে মাথাটা শুধু একটু নাড়ে। ভূধর বোধ করে অস্বস্তি আর অপমান। একটু ক্ষোভ জাগে, রাগ হয়। তার যে মনে পড়েছে তার ছেলে একটা নয়, যোয়ান মদ্দ পাঁচ পাঁচটা ছেলে, এটা যেন কৃপাময়েরই ব্যঙ্গ করা তাকে। সে যাবে কৃপাময়ের একমাত্র ছেলের জেলে-যাওয়া নিয়ে আন্তরিক সহানুভূতি জানাতে আর তার মনে পড়বে তার পাঁচ পাঁচটা ছেলের কথা? কথা এসব লোকের সঙ্গে না বলাই ভাল।

কতদিন সে ভেবেছে কৃপাময়ের সঙ্গে কথা বলাব, গায়ে পড়ে যেচে কথা বলার স্বভাবটা ত্যাগ করবে, তবু যে কেন দেখা হলেই ওর সঙ্গে সে কথা কয়।

'মামলাটার কি হোলো সরকার মশায় ?'

এ প্রশ্ন তো করবেই কৃপানাথ। বড় ছেলে তার ঘুষের মামলায় পড়েছে, এখন সে মামলার কথা না তুললে ব্যঙ্গ সম্পূর্ণ হবে কেন। কড়া কথা ঠেলে আসে ভূধরের মুখে, বলতে ইচ্ছা হয়, তোমার বাহাদুরী রাখো সামন্ত—কিন্তু মুখেই আটকে যায় কথাগুলি। কেন কে জানে!

'চলছে। মামলা চলছে। সাজানো মামলা, ফেঁসে যাবে।'

কৈফিয়তের মত শোনায়, আবেদনের মত। তার ছেলে লোক খারাপ নয়, মামলা সাজানো। কৃপাময় বিশ্বাস করুক, মামলা সাজানো। থুতু ফেলার বদলে ভূধর ঢোঁক গিলে ফেলে। নিমের দাঁতনের জন্যেই নিজের থুতুটা বড় তেতো লাগে সন্দেহ নেই।

'ওরা খুব খুশি হয়েছে, না সামন্ত ? গাঁয়ের লোক ? খুব ঢাক পিটিয়ে বেড়াচ্ছে ?'

একথা ওকে আমি কেন জিজ্ঞেস করলাম, ভূধর ভাবে। কৃপাময়ও তো গাঁয়ের লোক। ওরা খুশি হয়ে থাকলে, কৃপাময়ও তো খুশি হয়েছে নিশ্চয়। এক মুহূর্তের জন্যে বড় অসহায় বড় করুণ দৃষ্টিতে ভূধর তাকায় কৃপাময়ের দিকে, সে যেন সারা গাঁয়ের বিরোধী মতের, শত্রু ভাবের, ঘৃণা ও হিংসার প্রতিনিধি হয়ে সামনে দাঁড়িয়েছে। কৃপাময় জবাব দেবার আগেই নিজেকে সামলে নিয়ে সে ধাতস্থ হয়। যে ভাবটা কেটে গেল তাকে তখন তার মনে হয় ক্ষণিকের জন্যে মাথাটা কেমন ঘুরে ওঠা। রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি, পেট গরম হয়েছিল। কেন যে বাড়ির সবাই খাও খাও ক'রে তাকে এত বেশি খাওয়ায়। আজ সাবধানে খাওয়া দাওয়া করতে হবে। দাঁত মেজেই স্বর্ণসিন্দুর খাওয়া চাই।

বিরক্তি চেপে ভেবেচিন্তে কৃপাময় জবাব দেয়, 'ঢাক পিটে বেড়াবে কে।'

শুনে ভূধরের মনে হয়, কৃপাময় যেন বলতে চায়, তোমার ছেলের কীর্তির কথা ঢাক পিটে রটাবার দরকার হয় না, সবাই জানে। কি আস্পর্দা লোকটার, এমনভাবে তার সঙ্গে কথা কয়, এমন ভাসা ভাসা উদাসীনভাবে, অবজ্ঞার সঙ্গে। আর নয়। আর একটি কথা সে বলবে না ওর সঙ্গে। লাই পেলে এরা বেড়ে যায়। কৃপানাথের দিকে প্রায় পিছন ফিরে ভূধর এবার মাটিতে থুতু ফেলে।

কৃপাময় একটু ইতস্তত করে। তার কি উচিত লোকটাকে একটু সাবধান করা ? ফল হয় তো কিছুই হবে না, তবু বলতে বোধ হয় দোষ নেই। দালানের ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মারছে এক জোড়া বুভুক্ষু চোখ, ভূধরের সেজ ছেলে সুরেশ। তাকিয়ে সে আছে দালানের দক্ষিণে বাপের বাঁধানো পুকুরঘাটে, যেখানে ছেঁড়া ন্যাকড়ায় কেউ কোনো মতে, কেউ শুধু খানিকটা লজ্জা ঢেকে এসেছে গাঁয়ের ক'জন মেয়ে, না এসে যাদের উপায় নেই, নিরুপায় হয়েও ক'দিন পরে হয় তো যারা আসতেই পারবে না।

'একটা কথা আপনাকে বলি সরকার মশায়।'

'হুম্।' ভূধর ফিরেও তাকায় না।

'আপনার ছেলেকে একটু সাবধান ক'রে দেবেন, ঘোষপাড়ায় যেন না যান। সবাই ক্ষেপে আছে ওরা, কি ক'রে বসে ঠিক নেই। বৌঝি নিয়ে টানাটানি ওরা সইবে না, এবার পাড়ায় গেলে হয়-তো—'

'কোন ছেলে? আমার কোন ছেলে বৌঝি নিয়ে টানাটানি করে?' গর্জন ক'রে ঘুরে দাঁড়িযে কৃপাময়ের দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে ঘাটে বৌঝিদের নাইতে ও জল নিতে এবং উপরের ধাপে বসে সুরেশকে সিগারেট ফুঁকতে দেখে ভূধর আবার নির্জীব হয়ে যায়।

'আপনি যদি কথা দেন ছেলেকে সামলাবেন, আমি ওদের বলতে পারি। নয় তো, আমি যদ্দূর জানি, ছেলে আপনার খুন হয়ে যাবে।'

'ছেলেটা গোল্লায় গেছে, সামন্ত।'

কৃপানাথের হাতের চাপে নরম মাটিতে লাটির ডগায় টোল পড়ে কয়েকটা। গোল্লায় যাক, চুলোয় যাক। খুন হয়ে ছেলেটার নরকে যাওয়া বন্ধ করার জন্যে কৃপাময় মনে মনে আপশোষ করে।

'ওকে শহরে পাঠিয়ে দেব আজকালের মধ্যে, মেজ ছেলের ওখানে।'

'সেই ভালো।'

পরামর্শ দিচ্ছে, উপদেশ! যেন মহাজন, যেন গুরুঠাকুর, যেন মাষ্টার! ভয় দেখাচ্ছে যেন পুলিসের দারোগা!

কৃপাময়কে সে কি ভয় করে? কোনো কারণ তো নেই ওকে তার ভয় করার! তার সম্পদ আছে, আত্মীয়বন্ধু আছে, লোকজন আছে, কৃপাময় গরীব, একা। ছেলের বৌ আর ছেলেমানুষ নাতিটা ছাড়া ওর কেউ নেই। ওর অর্ধেক জমি তার কাছে বাঁধা। ইচ্ছা করলে ওকে সে—

'চললে নাকি সামন্ত? একটা লাউ চেয়েছিলে, নেবে তো নিয়েই যাও আজ।'

'আজ্ঞে ঠিক চাইনি, তবে ত্থান যদি—'

'দশজনকে দিয়েই তো খাব হে। নইলে এত লাউ দিয়ে করব কি? ওটা নাও, বড়ও হবে, কচিও আছে।'

প্রথম সোনালী রোদ এসে পড়েছে মাটির পথে, মাঝে মাঝে গাছের ছায়া। বর্ষায় পরিপুষ্ট সবুজ গ্রাম। শ্যাম মাইতি আর গোকুল দাসের পোড়া বাড়ির কালো কাঠ, বাঁশ ছাই আজও স্তূপ হয়ে পড়ে আছে, বর্ষাও ধুয়ে নিয়ে যায়নি, নতুন কুটিরও ওঠেনি। কোথায় চলে গেছে ওরা, ফিরে এসে নিশ্চয় আবার ঘর তুলবে।

কৃপাময়ের বাড়ির কাছাকাছি সোনা জেলের বৌ কাতু এইটুকু একখানা মোটা কাপড়ে তার যৌবন-উথলানো তাজা দেহটা কতটা ঢাকল কেয়ার না ক'রে মাথায় মাছের চুপড়ি বসিয়ে তার নিজস্ব কোমরদোলানো ছন্দে হন হন ক'রে চলে, কৃপাময়কে পেরিয়ে গিয়ে থামে, ফিরে এসে আবার তার নাগাল ধরে।

বলে, 'খাসা লাউটি, বাঃ। কত নিলে গা?'

'সরকার মশায় দিলেন, কাতু।'

'ওমা, হাঁ নাকি? ছু'টি চিংড়ি দি তবে তোমাকে।'

চুপড়ি নামিয়ে একটা কচু পাতা ছিঁড়ে কাতু এক খাবলা চিংড়ি তুলে দেয়।

কৃপানাথ বলে, 'পয়সা নেই কাতু।'

কাতু বলে, 'পয়সা কিসের? তুমি মোর বাপ। তোমার ছেলে মোকে বাঁচালে মিলিটারী থেকে। তোমায় দুটি চিংড়ি দিয়ে পয়সা নোব? ধম্মে সইবে মোর?'

আরও কিছু চিংড়ি কাতু কচু পাতায় তুলে দেয়।

'ছেলে ছাড়া পাবে কবে গো সামন্ত মশাই ?'

'কতবার শুধোবি কাতু ? দেরী আছে, এখনো দেরী আছে।'

'মোকে বলবে, ছেলে কবে আসবে মোকে বলবে। ছেলেকে তোমার রুই খাওয়াবো, পাকা রুই, গোটা রুই আদমুনি। তোমার ছেলে যদি না মোকে বাঁচাত গো সামন্ত মশাই—'

কাতুর ওথলানো যৌবনের অশ্লীলতা পর্যন্ত যেন ঢেকে যায় তার চোখ-ছলছলানো মুখের মেঘে। এতক্ষণে কৃপানাথ একদণ্ড তার দিকে তাকাতে পারে।

'আয় তো কাতু, খানিকটা লাউ কেটেদি তোকে। দুটি প্রাণী, এ লাউয়ের আধখানাও খেতে পারব না।'

লাউয়ের ফালি নিয়ে কাতু চলে গেলে কৃপানাথ বলে ছেলের বৌকে, 'লাউ চিংড়ি তো রাঁধবে বাছা, তেল কি আছে ?'

'আছে একটুখানি।' বলে কৃপানাথের ছেলের ছেঁড়া সেলাই-করা গেঞ্জি গায়ে আর কোমরে ভাঁজ খোলা কাঁথার লুঙ্গি জড়ানো বৌ।

'তাই রাঁধোগে তবে।'

বৌ নড়ে না। চোখ তুলে একবার চায়, চোখ নামিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে কৃপাময়ের সামনে, গেঞ্জি পরা লুঙ্গি জড়ানো রোগা প্রতিমার মত। জলভরা চোখ দেখে কৃপাময়কে একটু ভাবতে হয়। লাউচিংড়ি রাধতে বলায় তার ছেলের বৌয়ের চোখে জল আসে কেন ? তার ছেলের কথা ভেবে ? ছেলে তার বিশেষ ক'রে লাউ চিংড়ি খেতে ভালবাসত বলে তো তার মনে পড়ে না। তাছাড়া, তার সামনে এ ভাবে দাঁড়িয়ে তার ছেলের কথা ভেবে বৌ চোখে জল আনত না, আড়ালে যেত।

শেষে বুঝতে পেরে কৃপাময় বলে, 'চাল বাড়ন্ত বুঝি মা ? তাই তো।'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পের স্থবিরাবস্থা নেই, এই পৃথিবীর মতোই সে প্রাচীনা অথচ চিরযৌবনা। মানব-প্রকৃতি বিশ্ব-প্রকৃতি এই দুয়েব মিলনে শিল্পের উৎপত্তি, সুতরাং তার গতি কোন দেশে কোন কালে বন্ধ হবার উপায় নেই। শিল্প যে এক কালের মধ্যেই বদ্ধ থাকবে তারও উপায় নেই। সৃষ্টির একটা অংশ শিল্প, বাতাসের-মতো জলধারার মতো মহাকালের সহচর হয়ে মানুষের ক্ষণিক জীবনের মুহূর্তগুলো বর্তমান থাকে, শিল্পকার্য মানুষের অন্তরের এবং বাহিরের প্রকৃতির সাক্ষী স্বরূপ, মুহূর্তে মুহূর্তে নতুন পথ চলতে হয়, নতুন কথা লিখতে হয়, অমৃতের পাত্র পরিপূর্ণ ক'রে দিতে হয় বাইরের এবং অন্তরের রসে। যদি স্থপতির শিল্প পাথরকে মাটিকে স্পর্শ করলে, ধুলো হ'ল মধুমান্—"মধুমান্ পার্থিবো রজঃ," গানের সুর লাগলো গিয়ে বাতাসে, বাতাস মধুময় হ'ল—"মধুবাতাঃ," শিল্প ভাবসিন্ধুতে রসসিন্ধুতে ডুব দিলে, লবণাম্বু সেও মধুর স্বাদ পেয়ে গেল—"মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।" শিল্প-প্রবৃত্তি অলৌকিক চমৎকারী কর্ম করতে প্রবৃত্ত করায় শিল্পীকে—বাইরে এনে ফোটাতে অন্তরের মধ্যে যে ফুল গোপন রয়েছে তাকে। চারিদিকের আবহাওয়ায় মধুমাস লাগে যখন ফুল ফল ধরে' আপনা হতেই তখন গাছের মধ্যে প্রবৃত্তি জাগে প্রকাশের। শিল্পবৃত্তি—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে

পণ্ডিচেরীর পর কলম্বো পৌঁছতে বোধ হয় একদিন লাগলো। পরদিন বিকেলবেলা জাহাজঘাট লোকে লোকারণ্য—শহরসুদ্ধু ভেঙে পড়েছে বিশ্বকবির আগমন সংবাদে। মালা-চন্দন, কর্পূর কিছুই বাদ পড়েনি। সমস্ত জনতার সামনে জগদ্বিখ্যাত দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ কবির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে—তুই বগলে তুই বালিশ। দূর থেকে এই দৃশ্য দেখে রবীন্দ্রনাথ ও আমরা তিনজন হেসে আর বাঁচিনে। কবি হাসেন আর বলেন, "একেবারে পাগল।"

এই বালিশের একটু ইতিহাস আছে। সাহেবের ছেলেমানুষীর এই গল্পটাও বেশ মজার। এণ্ড্রুজ সাহেবকে পুরো দেখতে পাওয়া যায় না তাঁর ভিতরকার এই পাগল শিশুটিকে না দেখলে। এই ঘটনাগুলির ভিতর দিয়ে তাঁর যে রূপটি ফুটে ওঠে তাইতেই বোঝা সহজ হয় যে, রবীন্দ্রনাথের কেন তাঁর প্রতি এত বিশেষ মমতা ছিলো। কবি অনেক সময়েই খুব স্নেহের সঙ্গে "ও আমার এক আচ্ছা পাগল" বলে সাহেবকে উল্লেখ করতেন, আর বল্‌তেন, "পাগল না হলে কখনও এমন ক'রে ভালোবাসতে জানে? ও আমাকে এত ভালোবাসে যে দরকার হলে আমার জন্যে বোধহয় প্রাণও দিতে পারে। ভিতরে একটা শিশু না থাকলে একরকম হওয়া যায় না।"

এইবার বালিশের গল্পটুকু বলি। আমরা যখন মান্দ্রাজ থেকে রওনা হই সাহেব ভয়ে ভয়ে এসে বল্লেন, "রানী, ট্রেনে ব্যবহারের জন্যে তু'টো বালিশ দিতে পারো? কলম্বো পৌঁছে তোমাকে ফিরিয়ে দেবো।" আমি সাহেবের স্বভাব জানি। ওঁর নিজের জিনিস পরের জিনিস কিছুই রক্ষা করবার ক্ষমতা নেই। অন্যলোকের জিনিস দরকারের সময় নিঃসঙ্কোচে উঠিয়ে নিয়ে আস্‌তে পারেন, আবার অন্যের প্রয়োজনে নিজের যথাসর্ব্বস্ব খুশি মনে বিলিয়ে দিতেও জানেন। কতোবার আলিপুরে আমাদের বাড়িতে থেকেছেন। বিদেশ যাবার সময় দরকার মতো সোডার বাস্কেট, খাবার সাজিয়ে বেতের বাক্স সঙ্গে দিয়েছি, কিন্তু কখনও সে সব জিনিস ফিরে আসেনি। এসে হাসিমুখে বলেছেন, "রানী, সব হারিয়ে ফেলেছি।" আমরা জানতাম উনি ঐরকমই পাগল, কাজেই যখন যা দিয়েছি তা আর ফিরে পাবার আশা রাখিনি। কবিও এই নিয়ে সাহেবকে খুব ঠাট্টা করতেন। একবার কোথা থেকে ফিরে এসে কবিকে খুব চমৎকার একটা রেশমি চাদর দিয়ে বল্‌লেন, "Gurudev, here is a lovely present for you"; গুরুদেব সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করলেন, "From where have you stolen it?" সাহেব হো হো করে হেসে উঠে বল্‌লেন, "সত্যিই তুমি ধরেছো। আমি যে কোথা থেকে এটা সংগ্রহ করেছি কিছুতেই মনে করতে পারছি না, তাইতো ভাবলাম তোমাকে দিয়ে দিই, আমার দোষ কেটে যাবে।" আমাদের উপস্থিত সকলের একটা হাসির খোরাক জুটলো।

কুন্থরে বিছানা-বিভ্রাটের পর সাহেব আমার কাছে একটু অপ্রস্তুত হয়েই ছিলেন, তাই পাছে আবার একটা অসুবিধা করেন মনে ক'রে ভয়ে ভয়ে বালিস চাইলেন। আমিও মজা ক'রে বল্‌লাম, "হ্যাঁ, বালিশ দিতে পারি কিন্তু আপনাকে কথা দিতে হবে যে, আপনি আমার অন্যান্য

জিনিসের মত এ দু'টো জিনিসও হারাবেন না। কারণ আপনারা বিলেত চলে যাবার পর আমরা যখন ক'লকাতামুখী হ'ব তখন ট্রেনের লম্বা পথে বালিশ না থাকলে কষ্ট হবে।" সাহেব তৎক্ষণাৎ স্বীকার করলেন যে কিছুতেই এবারে বালিশ হারাবেন না। সেই মান্দ্রাজের পর এই প্রথম কলম্বোর জাহাজঘাটে আমাদের দেখা। আমাকে দেখামাত্র "রানী, এই নাও তোমার বালিশ। বাবাঃ! এ'কয়দিন যে আমার কি ভয়ে ভয়ে কেটেছে, পাছে হারিয়ে ফেলি; কথা দিয়ে অবধি আতঙ্কে অস্থির হয়ে আছি পাছে কথা না রাখতে পারি। মান্দ্রাজ ছেড়ে অবধি যখন যেখানে গিয়েছি একমুহূর্ত্তও বালিশ দু'টো হাতছাড়া করিনি। গুরুদেব, এখন আমার ছুটি। Prasanta, I am mortally afraid of Rani. She is a tyrant. Now you have witnessed I have kept my promise? Oh! today I am free. You will never be able to imagine how I passed these last few days. Whereever I went I carried these pillows so that I may not lose them." আমাদের তো হাসি আর কিছুতেই থামে না। কবি হাস্‌তে হাস্‌তে আমাকে বল্‌লেন "রানী, তোমার একি অন্যায়। না হয় আর দু'টো বালিশ বাজার থেকে কিনেই নিতে। অনর্থক বেচারাকে এরকম কষ্ট দেওয়া কেন? এই বোধ হয় জীবনে ও প্রথম কোনো জিনিস রক্ষে করতে পেরেছে—বেচারা এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। সেই কুনুরের বিছানার পর থেকে সাহেব তোমার সম্বন্ধে কী সাবধানেই না চল্‌ছে। কিন্তু এটা তোমার ওর উপর খুবই অত্যেচার—ওর কাছ থেকে কথা নিয়েছ যে ও বালিশ হারাবে না? তোমাকে খুব ভয় না পেলে ও একথা রাখতে পারতো না।" কবি এইসব কথা বল্‌ছেন আর কেবলি হেসে উঠছেন। সাহেবের দিকে ফিরে বল্‌লেন, "Andrews, you are right. She is a tyrant, otherwise knowing you she would not have extracted such a cruel promise like this."

বালিশদুটোর ওয়াড় সাহেবের হাতে হাতে একেবারে কালো হয়ে গিয়েছে। অত গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে এণ্ড্রুজ কবিকে অভ্যর্থনা করতে এসেছেন বগলে দুই বালিশ। কী অপরূপ দৃশ্য!

বহুদিন পরে, প্রায় পাঁচবছর হবে, সাহেবের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে আমার দেখা। দেখেই প্রথম কথা, "Rani, do you remember those pillows?" আর সঙ্গে সঙ্গে সেই শিশুর মতো হা হা ক'রে হাসি। আমার সঙ্গে মিঃ এণ্ড্রুজের এইরকম সম্বন্ধই ছিলো—তাই তাঁর এই চেহারাটাই আমার মনে বেশি উজ্জ্বল হয়ে রইলো। এইসঙ্গে সাহেবের আরো একটা চেহারা মনে ছবির মতো বসে গেছে—যেদিন তাঁর মৃত্যুশয্যায় তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। কবি যে বল্‌তেন, "এণ্ড্রুজ যে আমাকে ভালোবাসে সে ভালোবাসার তুলনা নেই", সে কথা যে কতো সত্যি সেদিন তা বুঝেছিলাম। মৃত্যুর ঠিক দু'দিন আগে হাসপাতালে আমরা তাকে দেখতে গিয়েছি। দেখি যন্ত্রণায় মুখ প্রায় নীল হয়ে গিয়েছে, তবু আমাকে দেখেই হাত বাড়িয়ে দিয়ে শক্ত ক'রে হাতখানা ধরে বল্‌লেন, "Rani, tell me how is Gurudev. Ask him not to worry about me. Please go and stay with him and give this message of mine that I am all right". যন্ত্রণায় আর বেশি কথা মুখ দিয়ে বেরোলো না, নার্স আমাদের

ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে ইসারা কোরলো। দেখে অবাক হোলাম যে মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যেও সাহেব শুধু তাঁর "গুরুদেবের" কথাই ভাবছেন—তাঁর কি রকম কষ্ট হবে সেই ভাবনাই তাঁকে উতলা করেছে। তাই আমাকে অনুরোধ করলেন কবির কাছে গিয়ে কয়েকদিন থাকতে। সেদিন অত কষ্টের মধ্যেও আমাদের দেখে তাঁর মুখে হাসি ফুটেছিলো; কিন্তু সেই প্রাণখোলা হাসি আর নয়।

যা'হোক্ অত অসুবিধা সহ্য ক'রে ঐ জাহাজে আরো কুড়িদিন থাকা চলবে না বলে কবি অন্য জাহাজের আশায় কলম্বোতে নেবে পড়লেন। জাহাজের অত্যাচারে তাঁর শরীর আরো বেশি খারাপ হয়ে উঠেছে, বেজায় পা ফুল্‌ছে, এইসব কারণে কলম্বোর ডাক্তাররা সপ্তাহখানেক বিশ্রাম ক'রে যাবার উপদেশ দিলেন। সাহেব বল্‌লেন, ইতিমধ্যে তিনি অন্য ষ্টিমারেরও বন্দোবস্ত ক'রে নিতে পারেন।

কলম্বোর খুব ধনীলোক মিঃ ডিসিল্‌ভার বাড়িতে কবি আতিথ্য গ্রহণ করেছেন; সুবিধা আরাম, কোনো আয়োজনেরই ত্রুটি নেই; কিন্তু তবু রবীন্দ্রনাথ ক্রমশঃ বেশি অসুস্থ বোধ করায় মিঃ ডিসিল্‌ভা একজন খুব বড় ডাক্তার ডেকে নিয়ে এলেন। তিনি রুগীকে পরীক্ষা ক'রে বল্‌লেন, এ রকম শরীর নিয়ে এত দূরের পথ পাড়ি দেওয়া আমি সঙ্গত মনে করি না। এ অবস্থায় রওনা হয়ে তারপর হঠাৎ জাহাজের মধ্যে যদি বেশি বাড়াবাড়ি হয় তখন কী উপায় হবে; আমার মতে এখন বিলেত না যাওয়াই ভালো। কবি নিজেও ডাক্তারের মতের বিরুদ্ধে যেতে ভরসা পেলেন না। দিন কয়েক পরে এণ্ড্রুজ একাই পশ্চিমে যাত্রা করলেন, আমরা রেলপথে ভারতবর্ষের দিকে ফিরলাম।

কলম্বোতে থাকতে থাকতেই বৈশাখী পূর্ণিমা এলো। ডিসিল্‌ভারা বৌদ্ধ—তাঁরা প্রতিবছর ঐ দিনে অনুরাধাপুরের অশ্বত্থচৈত্যে অর্ঘ্য দিতে যান। কলম্বো থেকে অনুরাধাপুর সম্ভবতঃ একশ মাইল হবে। ডিসিল্‌ভারা নিজেদের মোটরে যাচ্ছিলেন, আমাদের দুজনকেও সঙ্গে নিতে চাইলেন। তখনও এণ্ড্রুজ ছিলেন, কাজেই কবির জন্যে কোনো ভাবনা নেই। এমন সুযোগ সহজে পাবো না বলে কবি নিজেই আগ্রহ ক'রে আমাদের পাঠিয়ে দিলেন। আরিয়াম কলম্বোতে নিজের এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠেছিলেন। তা ছাড়া তিনি সিংহলেরই বাসিন্দা—তাই সবই দেখা আছে; কাজেই আরিয়াম এবং সাহেবকে কবির কাছে রেখে আমরা চলে গেলাম।

অনুরাধাপুরে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন যদি কেউ গিয়ে থাকে তবে সেই শুধু বুঝবে, সে কি দৃশ্য। আমার যেটা সব চেয়ে আশ্চর্য্য লেগেছিলো সে হচ্ছে সমস্ত যাত্রীদের নিজেদের ভিতরকার শৃঙ্খলা।

পঞ্চাশ হাজার লোক একজায়গায় এসে মিলেছে কিন্তু কোথাও গোলমাল নেই। ভেঁপু বাজছে না, ছেলে কাঁদছে না, মারামারি হচ্ছে না, রাস্তার মোড়ে মোড়ে কোথাও পুলিস নেই, অথচ পথঘাট লোকে লোকারণ্য। এই জনারণ্যে আর কোনো আওয়াজ নেই, শুধু অতলোকের মুখের মন্ত্রোচ্চারণধ্বনি সমস্ত আকাশ বাতাস যেন ভরে রেখেছে। সর্ব্বদাই গুন্ গুন্ একটানা একটা শব্দ কানে আস্‌ছে গানের মতো। কতো দূরদূরান্ত থেকে যাত্রীরা আস্‌ছে মোটরবাসে ক'রে, কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না, শুধু মন্ত্রোচ্চারণ করছে গাড়ীতে বসে। সকলেরই চাপা গলা, পাছে বেশি গোলমাল হয়।

অশথতলায় উঁচু ক'রে বেদী বাঁধানো, ব্যস্, আর কিছু নেই। এই অশথগাছই নাকি সঙ্ঘমিত্রা ভারতবর্ষ থেকে বহন ক'রে নিয়ে গিয়ে সিংহলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বুদ্ধের জন্মতিথিতে অনুরাধাপুরের সেই গাছের নিচেই লোকে পূজা নিবেদন ক'রে যায়। অশ্বত্থচৈত্যের বেদীমূলে ওঠবার এবং নামবার দু'টো সিঁড়ি। বেদীর চারপাশটা রেলিং দিয়ে ঘেরা—যাত্রীরা ওঠবার সিঁড়ি দিয়ে এসে বেদী প্রদক্ষিণ ক'রে সুপুরির খোলাতে সাজানো ধূপ প্রদীপ ও সুপুরির মঞ্জরী অর্ঘ্য দিয়ে নেমে যাচ্ছে। এখানে ধনী দরিদ্রের ভেদ নেই, আগে যাবার জন্যে ঠেলাঠেলি নেই—সবাই সারবেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, যে আগে এসেছে সে আগে উঠবে; সহিষ্ণুভাবে সবাই অপেক্ষা করছে। এরকম নিয়মানুবর্ত্তিতা আমাদের দেশে কোনো ভিড়ের মধ্যে দেখিনি কেন? বেদীমূলে কোনো পুরোহিত পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে নেই—প্রত্যেকেই আপনার অর্ঘ্য আপনিই নিবেদন করছে। এ দৃশ্য না দেখলে একটা বড় জিনিস দেখা হোতো না। অনুরাধাপুরের কথা অনেক সময় আমার মনে পড়ে, আর অবাক হয়ে ভাবি যে, পঞ্চাশ হাজার লোকের ভিড়ের মধ্যে কোথাও পুলিস দেখিনি।

অশ্বত্থচৈত্যে যাবার রাস্তার দু'ধারে সুপুরির খোলায় সাজানো অর্ঘ্য বিক্রি হচ্ছে। দোকানেও ধূপ প্রদীপ আলাদা ক'রে কিনতে পাওয়া যায়, যারা একটু বেশি প্রদীপ ও ধূপ দিতে চায় তারা আলাদা ক'রে কিনে নিতে পারে। দোকানীরা নিস্তব্ধভাবে নিজের পসরা নিয়ে বসে আছে, কেউ কাউকে হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি ক'রে জিনিস কিনতে বলছে না। যার যা খুসিমতো নিজেরাই কিনে নিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত আবহাওয়াটাই এমন সুন্দর ও গম্ভীর যে মনকে আপনিই প্রগল্‌ভতা থেকে ফিরিয়ে আনে। পূজার জায়গা তো এইরকমই হওয়া উচিৎ, যেখানে গেলে সহজেই মাথা নত হবে, মন পূজা নিবেদনের যোগ্য হবে।

আমাদের দেশের অনেক তীর্থের জায়গায় ঘুরেছি কিন্তু আকাশে বাতাসে এরকম গাম্ভীর্য্য কোথাও নজরে পড়েনি। সেখানে পাণ্ডার টানাটানি, ভিখিরির কচকচি, ধরমশালার দালালের ব্যবসাদারী, এ সবে মিলে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে—তীর্থের আসল চেহারাটাকে এরা ঘুলিয়ে দিয়েছে। সেই জন্যেই অনুরাধাপুরের এই নতুন আবহাওয়া আমার মনকে এত টেনেছিলো—এখনও থেকে থেকে ইচ্ছে হয় আবার যাই।

অনুরাধাপুরের অশ্বত্থচৈত্য ছাড়াও আর একটা প্রকাণ্ড স্তূপে অর্ঘ্য নিবেদনের জায়গা। যাত্রীরা প্রথমে বেদীমূলে পূজা দিয়ে তারপর সেখানেই যায়। স্তূপটা আগাগোড়া আলোর মালা দিয়ে সাজানো—কতো সহস্র প্রদীপ লেগেছে কে জানে! দেখতে অনির্ব্বচনীয়। বৈশাখী পূর্ণিমার ঝক্‌ঝকে জ্যোৎস্না রাত, চারিদিকে একটানা গম্ভীর সুর, সামনে প্রদীপের মালা—মনে হোলো যেন কোন এক স্বপ্নরাজ্যে এসে পড়েছি; যেন বাস্তব জগতের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। দুঃখ হতে লাগলো কবি দেখলেন না বলে।

পরদিন সকালে আবার কলম্বো ফিরে এলাম—মোটরে একশ মাইল কতোক্ষণই বা লাগে? ফিরে এসে কবির কাছে সব গল্প করাতে তিনি খুব খুশি হলেন। অনেক জায়গাতেই যেখানে উনি নিজে যেতে পারতেন না সেখান থেকে ফিরে এলে আমাদের মুখে খুঁটিয়ে সব কথা শুনতে ভালোবাসতেন। অনুরাধাপুর ওঁর মনকে গভীরভাবে স্পর্শ কোরতো জানি বলেই সারাপথ অধীর হয়ে অপেক্ষা করেছিলাম, কতোক্ষণে গিয়ে গল্প কোরব। কবি সব

শুনে বল্লেন, "আমাদের দেশের তীর্থগুলো পাণ্ডারা মিলে নষ্ট করেছে। বুদ্ধের যারা উপাসক তাদের মনে তিনি আপন গাম্ভীর্য্যের স্পর্শ লাগিয়েছেন, তাই অনুরাধাপুরে এমন সুন্দর জিনিসটি দেখতে পেলে।"

কবিকে আরো দু'দিন মিঃ এণ্ড্রুজ ও আরিয়ামের কাছে রেখে আমরা ডাম্বালা, সিগ্রিয়া, ক্যাণ্ডি প্রভৃতি সব দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো দেখে এলাম।

ডাম্বালা সিগ্রিয়া প্রভৃতির ফ্রেস্কো একটা দেখবার জিনিস। কোথায় কোন্ ঘন জঙ্গলের মধ্যে পাথর কেটে কেটে মানুষ গুহা বানিয়েছে—তারমধ্যে মন্দির তৈরী ক'রে তার গায়ে ফ্রেস্কো এঁকেছে। কতোদিনের কতো লুপ্ত ইতিহাস তার পিছনে। যেসব শিল্পীর সারা জীবনের সাধনা আমরা দেখতে পেলাম তাদের নামও কেউ জানে না, তাদের কোনো চিহ্নই কোথাও পড়ে নেই, শুধু তাদের হাতের কাজ আজও সাক্ষ্য দিচ্ছে তাদের সংস্কৃতির। সে যুগের এমনতরো আরো কতো ইতিহাস মানবসভ্যতা থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে যা দেখলে সবাই বিস্মিত হোতো।

সিগ্রিয়া ফ্রেস্কোর একটা ছবি আমার মনের উপরে এমন মায়াজাল বিস্তার করেছিলো যে, আজও সেই মেয়েটির মুখ স্পষ্ট মনে আছে। পাহাড়ের এত উঁচুজায়গায় ছবি আঁকা যে নিচে থেকে ভালো ক'রে দেখা যায় না বলে লোহার একটা মই-সিঁড়ির ব্যবস্থা আছে, যাতে লোকেরা যতোটা সম্ভব উপরে উঠে ছবিগুলো দেখতে পায়। বাইরের রোদ বৃষ্টিতে অনেক ছবিই ঝাপসা হয়ে এসেছে কিন্তু একটি মেয়ে হাতে একটা আয়না নিয়ে বসে আছে—এই ছবিটা একেবারে জল্ জল্ করছে। তার গায়ের রঙে হল্‌দের আভাস না দিয়ে হাল্কা সবুজ করা হয়েছে—একেবারে যেন নবদূর্ব্বাদলশ্যাম চেহারা। বেশ ছিপছিপে দেখতে, গলাটা অনেকখানি লম্বা, ঘাড়ের কাছে এলোচুলের খোঁপাটা নেমে এসেছে, চোখে মুখে সে যে কী অপূর্ব্ব লাবণ্য আজও ভুলতে পারিনি।

ডাম্বালা, সিগ্রিয়া প্রভৃতি যাবার রাস্তাটাও চমৎকার। ক্যাণ্ডি থেকে ঠিক কতো দূর তা এখন মনে নেই, তবে অনেকখানি পথ তা বেশ মনে আছে।

আমরা ভোরে ট্যাক্সি ক'রে বেরিয়ে সন্ধ্যেবেলা ক্যাণ্ডি ফিরে এলাম। ড্রাইভারটি বেশ ভালো পেয়েছিলাম—আমাদের খুব যত্ন ক'রে যেখানে যা দেখবার আছে সব দেখিয়ে দিলো।

ঘন বনের মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে পথ চলে গেছে—মোটরে যেতে চমৎকার লাগছিলো। য়ুরোপে সর্ব্বত্র যেখানে যা দেখবার আছে যখন দেখে বেড়াতাম কবি কতো সময় আমাকে ঠাট্টা ক'রে বল্‌তেন, "কি উৎসাহ বেড়াবার। তোমার চোখের তৃষ্ণা কি কখনও মিটবে না? আসলে বিধাতা কল্পনাশক্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন কিনা, তাই চোখে দেখবার জন্যে ছুটে বেড়াতে হয়। পেতে আমার মতো ভাগ্য তাহলে অনেক পরিশ্রম বেঁচে যেতো—একজায়গায় বসে বসেই সব কিছু দেখতে পেতে।" কথাটা ঠাট্টা ক'রে বলা হলেও খুবই সত্যি কথা। আর্টিস্টের চোখ যদি হোতো তাহলে নিজেদের চতুর্দ্দিককার পরিবেশের মধ্যেই এত সৌন্দর্য্য দেখতে পেতাম যে নানা জায়গায় ছুটে বেড়াবার দরকার হোতো না। শুনেছি অবনীন্দ্রনাথ কখনও নাকি আগ্রা যাননি; কিন্তু ওঁর "সাজাহানের মৃত্যু" ছবিখানা দেখ্‌লে কি কেউ বুঝতে পারবে যে উনি সত্যিই তাজমহল চোখে দেখেননি। শুনেছি অবনীন্দ্রনাথ

বলেছিলেন যে, "আমার মনের মধ্যে তাজমহলের যে ছবিখানি সঞ্চিত আছে আসলটি দেখতে গেলে পাছে সেটি নষ্ট হয়ে যায় সেই ভয়ে আমি তাজ দেখতে চাইনি।" এই "সাজাহানের মৃত্যু" ছবিখানাতে উনি প্রমাণ করেছেন ওঁর আসল তাজমহল দেখবার দরকার নেই।

ক্যাণ্ডি থেকে ফিরে এসে কবির কাছে দুঃখ করলাম উনি ডাম্বালা সিগ্রিয়া দেখতে পেলেন না বলে—বল্‌লেন, "এই তো, তোমাদের চোখ দিয়েই দেখতে পাচ্ছি, শুনতে শুনতে সমস্ত 'য়্যাট্‌মস্‌ফিয়ারটা' আমার মাথার মধ্যে জমে উঠেছে। হয়তো কোনোদিন দেখবে আমার অগোচরেই কোনো গল্প বা কবিতার মধ্যে সমস্ত ছবিটা বেরিয়ে এসেছে। এম্‌নি করেই তো আমরা দেখি। তোমার মতো আমাকে ছুটে বেড়াতে হয় না।" আমি বল্লাম, "জীবনে এত জায়গায় বেড়িয়েছি তবু কেন আমার বেড়াবার নেশা ঘুচলো না।"

"সে তো আমি খুবই জানি। তাই জন্যেই তো বল্‌লুম যে এখানে যা দেখবার আছে সব কিছু দেখে নাও। কেমন? যেতে বলে ভালো করিনি? কিন্তু এইবার একটা বোঝাপড়া আছে। আচ্ছা, আমাকে ফেলে রেখে তো তোমরা বেড়িয়ে এলে, এখন আমার জন্যে কী এনেছো সেখান থেকে বের করো।" ভেবেছিলেন অপ্রস্তুত ক'রে দেবেন। বলা মাত্র তৎক্ষণাৎ আমি আমার হাতব্যাগ থেকে ক্যাণ্ডির তৈরী একটা লম্বাটে তামার বাক্স রূপার তারের কাজ করা বের করে ওঁর হাতে দিলাম। কৌটোটাতে কবির কলম-পেন্সিল রাখবার বেশ সুবিধা হবে মনে করেই এটা নিয়েছিলাম, কারণ প্রত্যেকবার লিখবার বাক্সর মধ্যে ওঁকে কলম বা পেন্সিল হাৎড়াতে যখন দেখতাম মনে হোতো এই রকম একটা লম্বা কৌটো পেলে বড় সুবিধা হয়।

জিনিসটি হাতে নিয়েই খুব হেসে বল্‌লেন, "আরে, এযে সত্যিই একটা ভালো জিনিস এনেছো আমার জন্যে। আমি ভেবেছিলুম হঠাৎ কিছু চেয়ে ঠকিয়ে দেবো, কিন্তু এ যে দেখছি আমাকেই ঠকালে। না, না, এত ভালো জিনিসটা তুমিই রাখো, কী হবে আমার এসব দিয়ে?" বল্‌লাম, "সে কী ক'রে হতে পারে; আপনার কথা মনে করেই যে কিনেছি। প্রত্যেকবার বাক্স গোছাবার সময় ছুরি কলম পেন্সিলগুলো বেজায় গোলমাল করে। সব কটাকে একত্র ধরে রাখবার এই একটা উপায় বের করা গেছে; কিন্তু একটা সর্ত্ত আছে।"

"সর্ব্বনাশ! শেষকালে কি এণ্ড্রুজের মতো আমাকেও বিপদে ফেল্‌বে নাকি? যদিও ভয় হচ্ছে তবু বলো; শুনি কি সর্ত্ত।"

"আপনি সব জিনিসই যেমন দু'দিন পরে যাকে তাকে বিলিয়ে দেন এই কৌটোটি সম্বন্ধে তা করতে পারবেন না। হারিয়ে ফেল্‌লে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু কাউকে দিয়ে দিলে চল্‌বে না। কারণ এরকম একটা জিনিস লেখবার বাক্সে না থাক্‌লে সত্যিই ভারি অসুবিধা হয়।"

"হ্যাঁ, এ অতি উত্তম প্রস্তাব। এ সর্ত্তে আমি রাজী আছি, কারণ এটার অভাব আমিও অনুভব করেছি, কাজেই নিশ্চয়ই কাউকে দেবো না।"

এণ্ড্রুজের মতো কবিও কথা রেখেছিলেন। প্রত্যেকবার আমাদের বাড়িতে যখন আস্‌তেন বাক্স থেকে কলম বের করবার সময় বল্‌তেন, "এই ছাখো, এখনও কাউকে দিইনি। আমার উপরে তোমার কী অবিশ্বাস।"

কলম্বোতে কবির শরীর খুবই অসুস্থ চল্‌ছিলো বলে বাইরে কোথাও এনগেজ্‌মেণ্ট নেননি, তাই সারাদিন বাড়ি বসে বসে "যোগাযোগ" ও "শেষের কবিতা" (তখন গল্পটাকে 'মিতা' বলে উল্লেখ করতেন) লেখা চল্‌ছিলো। তবে কলম্বোতে কেন জানি না যোগাযোগটাই বেশি লেখা হয়েছিলো। শরীর অসুস্থ হলেও লেখা দু'টো নিয়ে সর্ব্বদাই মন এমন খুশি ছিলো যে সারাদিন হাসিতে কৌতুকে আমাদের সকলকে ভরিয়ে রেখেছিলেন।

কলম্বোর একজন ধনী ভদ্রলোক সেই সময় মিঃ আরিয়ামের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন, কিন্তু আরিয়াম কিছুতেই রাজী নন্। মেয়ের বাবা একদিন বিকেলে কবির কাছে তাঁব মেয়েটিকে নিয়েও এলেন দেখাতে, যদি কবি আরিয়ামের মত করাতে পারেন। শোনা গেলো ভদ্রলোক অনেক টাকা যৌতুক দিতে রাজী; পঞ্চাশ হাজার কি এক লক্ষ, ঠিক মনে নেই, এই রকম হবে। মেয়েটি দেখতে কালো কালো, ছেলেমানুষ, একখানা গোলাপী রংএর শাড়ী পরে এসেছিলো তাও মনে আছে, আর আপাদমস্তক হীরের গহনায় মোড়া। কন্যার বাবা যে এক লক্ষ টাকা দিতে পারেন তা তাঁর মেয়ের সাজ দিয়েই তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। আরিয়াম তো সেদিন বিকেলবেলা পালিয়ে বেড়ালেন। কবির তাতে খুব মজা লেগেছিলো। পরে যখন তখন আরিয়ামকে বল্‌তেন, "ওহে, এখনও ভেবে দেখো। এক লক্ষ টাকা সোজা নয়। এত ভয় কিসের? আর মেয়েটিকে দেখে শুনে তো কিছু ভয়ঙ্কর বলে মনে হোলো না। বুঝেছ? এখান থেকে যাবার আগেই একটা ঠিক ক'রে ফেলো। না হয় তুমি টাকাটা নাই নিলে, আমাকে দিয়ে দিলে আমি খুশি হয়েই নেবো।" আরিয়াম যখন হেসে উঠতেন ওঁর কথা শুনে তখন কবি খুব দুঃখের ভান ক'রে বল্‌তেন, "হায়রে, আমাকে কেউ এক লাখ টাকা আর মেয়ে নিয়ে সাধে না। এ তো প্রায় অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা বল্‌লেই হয়। আমি পেলে আমার বিশ্বভারতীর জন্যে আর কী ভাবনা ছিলো?"

কবির আচমকা কৌতুক করার স্বভাব তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত সকলেরই জানা আছে। তবু কোনো গল্প মনে পড়ে গেলে বলতে ইচ্ছে করে। এমন গম্ভীর ভাবে হঠাৎ কিছু বলে উঠতেন যেটা মন মোটেই প্রত্যাশা করেনি, তাতে ক'রে আরো বেশি হাসিয়ে দিতেন।

একদিন কলম্বোতে বাজারে বেরিয়ে ছোট, বড়ো, মাঝারি নানা আকারের চোদ্দ পোনেরোটা আবলুস কাঠের হাতি কিনে এনেছি। হাতিগুলো ঘরে টেবিলের উপর সার করে সাজিয়ে দেখছি এমন সময়ে কবি হঠাৎ ঘরে ঢুকে আমার হাতির মিছিল দেখে বল্‌লেন, "ও কি ও, অতগুলো হাতি কি হবে?" আমি যেই উত্তর করেছি, "আপনার সায়েন্টিস্ট হাতি বেজায় ভালবাসেন, তাই কিনে এনেছেন", অম্‌নি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, "এতদিনে বুঝতে পারলুম প্রশান্তর তোমাকে কেন পছন্দ।" আমরা হো হো ক'রে ঘর সুদ্ধু হেসে হেসে অস্থির। মোটেই কেউ আন্দাজ করতে পারিনি কি উত্তর দেবেন। নিজেও খুব খানিকটা হেসে আমার হাসি দেখে বল্‌লেন, "যা মুখে আসে তাই বলে বসি, আর তুমি তাইতে হাসো? কিছু যদি অপমান বোধ থাকে তোমার।" কতোদিনের এইরকম কতো ছোটোখাটো ঘটনা মনে পড়ে।

এইবার আমাদের ফেরবার পালা। কলম্বো থেকে রওনা হয়ে প্রথম মাতুরায় দু'দিন বিশ্রাম। অসুস্থ শরীরে কবি লম্বা পথ একটানা যেতে পারবেন না বলে এই ব্যবস্থা হোলো। মাতুরায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার গোপাল মেননের বাড়ি আমরা উঠলাম। তাঁরা পরিবার সুদ্ধু সবাই তখন অন্যত্র হাওয়াবদল করতে গিয়েছেন। তাঁর একটি অল্প-বয়সী ছেলে ও চাকর-বাকর বাড়িতে ছিলো। মিঃ মেনন টেলিগ্রাম ক'রে জানালেন যে তাঁর বাড়িতে কবি দু'দিন বিশ্রাম ক'রে গেলে তিনি কৃতজ্ঞ হবেন। তিনি কোনো একটা বিশেষ কারণে নিজে না আস্‌তে পারায় ছেলেকে পাঠিয়েছেন কবির অভ্যর্থনার জন্যে।

মাতুরাতে তখন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন শিক্ষক, (পরে কলকাতা কর্পোরেশনের বড় কর্ম্মচারী) শ্রীযুক্ত বঙ্কিম রায় ছিলেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত খুশি কবিকে বহুদিন পরে দেখতে পেয়ে। রবীন্দ্রনাথের শরীর তখন মোটেই ভালো না—সমস্তদিনই শুয়ে কাটলো। তবু সন্ধ্যেবেলা ওখানকার নামকরা একজন ওস্তাদ কবি এসেছেন খবর পেয়ে তাঁকে নিজের গান শুনিয়ে গেলেন। ওস্তাদটি চলে গেলে কবি বল্‌লেন, "খুব ওস্তাদি বটে, খুবই কঠিন সাধনা করতে হয়েছে, তবু গলায় গান নেই, কেবলি গলার জিম্‌নাষ্টিক, ভাল লাগে না।"

পরদিন আবার বোট-মেলে মাতুরা থেকে যাত্রা। কবি স্টেশন্‌ থেকে বাড়ি গিয়েছিলেন আবার বাড়ি থেকে স্টেশনে। মাতুরা আমাদের আগেও দেখা ছিলো তবু এক ফাঁকে মন্দির বেড়িয়ে আস্‌বার লোভ সামলাতে পারলাম না, যদিও স্বীকার করছি উত্তর ভারতের মোগলবাদশাহের রুচিটাই আমার বেশি পছন্দ। দক্ষিণভারতের স্থাপত্য আমার চোখে ভাল লাগে না ; এতো জবড়জঙ্গ যে মনের উপর বড্ড যেন বেশি ভার চাপায়। সমস্ত জড়িয়ে দেখলে মন্দিরগুলো আমার সুন্দর লাগে না যদিও, কিন্তু আলাদা আলাদা করে খোদাইকরা মূর্ত্তিগুলো তার গায়ের উপর যখন দেখি মনে হয় এর যেন তুলনা নেই।

গাড়ী ছাড়বার পর ডাইনিং কার থেকে কবির জন্যে খাবার আনিয়ে দিয়ে আমরা তিনজন বসে রইলাম ত্রিচিনাপল্লী স্টেশনের "হিন্দু খাবারের" আশায়। আগেই আমাদের জানা ছিলো যে ঐ স্টেশনের দেশী খাবার খুবই চমৎকার। ইচ্ছে হলে রেস্তোরাঁতে বসেও খাওয়া যায় নাহলে তারা গাড়ীতে পরিবেশন করেও খাওয়ায়। যখন ত্রিচিনাপল্লীতে গাড়ী থামলো, ঝকঝকে পিতলের টিফিন ক্যারিয়ারে করে খাবার গাড়ীতে দিয়ে গেলো, এবং সঙ্গে রেশমের মতো কচি কলাপাতা। কবি দুঃখ করতে লাগলেন স্পেন্সারের খাবার খেয়েছেন বলে। কবি যদিও কোনো-দিনই ঠিক বাঙালীর মতো ভাতের ভক্ত ছিলেন না তবু আমাদের গরম গরম ভাত, বাটিভরা ভালো ঘি, সঙ্গে ডাল, তরকারী, ভাজা, আচার, বসম ও দৈ দেখে বুঝতে পারলেন 'হিন্দু খাবার' খুবই তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া যেতো। যে ব্রাহ্মণ গাড়ীতে এসে পরিবেশন করছিলো তার দিব্যি গৌরবর্ণ গায়ের রং, স্নান করা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চেহারা, পরনে লালচেলী—দেখলে ভালো লাগে। একজনের মতো খাবার বলে যা দিলো তা আমরা অনায়াসেই তিন জনে খেতে পারতাম। এক একজনের খাবারের দাম মাত্র ছয় আনা, এর ভিতর দৈ ঘি, এমনকি গ্লাস ক'রে দুধও ধরা আছে। কবি আমাদের খাবারের চেহারা

দেখে ও দাম শুনে বল্‌লেন, "আমাকে তোমরা কী কতকগুলো মাছ মাংস খাওয়ালে তিনটাকা খরচ ক'রে; হয়তো কোনোটা বাসিই বা হবে—আমি অনায়াসেই এই খাওয়া খেতে পারতুম। তোমরা তো বল্‌ছো এতে ঝালও তেমন বেশি দেয়নি, তবে আমি খেলে কী দোষ হোতো?" তখন তো আর উপায় নেই, যা হবার হয়ে গিয়েছে। তবু আমরা যে ভালো খেলাম তাতেই কবি খুশি হলেন। আমার তৃপ্তি ক'রে ডাল ভাত মেখে খাওয়া দেখে বল্‌লেন, "এই বঙ্গরমণীর ভাত পেলে কী আনন্দ। বাঙাল কি না, তাই বিলেতেও রাস্তায় রাস্তায় দোকান খুঁজে বেড়াতো কোথায় চাট্টি ভাত পাওয়া যায়।" মনে আছে বিলেতে অনেকদিন ভাত না খেতে পেয়ে যখন হা হুতাশ করতাম তখন কবি বল্‌তেন, "আচ্ছা ছাখো, তোমাকে আজ এমন ক'রে আলু সিদ্ধ মেখে খাওয়াবো যে তোমার মনে হবে বুঝি ভাতই খাচ্ছো।" হোটেলের ম্যানেজারকে বলে পাঠাতেন কিছু বেশি করে আলু সিদ্ধ দেবার জন্যে। তাতে খুব যত্ন ক'রে মাখন, মাষ্টার্ড, লবণ, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, ডিম সিদ্ধ ইত্যাদি দিয়ে এমন ক'রে মাখতেন যে খেতে চমৎকার লাগতো—ঠিক মনে হোতো যেন ভাতে সিদ্ধ ভাত খাচ্ছি। এম্‌নি করে মেখে আমাকে অনেকবার খাইয়েছেন বলে জান্‌তেন ভাতের সম্বন্ধে আমার কি টান।

গাড়ী ভোরবেলা মান্দ্রাজে গিয়ে পৌঁছলো। এবারে আর জাহাজ ধরবার তাড়া নেই। এবারেও আমাদের আস্তানা হলো মিঃ ক্যাণ্ডেতের বাড়িতেই। তখন জুন মাসের মাঝামাঝি —বর্ষা আপন দখল কায়েমি করে জমিয়েছে, কাজেই গরমটা আরো ভাপসা। সেইদিন রাত্রেই যাতে ক'লকাতা রওনা হওয়া যায় সেইজন্যে কবি ব্যস্ত হলেন। একে ওঁর অসুস্থ শরীর, তাতে এই দীর্ঘ-যাত্রার অবসাদ, সামনেও লম্বা পথ—সকলেই পরামর্শ দিলেন অন্ততঃ একটা দিনও বিশ্রাম ক'রে যেতে। কবি কিছুতেই রাজী নন, অবশেষে বিধাতা আমাদের সহায় হলেন। স্টেশনে গিয়ে জানা গেলো সেদিনকার ডাক-গাড়ীতে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা কামরাও খালি নেই। অগত্যা একটা দিন না থেকে আর কি উপায়?

স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তখন মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার কাজেই ব্যাঙ্গালোরে রয়েছেন। অধ্যাপক বল্‌লেন, তিনি ঐ একদিনের মধ্যেই একবার ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা ক'রে আস্‌বেন। পরদিন ভোরেই ফিরে আস্‌বার ট্রেন আছে, কাজেই ক'লকাতার গাড়ী ধরতে কোনো অসুবিধা হবে না। সকালের গাড়ীতেই তিনি চলে গেলেন, আমি ও মিঃ আরিয়াম কবির কাছে রইলাম।

অধ্যাপক সেইসময় রাশিবিজ্ঞানের Biometry-র একটা কাজ প্রায় শেষ ক'রে এনেছেন। সে কাজের সূচনা ১৯১৭ সালে ওঁর ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ফলেই হয়েছিলো। বেড়াবার সময় দিনরাত খেটেছেন এই কাজটা নিয়ে যাতে ফিরতি পথে মহীশূর গিয়ে ডক্টর শীলকে পেপারটা দেখিয়ে আনতে পারেন—বৃদ্ধ তাহলে মহা খুশি হবেন। সেইজন্যে পর্ব্বতপ্রমাণ বই, মোটা মোটা বাঁধানো Biometrika, আর রাশি রাশি কাগজপত্র মাথায় ক'রে সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। এণ্ড্রুজ সাহেব পাহাড়ে যাবার বেলা আমার বিছানার বোঝা লাঘব করিয়েছিলেন কিন্তু তারচেয়ে অনেক ভারি অধ্যাপকের বই খাতা সম্বন্ধে আপত্তি করতে পারেননি। সেইগুলোই

হোল্ড অল-এর ভেতর বিছানার বদলে গিয়েছিলো। কবি দিনের বেলায় খানিকখন আমার স্বামীকে না দেখতে পেলেই ঠাট্টা ক'রে বলতেন, "ঐরে আবার অঙ্ক কষতে বসেছে। আজ আর তাহ'লে তোমার কোথাও বেরোনো হবে না।" তারপরই হেসে বল্‌তেন, "জানো, ঐজায়গায় ও আমাকে বেজায় হারিয়ে দিয়েছে। দিনরাত খাতার উপর ঝুঁকে পড়ে ও যখন অঙ্ক কষে দেখে ভারি হিংসে হয়, আর নিজের 'পরে রাগ ধরে ছেলেবেলায় ইস্কুল পালিয়েছিলুম বলে। তা না হ'লে দেখতে আজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কী কাণ্ড করতো। আমি হো হো ক'রে হেসে উঠতাম, নিজেও সে হাসিতে যোগ দিয়ে বলতেন, "না না হাসির কথা নয়; প্রসান্তর মোটা মোটা অঙ্কের বইগুলো যখন দেখি তখন ভাবি ঐ একটি রাজ্যে শুধু আমার প্রবেশ করা হোলো না। আর সবইতো কিছু কিছু করলুম; এমন কি এই শেষ বয়সে নন্দলালের সঙ্গে পাল্লা দিতেও তো ভয় পেলুম না, শুধু তোমার কর্তৃপক্ষের সঙ্গেই আমার কম্‌পিটিশনের রাস্তা বন্ধ। অনেক সময় ভাবি এখনও আরম্ভ করলে যদি হোতো তো একবার চেষ্টা দেখতুম; কিন্তু আর হয় না—বড্ড দেরী হয়ে গেছে; কাজেই বাধ্য হয়ে ওর কাছে মাথা হেঁট করে থাকি।" আমার হাসি আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌লে বল্‌তেন, "তুমি বিশ্বাস কোরছো না? সত্যিই আমার দুঃখ আছে সায়ান্স পড়িনি বলে, বিশেষ ক'রে ম্যাথামেটিক্‌স্‌টা।" এই রকম হাসি তামাসা যখন চল্‌তো হঠাৎ হয়তো বলে উঠতেন, "তুমি দেখো; সাংখিক্ ভারি খুশি হয় এইসব কথা বল্‌লে—জানে কিনা ঐ জায়গায় ওর জিৎ কারণ আমার লেখা ও পড়ে উপভোগ করতে পারে কিন্তু ও যে সারাদিন কী করছে আমার কিছু বোঝবার উপায় নেই। এখানে তোমার আর আমার অবস্থা একেবারে সমান।"

যাহোক অধ্যাপক মহীশূর চলে যাওয়ার পরে মিঃ ক্যাণ্ডেথ্ আপিস্ থেকে ফিরে এসেছেন, আমাদের চা খাওয়া শেষ হয়েছে, সবাই বসে গল্প করছি; বেলা তখন সাড়ে পাঁচটা কি ছটা হবে, কবি হঠাৎ বলে বসলেন, "আচ্ছা, প্রশান্ত একাই ব্রজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করবে, আর আমিই বা না করবো কেন? আবার কবে এদিকে আসা হবে না হবে কে জানে? ঘরের পাশে এসে ওঁকে না দেখে ফিরে যাওয়া কি উচিৎ?" ব্রজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের অনেক দিনের বন্ধু, কাজেই প্রস্তাবটা যুক্তিসঙ্গতও বটে, তবে শরীরের কথাটাও তো নিতান্ত অবাস্তব নয়! তাই আরিয়াম মৃদু আপত্তি তুল্‌লেন। আমি মনে মনে জানতাম এ খেয়াল কবির একবার যখন হয়েছে তখন আমাদের আপত্তিতে কোনো ফল হবে না।

ট্রেন ছাড়তে আর ঘণ্টা দুই দেরী। মিঃ ক্যাণ্ডেথ্ স্টেশনে ফোন্ ক'রে জানলেন যে গাড়ীতে জায়গা আছে। কবি বল্‌লেন, "আরিয়ামের যাবার কোনো দরকার নেই, রানীই একা আমাকে নিয়ে যেতে পারবে।" তাড়াতাড়ি ক'রে সমস্ত জিনিসপত্র বেঁধে নিলাম। ব্যাঙ্গালোর অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জায়গা, কাজেই কুনুরের মতো বিপদ যাতে না হয় তাই বিশেষ ক'রে হাল্কা গরম কাপড়গুলো বিলেতের বাক্স থেকে বের ক'রে একটা সুটকেসে সাজিয়েছি। অল্প ক'দিনের মতো যা দরকার তাই সঙ্গে যাবে, বাকি সব মালপত্র মান্দ্রাজেই পড়ে থাকবে—আমরা ফিরতি-পথে তুলে নিয়ে যাবো এই ব্যবস্থা। কবির মুখ-ধোবার জিনিসের ছোটো হাতবাক্সে অন্তত দু'বার স্নানের মতো পোশাক ভরে নেওয়া আমার বরাবরের অভ্যাস। কি জানি, যদি স্টেশন

থেকে বড় বাক্স তোরঙ্গ এসে পৌঁছতে দেরী হয়? স্নানের যাতে দেরী না হয়ে যায় তাই এই সতর্কতা। ভারতবর্ষে ঘোরবার সময় ওঁর পুরোনো চাকর বনমালী সঙ্গে থাকে। এবারে পশ্চিমগামী বলে আর কেউ সঙ্গে আসেনি, কাজেই আমি আরো ভয়ে ভয়ে থাকি পাছে আমার কোনো ত্রুটিতে কবি অসুবিধায় পড়েন। তাই যে যে বাক্স যাবে এবং যে কটা থাকবে সব মিঃ ক্যাণ্ডেথের একটা খালি ঘরে সাজিয়ে আরিয়ামের জিম্মা ক'রে দিয়ে নিশ্চিন্ত হোলাম যাতে মিঃ আরিয়াম আগেই যখন জিনিস নিয়ে স্টেশনে যাবেন তখন কোনো বিভ্রাট না বাধে।

ট্রেন ছাড়ার অল্প আগে ধীরে সুস্থে ক্যাণ্ডেথ, কবিকে স্টেশনে পৌঁছে দিলেন। গিয়ে দেখি রেলের কামরায় বেঞ্চির নিচে সব বাক্স তোরঙ্গ ইতিমধ্যেই আরিয়াম দিব্যি ক'রে সাজিয়ে দিয়েছেন—বিছানা পাতা—কোনো কিছুরই ত্রুটি নেই।

গাড়ী ছাড়বার মুহূর্তে মিঃ আরিয়ামকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, জিনিসগুলো দোতলা থেকে আপনার কাছে নিচে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম সব এসেছে তো?

"হ্যাঁ, সব এসেছে।" বল্‌তে বল্‌তেই ট্রেন ছেড়ে দিলো। একটু পরে যখন কবি বিছানার উপর গুছিয়ে বসেছেন ভাবলাম জিনিস কটা একবার নিজের চোখে দেখে নিই। অল্প আলো—মোটামুটি সবই চোখে পড়লো, শুধু কবির সেই কাপড়ের বাক্সটা নেই। বুকের মধ্যে যেন রক্ত জমাট বেঁধে গেলো—কি হবে? প্রাণপণে আশা করতে লাগলাম যে নিশ্চয়ই বেঞ্চির তলায় কোথাও গোঁজা আছে, অন্ধকার হয়তো আমার নজরে পড়ছেনা। এ কখনও হয় যে আরিয়াম এত বড় ভুল করবেন? তিনি তো জানেন কবির সমস্ত কাপড় তার মধ্যে—তাঁর সামনেই আমি জিনিস গুছিয়েছি, সে বাক্স পড়ে থাকলে আর উপায় নেই, কাজেই নিশ্চয়ই সেটা মনে ক'রে দিয়েছেন। যাই হোক, কবিকে আর কিছু বল্‌লাম না—মিথ্যে তাঁকে ভাবিয়ে লাভ কি? সকালে ব্যাঙ্গালোর পৌঁছে যা হয় করা যাবে।

সুটকেসের ভাবনায় সারারাত ঘুম হোলো না। একে এই প্রথম একা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পথে চলেছি, তার দায়িত্ব কম নয়—তার উপরে যাত্রার শুরুতেই এই এত বড় একটা অঘটন।

কবি খুব ভোরেই তখন চা খেতেন। সে আমলে বনমালীকে রাত দু'টোর সময় উঠে উনুন ধরাতে দেখেছি। সেদিন আমি রাত চারটের সময়, কোন্ স্টেশনে মনে নেই, প্ল্যাটফরমে নেমে একটা খানসামাকে ধরে রিফ্রেশমেণ্ট রুম থেকে কবির জন্যে চা সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এলাম। উনি তো মহা খুশি। পুরুষ জাতীয় কোনো সঙ্গী না থাকা সত্ত্বেও যে অত ভোরে চা পাওয়া যাবে তা ভাবেননি, তাই বার বার আমাকে বাহবা দিলেন। কিন্তু কবি তো জানেন না যে কেন আমি অত ভোরে উঠতে পেরেছি। (ক্রমশঃ)

রানী মহলানবিশ

৯ই আগষ্ট, ১৯৪৫

(১)

নিপ্পনের রক্ত সন্ধ্যা, মেঘে মেঘে ঘোর শব্দ!
উত্তর পূর্ব এশিয়ার রুক্ষ প্রান্তরে
পিঙ্গল উটের দল মুখ তুলে শোনে;
মেঘে মেঘে লাল ঝড়, বসন্তের বজ্রধ্বনি মাঞ্চুরিয়ায়,
আন্দোলিত মঙ্গোলীয় মরুভূমি ট্যাঙ্কের ঘর্ঘরে,
প্রাচ্যের পীত দেহে সঞ্জীবনী রক্তের উদ্দাম জোয়ার।

(২)

সাম্রাজ্যের পতাকা উড্ডীন হিন্দুস্থানে; মেঘে মেঘে
কালো শব্দ;
এখানে রুগ্ন শিশুর কান্নায়, উলঙ্গ নারীর লজ্জায়
গ্রামে গ্রামে গুমোট কানাকানি,
ধূসর মাঠের পাশে ধূমায়িত নদীর রেখা।
এখানে পাহাড়ী কুয়াশায় বুঁদির কিল্লার যুদ্ধ শেষে
নেতারা যে যার শিবিরে প্রত্যাগত;
লাটের ভেল্‌কিতে পরম শত্রু আজ দোস্তে পরিণত,
স্বজন শত্রুতে;
এখানে রাজনীতি পরনিন্দা, পরচর্চা, বুড়োর ঝামেলা;
ইজ্জতের গোলাম যারা
একরোখা অন্ধ রাগে আত্মঘাতী যারা
এ দুর্দিনে তাদেরি আসর, রাজনীতি তাদেরি পেশা।

আর মেঘে মেঘে কালো শব্দ বাড়ে,
নদীর গেরুয়া বেগ আনেনা ফসলের অগ্নিশিখা,
জলের উদ্দাম জোয়ার ঘোলাটে প্রলাপ,
মাঝে মাঝে শুধু মাছের ঝলক।
ইলিশের স্বাদ কিন্তু ভুলেছে জেলেরা,
উলঙ্গ তাঁতিনীর লজ্জা মহাপ্রাণ মৃত্যু ঢাকে।

সমরেশ সেন

এলিফ্যাণ্টা

বলিষ্ঠ কব্জি, শিল্পসিদ্ধ আঙুল, বুদ্ধিদীপ্ত শ্রম-চেতনা
একদিন গড়েছিল তোমার ভারত-প্রহরী মূর্ত্তি
হে ত্রিমুণ্ড মহাকাল !
আরব্য-সিন্ধু-বলয়িত ক্ষুদ্র দ্বীপের শৈলচূড়ায়,
বিশাল ভারতবর্ষের পশ্চিম তটপ্রান্তে
অধুনালুপ্ত অতিকায় ঐরাবতের স্মৃতি-বিজড়িত
এলিফ্যাণ্টা।

দূর দিগন্তে নীল অজগর
মত্ত ফেনিল উর্ম্মি-মুখর
ক্ষুধিত-শূন্যে খাঁ খাঁ করে খর সূর্য্য !
কঠিন পাহাড়ে শিলাকাটাগুহা পাষাণ স্তম্ভশ্রেণী
মরা অতীতের হৃদয়াবেগের শিলীভূত প্রতিবিম্ব
সন্ধানী চোখে কি চাও জানিনা ত্রিমুণ্ড মহাকাল
স্তব্ধ বিষাণ—বিপ্লবী রণতূর্য্য।

অদূরে বোম্বাই বন্দর ঃ
অগণিত ঐশ্বর্য্য-পিশাচের বৈষম্য-কলুষ বাণিজ্যতীর্থ।
সিংহ-লাঞ্ছিত বৈদেশিক পতাকা-শোভিত শত শত
জাহাজের মাস্তুলে
আকাশের শরশয্যা,
ভেদবুদ্ধি কলুষিত মহানগরী অহোরাত্র স্বার্থমুখর
কায়েমী স্বার্থেব রক্ষণশীল আভিজাত্যে।
তুমি শুধু ঠুঁটো সাক্ষী
কোলাবার এলিফ্যাণ্টা ভারত-প্রহরী !
অবিশ্বাসী অবিনাশী
ত্রিমুণ্ডের গুম্ফা-কারাগারে।

পর্ত্তুগীজ বণিক-দস্যুদের প্রথম অশুভ দৃষ্টিকে প্রশ্রয়
দিয়েছিলে একদা
হে শিথিল-বীর্য্য এলিফ্যাণ্টা,
যুগ-বিপ্লবের কোন্ অশুভলগ্নে, কোন্ পাপে, জানিনা।

পবিত্র স্বদেশ তাই আজো শৃঙ্খলিত নির্য্যাতিত !
গুহায় গুহায় রূপায়িত ভাস্কর্য্যের কারুশিল্পে
থম্‌ থম্‌ করছে তোমার ঐতিহ্যের অহমিকা
আত্ম-মর্য্যাদার আভিজাত্যে উদাসীন্‌।
ত্রিমুণ্ড শিবের দিগন্ত-প্রসারী দৃষ্টি নিশ্চল
শতশতাব্দীর রহস্যময়তায়।
পূবে পশ্চিমে শৈল-প্রাচীরের শিখরে শিখরে শৈব-স্থাপত্যের মায়া
ভাঙাবুকে গম্ভীর ইতিহাসের ক্রম-বিলুপ্ত বিষাদ চিহ্ন ;
মাঝে মাঝে ডেকে যায় সিন্ধু-সারস
উপত্যকার ধানক্ষেতে হু হু ক'রে ওঠে এলোমেলো হাওয়া
চল্লিশ কোটি ছন্নছাড়ার দীর্ঘশ্বাসে।

দূরে বহুদূরে, আরব্য-সমুদ্রের পরপারে—
উদাস আফ্রিকা,
কালো-চামড়ার অভিশাপে গড়া নিরক্ষর মহারণ্যভূমি
স্বাজাত্যাভিমানী বর্ণ-বিদ্বেষী বৈশ্যবর্গের উপনিবেশ
মহাত্মাজীর প্রথম মুক্তি-সংগ্রাম ক্ষেত্র
নির্য্যাতিত উপেক্ষিত মহাদেশ।

আজো ত্রিমুণ্ড শঙ্কর—
দক্ষিণে ইসলামতীর্থ মক্কাকে অভিবাদন জানাচ্ছে
বামে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে আশীর্ব্বাদ
পশ্চিমদিকে নিবদ্ধ মধ্যমুণ্ডে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সন্ধানী দৃষ্টি।
আজো বিদেশী ভারতযাত্রীর মাথা নুয়ে পড়ে
অতীতের মহিমান্বিত এই বিরাট স্থাপত্য-দেউলের প্রাঙ্গনে
অতিকায় মহামাতঙ্গ মূর্ত্তি কাল-খড়্গে ছিন্ন-মুণ্ড
সে পাষাণ-মুণ্ড এখনো রয়েছে বোম্বায়ের ভিক্টোরিয়া উদ্যানে
দর্শকের ক্লীব-কৌতূহল নিবৃত্তি করছে আজো।

সময়ের অস্ত্রাঘাতে উচ্চৈশ্রবা বিধ্বস্ত।
মন্দিরের ভাঙ্গা ইট, পরিত্যক্ত যজ্ঞবেদী, শতদীর্ণ মর্ম্মর স্তম্ভ
ইতস্ততঃ ঐতিহ্যের বিক্ষিপ্ত কঙ্কাল
আজো পড়ে আছে
ভ্রষ্ট দিনের ভিত্তি-শ্মশানে।

তুমি শুধু আজো জেগে আছো
অতীতের এলিফ্যাণ্টা,
ত্রিমুণ্ড ত্রিকালদর্শী নভঃস্পর্শী উদ্ধত ললাট
ঘনপিনদ্ধ পিঙ্গল জটাভারে
ধূসর পাষাণে খোদিত মুকুট,
অজানা যুগের শিল্পসিদ্ধের
হাতুড়ী বাটালি ছেনিতে খোদাই করা
জরাজর্জ্জর ভারত-প্রহরী ত্রিমুণ্ড মহাকাল !

বিমলচন্দ্র ঘোষ

রৌদ্রের গান

এখানে সূর্য ছড়ায় অকৃপণ
দু'হাতে তীব্র সোনার মতন মদ,
সে সোনার মদ পান ক'রে ধানক্ষেত
দিকে দিকে তার গ'ড়ে তোলে জনপদ ।

ভারতী ! তোমার লাবণ্যে দেহ ঢাকে
রৌদ্র তোমায় পরায় সোনার হার,
সূর্য তোমার শুকায় সবুজ চুল
প্রেয়সী তোমার কতো না অহংকার !

সারাটা বছর সূর্য এখানে বাঁধা
রোদে ঝলসায় মৌন পাহাড় কোনো,
অবাধ রৌদ্র তীব্র দহনভরা
রৌদ্রে জ্বলুক তোমার আমার মনও ।

বিদেশকে আজ ডাকো রৌদ্রের ভোজে
মুঠো মুঠো দাও কোষাগারভরা সোনা,
প্রান্তর বন ঝলমল করে রোদে
কী মধুর আহা রৌদ্রে প্রহর গোনা ।

রৌদ্রে কঠিন ইস্পাত উজ্জ্বল
ঝকমক করে ইশারা যে তার বুকে
শূন্য নীরব মাঠে রৌদ্রের প্রজা
স্তব করে জানি সূর্যের সম্মুখে।

পথিক বিরল রাজপথে সূর্যের
প্রতিনিধি হাঁকে আসন্ন কলরব,
মধ্যাহ্নের কঠোর ধ্যানের শেষে
জানি আছে এক নির্ভয় উৎসব।

তাইতো এখানে সূর্য তাড়ায় রাত
প্রেয়সী তুমি কি মেঘভয়ে আজ ভীত?
কৌতুকছলে এ মেঘ দেখায় ভয়,
এ ক্ষণিক মেঘ কেটে যাবে নিশ্চিত।

সূর্য তোমায় আজকে এখানে ডাকি
দুর্বল মন, দুর্বলতরো কায়া,
আমি যে পুরোনো অচল দীঘির জল,
আমার এ বুকে জাগাও প্রতিচ্ছায়া।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

শেষ রাত্রি

যারা বলে দেরি নাই আমার মৃত্যুর পরোয়ানা
রাত্রির আকাশে আজ লেখা হবে কলঙ্কলেখায়
যারা বলে দেরি নেই মুহূর্তেই আমি মরে যাব
আমার সংগ্রাম পণ জিজীবিষা ব্যর্থ হবে শেষে—

তাদের নির্বোধ উক্তি উপেক্ষা করিয়া যাবে
উন্মাদের প্রলাপের অর্থ তুমি খুঁজো না বৃথাই।

যারা বলে আমার অক্লান্ত চেষ্টা আত্মপ্রতিষ্ঠার
তোমার স্বার্থের নামে লক্ষ্য শুধু স্বার্থ সাধনের
আমার অকুণ্ঠ প্রেম যারা বলে ইন্দ্রিয়বিকার
আমার স্বরূপ যারা নিজেদের রূপের আদলে
বিকৃত করিয়া আজ ছবি আঁকে কদর্য মিথ্যার

তাদের প্রচারে তুমি ক'রো না বিশ্বাস
শুনো না তাদের কথা তারা মিথ্যাবাদী।

জানি তুমি ঘরের দুর্দশা দেখে হয়েছো চঞ্চল
আমারে ঘিরিয়া দেখো ব্যর্থ প্রেমিকেরা
ঘরভাঙা ষড়যন্ত্র করিছে আক্রোশে
আমারে মারিতে তারা আমার ঘরের লোকে
নানা ভাবে দেয় প্ররোচনা
তোমারে দেখায় ভয় অতর্কিত গুপ্ত ছুরিকার
কুৎসা রচনা করে তোমার আমার

তাদের চক্রান্তে তুমি অসহিষ্ণু হ'য়ো না শঙ্কিত
তাদের মিথ্যার দর্পে টলিয়ো না তুমি।
অগ্নিকুণ্ড ঘিরে এই পতঙ্গের আস্ফালনে
বুদ্ধির বিভ্রম যেন না ঘটে তোমার।

ধৈর্য ধর, নিন্দুকের অপবাদে হয়ো না কুণ্ঠিত
দুর্নীতির ধূলিধুমে দৃষ্টি যেন অন্ধ নাহি হয়
ক্ষণিকের ঘূর্ণাবর্তে কেন্দ্রচ্যুত হয়ো না সংকোচে
সূর্যাস্তের চিতাগ্নিরে বালসূর্য মনে করিয়ো না।

ধৈর্য ধর শান্ত কর মন
অটল বিশ্বাসে ঘাঁটি আগুলিয়া থাক
আমাদের মিলিত সংগ্রাম জয়ী হবে পরিণামে
প্রেমের দুর্জয় শক্তি সূর্যালোকে হবে স্বপ্রকাশ।

সেদিন সুদূর নয় রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে আসে
পুবের আকাশ দেখো কাঁপে থরথরো
সূর্যের আসন্ন আবির্ভাবে।
ধৈর্য ধর, সূর্যেরে উঠিতে দাও, হয়ো না অস্থির।

পেচকের মতো যারা অন্ধকারে সন্তর্পণে চলে
তাদের আশ্রয়কোণ রাত্রিশেষে রৌদ্রের দাহনে
জ্বলিয়া পুড়িয়া যাবে সূর্যালোকে সংস্কৃত আকাশে
রাত্রির কলঙ্কলেখা নাস্তিগর্ভে হবে অবলীন।

নবেন্দু রায়

ভ্রমণ

আরাকান রোড ধ'রে চাটগাঁ আর মেদিনীপুর···এই বাংলাদেশ।
উৎসন্ন পল্লীর পথ···কয়েক শো মাইল মাঠ···মাঠের বিস্তার,
বিক্ষিপ্ত প্রাণের এক সূর্যাস্তের টুকরো এই উৎক্ষিপ্ত সংসার—
মরাইয়ে ইঁদুর, ঘরে চাম্‌চিকে তারপরে প্রান্তর অশেষ।
ভাবনার সীমান্তে তাই পলাতক রেললাইন—স্মৃতির ওপার।
পিছনে রক্তের দাগ, কয়েক শো মাইল মাঠ, এই বাংলাদেশ

অথচ একদিন এদেশে ধান ছিলো মাটির টান,
মুঠোয় ভরা সুখ, সুখের গান আর গানের রেশ।
সুরের হাবভাবে কখনো মাঠ ঘাট উধাও—প্রাণ-
পাখির হৈ চৈ দীঘির থৈ থৈ সবুজে শেষ।
সময় পায়ে পায়ে চল্‌তো গায়ে গায়ে ধরতো গান।
এমনি ছিলো ভাই সুখের দেশ ভাই সুখের দেশ।

অনেকদিন অনেকদূর রেললাইন ধ'রেই জীবন থেকে পালাই।
উনিশ শো তেতাল্লিশ···উনিশ শো চুয়াল্লিশ···শহর থেকে শহর।
বাংলাদেশে হারিয়ে যাই, বাংলাদেশ ছাড়াই। পথের শেষে খবর—
পিছন থেকে নরক তার হাত বাড়ায়—মড়ক, রুগ্নদেহ, বালাই;
সামনে মন টল্‌ছে, ঘোর কুয়াশা দিক্‌সীমায়, সন্ধ্যা গোনে প্রহর।
আজকে তাই অন্ধকারে ফেরার পথ-খোঁজার চোখের বাতি জ্বালাই

এক যে ছিলো ভাই সুখের দেশ ভাই সুখের দেশ।
ভাঙলো ঘর যার তেরোশো পঞ্চাশে দারুণ ঝড়।
এই কি সেই দেশ—ভগ্নমন যার, স্বপ্নশেষ?
মাঠের পার তবু হারানো পথ ধ'রে হাঁটার পর
হয়তো এরপর-ও ছিন্ন সেইসব গানের রেশ
শুন্‌বে কান, আর বুন্‌বে বীজধান, তুল্‌বে ঘর।

দীর্ঘ রাত। দূরের পথ। স্বপ্নবৎ দেশ-কাল। ওঠ্‌রে মন ওঠ্‌।
এবার ঘুম-ভাঙার দেশ ভুল ভাঙায়। ঘুম নেই। আব্‌ছা ভয় ভয়ঃ
সামনে পাকা ফসল, লোভী পঙ্গপাল, তাই এক আকালে শেষ নয়—
মৃত্যু জোর তুফান তোলে মরানদীতে বারবার। ছোট্‌রে মন ছোট্‌।
আবার ফিরে ঘর বানাই···ঘর ছাড়াই···মাঠ পার···যেখানে ভোর হয়
সেখানে শেষ বাঁধ-বাঁধার খাল-কাটার চেষ্টায় আমরা একজোট্‌।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

কয়েকটি আধুনিক সাঁওতালী গান

(অনুবাদ)

[গান তিনটিই মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা থানার আশেপাশে সাঁওতালদের মুখে শোনা। দু'দুটো বিমানঘাঁটি গ'ড়ে উঠেছে এ অঞ্চলে—ঝড়ভাঙা আর ডিগ্‌রীতে। যুদ্ধের ক'টা বছরে গ্রামাঞ্চলের চেহারা গেছে বদ্‌লে। অন্ধকার বিশাল শালবনের চিহ্ন নেই ; ঠিকাদারের অগণিত গাড়ীতে বোঝাই হচ্ছে রাশি রাশি চালানী কাঠ। বিমান ঘাঁটিকে বেড় দিয়ে গ'ড়ে উঠেছে মিলিটারী আর ঠিকাদার, মজুর আর দোকানী, আর গণিকাদের নতুন জনপদ। জঙ্গল ছেড়ে সাঁওতালের দল শহরে ছুটেছে। উদ্দাম আরণ্যক জীবন আজ ছিন্নভিন্ন। কিন্তু তবু গতিচঞ্চল যন্ত্রসভ্যতার মধ্যে তারা নতুন স্বপ্ন দেখতে শিখেছে—তারই কিছুটা আমেজ পাওয়া যাবে এই কটি গানে। —সম্পাদক, পরিচয়।]

(১)

ধানকলের বাঁশী বাজছে
যেতেও ত' হবে এতখানি রাস্তা
আর ত' জঙ্গল নেই যে ফুল ফুটে থাকবে
আর ত' ফুল নেই তোর খোঁপায় দিয়ে দেব'
আর ত' শিকার নেই মাদল নিয়ে বনে বনে ঘুরবি
আর আমরা সব ধানকলে যাবাব ছুটি।

কন্দ ঘাসও ত' শুকিয়ে গেছে,
কন্দ মূলও ত' ফুরিয়ে গেছে
যে ফিরে এসে খাবি।
তাই ধানকলেতে চল।

(২)

ও পাড়াতে বর আসছে
মরদরা সব যাচ্ছে।

আজ প্রাণ ভ'রে সব হেঁড়ে খাবো
চল্ না দিদি যাবি যে—
তেল হলুদ সব মাখতে হবে।
বর আসবে বলেই কি জঙ্গলে ফুল ফুটলো
তাই কি কদুর শিষ উঠ্ল
তাই ভুঁড়ূর ফল উঠ্ল পেকে ?

(৩)

মিলিটারী এলো।
মিলিটারী আসার ফলে
এক টাকার জিনিস হ'ল তিন টাকা।
এখন আর কাজের ভাবনা নেই—
আর নামাল দিয়েও খাটতে যেতে হবে না।
পারকুলোর বদলে এখন ধান পাবো—ধান।
যাবার আসবার ভাবনা নেই
খাটবারও আর ভাবনা নেই
জঙ্গল হ'য়ে উঠেছে শহর।
হাওয়া জাহাজের চীৎকারে আর গোলমালে
ঘুমোনোও দায় হ'য়ে উঠেছে।

আমাদের শল্মা সাঁওতালনী
তার মাথায় উঠেছে তেল
খোঁপাতে আবার ফুল গুঁজেছে।
কোত্থেকে পেল কে জানে ?

এখন গাঁয়ের মধ্যে চাল পাবি না
পাবি রোডে।
তাও চাল নয়, পাবি ভাত
গরম ভাত।

কাজ খুব, কিন্তু তবু ত' কাজ
হাতেও ত' কিছু ক'রলি।
তবে দেখিস দিদি
ট্রাকের সামনে পড়িস না।

যথাস্থান

ভোরেও ঘরের ভিতরটা অন্ধকার হয়েই থাকে। কোন দিকে কোন ফাঁক নেই আলো আসবার। একটি মাত্র জানালা আছে পশ্চিমের দিকে কিন্তু সেটিও খুলবার জো নেই। জানালার ওপারেই সেই বাবরিকাটা মুসলমান ছোকরাটির বিড়ির দোকান। মাঝখানে মাত্র দেড়হাত গলি। ইচ্ছা করলে একটু এগিয়ে এসে শিকের ফাঁক দিয়ে সে উমার আঁচলও টেনে ধরতে পারে। ইচ্ছা যে ওর করে না তা নয় কিন্তু অতখানি সাহস আজো হয়নি। তবে হ'তে কতক্ষণ। স্পর্ধা ওর দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছে। জানলা একটু খোলা পেলেই উমার দিকে তাকিয়ে সে হাসে, চোখের ইসারায় অনুরাগ জানায়, আজকাল শিস্ দিয়ে গানও আরম্ভ ক'রেছে, 'চোখে চোখে রাখি হায়রে।'

বউদি সুলতা আধো সুরে বাকি কলিটুকু গেয়ে দেয়, 'তবু তারে ধরা যায় না।' আহাহা, বেচারার হৃদয় ফেটে যাচ্ছে, গলা ভেঙে যাচ্ছে—ধরা তাকে একটুখানি দাও না ঠাকুরঝি।'

উমা বলে, 'মর তুমি। এত দয়া থাকে তুমি ধরা দিলেই পার।'

সুলতা বলে, 'আহাহা আমাকে তো আর চায় না। জানে কিনা যে আমার একজন আছে।'

উমা চুপ ক'রে যায়। একজন তার নেই। বিয়ের বছর দুয়েকের মধ্যেই সে বিদায় নিয়েছে।

সুলতা বুঝতে পারে, কথাটি ভালো হয়নি। কিন্তু প্রতিমুহূর্তে অত হিসাব ক'রে ক'রে কি আর কথা বলা যায়, না বলতে ভালো লাগে।

তবু সুলতা কথাটা আবার ঘুরিয়ে নেয়, 'তাছাড়া আমি ধরা দিলে তোমার দাদার দশাটি কি হবে তা ভাব দেখি।'

উমা বিরক্ত হয়ে বলে, 'থাক বউদি, ওসব ইতর রসিকতা আমার ভালো লাগে না। দাদাকে বলো না বাড়িটা বদলাতে। মাগো, এমন পাড়ায় ভদ্রলোক থাকে। আর এখানে এসেছি তো ছ'মাস হয়ে গেল, এর মধ্যে অন্য কোন জায়গা পাওয়া গেল না শহরে?'

সুলতাও বিরক্ত হয়, 'পাওয়া গেলে কি আর সাধ ক'রে এখানে কেউ থাকে ঠাকুরঝি! ভালো বাড়িতে থাকবার ইচ্ছা সকলেরই করে। কিন্তু দেখছ তো চোখে, মরবারও কি সময় আছে মানুষটার!'

উমা চুপ ক'রে থাকে, দাদার সম্বন্ধে কিছু বললেই বউদি ভয়ঙ্কর বিরক্ত। দাদার ওপর অভিমান করবারও যেন কোন অধিকার নেই উমার। তাকে ভালোও বলবে বউদি, মন্দও বলবে বউদি—কেবল উমাই কিছু বলতে পারবে না, সংসারে কেবল উমারই সব কথা একেবারে অবান্তর।

বেলা নটায় টিউসনি শেষ ক'রে ঘরে ফিরল প্রফুল্ল। এই একটি ঘণ্টার মধ্যে নেয়ে খেয়ে দশ মিনিট পথ উল্টো হেঁটে ট্রাম ডিপোতে পৌঁছে সেখান থেকে অফিসের ট্রাম ধরতে হবে। কেন না মাঝপথ থেকে ট্রামে ওঠা—এক মল্লযুদ্ধের ব্যাপার। যুদ্ধে সব দিনই যে জয়ী হওয়া যাবে তার তো কোন নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া এক সপ্তাহের মধ্যেই একদিন গেছে পকেট কাটা আর একদিনের হাতাহাতির ফলে নতুন কেনা জামার হাতাটা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। সুতরাং কিছু দিন থেকে প্রফুল্ল পিছু হটতে সুরু করেছে। এতে খানিকটা হাঁটতে হয় বটে—কিন্তু ভিতরে গিয়ে নির্বিবাদে ব'সে যাওয়া যায়।

প্রফুল্ল ঘরে ঢুকে জানলাটা খুলে দিতে দিতে স্ত্রীকে বল্‌ল, 'দিন দুপুরে কি ডাকাত পড়বে না কি ঘরে? এমন গরম আর অন্ধকারের মধ্যে দোর জানলা বন্ধ ক'রে কি দম আটকে মরবে?'

সুলতা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'মরলে তো বাঁচতুম। কিন্তু তুমি ভেবেছ কি? অন্য কোথাও ঘর দোর দেখবে না, এই হতচ্ছাড়া পাড়াতেই চিরটা কাল কাটিয়ে যাব।'

স্ত্রীর কথায় কোন্ জবাব না দিয়ে প্রফুল্ল বোনের দিকে তাকায়, 'আজও আবার বাঁদরামি করেছে না কি ছোঁড়াটা? কাল যে অত ক'রে ধমকে দিলাম তাতেও আক্কেল হোলো না!'

উমা মনে মনে কেমন যেন একটু লজ্জা বোধ করে। কথাটা দাদা বউদির কাছে শুনলেই পারতেন, সরাসরি তাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন।

সুলতার আক্রোশ যায়নি, বলল, 'ধমক! ধমক দিতে তুমি জানো? ধমক দেওয়ার মত জোর আছে তোমার গলায়!'

'যতটুকু ছিল, তোমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ক'রেই তা গেছে।'

উমা বিব্রত হয়ে বলে, 'চান ক'রতে যাও দাদা, অফিসে কিন্তু আজ আবার লেট হয়ে যাবে।'

প্রফুল্ল বলে, 'ধুত্তোর অফিস। চল্ উমা, দেশের বাড়িতে গিয়ে থাকি। চল্লিশ টাকার শহুরে জীবন আর নয়। দু'চার বিঘা যা জমি আছে চাষ আবাদ ক'রে খাব।'

উমা মনে মনে হাসে। অফিসে লেট হবার সম্ভাবনা দেখলেই এ কথা প্রফুল্ল প্রায়ই বলে। এখনো মাঝে মাঝে দেশের বাড়িতে ফিরে যেতে চায় প্রফুল্ল। এখনো এক মন তার গাঁয়ের জন্য কাঁদে কিন্তু আর এক মন ফের এই গলিতে এসে বাসা বাঁধে।

অফিসে বেরোবার মুখে প্রফুল্ল উমাকে ভরসা দিয়ে যায়, 'তুই ভাবিসনে উমা। ছোঁড়াটা আবার যদি কোন অভদ্রতা করে আমি এবার নিশ্চয় পুলিসে খবর দেব।'

উমা ভাইপোকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে ঘাড় নাড়ে, কথা বলে না।

প্রফুল্ল বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দোকানে ব'সে হামিদ আবার শিস দিয়ে গান জুড়ে দেয়। জানলাটা ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। তা যাক্ কিন্তু কান তো আর বন্ধ করতে পারবে না।

আশ্চর্য, এতদিন ধ'রে এত চেষ্টা করছে হামিদ কিন্তু মেয়েটার মন মোটে টলে না। অবশ্য পয়সা ব্যয় করলে মেয়ে পাড়ায় অভাব নেই। ঐ বয়সী যথেষ্ট মেয়েই আছে। কিন্তু ঐ রকম মুখ, ঐ রকম চোখ আর ঐ রকম চোখের দৃষ্টি যে আর কারোরই

নেই। এমন রূপ এমন চেহারা থাকা সত্বেও এত বেরসিক কেন মেয়েটা? তার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই ক্রুদ্ধ বিরক্ত মুখে সশব্দে জানলাটা বন্ধ ক'রে দেয়। ঐ মুখে কি বিরক্তি মানায়! মানায় ঐ চোখে অমন কড়া শাসনের ভঙ্গি। মোলায়েম ক'রে একটু হাসলে না জানি আরো কত সুন্দর দেখাতো মেয়েটিকে—ও নিজেও বোধ হয় সে কথা জানে না।

ছোট্ট আরশিটুকু সামনে নিয়ে হামিদ তার বাবরি চুলগুলি বার বার ক'রে আঁচড়ায়, বিড়ির পাতা কাটা কাঁচিটা দিয়ে কচি গোঁফের বাড়ন্ত রোমগুলি ছেঁটে ছেঁটে দেয়। দেখা যাক আরো দু-চারদিন। ভালোয় ভালোয় মেয়েটা যদি রাজী হয়ে যায় তো ভালো, না হ'লে একদিন জোর ক'রে খিল ভেঙে ঢুকবে গিয়ে ওর ঘরে। চেনে না তো হামিদকে! হামিদের উৎপাতের ভয়ে পারতপক্ষে এ ঘরেই আসে না উমা। ভিতরের দিকের ঘরগুলির সামনে যে লম্বা একফালি বারান্দা আছে চিলতে চিলতে ক'রে বাড়িওয়ালা তা প্রত্যেক ভাড়াটেকে বাঁটোয়ারা ক'রে দিয়েছে। সেই দু' হাত আড়াই হাত জায়গায় তোলা উনুনে রান্না করতে হয়। উমাদের বারান্দা নেই। ঘরের সামনে সদর দরজার রাস্তা। ভুবনবাবু ঘরের ভাড়া নিয়মিত দিতে পারেন না। তার শাস্তি হিসাবে রান্নার জায়গার অর্দ্ধাংশ প্রফুল্লদের দিতে হয়েছে। সকাল সন্ধ্যায় রান্নার সময়টা উমার সেখানেই কাটে। কোলের কাঁদুনে ছেলেটাকে নিয়ে বউদিব কষ্ট হয়, অফিসের ভাত তাড়াতাড়ি ক'বে দিতে পারে না। তাই উমাই প্রায় রোজ আসে রাঁধতে। মাছের রান্না শেষ ক'রে উনুন লেপে নিজের জন্য আবার আলাদা ক'রে রেঁধে নিতে হয়।

শোয়ার জন্য আলাদা কোন ব্যবস্থা হয়নি। বাড়িওয়ালার বুড়ো মা ছোট ছোট নাতিনাতনীদের নিয়ে দোতলার কোণের ঘরটায় থাকে। রাত্রে সেইখানে গিয়ে বিছানা পাতে উমা। বুড়ী বলে, 'তোর কোন ভয় নেই মা! আমার পাশে নিশ্চিন্তে শুয়ে ঘুমো। কেউ তোর চুলেব ডগাটুকুও ছুঁতে পারবে না।'

শুয়ে শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত তবু ঘুম আসতে চায় না উমার, রাত্রে বাড়িওয়ালা উঠে মাঝে মাঝে বাইরে যায়। আর তাব চটি জুতোর শব্দে বুকের মধ্যে অকারণে উমার টিপ টিপ করতে থাকে, বার বার ঘুম ভেঙে যায়। একেকবার মনে হয়, এর চেয়ে শ্বশুরবাড়িতে থাকাই ভালো ছিল। কিন্তু থাকবে কি ক'রে। সেখানে শাশুড়ী আর ভাসুর তাকে দু'চোখে দেখতে পারলেন না। তাতে ক্ষতি ছিল না। দেবরটি দু'চোখ ভোরে দেখতে চাইল, তাতেই হোলো বিপত্তি।

সুলতা মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে বলে, 'ঠাকুরঝি তোমার কিন্তু ভাই একটু বাড়াবাড়িও আছে; দুপুর বেলায় তো নিজেদের ঘরে এসে ঘুমোতে পার। ওর দিকে না তাকালেই হোলো; না শুনলেই ওর শিস দেওয়া গান।'

উমা চুপ করে থাকে, সুলতা তো জানে না কপাল যাদের পোড়া অত সহজে তাবা ছাড়া পায় না। কেবল না শুনলে ও না তাকালেই হয় না, অন্যের তাকানো শুনানোর জবাবদিহিও দিতে হয়।

কিন্তু তবু সুলতা সেদিন জোর ক'রেই উমাকে ধ'রে নিয়ে এল—'তোমার পায়ে পড়ি ঠাকুরঝি, সারাদিন তুমি এঘর ওঘর করতে পাববে না। থাকো আমার পাশে

শুয়ে। কে তোমার কি করতে পারে আমি দেখি।' তার পর ঘরের জানাল্লাটা খুলে দিল স্বলতা। দিন রাত জানালা বন্ধ রাখতে রাখতে ভিতরটায় ভ্যাপসা গন্ধ হয়ে গেছে।

স্বলতা ছেলে কোলে নিয়ে অঘোরে ঘুমোয় কিন্তু উমার ঘুম পায় না। সে যে এ ঘরে এসেছে কি ক'রে টের পেয়ে গেছে ছোঁড়াটা। শিস দিয়ে আবার গান ধরেছে। উমা উঠে জানলাটা বন্ধ করতে গেল। হামিদ বোধ হয় এইই চেয়েছিল। উমা যেই জানলার ধারে এলো হামিদ এক বাক্স সাবান আর তরল আলতা উঁচু ক'রে তাকে তুলে দেখাল। হামিদ কিছুদিন ধরে জিনিসগুলি কিনে রেখেছিল। আলতা সাবানের লোভ কোনো মেয়ে সম্বরণ করতে পারে না। কিন্তু উমা যখন তার পরেও সশব্দে আগের মতই জানলা বন্ধ ক'রে দিল, হামিদের মনে হোলো—তার হৃদপিণ্ডটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেছে। এমন নিষ্ঠুর এই মেয়ে জাতটা? ওদের কেবল ওপরটাই নরম, ভিতরটা শক্ত পাথর ছাড়া কি কিছু নয়?

প্রফুল্ল বাড়ি এসে সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেল। আর তো চুপ ক'রে থাকা চলে না, বাড়ি এবার বদলাতেই হোলো। কিন্তু বদলাবার চেষ্টা কি আর সে করে না? ক'রলে হবে কি? কারোর মুখে এমন কথা শোনা যায় না যে অমুক জায়গায় আছে ঘর একখানা। কিন্তু বাড়ি বদলাতে পারুক আর না পারুক ছোঁড়াটাকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার। দিনের পর দিন ও যে ক্রমেই প্রশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারেও প্রফুল্ল খুব ভেবে দেখেছে। এই নিয়ে হৈ চৈ হাঙ্গামা ক'রে লাভ নেই। পাড়া ভ'রে গুণ্ডা আর বদমাসের আড্ডা। তাছাড়া এ বাড়ির লোকের প্রকৃতিও সে জানে। সাহস ক'রে কেউ হামিদের গায়ে হাত দেয় না। সামনে লোক দেখানো একটু ধমকটমক হয়তো দেবে কিন্তু আড়ালে গিয়ে মুচকি হাসবে আর বলবে, 'এক হাতে কি আর তালি বাজে মশাই!'

কিন্তু আজ আর প্রফুল্লর সহ্য হোলো না। হামিদের বিড়ির দোকানের সামনে গিয়ে বলল, 'হারামজাদা বদমাস! তোমাকে আমি পুলিসে দেব—তবে ছাড়ব।'

হামিদ মনে মনে হাসল। রোজ দেখে দেখে লোকটিকে সে চিনেছে। সকাল বেলায় উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায়, সন্ধ্যায় গড়াতে গড়াতে আসে। কখনো কোনো দিকে তাকায় না, সকালে থাকে না সময়, সন্ধ্যায় থাকে না সামর্থ্য।

হামিদ নিতান্ত নিরীহ ভঙ্গিতে বলল, 'মাথা গরম করেন কেন বাবু। আমি তো কেবল বিড়ি বাঁধি আর বেচি। পুলিস কেন আসবে এখানে। যদি আসে তো বিড়ির লোভেই আসবে। ভারি মিঠে কড়া বিড়ি আমার। আপনি তো কোনোদিন খেয়ে দেখলেন না।'

কথাটা কেবল পরিহাস করেই যে হামিদ বলে তা নয়। মাঝে মাঝে ভারি সাধ যায় প্রফুল্লকে তার নিজের হাতে বাঁধা বিড়ি খাওয়াতে। শত হলেও প্রফুল্ল তো মেয়েটিরই দাদা।

'আচ্ছা, তোমার ছ্যাবলামি আমি বের করছি দাঁড়াও!' দাঁত কিড়মিড় করতে করতে প্রফুল্ল ফিরে আসে।

জানালায় দেখা না পেলেও পথে মাঝে মাঝে উমাকে হামিদ দেখতে পায়। তার দোকানের সামনে দিয়েই একটা বুড়ীর সঙ্গে উমা কোনো কোনো দিন নাইতে যায় গঙ্গায়

ফেরার পথে তার সুন্দর ছোট্ট কপালে শ্বেতচন্দনের ছাপ দেখে হামিদ মনে মনে ভাবে, মুসলমান বিড়িওয়ালা না হয়ে গঙ্গার ঘাটের ঠাকুর হয়ে জন্মালে আর কিছু না হোক ঐ কপালে নিজের হাতে সে চন্দনের তিলক তো পরিয়ে দিতে পারত।

হঠাৎ সেদিন তার চোখে পড়ল মেয়েটির পরনের কাপড়খানা শতছিন্ন। গিঁট ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। যে কাপড়খানা পুঁটলির মত হাতে ক'রে নিচ্ছে সেখানারও একই দশা।

পরের কয়েকদিন মেয়েটিকে আর গঙ্গায় যেতে দেখা গেল না। হামিদ সব বুঝতে পারল। কাপড় নেই শহরে একথা অনেককেই বলাবলি করতে শুনেছে কিন্তু আজ এই প্রথম যেন সে স্বচক্ষে তা দেখতে পেল। না থাকবার বেদনাটা এই প্রথম বিঁধল হৃদয়ে। ছিছি, কেন মিছামিছি আলতা আর সাবান সে কিনেছিল। কাপড়ের কথাটা কেন তার মনে হয়নি, কেন চোখে পড়েনি।

পরদিন কি একটা কার্জে জানলার কাছে আসতেই উমা আর স্থলতার চোখে পড়ল, হামিদ একখানা লাল ডুরে শাড়ি তাদের উঁচু ক'রে তুলে দেখাচ্ছে আর মিষ্টি মিষ্টি হাসছে।

স্থলতা বলল, 'আহাহা, দিচ্ছে যখন হাত পেতে নাওই না ঠাকুরঝি।'

উমা কঠিন ভঙ্গিতে বলল, 'বউদি ইতরতার কি কোনো সীমা নেই তোমার?' তারপর উমা জানলাটা ফের বন্ধ ক'রে দিল।

বাসায় এসে খবরটা শুনে প্রফুল্ল কিন্তু আজ আর তেমন চটল না, বলল, 'বোধ হয় চোরাবাজার থেকে কিনেছে, এখন চড়া দামে বিক্রি করতে চায়। আচ্ছা দাঁড়াও, দেখি খোঁজ নিয়ে। যদি ধরা যায়, মন্দ কি।'

শাড়িখানি নিজের হাতে উমাকে পৌঁছে দিতে পারলেই সব চেয়ে আনন্দ হোতো হামিদের, কিন্তু তেমন স্থবিধা তো শিগগির হবে না, মেয়েটা তাকে দেখলেই পালায়। দেওয়া যাক ওর দাদার মারফতেই। বিনা পয়সায় দিতে পারলেই সব চেয়ে ভালো হোতো কিন্তু ইব্রাহিম সেখ ঐ শাড়িখানার জন্যে পুরোপুরি দশটা টাকা তার কাছ থেকে নিয়েছে। আজ বাদে কালকের হোটেল খরচটাও হামিদের কাছে আর নেই।

হামিদ বলল, 'দশ টাকা দিন বাবু, কেনা দামেই দিচ্ছি আপনাকে।'

মনে মনে ভাবল, বিনা দামে যদি দিতে পারতাম। প্রফুল্ল তবু দর করে, 'দশ টাকা! মাথায় বাড়ি দিতে চাস না কি তুই। দেব একবার পুলিসে খবর!' অগত্যা ন'টাকায় রফা করতে হয়। বেচতে তাকে যে হবেই। লোকসানে না বেচলেই কি লোকসান সে ঠেকাতে পারবে!

কিন্তু পরদিন সবিস্ময়ে হামিদ দেখতে পেল, ডুরে শাড়িখানি উমা পরেনি। তার বউদিই সেখানা প'রে ছেলে কোলে নিয়ে ঘর ভ'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হামিদের মনে যে জ্বালা ধরল একশ টাকা লোকসানে তা হয় না। তলে তলে তাহলে এই শয়তানিই ছিল ওদের মনে। আচ্ছা হামিদও দেখে নিচ্ছে। তার পর থেকে হাসিতে দৃষ্টিতে অশ্লীল স্বরের গানে হামিদের প্রণয় নিবেদন স্পষ্টতর হোলো, উচ্চতর হোলো এবং অবিশ্রাম গতিতে চলতে লাগল। দোকানের সামনে দিয়ে ফের ওকে একবার যেতে দেখলে হয়, হাত ধ'রে উমাকে সে টেনে আনবে ভিতরে। দেখবে কে তার কি করতে পারে।

স্থলতার বাপের বাসা বেনেটোলায়। ষষ্ঠী পূজার দিন সকালবেলায় স্থলতার ভাই নিতাই এল সবাইকে নিতে। ‘চল দিদি।’

‘এখনই! বলিস কিরে, তোর জামাইবাবু অফিসে যাবে না? রেঁধে বেড়ে দিতে হবে না তাকে?’

উমা বলল, ‘তাতে কি, তুমি যাও বউদি—আমি দেখব সব।’

নিতাই বলল, ‘তাই বুঝি ভেবেছেন উমাদি। দেখবার জন্যে আপনাকে রেখে যাচ্ছি। চলুন চলুন চটপট তৈরী হয়ে নিন।’

স্থলতা বলল, ‘চল ঠাকুরঝি।’

প্রফুল্ল বলল, ‘আমার জন্যে ভাবিসনে। একবেলা হোটেলে চালিয়ে নেব।’

নিতাই বলল, ‘আহাহা কেন আবার মিছামিছি হোটেলে খবচ করতে যাবেন, ওবেলা তো নেমন্তন্নেই যাচ্ছেন।’

কিন্তু নিতাই কি পাগল হয়েছে? উমার কি জো আছে যাওয়ার?

নিতাই বলল, ‘কেন—কি হয়েছে উমাদি।’

‘হবে আবার কি। শরীরটা ভাল নেই ভাই।’

প্রফুল্ল ও একটু যেন অসন্তুষ্টভাবে বলল, ‘কেন কি হয়েছে তোর শরীরেব?’

তারপর উমার দিকে তাকিয়ে কি যেন বুঝতে পেরে প্রফুল্ল বলল, ‘যাওতো নিতাই, দুটো সিগারেট নিয়ে এসোতো সামনের দোকান থেকে, এই নাও পয়সা।’

নিতাই বেরিয়ে গেলে প্রফুল্ল বলল, ‘তুই আমার ধোয়া কাপড়খানা প’রে যা, চুল পেড়ে কাপড়ে তো দোষ নেই।’

উমা ম্লান একটু হাসল, ‘আর তুমি! তুমি বুঝি ঐ পা-জামা প’রে যাবে জামাইষষ্ঠীতে!’

উমা ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নার আয়োজন করতে বসল। এবং কারো ডাকাডাকিতেই আর ফিরল না।

স্থলতা মনে মনে লজ্জিত হোলো, ক্ষুব্ধ হোলো। কিন্তু শরীব ভালো না থাকার অছিলায় সে তো আর না গিয়ে পারে না। কাপড় কি তারই আছে? আটপৌরের মধ্যে সেদিনের কেনা ঐ ডুরে শাড়িখানাই কেবল আস্ত। কিন্তু তা পরে তো আর বেরোন যায় না। বাপ মায়ে ভাববে, একেবারেই ফকির হয়ে গেছে। বাক্স ঘেঁটে অবশেষে একখানা অত্যন্ত পুরোনো শাড়ি বেরোল। প’রে যাওযা যায। কিন্তু অতি সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। ফেঁসে যাওয়ার আশঙ্কা প্রতিমুহূর্তে। স্থলতারা যাওয়ার খানিক পরেই খেয়ে দেয়ে প্রফুল্লও বেরিয়ে গেল অফিসে।

উমা চান ক’রে কেবল কাপড় বদলেছে—বাড়িওয়ালার মা বললেন, ‘আহাহা নেয়ে উঠলি মা, পিণ্টুকে যদি নাইয়ে দিতিস্ একটু। ওর মা তো হাঁসপাতালে দিব্যি আছে, যত জ্বালা হয়েছে আমার।’

অপ্রসন্নতা চেপে উমা বলল, ‘তাতে কি মা, পাঠিয়ে দিন—আমিই দিচ্ছি ওকে নাইয়ে।’ কিন্তু পাঁচ ছ’বছরের ছেলে হলে কি হবে, পিণ্টু একেবারে বদমাসের হাঁড়ী। ওর মাথায় এক ঘটি জল ঢালতে না ঢালতে ও সমস্ত বালতির জল দিল উমার গায়ে ছিটিয়ে। পিণ্টুকে নাওয়াতে গিয়ে উমা নিজেই আর একবার নেয়ে উঠল।

একখানা মাত্র কাপড় আছে শুকনো। বউদির সেই ডুরে শাড়িখানা। ঘরে এসে আলনা থেকে সেখানা পেড়ে নিয়ে ভিজে কাপড় বদলে ফেলল উমা। কিন্তু এখানা প'রে সকলের সামনে গিয়ে খেতে বসতে লজ্জা করে। একটু দেরি করলেই আগের ভিজে কাপড়খানা শুকিয়ে যাবে।

সমস্ত ঘরটা অগোছালো। বাপের বাড়ি যাওযার আগে ছেলেকে সাজিয়েছে, নিজেকে সাজিয়েছে কিন্তু ঘরটা একটু স্বরে-তেরে রেখে যাওয়ার বউদির সময় হয়নি। কেন উমাই তো আছে। বলিহারি মানুষের আক্কেল! অপ্রসন্ন মুখে উমা ঘরটা ঝাঁট দিতে লাগল। তারপর স্থূলতার প্রসাধন পর্বের শেষে যা সামান্য আবর্জনা জমেছিল ঘরে, সব জড়ো ক'রে জানলার একটা পাট খুলে দুটো শিকের ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে সেগুলি ফেলে দিল রাস্তায়।

হামিদ যেন এতক্ষণ তাকে তাকে ছিল। উমার সাড়া পাওয়া মাত্রই বিড়ি বাঁধা বন্ধ রেখে দু'চোখ তুলে জানালার দিকে তাকাল। মুহূর্তকাল মুগ্ধভাবে তাকিয়েই রইল, তারপর প্রসন্নকণ্ঠে বলল, হ্যাঁ, এবার ঠিক হয়েছে—চমৎকার মানিয়েছে এবার।

উমা চমকে উঠে জানালা বন্ধ ক'রে সরে এল ওখান থেকে। লোকটা আরও কি ক'রে বসবে ঠিক কি। ভয়ে বুকের ভিতরটা কাঁপতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য, হামিদ আজ আর শিস দিয়ে উঠল না, অশ্লীল স্বরে গানও ধরল না, চুপ করেই রইল। তবু উমার দুই কান ভরে একটি মৃদু কণ্ঠ বারবার ধ্বনিত হতে লাগলঃ চমৎকার মানিয়েছে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

চারু ও ব্যবহারিক ব'লে দু'রকম শিল্প নেই। শিল্প শুধু একই রকম—ব্যবহার ও সৌন্দর্য উভয়কে নিয়ে তার গঠন, তার ব্রত হচ্ছে জীবনকে সুন্দর সুন্দর রূপমূর্তি দিয়ে, সুন্দর সুন্দর চিন্তার বস্তু-বাহন দিয়ে পরিবৃত ক'রে জীবনে মনোহারিত্ব সঞ্চার করা। শিল্পী ও কারিগর ব্যাপৃত সেই একই মহান্ কাজে। তাদের দু-জনেরই কাজ হচ্ছে মানুষের আবাসকে চোখ জুড়োবার, মন ভুলোবার রূপে রূপান্তরিত করা।—আনাতোল ফ্রাঁস

বার্তা

[এই গল্পটি মিসেস্ টিঙ্‌লিঙের "নিউজ" গল্পের অনুবাদ

—টিঙলিঙ চীনে স্থলেখিকা ব'লে স্থবিদিত। চীনের যুবক যুবতীদের কাছে তাঁর লেখা অতি প্রিয়—এমন কি জাপানের বিপ্লবী তরুণ তরুণীরাও তাঁর লেখার আদব ক'রে থাকে। তাঁব অনেক গল্পই রুশ ভাষায়, জাপানী ভাষায় এবং ফবাসী ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

১৯০৫ সালে হুনান প্রদেশের "চাঙতেহ্" অঞ্চলে এক গরীবের গৃহে টিঙলিঙ জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষার জন্য তাঁকে যথেষ্ট সংগ্রাম করতে হয়। ছাত্রী জীবনেই তিনি বিপ্লবী আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন এবং চীনের বিপ্লবী তরুণ তরুণীদের কেন্দ্র ক'রে কয়েকটি গল্প লেখেন। বিপ্লবী নেতা "হু-ইয়ে-পিঙ্"-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। "হু-ইয়ে-পিঙ্" শুধু বিপ্লবী নেতা-ই ছিলেন না—তিনি ছিলেন একজন সু-সাহিত্যিক। চিয়াংকাইসেকের অধিনায়কত্বে যখন কুয়োমিনটাঙ দল কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে তখন অন্যান্য কমিউনিষ্টদের সঙ্গে "হু-ইয়ে-পিঙ"কেও হত্যা করা হয়। "হু-ইয়ে-পিঙ"এর হত্যার পব "টিঙলিঙের" কয়েকজন বন্ধু তাঁকে বিপ্লবের পথ থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করেন, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি। "টিঙ-লিঙ" তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বিপ্লবের বাণী প্রচার করতে থাকেন।—১৯৩৩ এ চিয়াং সরকারের "ব্লু জ্যাকেটস্" সম্প্রদায় "টিঙলিঙ"কে গ্রেপ্তার কবে কোথায় নিয়ে যায় তার কোন খবরই কয়েক বছর পাওয়া যায়নি। প্রথমে সবাই মনে করেছিল যে, তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে, অবশ্য পরের সংবাদ হচ্ছে যে, তিনি চিয়াং-এর কারাগারে এখনো বন্দিনী,—তাঁর সাতখানি বই কুয়োমিনটাঙ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে]

১

"মা, তুমি রান্নাঘরে যাও"—এই ব'লে আ-ফু কাঠের সিঁড়ির ছোট্ট দরজা দিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে গেল। তার পিছনে পিছনে আবার চলে গেল সেই যুবকটি। যুবকটির হাতে রয়েছে তার ভাঁজ করা ছাই রঙের ছোট্ট জামাটি।

মা একটি সরু জানালার পাশে বসেছিল—জানালাটি দু'ফুট একখানি তক্তা দিয়ে ঢাকা। এই তক্তাখানাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেই ঘরে বেশ আলো আসে। সেই আলোতে মা তার নাতির ছেঁড়া পাজামাগুলি মেরামত করতে পারে।

তারা ফিরে এলো। আ-ফু তার মা'র দিকে ফিরেও তাকালো না—তার নীল জামাটা খুলে সে বিছানার উপর গিয়ে বসলো এবং বন্ধুকে তার পাশে এসে বসতে বললো।

মা খুব ভালোভাবেই বুঝলো যে, এখন সেই পুরানো কাজ আবার স্থরু হবে। যেদিন থেকে এ কাজ স্থরু হয়েছে সেদিন থেকে তার মনে হয়েছে যে, তার ছেলে চলে গিয়েছে অন্য এক জগতে—সে জগত তার কাছে দুর্বোধ্য, সে-জগতে তার প্রবেশাধিকার নেই। সে-জগতে প্রথম পা দিয়ে-ই আ-ফু তার মা'কে একরকম উপেক্ষা করেই চলেছে। ছেলের এই উপেক্ষায় মা ক্ষুব্ধ না হ'য়ে পারে নি। কিন্তু, তবুও মা তার

ছেঁড়া জামা ও টুকরা কাপড়ের বাণ্ডিলটা গুটিয়ে নিল; তারপর নীচু হ'য়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—যাবার সময় আড়চোখে আগন্তুকের দিকে তাকালো।

আসলে মা কিন্তু রান্নাঘরে গেল না। তাব বদলে ছোট্ট দরজাটি দিয়ে সে ধীরে ধীরে সিঁড়ি থেকে নেমে সিঁড়ির ঘরে গিয়ে বসলো। একজনের পক্ষে লম্বা হ'য়ে শোবার জন্য সিড়ি'র ঘরটি বেশ পর্যাপ্ত। বাইরে সূর্যের আলো যখন প্রখব থাকে তখন-ও এ ঘরটি অন্ধকার। কিন্তু অন্য ঘরটি থেকে এ ঘরটি শুধু একটি পাতলা কাঠের দেয়াল দিয়ে পৃথক কবা এবং তার ছেলের প্রত্যেকটি কথা সুস্পষ্টভাবে এ ঘর থেকে শোনা যায়।

অল্প সময়ের মধ্যে কারখানা থেকে আ-ফুর কয়েকজন সহকর্মী এসে উপস্থিত হ'লো। মা'র চোখের সামনে দিয়ে তারা সবাই সেই নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে ছোট্ট ঘরটিতে গিয়ে বসলো—ঘরটিতে মাত্র একটি জানালা।

তারা কাজের কথা আগ্রহের সঙ্গে আরম্ভ করলো। মা তখন খুব সাবধানে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ ক'রে সে সযত্নে শুনছিল ওদের কথাবার্তা—একটি অক্ষরও যেন বাদ না যায়।

তখন সন্ধ্যা। সরু গলিটায় অনেক লোক জমেছে। এদের মধ্যে কয়েকজন নিজেদের গা রগড়াচ্ছে, কেউ কেউ বা পরস্পরের গা রগড়ে দিচ্ছে। গলিটার ছোট্ট টুলগুলিতে অর্ধনগ্ন অবস্থায় বসে রয়েছে অনেকে—ভাঙা বেতের পাখা দিয়ে তারা মশা তাড়াচ্ছে। লোকগুলো কথা বলেই চলেছে, হাস্‌ছে, নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা তামাসা করছে বা গান গাইছে—তারা গাইছে তাদের গ্রাম্য-গান যার মর্মকথা শুধু মজুররা-ই জানে। এই গোলমালে মাঝে মাঝে মা'র শুন্‌তে অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু মা কাঠের দেয়ালে কান পেতে স্থির হ'য়ে সযত্নে শুন্‌ছিল তার ছেলে ও সহকর্মীদের সমস্ত কথাবার্তা।

অন্ধকার হয়ে এলো। প্রত্যেকটি পরিবারই রান্না করতে আরম্ভ করলো। প্রত্যেকটি কুটির থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে বেরুতে লাগলো জ্বালানী কাঠের এবং রান্না করবার সস্তা তেলের ধোঁয়া। সমস্ত গলিটা-ই ধোঁয়ায ভরে গেল, তারপর ধীরে ধীরে সেই ধোঁয়া দূরে—বহুদূরে ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু সিঁড়ির ঘরে যেখানে মা শুয়েছিল সেখানে ধোঁয়া প্রবেশ ক'বে আর বেরুতে পারলো না—সমস্ত ঘরটা ধোঁয়ায় ভরে গেল। মা আর কাশি চেপে রাখ্‌তে পারলো না। খক্ খক্ ক'রে সে কেশে উঠলো।

পাশের ঘর থেকে তার ছেলের সহকর্মীদের ভিতর একজন বল্লে—"কি বিশ্রী কাশি! তোমার মা কি অসুস্থ?"

মা তখন ধোঁয়ায় ভরা ঘরখানায় বসে অতিকষ্টে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল।

আ-ফু তখন-ই জানলো যে, তার মা সিঁড়ির ঘরেই রয়েছে। তাই আ-ফু বল্লে—"মা, ঐ গর্তটা থেকে বেরিয়ে এসো। দেখছো না কি অসম্ভব গরম! কেন-ই বা তুমি ওখানে অমন ক'রে বসে আছো?"

মা কিছুতেই ওখান থেকে নড়তে রাজী নয়—মুখে এক টুকরা কাপড় গুঁজে সে চুপ ক'রে রইল। সে জান্‌তো যে ওরা তাকে চায় না। কিন্তু তবুও, ধোঁয়ায় নাক চোখ জলে ভরে যাওয়া সত্বেও, ওদের কথাবার্তা শুনবার জন্য সে স্থির সংকল্পে বসে রইলো। তার ছেলের বৌ ও নাতি নীচে খেতে বসে যখন তাকে ডাকলো

তখনও সে কোন উত্তর দিল না। ঝাঁকে ঝাঁকে মশা এসে তাকে আক্রমণ করলো—হাত দিয়ে সে শুধু তাদের তাড়িয়ে দিলে। কিন্তু তারা পালিয়ে যাবার পূর্বে তার রক্তহীন হাত দুখানায় রেখে গেল অসংখ্য দাগ।

অবশেষে অতিথিরা কথা শেষ করে চলে গেল। আ-ফু রান্নাঘরে এসে খাবার নিতে লাগলো—খাবারগুলো তখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মা কিন্তু তখনও তার গর্ত থেকে বেরোয়নি। পরে মা এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। ছেলের বৌ তখন পিছনের দরজায় তার ছোট্ট ছেলেটিকে কোলে নিয়ে বসেছিল। আর তার পাশেই আ-ফু তার খাবার পাত্রটি ভরে নিচ্ছিল। মার দিকে তাকিয়ে-ই বৌ জিজ্ঞেস করলে—

"কি ব্যাপার মা, তোমার কি অসুখ করেছে?"

"বাজে কথা, আমি বেশ ভাল আছি।" মা'র মুখের রেখায় ফুটে উঠলো আনন্দ ও তৃপ্তির ভাব এবং তারই অভিব্যক্তি হ'লো তার কথায়—তার কথাগুলো বেরিয়ে আসছিল তার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে।

কিন্তু তার ছেলে কিংবা ছেলের বৌ কেউ-ই এ জিনিসটা লক্ষ্য করলো না।

২

ছেলে এবং বৌ—দু'জনই কারখানায় কাজে চলে গিয়েছে। দুষ্টু নাতিটা গলিতে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করছে।

মা বসে বসে একটা শতচ্ছিন্ন পোশাক সেলাই কচ্ছিল। পোশাকটি উপরের ফ্ল্যাটের ইয়ে-টা-ফুর। ইয়ের স্ত্রী নিজেও কাজ করে কারখানায়—তার অবসর-সময় কেটে যায় রান্না করতে আর বাসন, জামা-কাপড় প্রভৃতি পরিষ্কার করতে। সুতরাং পোশাক মেরামত করবার সময়-ই বা সে পাবে কি ক'রে?

সেলাই করতে করতে মা অস্বস্তি বোধ করছিল এবং নড়ছিল। কি যেন তার মনকে ভারাক্রান্ত ক'রে তুলছিল। যে কোন একজনের কাছে সে মন খুলে সব বল্‌তে চায়—কাজ করবার প্রয়োজনীয়তা সে অনুভব করলো। কিন্তু কার কাছেই বা সে কথা বল্‌তে পারে, কার কাছেই বা কাজ করবার জন্য সে আবেদন জানাতে পারে? এমন কি তার নিজের ছেলে পর্যন্ত তাকে উপেক্ষার বস্তু মনে করে; তাছাড়া কি সে বল্‌তে চায় বা কি সে করতে চায় সে সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণাও নেই। তাই ব্যথিত মনে সে অনেকক্ষণ একাই বসে রইলো। তবুও কাজের কথা ভাবা সে ছেড়ে দিল না। কেন জানি না হঠাৎ তার মনে হলো বৃদ্ধা মিসেস ওয়াংগু-এর কথা। মিসেস ওয়াঙের বাড়ীতে গিয়ে সে উঠলো। বৃদ্ধা ওয়াঙ কাছেই থাকে।

ওয়াঙ পো-পো তখন একটা কাঠের গামলার সামনে নীচু হ'য়ে কাপড় পরিষ্কার কচ্ছিল। মা তার পাশে এসে দাঁড়াল এবং প্রথমে বিশেষ জরুরী কিছুই বললো না। শেষে, কিছু না ভেবেই সে বলে ফেলল—"সন্তার দেশের কথা কি মনে পড়ে? সেই যেখানে আমরা সবাই খাবার জন্য একসময় গিয়েছিলাম, সে-সময়ের কথা কি তোমার মনে আছে?"

"সে কথা কি ভুলতে পারি? প্রত্যেকেই আমরা রান্না করলাম, খেলাম, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জিনিসে ভাগ বসালাম। তখন আমি বলেছিলাম—এ ভাবে যদি আমরা চিরকাল কাটাতে পারি তবে কি মজাই না হয়!"

মিসেস ওয়াঙ হাতের কাজ থামিয়ে ভিজা হাত দুখানা নিজের উরুতে মুছলো। পাশের ঘরের বৃদ্ধা মিসেস লি' কথা শুনেই এসে উপস্থিত হয়েছে—উত্তেজিত স্বরে ওয়াঙ ও মা'র কথার মাঝখানে সে বলে উঠলো—"হুঁ, আমরা তো প্রথমে ও কথা বিশ্বাস-ই করিনি। আ-শান যখন এসে আমাদের ওকথা বললো তখন সবাই তাকে মিথ্যেবাদী ব'লে উড়িয়ে দিল। আমরা যখন দেখলাম ওকথা ঠিক সত্যি তখন-ও আমরা বিশ্বাস করতে পারিনি—সেই লোকগুলো যখন আমাদের নিমন্ত্রণ পর্যন্ত করলো তখনও আমরা সন্দেহ করেছিলাম। কিন্তু খুব অল্পদিনের জন্যই ঐ ব্যবস্থা ছিল এবং সেটাই আমার খারাপ লেগেছিল। অবশ্য নচ্ছার পুলিস আর জাপানী চরেরা এসে পড়ার জন্যই তারা স্টোভ, কেট্‌লী প্রভৃতি নষ্ট করে ফেললো।"

"খাওয়াটা কি আইনবিরুদ্ধ! —সত্যি কি তাই? তবে জীবন্ত শবদেহগুলো—"

আ-ফুর মা আগ্রহের স্বরে জিজ্ঞেস করলো—"সেদিন সমস্ত খরচ কে দিয়েছিল, তা কি কিছু জানো?"

"নিশ্চয়ই। লিউ নামে সেই বড়লোকটি সমস্ত খরচ দিয়েছিল এবং পরে সে জন্যই পুলিস তাকে শহর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।"

"কি নাম বল্লে? লিউ? কেত্থেকে সে টাকা পেলে? কোন বড়লোক কি ওরকম ভাবে টাকা খরচ করে? না, কিছুতেই না—সে নিশ্চয়-ই আমাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে মজুরী দিত। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এই টাকা এসেছে......"

মা তার গলার স্বর নীচু ক'রে খুব সাবধানে বাকী কথাগুলো বললো।

মিসেস ওয়াঙ ও মিসেস লি' দু'জনেই চীৎকার ক'রে উঠলো—"তাই না-কি?"

অ-ফুর মা বলতে লাগলো—"কখনোই একজন লোক নয়—অনেক। অনেক লোক। যুদ্ধের সময় হাজারে হাজারে লোক একত্র হ'য়ে জোগাড় করলে অনেক টাকা এবং তা তারা পাঠালে সাংহাইতে এবং তার-ই কিছুটা অংশ এসেছিল আমাদের জন্য, কারণ আমরা তখন জাপানী কারখানায় ধর্মঘট করেছিলাম এবং জাপানী দস্যুরাই সাংহাই আক্রমণ করেছিল। তখন আমাদের খাবার কিছুই ছিল না তা কি তোমাদের মনে নেই? তাই তারা আমাদের জন্য ঐ রকম বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করেছিল।"

"ও, তাই হবে। গরীবকে সাহায্য গরীবরাই করে। আমার এটা বোঝা উচিত ছিল যে, লিউ কিছুতেই অতটা বোকা নয়। কিন্তু সমস্ত খবর তুমি কোত্থেকে পেলে?"

ছেলে তাকে উপেক্ষা করেছে—মন তার ভরে উঠেছে দুঃখে। কিন্তু আ-ফু'র মা সে সব ভুলে গেল। তার মনে হ'ল, অনেক জিনিস সম্বন্ধেই সে এখন অভিজ্ঞ। গর্বের সঙ্গে সে বলতে লাগলো—"আগে আমি ঢাকের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়া মানুষের মতনই অজ্ঞ ছিলাম। কিন্তু আমি সবই শুনলাম—তারা যে জয়লাভ করেছে তাও শুনেছি এবং এখন শুনছি যে, তাদের জন্য উপহার পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছে।"

"ঠিক কথা, এবং তাহলে খুব ভালোই হয়। তারা আমাদের সাহায্য করেছিল, আমাদেরও তাদের সাহায্য করা উচিত।"—এ কথাগুলো বেরিয়ে এলো বৃদ্ধা লি'র মুখ থেকে ; মনে হলো তার সমস্ত জীবনে এরকম নির্ভুল সিদ্ধান্তই সে করে এসেছে।

নিশ্চিত হ'বার জন্যই মিসেস্ ওয়াঙ বল্‌লে—"কিন্তু কে জানে কখন তারা সাংহাইতে এসে পৌঁছবে?"

"চিন্তিত হ'য়ো না, তারা আসবে—একদিন তারা আসবেই। কত শীগগির তারা আসবে তা নির্ভর করছে আমাদের উপর। যত শীগগির তাদের আমরা কিছু পাঠিয়ে দেব, তাদের আসবার জন্য টেলিগ্রাম করবো, তাদের জানাবো যে তাদের পথ চেয়ে আমরা ব্যস্ত হ'য়ে আছি, তত শীগগিরই তারা আসবে। যদি আমরা তাদের জানিয়ে দিতে পারি যে, আমরা দুঃখকষ্টে আছি তা হ'লে নিশ্চয় তারা প্রথমে এখানেই আসবে।"

মিসেস ওয়াঙ-কে ব্যাখ্যা ক'রে মা এ কথাগুলো বললো। মনে হচ্ছিল যেন মা সব কিছুই জানে।—যদিও সে যা শুনেছিল এ কথাগুলো কিন্তু তা নয়। এ কথাগুলোকে সত্য বলে সে শুধু কল্পনা করেছিল এবং যা সে নিশ্চিত বলে অনুভব করেছে তাকেই সত্য বলে স্থির করে রেখেছিল।

মিসেস লি বল্লে—"আমার মনে হয় তাদের কিছু পাঠানোর জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত। সে জিনিস যত খেলোই হোক না কেন, তাতে মনে করবার কিছু নেই ; যখন আমরা ভালোবেসে একটা জিনিস তাদের পাঠাচ্ছি তখন তারা জিনিসটার দিকে তাকিয়ে হাসবে না। আর ওরকম করা কি ঠিক?"

মা অত্যন্ত উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলো। মিসেস ওয়াঙ-ও তার সঙ্গে একমত—তাদের একটা জিনিস পাঠাতে-ই-হবে। কিন্তু কি কেনা যায়? তারা সবাই একসঙ্গে অনেক কষ্ট ক'রে হয়তো একমুঠো পয়সা যোগাড় করতে পারবে, কিন্তু তা দিয়ে তারা কি-ই বা কিনবে। এ বিষয়ে তারা চিন্তিত হ'য়ে পড়লো। শেষে মিসেস লি বল্লে, "যদি তারা কয়েকটি মেয়েকে একাজে যোগ দিতে ডাক দেয় তা হলে একাজ তাদের সহজ হবে।" এভাবে সিদ্ধান্ত ক'রে ছোট্ট ছেলেমেয়েদের মতন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে তারা বেরুলো। তাদের কুঞ্চিত মুখে হাসি দেখা দিল এবং হাসির ফাঁকে তাদের দাঁত কয়েকটিও অল্প বেরিয়ে পড়লো। দলে নতুন মেয়ে আনবার জন্য তারা আলাদা হ'য়ে গেল।

৩

তাদের সবাইর পক্ষেই এ এক নতুন কাজ।

তিন বৃদ্ধা বেরুলো কাপড় কিনতে, আর দুজনকে পাঠান হ'লো সুতো কিনতে। কিন্তু তিন পয়সায় এক পাক সুতো পাওয়া অসম্ভব হ'য়ে পড়লো। যে বৃদ্ধারা সুতো কিনতে গিয়েছিল তারা স্থির করলো যে, তাদের ছেলে-বউদের কাছে কয়েকটা পয়সা তারা ভিক্ষা চাইবে এবং সুতো কিন্‌বার পক্ষে তা-ও যদি যথেষ্ট না হয় তবে তারা অন্যদের কাছে চাঁদা চাইবে। তাই তারা তাদের পয়সাগুলো ভালো ক'রে বেঁধে রেখে দিল।

যারা কাপড় কিন্‌তে গিয়েছিল তারা কিছুতেই স্থির করতে পারলো না, কি রকম কাপড় তারা কিন্‌বে—এবং তারা এক দোকান থেকে আর এক দোকানে ঘুরতে

লাগলো। শেষকালে তারা এমন কাপড় পেলে যা দেখে তাদের মনে হ'লো—এই কাপড়-ই চাই। তখন তারা ভয়ে ভয়ে তাদের পয়সাগুলো গুনলো। সত্যি কাজ-টা সহজ নয় এবং তাদের দায়িত্বও তারা অনুভব করলো।—যদি শেষে জিনিসটা মনোমত না হয়, তবে তাদের অপমানের একশেষ হবে।

"এতেই আমাদের চালাতে হবে—অত খুঁতখুঁত করলে আমাদের চল্‌বে না। এ কিন্‌তে আমাদের প্রতিটি ফুটে ছত্রিশ পয়সা লাগ্‌বে।"

কাপড়টা দিয়ে তারা কি তৈরি করবে দোকানী তা জান্‌তে চাইলো, কিন্তু বৃদ্ধারা কিছুই বললো না—অবশ্য মনে মনে তারা হাসলো।

"আচ্ছা এটাই নেওয়া যাক্। দু'ফুট-ই কি যথেষ্ট?"

"হ্যাঁ, দু'ফুটের কিছুটা বেশি আমরা চাইবো।"

"একেবারে রাহাজানি! একফুট লাল সালুর দাম ছত্রিশ পয়সা!"

জিনিসগুলো নিয়ে তারা চলে গেল—মনে হচ্ছিল যেন সম্রাটের মনিমুক্তাব বাক্সটির দায়িত্ব তাদের উপর দেওয়া হ'য়েছে।

বারোটি বা তার-ও বেশি বৃদ্ধা কাপড়, সুতো প্রভৃতি নিয়ে বসলো—কি রকম কাজ করা হবে সে-সম্বন্ধে তারা আলোচনা করলো। কয়েকজন বল্‌ছিল যে, এক কোণে কাস্তে ও হাতুড়ী থাকা চাই। কারণ অন্য সব মেয়েরা নিশানের কোণে কাস্তে ও হাতুড়ী এঁকে দেয়—এ তো তারা দেখেছে। আর যখন এটা একটা উপহার তখন এটাকে সব দিক দিয়ে সুন্দর করা-ই তো উচিত।

আরো কয়েকটা পয়সা তারা জোগাড় ক'রে ফেললো এবং তাদের ভিতর একজন এক টুক্‌রা কালো কাপড় কিন্‌তে চলে গেল।

অবশেষে কাজটা শেষ হলো। কাস্তে ও হাতুড়ী ঠিক জায়গায় বসানো হয়নি—সামান্য একটু স'রে গিয়েছে, সেলাই-ও তত বেশি ভালো হয়নি, কিন্তু তাদের প্রত্যেকের মনই আনন্দে ভরপুব।

নিশানটা ভাঁজ করার আগে অনেকক্ষণ ধরে তারা দেখলো। তারপর তারা বসে গেল নিজেদের আশার কথা বল্‌তে।

"……আচ্ছা মনে কর সাংহাই এক ভিন্ন জগৎ; সেখানে সাত ঘণ্টা মাত্র কাজ, আর বেশি মজুরি, রবিবার কোন কাজ নেই এবং থিয়েটারে বক্সের ফ্রি টিকেট সবার জন্যে……"

উপহার যথাস্থানে পৌছে দেবার ভার পড়লো আ-ফুর মা'র উপর—মাও তাদের আশ্বাস দিল যে, উপহারটা ঠিক ঠিক ভাবে পৌছে দেওয়া হবে। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকে ভাবছিল—"কিন্তু আমাদের মত বৃদ্ধাদের কাছ থেকে এই সামান্য জিনিস কি তারা সত্যি সত্যি গ্রহণ করবে?"

৪

সেই লোকটিকে নিয়ে আ-ফু আবার বাড়ী এলো। সিঁড়িতে তাদের পায়ের শব্দ শুনে মা'র বুক দুড়'দুড় ক'রে উঠলো। যে-হাতে তার সূঁচ ছিল সে-হাতখানা থর থর ক'রে

কাঁপতে লাগলো। মা তাদের দিকে তাকাতে পর্যন্ত সাহস করলো না—সেখানে শুধু স্থির হ'য়ে বসে রইলো।

"মা, এখান থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরে যাও।"

মা প্রাণ খুলে কথা বল্‌বার চেষ্টা করলো, কিন্তু কিছুতেই তার মুখ থেকে একটি কথা-ও বেরুলো না। তার ছেঁড়া জামা-কাপড়গুলো সে ভাঁজ করলো এবং সেই মূল্যবান প্যাকেটটির উপর হাত দু'খানা রাখলো। সেই লোকটির দিকে তাকাবার জন্যে সে মাথা উঁচু করলো—লোকটির দিকে তাকিয়ে তার মনে হ'লো—তার চোখ দু'টো করুণায় ভরা এবং তাই সে উৎসাহিত হয়ে উঠলো। সিঁড়ির দিকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যেতে যেতে সে তাদের সামনে ইতস্তত করছিল।

তার এই অদ্ভুত হাবভাব দেখে আ-ফু জিজ্ঞেস করলো—

"আচ্ছা মা, ব্যাপার-টা কি ?"

মা ফিরে দাঁড়াল এবং আ-ফু'র সাথীর কাছে গেল। বুক থেকে সেই উপহারটা বের করে সে দৃঢ়চিত্তে তার কাছে এগিয়ে দিল এবং বললো—

"এটা তাদের জন্যে। আমাদের পক্ষ থেকে এটা অনুগ্রহ ক'রে পাঠিয়ে দিও।"

"তারা ?—তারা কারা ?"

"তুমি তো জানো। তারা! যাদের কথা তোমরা প্রায়-ই আলোচনা করো। আমরা বৃদ্ধারা জানি—"

"ও !"

"ওদের জন্যে ছোট্ট একটি জিনিস তৈরী করবার জন্যে আমরা চৌদ্দজন একত্রিত হয়েছিলাম এবং সেই জিনিসটি হচ্ছে এই—"

লোকটি প্যাকেটটি খুললো—তার চোখে ফুটে উঠলো আনন্দের হাসি।

আ-ফু উত্তেজিত স্বরে চীৎকার ক'রে উঠলো ঃ—

"তুমি কি বলতে চাও ? তোমরা—মানে বৃদ্ধারা এই জিনিসটি তৈরী করেছ ?"

আনন্দ ও গর্বে সে কেঁপে উঠলো। মাথা নেড়ে সে যখন সম্মতি জানালে তখন তার জয়ের হাসি সে আর চেপে রাখতে পারলো না।—

"আমরা আশা করি, তারা শীগ্‌গির-ই আসবে—"

"মা, এ সব তুমি কি ক'রে জান্‌লে ?"

"আমি তোমাদের কথা বলতে শুনেছি এবং আমি সবই বুঝেছি।"—সে হাসলো, মনে হ'লো সে আজ সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট।

হো হো ক'রে তারাও প্রাণ খুলে হাসলো। মা কিন্তু তাদের সব কিছুই লক্ষ্য করছিল, সঙ্গে সঙ্গে তার অস্থিরতা ফিরে আসছিল। শেষ পর্যন্ত ভয়ে ভয়ে সে জিজ্ঞেস করলো ঃ

"এ কি সত্যি ? তোমাদের সমিতিতে কি তোমরা বৃদ্ধাদের নাও ?"

আ-ফু হেসে বললো—"তোমার মত দুষ্টু বৃদ্ধাকে আমরা নিই না।" তারপর সে মাথা ন্যাড়লো এবং মা'কে বললো যে, তাদের সমিতিতে সমস্ত মানুষকেই—যারা কাজ করতে চায়, তাদের সকলকেই তারা নেয়।

"ঠিক, এই কথা-ই আমি জান্‌তে চাচ্ছি। তা হ'লে তোমরা শুধু আমায় বলো, তারা কি চায়—আমরা বৃদ্ধারা ঠিক-তাই ক'রে দেব। যখন তোমরা ডাকবে তখনই আমরা কুড়ি কি ত্রিশ জন এসে হাজির হব।"

"বেশ কথা—সত্যি ভালো কথা।"

ইতিমধ্যে আব সবাই (আ-ফু'র সহকর্মীরা) সিঁড়ি দিয়ে সেই ছোট্ট ঘরটিতে এসে জড় হয়েছে এবং তারা সকলেই ঘটনাটি শুন্‌তে চাচ্ছে। মা লজ্জায় জড়সড় হয়ে গেল এবং ছেঁড়া জামা-কাপড়গুলো নিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে সে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

মা শুন্‌ছিল—যুবকেরা নিজেদের মধ্যে চীৎকার ক'রে বলাবলি করছে—"চমৎকার! চমৎকার! সত্যি সত্যি বৃদ্ধারা নিজেদের সংগঠিত করছে!"

দীপ্ত চোখে মা তাদের দিকে তাকালো এবং নিশানটাকে শেষ বারের মত দেখে নিল—কালো কাস্তে ও হাতুড়ীর চারদিকে লাল রঙটা জ্বল জ্বল করছে।

অনেক পরে মা কিছু-ই মনে করতে পারছিল না—এমন কি সিঁড়ি দিয়ে যে সে নেমে এসেছে তা-ও না।

টিঙ লিঙ

অনুবাদক—সুধাংশু দাশগুপ্ত

পয়মাল

চোখ-জুড়ানো সবুজের বান ডেকেছে গজ্জনতলীর ঘোনায়।

গহন বনের অভ্যন্তরে বিক্ষিপ্ত পাহাড়গুলির মাঝে মাঝে উর্বব চাষের জমি—সোনার ফসল ফলায় মানুষ। হেমন্তে সোনালী ধানের শীষে শিশিরকণা ভোরবেলার রোদে ঝিল্‌মিল করে। হেমন্তের অকৃপণ আশীর্বাদ এবারো লাভ করেছে গজ্জনতলী।

চট্টগ্রামের বিশাল এবং গহন বনানীর যে-রূপশ্রী, তার তুলনা নেই। শান্ত সমাহিত এখানকার প্রকৃতির রূপ—ধ্যানমগ্ন ভৈববের সৌম্য-গম্ভীর মূর্তি যেন। সাঁওতাল পরগণার বনশ্রী এ নয়। প্রকৃতির রক্তমাতাল-করা মদির রূপ-মাধুরিমা এখানে নেই। শাল-পলাশের বিস্তীর্ণ বন-প্রান্তর, পাথর চোযানো ঝরণাব উচ্ছলিত কলধ্বনি, মহুয়ার মদির বিহ্বলতা আর পাহাড়ী মেঠো পথে সাঁওতাল ষোড়শীর তরল হাসির চকিত কলরোল,—স্বপ্নময় সেই মায়াজগৎ অন্তত এটা নয়।

গজ্জনতলীর ওপর সন্ধ্যা নেমে আসছে। পশ্চিম দিকের পাহাড়টার কোন এক নভোস্পর্শী গজ্জন গাছের নিভৃত ডালে একটা ধনেশ পাখি ডেকে চলেছে অবিরাম—কেঁদে চলেছে প্রিয়াসঙ্গ-বিরহে। আসন্ন সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকার এই নিভৃত লোকে বৈরাগ্যের প্রচ্ছন্ন আহ্বান। তৃণাকীর্ণ আল বেয়ে নিস্তরঙ্গ সবুজের বুক চিরে ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে আসছে—এই ঘোনা অঞ্চলের ধাতের প্রহরী সে।

শীত শীত করছে সুলেমানের। আশ্চর্য কিছু নয়। ম্যালেরিয়ার বিষে জর্জর তার দেহ। আজ রাতেও জ্বর আসবে তার—হাড়-কাঁপানো জ্বর। ক্রমাগত ভুগে ভুগে নিঃশেষে স্বাস্থ্য আর উদ্যম খুইয়ে বসেছে সে। তার এই কঙ্কাল-মলিন চেহারা দেখে আজ কে বলবে, মাত্র তিন বছর আগে বর্মা থেকে পালিয়ে আসবার সময় মংডর গিরি-পথে অগণিত মগদস্যুর লাল খুনে অভিসিঞ্চিত করেছিল সে তার প্রতিশোধ-উন্মত্ত কিরিচ-দাখানাকে। কোথায় গেল তার সে সব দিন!

অবসন্ন পা দু'টোকে টেনে টেনে টিলা বেয়ে উঠে এলো সুলেমান। টং-ঘরে উঠবার মইটার গোড়ার কাছে খড়ের গাদাটার উপর সটান্ সে এলিয়ে পড়লো।

গভীর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো সুলেমানের জীর্ণ বুকখানা দুলিয়ে। আজ ক'দিন ধরে অত্যন্ত ভারাতুর হয়ে রয়েছে তার মন। পাথরের মতো গেড়ে বসেছে এক দুঃসহ চিন্তা। আপ্রাণ চেষ্টা ক'রেও মুক্ত করতে পারছে না নিজেকে, পারবেই বা কী করে! তার বিশ্বাসের ভিতে ফাটল ধরিয়েছে তীব্র এক সন্দেহের আলোড়ন।

কি ভেবে হঠাৎ উঠে বসলো সুলেমান। তার রোগশীর্ণ মুখখানা জ্বলজ্বল করছে, কেমন যেন আচ্ছন্নভাবে ভাতের মোচাটা খুলে ফেললে সে, প্রতিদিনকার অভ্যাস-বশেই হয়তো। রোজই জ্বর আসে তার সন্ধ্যার পরেই। সারা রাত ধরে জ্বর চলে—সেই ভোরের দিকে ঘাম দিয়ে তবে ছাড়ে জ্বর। তাই সন্ধ্যার মুখে এই সময়টাতেই দু'মুঠো যা পারে তাকে খেয়ে নিতে হয়। রাত ঘনিয়ে ওঠার সঙ্গেই জ্বর বাড়তে থাকে—খাওয়া হয় না।

মোচার প্রসারিত সেঁকে-নেওয়া কলাপাতার ওপর এক চাকা খরখরে ভাত। তারই ভেতর থেকে উঁকি মারছে খানিকটা লঙ্কাপোড়ার চাট্নি, তলার দিকে কিছু লাউ শাক সিদ্ধ থাকলেও থাকতে পারে—বঞ্চিত জনগণের প্রাত্যহিক নেয়ামৎ, মুহূর্তের জন্যে শূন্যদৃষ্টিতে একবার সেদিকে তাকিয়েই অধীরভাবে সুলেমান উঠে দাঁড়ালো। যে-দুর্বিসহ অন্তর্জ্বালায় সে খাক হয়ে যাচ্ছে তার তুলনায় জঠরের জ্বালাটা একান্তই অর্থহীন হয়ে গেছে আজ।

উদভ্রান্তের মতো টিলার ওপর পায়চারি শুরু করলো সুলেমান।

রাত বেড়ে চলেছে। গজনতলীর বুক জুড়ে সঞ্চারিত হচ্ছে সূক্ষ্ম কুয়াশার ইন্দ্রজাল। ঝলকে ঝলকে শিরশিরে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদটাও দেখা দিয়েছে পুবের অরণ্যমণ্ডিত পাহাড়টার চুড়োয়—ফিকে আলোয় চারদিক রহস্যময়। পশ্চিম পাহাড়টার ওপাশের থলি থেকেই হয়তো ভেসে এলো কোনো যূথপতির বৃংহন ধ্বনি। যে-কোনো মুহূর্তে সদলবলে পাহাড় বেয়ে সরাসরি এপাশের ক্ষেতেই নেমে আসতে পারে। পাকা ধানের মঞ্জরীর আকর্ষণ তো কম নয়।

অন্য দিন হলে এতক্ষণে টং থেকে নেমে এসে মশাল জ্বালাতো সুলেমান। ক্যানেস্তারা পিটিয়ে পূর্বাহ্নেই খবরদারি ঘোষণা করে দিত। আজ কিন্তু কোনোদিকেই হুঁশ নেই তার। জীর্ণ মলিন কাঁথাটা বুক অবধি টেনে অসাড়ের মতো সে শুয়ে আছে। অর্ধোন্মীলিত জলজলে চোখে আচ্ছন্নতার ঘোর। শহরের তাপের সঙ্গে

প্রতিযোগিতা চালিয়ে জ্বলছে তার মাথায় আগুন···না, না, সে বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করে না লোকের এ-সব কানাঘুষো। কি ক'রে বিশ্বাস করতে পারে সে এমন কথা? কত লোকেরই তো বৌ-ঝিরা কাজ করছে আরাকান রোডে;—ভ্রষ্টা হয়ে গেছে বুঝি সব! হুঁ,—যত সব নিন্দুকের কুৎসা।···

···সুলেমানের মনের পর্দায় কত দিনের সুপ্ত স্মৃতি ধীরে ধীরে জেগে উঠছে ছায়া-ছবির মতো· ····তার স্বপ্নরাজ্য রেঙ্গুন শহর। ঝলমলে রাস্তা বেয়ে অবিশ্রান্ত জনস্রোত, —মোটর, ট্রলিবাস, লেন্‌চা। কর্মজীবনের সে কি বিপুল উত্তেজনা। ব্যস্ততা-মুখর লুই স্ট্রীট, তার বড় সাধের সাজানো গোছানো পানের দোকান। মগিপানের স্তূপ। সুর্তি জর্‌দার সুরভিতে মন্থর বাতাস। মিঠাপানির সারি সারি বোতল। কার্নিশে লাগানো ঝালরের টুংটাং। রেশমী রুমালের উৎক্ষেপ। থাকে থাকে পোলো সিগারেটের পেটি পেটি বাক্স,—বর্মা চুরুটের মোড়ক। নীল লাল বিজলী বাতির রোশনাই। আর দোকানের সম্মুখে রূপের ফুলঝুরি—বিলাসিনী কামিনীর দল আসছে আর যাচ্ছে ঝলকে ঝলকে দেহবাসের খস্‌বু ছড়িয়ে। ক্ষিপ্রগতিতে হাত চালিয়ে চলেছে সুলেমান। টাকা, আধুলি, সিকি, আনি, দু'আনি হাতবাক্সের ছিদ্র দিয়ে টুক্‌টুক্ শব্দে পড়ছে ঝরে। মনে পড়ছে সুলেমানের,—একান্তভাবে মনে পড়ছে, কত আশা আর আনন্দ নিয়েই না সে দেশে ফিরেছিল সে-বার। পেটিভরা কাঁচা কাঁচা টাকা, করকরে নোট—তার মেহনতের পারিশ্রমিক। ঘরে তার আনন্দের তুফান বইলো,—মায়ের মুখে ফুটলো হাসি। তারপর! তারপর এলো তার বিয়ের দিন—'শাদী মোবারক্'। সেই দিনটির কথা কি কখনো ভুলতে পারবে সুলেমান! কি লজ্জাই না করেছিল তার, দুল্‌হা সেজে তানজামে চড়ে বরযাত্রী যেতে। মুখে রুমাল চেপে গুটিসুটি হয়ে বসেছিল সে বিবাহ মজলিসে। অন্ধকার ঘরে রংবাতির চকিত আভায় নববধূর মুখখানি প্রথম দেখে মনে হয়েছিল সুলেমানের, সে যেন মধুর এক স্বপ্ন দেখছে,—বেহেশ্‌তের কোনো হুবপরীই যেন পথ ভুলে নেমে এসেছে মর্তে,—তারই একান্ত কাছে। ছ-ছ'টা বছর কেটে গেল, তবু আজো এতটুকু কি নিষ্প্রভ হয়েছে মরিয়ামের সেই রূপশ্রী। মরিয়াম,—তার কত সোহাগের মরিয়াম!

বুকের পাঁজরে ধক্‌ধক্ শব্দে বার কয়েক আঘাত করলো সুলেমানের হৃৎপিণ্ডটা। অন্তরের নীরব গোঙানি তরঙ্গায়িত হয়ে বেরিয়ে এলো চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাসেঃ আজ তার এ কি নসিব! বোমার হিড়িকে বর্মা থেকে পালিয়ে আসতে হলো তাকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায়। কানি দুই জমি ছিল তার, তাও হস্তান্তর হয়ে গেল আকালের দিনে। আরাকান রোডে মাটিকাটার কাজ ক'রে কিছুটা দিন সে চালিয়েছিল সংসার। কিন্তু তাতেও বিধাতা বাদ সাধলো—নিংড়ে নিয়ে গেল তার সমস্ত তাকত। টানা ভুগে চলেছে সে পোড়া ম্যালেরিয়ায়। শক্তি নেই, সঙ্গতি নেই। গতর খেটে পেট চালাবার সামর্থ্যটুকু পর্যন্ত নেই তার আজ। জোয়ানকিতেই অথর্ব হয়ে গেছে সে সম্পূর্ণ। সারাটা দিন ভাঙ্গা ঘরের দাওয়ায় নিঃসাড়ের মতো শুয়ে থাকে সে। ধুক্‌পুক্ করে প্রাণ,—খাবি খায় ডাঙ্গায়-তোলা মাছের মতো। তবু বেলা ঢলে পড়তে না পড়তেই তাকে বেরুতে হয় গঞ্জনতলীর উদ্দেশে। এই ক্রোশ দুই পথ আসতে তাকে কতবারই না জিরুতে হয়। প্রতি রাতে ঘোনায়

চৌকি দিয়ে মাসের শেষে পায় সে মাত্র আটটি টাকা। এত দুঃখ, এত দুর্ভোগ, এত অভাব অভিযোগ! তার ওপর এ কি কথা শুনছে সে লোকের মুখে, ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরছে মরিয়াম! না, না, এ হতে পারে না। মরিয়াম যে তার ঘরের লক্ষ্মী। কি করে সে অবিশ্বাসিনী হয়ে উঠবে, খোয়াবে ইজ্জৎ! অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব।—তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ ক'রে দু'হাতে মাথার রুক্ষ চুলের গোছা টেনে ধরলো সুলেমান।

বাইরে কুয়াশা গাঢ়তর হয়ে গজনতলী ছেয়ে ফেলেছে। হাতির ডাক শোনা যাচ্ছে না। চারিদিকের জমাট-বাঁধা নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে মাথার ওপর দিয়ে ডেকে ডেকে উড়ে গেল দিশেহারা ধনেশ পাখিটা। এখনো কেঁদে মরছে সে অধীরভাবে। কোন দুর্বৃত্ত তার এমন সর্বনাশ করলো! পাখিটার ক্রমবিলীয়মান বিলাপধ্বনি সুলেমানের আচ্ছন্ন চেতনায় কতখানি আলোড়ন জাগিয়ে গেল কে জানে।

যেন হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের একটা চমক খেলো সুলেমানঃ বিশ্বাস নেই, বিশ্বাস নেই—ওই সব মিলিটারি ঠিকাদারদের। কি না করতে পারে ওরা, হাসির আড়ালে ছুরি বয়ে নিয়ে বেড়ানোই যাদের কাজ? ওরা পারে—পারে ওরা ঘরে ঘরে জ্বালিয়ে দিতে আগুন। নির্বিকারে চেপে ধরতে পারে মানুষের টুঁটি। নিঃসঙ্কোচে ওরাই তো উপড়ে আনে নিজেদের অপকীর্তির নিশানা—অবাঞ্ছিত ভ্রূণশিশু। লাঞ্ছিতা সতীসাধ্বীর চোখে ফিন্‌কি দিয়ে খুন বইয়ে দিল কারা? দয়া মায়া নেই এতটুকু—পাথর হয়ে গেছে প্রাণ। তাই তো এমন হাসিমুখে মানুষের অসহায়তার সম্পূর্ণ সুযোগ নেয় ওই ইবলিস্‌গুলো। রাতারাতি ফেঁপে ফুলে গেল। তবু চাই টাকা—আরো টাকা। সামান্য স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ওরাই বিকোতে পারে আত্মসম্মান, মনুষ্যত্ব, মা-বোনের ইজ্জৎ—সবই। ওই সব শক্তিমান শয়তানদের মধ্যেই চল্‌ছে দুর্নীতির প্রতিযোগিতা—কে কেমন করে অপরকে ডিঙ্গিয়ে নতুন নতুন কাজ বাগাবে তারই দুরভিসন্ধি। বিশ্বাস কি, ওই শালা রাজু মিয়া একটা নতুন কন্‌ট্রাক্টের জন্যেই হয়তো—

আর ভাবতে পারলো না সুলেমান। এক ঝলক উত্তপ্ত রক্ত তড়িৎ-প্রবাহের মতো তার মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম স্নায়ুগুলির ভিতর দিয়ে বয়ে গেল যেন। মাথাটা তার ছিঁড়ে পড়তে চাইলো। অব্যক্ত ব্যথায় টন্‌টন্‌ করে উঠলো তার স্নায়ুকেন্দ্র।

ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইট উদ্দাম হয়ে উঠেছে সুলেমানের প্রাণ-প্রবাহিকায়। দেহের তাপ বেড়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর। মাথার তালু দপদপ করছে। সুলেমানের লাল চোখ দু'টো ধীরে ধীরে বুজে এলো। আর মুহূর্ত কয়েক পরে তার মস্তিষ্কপিণ্ডের এক নিভৃত কোষের রেশমী ঝিল্লিতে প্রদাহের স্পন্দন সঞ্চারিত হয়ে পড়লো ···

ওরা কারা আসছে! ওই যে, অন্ধকারে? কেমন তাল পাকিয়ে এগিয়ে আসছে দেখছিস্‌ না? না, না,—মানা করে দে, মানা করে দে, এদিকে যেন না আসে।

ডিলিরিয়ামের ঘোরে হঠাৎ আঁত্‌কে উঠলো সুলেমান,—রাক্ষস ওরা! দেখছিস্‌ না মুখের চারপাশে লেগেছে কত রক্ত? মানুষের কল্‌জে চিরে রক্ত খায় যে ওরা—শুষে খায়—সোঁ সোঁ করে খায়!

খানিকক্ষণ ঝিমিয়ে থেকে সুলেমান আবার প্রলাপ শুরু করলো;—ওরে তোরা সব কোথায় গেলি। সব যে জ্বলে গেল—পুড়ে খাক হয়ে গেল। আগুন-আগুন!

বলতে বলতে ডুকরে কেঁদে উঠলো স্থলেমান এবং পরক্ষণেই বিকৃত কণ্ঠে গাইতে লাগলো—

ও কুতুবদিয়ার বাত্তিঘর !
ঝড় ঝাপটে তুই কেম্‌নে থাকস্‌
অচল অনড়···

স্থলেমানের মস্তিষ্ক অতিমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছে শুধু কি এনোফিলিসের বিষেরই প্রতিক্রিয়ায ?

রাত গভীরতর হয়ে উঠেছে। গজনতলীর আকাশ জুড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বজ্রবাহী লৌহ ঈগলের গোঙানি। বোমারুর একটা স্কোয়াড্রন চলেছে পুবমুখী জাপ-অধিকৃত এলাকার সামরিক লক্ষ্য বস্তুর উদ্দেশে। টং-ঘরের ছুটোর একটা বড় গোছের ছিদ্র দিযে এক ঝলক জ্যোৎস্না এসে পড়েছে স্থলেমানের ঠিক মুখখানার ওপর। চক্‌চক্ করছে মুখখানা জ্বরের তাপাধিক্যে। ক্ষুধিত চোখের কোণে জমাট-বাঁধা অশ্রুর ফোঁটা—বড় বড় ছ'খণ্ড মুক্তার মতো চিকচিক করছে আলোয়। ডিলিরিয়ামের আচ্ছন্নতা কেটে গেলেও নূতন করে তার চেতনার ওপর দিযে ঝড় বয়ে চলেছে। নিস্তেজ অসাড় মস্তিষ্কের পীতাভ স্তরভাগের অলক্ষ্য বিক্ষেপ তাকে বুঝি উদ্‌ভ্রান্তই করে দেবে অবশেষে।

কিসের যেন একটা চকিত কশাঘাতে আচম্‌কা উঠে বসলো স্থলেমান। চোখ ছ'টো বিস্ফারিত হয়ে জ্বলজ্বল করতে লাগলো। মুহূর্ত বিলম্ব না ক'রে সে হাতড়ে হাতড়ে নেমে এলো টং থেকে।

ক্ষেতের তৃণাকীর্ণ আল ভিজে উঠেছে শিশিরে। মাতালের মতো স্খলিত পাযে এগিযে চলেছে স্থলেমান। মাথাটা ঘুরছে তার। থেকে থেকে চোখের ওপর ঘোলাটে হয়ে আসছে নিষ্ঠুর পৃথিবী। কায়িক দুর্বলতায অবলুপ্ত হয়ে আসতে চায় চেতনা। তা হোক্—আজ রাতে স্থলেমানকে ফিরতেই হবে ঘরে।

খানিকটা গিয়ে মোড় নিল স্থলেমান। ছ'পাশ থেকে পাহাড় সোজা নেমে এসেছে জমিতে—লম্বালম্বি প্রসারিত ধানের ক্ষেত। ডান পাশের পাহাড়টার ধার-ঘেঁষা জমিতে কে জানে কখন নেমে এসেছে এক পাল হাতি। নতুন ধানের শীষে ভোজ লেগেছে। মধুগন্ধী ফসলের আস্বাদে নেশা ধরেছে—শুরু হয়েছে বপ্রক্রীড়া। পযমাল হয়ে যাচ্ছে সোনার ফসল। শুঁড় উঁচিয়ে ওদের মধ্যে কেউ কেউ তুলছে আনন্দ-বিগলিত বৃংহন ধ্বনি। কেউ কেউ আবার অকারণ পুলকে চার পা একত্র ক'রে ঘুরপাক খাচ্ছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই স্থলেমানের। বাম পাশের পাহাড়টার ধার দিয়ে কুয়াশা-ঢাকা পথে সে মিলিযে গেল অশরীরী কোনো জিনের মতো।

শীর্ণতোযা পাহাড়িয়া খাল—রাতার ঝিরি। জলে চকিত তরঙ্গ তুলে ছলাৎ ছলাৎ শব্দে পা ফেলে পেরিয়ে গেল স্থলেমান। পাড় বেযে উপরে উঠলেই চোখে পড়ে চুনতির ফরেস্ট অফিস—নিঃসঙ্গ, একক।

খানিকটা পথ মাত্র রযেছে বাকি। জ্যোৎস্নায় চারিদিক পরিপ্লাবিত হয়ে আছে। ফাঁকা ক্ষেতের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে শিরশিরে হাওয়া ধানের শীষে ঢেউ জাগিযে। দূর হতে ভেসে আসছে হুতোম প্যাঁচার হুম্‌কি। একটানা গতিতে এগিয়ে চলেছে

সুলেমান। ক্লান্তি নেই এতটুকু, ভ্রূক্ষেপ নেই কোনো দিকে। কাঁটার আঁচড়ে বিক্ষত হয়ে গেছে তার শরীর; বেসামাল চলার দরুন হোঁচট খেয়ে উড়েই গেছে একটা নখ। কিন্তু কোনো রকম বোধশক্তিই নেই সুলেমানের। এমন অমানুষিক কি করে হয়ে উঠলো সুলেমান? তার কঙ্কালসার তাপদগ্ধ দেহে এত শক্তিই বা হঠাৎ এলো কোথা থেকে!

বিরলবসতি গ্রাম,—রাতারকুল পেরিয়ে আরাকান রোডে পড়লো সুলেমান। বাঁয়ে মোড় ঘুরে দু'পা এগুলেই চুনতির হাটখোলা। এবার রীতিমতো বেড়ে গেল সুলেমানের চলার গতিবেগ। ঘরের দুর্বার টান হঠাৎ এমন প্রবলতর হয়ে উঠলো কেন কে জানে?. বর্মা থেকে ফিরবার পথে একদিনও কি ঘরের প্রতি এতখানি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছিল সুলেমান?

সুলেমানের শিশির-সিক্ত পা দু'খানা আরাকান রোডের গেরুয়া ধুলিতে রাঙ্গা হয়ে উঠলো মুহূর্তে। আরাকান রোড—যার ধুলিকণায় একাকার হয়ে মিশে গেল সমস্ত সভ্যতার চূর্ণাস্থি।

বেসামাল ত্রস্ত পায়ে উঠানে সুলেমান ভাঙ্গা গলায় ডাকলো,—মা—রে; ও-মা!

ডুকরে-ওঠা কান্নার মতো রাতের বাতাসে ছড়িয়ে গেল সে-ডাক।

—মা-রে, ও-মা। দুয়ারে টোকা দিতে দিতে সুলেমান আবার ডাকলো।

অন্ধকার দু'টো খুপরি আর এক টুকরো দাওয়া—সুলেমানের দোচালা দীন কুটির। বাঁয়ের খুপরিতে মৃদু একটা শব্দ হলো—দেশলাই জ্বালাবার শব্দ। জীর্ণ বেড়ার ছিদ্রগুলি দিয়ে মৃদু আলোকরশ্মি ঠিক্‌রে বাইরে এসে পড়লো। সুলেমানের হৃদযন্ত্রের স্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠছে প্রতি মুহূর্তে।

চেরাগ হাতে দুয়ারের আগল খুলতে খুলতে মা বললো,—হঠাৎ এত রাত্রে যে ফিরে এলি সলু?—কথাগুলো বলতে গিয়ে মায়ের গলার স্বর একবার কেঁপে গেল যেন।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দাওয়ায় উঠে একটা ছোঁ মেরে মায়ের হাত থেকে চেরাগটা নিয়েই দমকা হাওয়ার মতো ডানদিকের খুপরিটায় ঢুকলো গিয়ে সুলেমান। ঘরে ঢুকেই পাথরের মতো দাঁড়িয়ে পড়লো সেঃ আহ্!—তার অন্তর তোলপাড় করে বিহ্বল আনন্দের একটা ঢেউ খেলে গেল। যেন মুহূর্তে নেমে গেছে তার বুকের ওপর গেড়ে-বসা জগদ্দল পাথরটা। দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলো সুলেমান। চেরাগের শিখাতে শিহরণ লেগে গেল পুলকের।

একপাশে অকাতরে ঘুমুচ্ছে মরিয়াম। কি অপূর্বই না দেখাচ্ছে তাকে চেরাগের মিঠে আলোয়। শ্লথ আঁচল। গায়ের চুলিটার আড়ালে পরিপুষ্ট বক্ষ দোল খাচ্ছে নিঃশ্বাসের তালে তালে। চোখের পাতায় অপরিসীম ক্লান্তির কালিমা। আহা বেচারী, দিনান্তে কতই না মেহনত করতে হয় তাকে আরাকান রোডে কলসী ভরে ভরে জল ছিটোতে। ঘুমোক; নিশ্চিন্তে ঘুমোক সে। জাগাবে না তাকে সুলেমান।

কিন্তু-বুক দুলিয়ে আবেগের একটা তরঙ্গ বয়ে যেতেই সুলেমান দু'পা এগিয়ে গেলো। কম্পিত মৃদু কণ্ঠে ডাকলো,—অ, শুনছো!

ত্রস্তভাবে উঠে বসলো মরিয়াম: তুমি! গুটিসুটি হয়ে বসে অসংযত আঁচলটা টেনে ঠিক করে দিলে। ঘুমের সমস্ত জড়িমা কেটে গিয়ে চোখের তারাছুটো অস্বাভাবিক চঞ্চল হয়ে উঠলো চকিতে।

মেঝেয় চেরাগটা রেখে মরিয়ামের পাশে গিয়ে বসলো সুলেমান: বড্ড জ্বর উঠেছে, তাই চলে এলাম।

জড়সড় ভাবে বসেই মরিয়াম আলগোছে ডান হাতখানা সুলেমানের কপালের ওপব রাখলো—উঃ, গা যে পুড়ে যাচ্ছে! চল, মাথাটা একবার ধুইয়ে দি তোমার।

মরিয়ামের কোমল করস্পর্শে সুলেমানের স্নায়ুমণ্ডলী অলস অবশতায় যেন ঝিমিয়ে আসতে চাইলো। কি ঠাণ্ডা হাত মরিয়ামের! দেহটা যেন জুড়িয়ে গেল মুহূর্তে।

ছুই বাহু প্রসারিত করে উচ্ছ্বসিত আবেগবশে সুলেমান মরিয়ামকে টেনে নিয়ে তার সমুন্নত বক্ষের উপর নিজের অবশ মাথাটা হেলিয়ে দিল নিবিড় ভাবে—যেন প্রিয়তমার বুকের নিবিড়তায় মিশে গিয়ে নিজ অন্তরের সমস্ত জ্বালা সে জুড়িয়ে দেবে আজ।

কিন্তু মুহূর্তে কোথা থেকে কী হয়ে গেল যেন। মরিয়ামের সমস্ত বেশবাস থেকে পলকে এক ঝলক সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়লো সুলেমানেব নাসারন্ধ্রে। প্রথমটা কিছু যেন ঠাওর করতে পারলো না সুলেমান। শিকারী গ্রে-হাউণ্ডের মতো অধীরভাবে বারকয়েক সে নাসিকা কুঞ্চিত করলো ঘ্রাণ নেবার জন্য। সে-সুগন্ধি যত মধুরই হোক অন্তত সুলেমানের শ্বাসনালীটায় তা বিষাক্ত গ্যাসের মতোই তরল আগুনের তীব্র জ্বালাময় প্রদাহ ছড়িয়ে দিয়ে গেল।

তীক্ষ্ণ একটা বেদনার্ত চীৎকার করে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠে দাঁড়ালো সুলেমান।

সুলেমানের জ্বলন্ত চোখের তারা ছ'টো ঘুরছে। ঘুরছে পৃথিবী। সম্মুখে বেড়ায় গুঁজে-রাখা ঝকঝকে কিরিচ-দাখানা মিলিয়ে যাচ্ছে ধীরে। মেরুদণ্ড বেয়ে তীব্র তীক্ষ্ণ অনুভূতির বিদ্যুৎস্ফূর্তি। সুলেমানের মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্র জ্বলন্ত নীহারিকার উত্তপ্ত বাষ্পে সঞ্চারিত হয়ে গেল।

সুলেমানের পৃথিবীর রং বদলে গেছে। ঝড় উঠেছে চারিদিক ঘিরে। সিটি বাজছে আতঙ্কে। ছুটছে লোক উর্ধ্বশ্বাসে, দিকহারা।. বগুলা বাজার ধ্বসে পড়েছে,—গলে যাচ্ছে রেঙ্গুন।...টাঙ্গুপের ঢালায় পচছে মানুষ, খাবি খাচ্ছে যাত্রীর দল। মংডর অন্ধকার গিরিপথে মশালের লকলকে আগুন। হুঙ্কার তুলে মগদস্যুর অতর্কিত আক্রমণ। হাহাকার চিৎকার —মাঝে মাঝে এক একটা অন্তিম আহত-আর্তনাদ। কিরিচ-দাখানা সুলেমানের হাতে নেচে চলেছে রুদ্রতালে।...ধূলিধূসর আরাকান রোড—চলেছে কনভয়—বিরাট এবং বিসর্পিল। হেডলাইট, হর্ণ। ট্যাঙ্কের বহর চলেছে পিছু পিছু—নিরবচ্ছিন্ন যান্ত্রিক ধ্বনি-তরঙ্গ—কট্ কট্ কট্ কট্...

সুলেমানের লাল চোখছ'টো ঘুরতে লাগলো।

দোর গোড়ায় স্পন্দিত বুকে এসে দাঁড়ালো মা। হাতে তার এক তাড়া নোট। ভীরু গলায় বললো,—অবুঝ হস্‌নি বাপধন; বাপ দাদার ছ'খানি জমি তো অন্তত এবার ছাড়াতে পারবি তুই।

মায়ের কথাগুলো শুনতে পেল কি পেল না সুলেমান! আচমকা ঘুরে সে বিদ্যুৎ বেগে ছুটে বেরিয়ে গেল উঠানে। বেরুবার মুখে তার বেসামাল পায়ে লেগে চেরাগটা ছিটকে

পড়লো গিয়ে বেড়ার গায়ে। দিশেহারাভাবে ডুকরে ডুকরে কেঁদে তড়িৎপায়ে মরিয়াম এলো বেরিয়ে অন্ধকার খুপরী থেকে। হতবাক মাও এলো পিছু পিছু।

ততক্ষণে এদিকে স্থরু হয়ে গেছে যা হবার তা। উঠানের এক কোণ থেকে পোষা মুরগীর কুঁড়া খাবার টোপ-পড়া টিনের পাত্রটা তুলে নিয়ে, বেড়া থেকে ভেঙ্গে-নেয়া এক টুকরো কঞ্চি দিয়ে স্থলেমান সেটা আপ্রাণ পিটিয়ে চলেছে—টং টং টং। সে দেখতে পাচ্ছে—স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে, চারদিক থেকে পালে পালে হাতি নেমে এসেছে গজনতলীর ঘোনায়,—আকাশ কেঁপে কেঁপে উঠছে তাদেব পৈশাচিক আনন্দের উল্লাসধ্বনিতে।

সোনার ফসল কী এবার আর বাঁচাতে পারবে স্থলেমান?

বুলবুল চৌধুরী

"জাতি"-সমস্যা বিচার

আচার্য ভূপেন্দ্রনাথের পরিচয় অনাবশ্যক। তিনি শুধু দেশপ্রেমিক কর্মী নন, যুবক, ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের নেতা নন, বর্তমান ভারতের একজন অসাধারণ জ্ঞানী ও পণ্ডিত। নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব তাঁর নিজস্ব বিষয় হইলেও পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস ও সাহিত্যেও তাঁর অধিকার কম নয়। কিন্তু সাধারণ দেশবাসী তাঁর এই অগাধ পাণ্ডিত্য হইতে লাভবান হইবার বিশেষ স্থযোগ এযাবৎ পায় নাই। কারণ তাঁর লেখাগুলি বাঙলা, ইংরেজী, হিন্দী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় ও বিভিন্ন প্রদেশের সাময়িক পত্রিকার স্তম্ভে ছড়ানো আছে; একত্রে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। 'পরিচয়' পত্রিকা তাঁর 'ভারতীয় সমাজ পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস' ধারাবাহিক ভাবে ছাপিয়া বাঙালী পাঠক গোষ্ঠীকে সে স্থযোগ কিছুটা দিয়াছে। কিন্তু এই ইতিহাসটিও এখনও সমাপ্ত ও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁর প্রথম প্রকাশিত ইংরেজী গ্রন্থ Studies in Indian Social Polity বাঙালী ও অবাঙালী শিক্ষিত সমাজকে সর্বপ্রথম সেই স্থযোগ দিল যা তাঁদের এতদিন ছিল না। এই দীর্ঘকাল-অনুভূত অভাব দূর করিবার জন্য প্রকাশক আমাদের ধন্যবাদার্হ।

আলোচ্য গ্রন্থখানি একটি মৌলিক ও অমূল্য জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ। এই ধরনের পুস্তক ভারতবর্ষে ইতিপূর্বে আর প্রকাশিত হয় নাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। গ্রন্থখানি ডাঃ দত্তের ভারতীয় ইতিহাস ও সমাজনীতি বিষয়ে সারাজীবন ব্যাপী অধ্যয়ন, আলোচনা ও গবেষণার ফল। যদি শুধু পাণ্ডিত্যের দিক দিয়াই বিচার করা যায় তাহা হইলে গ্রন্থখানিকে জ্ঞানের আকর বলিলেও অত্যুক্তি হয না। মাত্র ৪৬৪ পৃষ্ঠার এই একখানি বই পড়িয়া পাঠক ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে যত কথা জানিতে পারিবেন, একগাদা তথাকথিত 'ইতিহাস' পড়িয়াও তত পারিবেন না। অথচ ইহা প্রধানত 'ইতিহাস' গ্রন্থ নয়। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ

স্বরূপ জাতি প্রথাই (Caste System) হইল এই পুস্তকের প্রধান আলোচ্য বিষয়। পুস্তকখানি ১৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত। তার মধ্যে ১৪টি অধ্যায় কেবল জাতি বিষয়ক। এই ১৪টি অধ্যায়ে ভারতীয় জাতিপ্রথার বিভিন্ন দিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইয়াছে, যথা, ভারতীয় আর্যগণের উৎপত্তি, জাতি ও race-এর সম্বন্ধ বিচার, ভারতীয় জাতিসমূহের অর্থনৈতিক ভিত্তি, প্রাচীন ভারতে শ্রেণী (Guild) ও সঙ্ঘ প্রথা, বিভিন্ন যুগে বর্ণ চতুষ্টয়ের ইতিহাস, ভারতে ও অন্যান্য দেশের শুচি-অশুচি ও আচার-বিচারের ধারণা, হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্যতা, বর্ণ সমূহের পরস্পরের প্রতি সামাজিক মনোভাব, বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ, বর্তমান ভারতে জাতিপ্রথা, শূদ্রাশূদ্র বিচার—এমন কি ভারতের বাহিরে ও অন্যান্য দেশে (যথা ঈজিপ্ট, মেসোপটেমিয়া, চীন, গ্রীস, রোম, জার্মানী ও ইংলণ্ড) বর্ণব্যবস্থা ছিল কিনা তাহাও বিচার করা হইয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থখানিকে জাতি প্রথার বিশ্বকোষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বাকী দুই অধ্যায়ে জাতি ছাড়া অন্য দুইটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। একটি হইতেছে প্রাচীন হিন্দু আইনের প্রামাণ্য মূল। গ্রন্থকারের মতে এই মূল ধর্মশাস্ত্র নয়, অর্থশাস্ত্র। দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে ৩০০ খৃঃ পূর্বাব্দ হইতে ১৫৬৭ খৃঃ অব্দের মধ্যে সম্পাদিত শিলা ও তাম্রলেখের সাহায্যে প্রাচীন ভারতের ভূমি সম্পর্কিত আইনের বিস্তৃত আলোচনা আছে। এই সম্পর্কে ২-টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বিবেচিত হইয়াছে, যথা, প্রাচীন ভারতে ভূমির অধিকারী কে ছিল ও সামন্ত প্রথা প্রচলিত ছিল কি না? প্রথম প্রশ্নটির সম্বন্ধে এঙ্গেলস্‌কে মার্কস্ লিখিয়াছিলেন (১৪ই জুন, ১৮৫৩) "As to the question of property, this is a very vexed question among the English writers on India." ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে—"ভূমির উপর রাজার কোনরূপ অধিকার ছিল বলিয়া মনে হয় না।" অথচ মেগাস্থিনিস্ অবলম্বনে Diodorus ও Strabo বহু পূর্বে লিখিয়া গিয়াছেন, "ভারতে যাবতীয় ভূমি রাজার সম্পত্তি।" কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে শেষোক্ত মতের সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু মৌর্যোত্তর যুগে মনু ও জৈমিনি কৌটিল্যের বিপরীত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। গ্রন্থকার প্রাচীন লেখমালার ভিত্তিতে বলিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতে রাজাই ছিলেন ভূস্বামী। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, লেখমালার সাহায্য ব্যতিরেকেই প্রায় একশতাব্দী পূর্বে মার্কস্ ও এঙ্গেল্‌স ঠিক এই মতই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মার্কসের মতে, "The King is the sole and only proprietor of all the land." এঙ্গেলস্ বলিয়াছেন—"The absence of property in land is indeed the key to the whole of the East," দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতে সামন্তপ্রথা যে শুধু ছিল তাই নয়, পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছিল। ইওরোপের সঙ্গে তফাৎ মাত্র এইটুকু যে, এখানে বাহির হইতে সামরিক আক্রমণের ফলে এই প্রথা প্রবর্তিত হয় নাই। বিভিন্ন শ্রেণীর সামন্তের একটি তালিকাও তিনি দিয়াছেন। আলোচ্য দু'টি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ভিন্ন হওয়ায় বোধ হয় লেখক পুস্তকখানির নাম ভারতীয় 'জাতি' ব্যবস্থা না রাখিয়া ভারতীয় 'সমাজ' ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। এই সামান্য পরিচয় হইতেই আশা করি বুঝা যাইবে যে, পুস্তকখানিতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে এবং শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই এখানি পড়া উচিত।

কিন্তু পাণ্ডিত্য ইহার একমাত্র বিশেষত্ব না। পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ তো ইহা ছাড়াও অনেক আছে। কিন্তু এই পুস্তকে এমন একটি বৈশিষ্ট আছে যা এই বিষয়ে লিখিত কি ভারতীয় কি বিদেশীয় কোনও পুস্তকে নাই। সেটি হইতেছে গ্রন্থকারের মৌলিক দৃষ্টি-ভঙ্গী। গ্রন্থকার অমানুষিক পরিশ্রম ও অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় দ্বারা গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। তার জন্য তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সব উপাদানই যে তিনি প্রথম আবিষ্কার বা সংগ্রহ করিয়াছেন তা নয়। বহু মালমশলা দেশী বিদেশী অন্যান্য অনেক গবেষক তাঁর পূর্বেই আবিষ্কার বা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি সেইগুলিকে যেমন পাইয়াছেন, মাত্র সেই রকমই যদি ব্যবহার করিতেন তাহা হইলে বড় জোর তথ্যের এক স্তূপ খাড়া করিতেন। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া সেগুলিকে নূতন রকমে সাজাইয়া নূতন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যার নাম ইতিহাসের ভৌতিক বা অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা। ভাববাদী, নৈতিক বা ধার্মিক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে ইতিহাসের এই বস্তুবাদী ব্যাখ্যার সন্ধান জগতকে সর্বপ্রথম কার্ল মার্ক্স দেন। গ্রন্থাকার মার্ক্সবাদী ও আমাদের দেশে মার্ক্সবাদের অন্যতম প্রবর্তক। তিনি মার্কসবাদ হইতেই এই দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন। এই দৃষ্টি অনুসারে "সমস্ত ইতিহাস হইতেছে শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস।" এই সূত্রটিকেই ইতিহাসের চাবিকাঠি বলা হয়। এই চাবিকাঠির সাহায্যে গ্রন্থকার প্রাচীন ভারতেতিহাসের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণা ভুল। সে ভারত সৃষ্টিছাড়া দেশ ছিল না কিংবা সাম্য, মৈত্রী, প্রেম ও অহিংসার পূণ্য তপোবনও ছিল না। এখানে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইত না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো এখানেও উচ্চ-নীচ, শোষক-শোষিত শ্রেণী ছিল। উচ্চ শ্রেণী নিম্ন শ্রেণীর উপর অত্যাচার করিয়াছে, নিম্ন শ্রেণীও উচ্চ শ্রেণীর অত্যাচারের প্রতিরোধ করিয়াছে। ফলে শ্রেণীগুলি চিরকাল একভাবে থাকে নাই। তাদের অনবরত উত্থান ও পতন হইয়াছে অর্থাৎ শ্রেণীতে শ্রেণীতে অনবরত সংগ্রাম চলিয়াছে। এই নূতন আলোকসম্পাতে প্রাচীন ভারতেতিহাসে যাহা অন্ধকার ছিল তাহা আলোকিত হইয়াছে, যাহা নিরর্থক ছিল তাহা অর্থপূর্ণ হইয়াছে, যাহা মৃত প্রাণহীন ছিল তাহা সজীব প্রাণবন্ত হইয়াছে। এখানেই ডাঃ দত্তের কৃতিত্ব ও মৌলিকত্ব। তার পূর্বে কোনো দেশী বা বিদেশী ঐতিহাসিক বা ভাতরতত্ববিদ এমন কি মার্ক্সবাদীও এ কাজ করিতে পারেন নাই। এইজন্য যাঁরা ভারতের কাল্পনিক নয় বাস্তবিক ইতিহাস জানিতে চান—তাঁদের সংখ্যা বর্তমানে কম নয় ও ক্রমবর্ধমান—তাঁরা সকলেই আচার্য ভূপেন্দ্রনাথের নিকট চিরঋণী থাকিবেন। মার্ক্সবাদীগণ তো বটেই। কারণ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন দেশে যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়াছে অথচ এ যাবত শ্রেণী সংগ্রামের উদাহরণ দিতে হইলে তাঁহাদের কথায় কথায় ইওরোপীয় ইতিহাসের আশ্রয় লওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। অতঃপর আর তাহার প্রয়োজন হইবে না। আমাদের দেশের ইতিহাসেই তাঁহারা প্রচুর উদাহরণ পাইবেন।

ভারতের জাতি ব্যবস্থা সম্বন্ধে এ পর্যন্ত দুই রকম মত চলিয়া আসিতেছিল—একটি প্রধানত ভারতীয়, দ্বিতীয়টি প্রধানত বিদেশীয়। প্রথমটিকে ইতিহাসের ধার্মিক ব্যাখ্যা ও দ্বিতীয়টিকে racial ব্যাখ্যা বলা চলে। যে কোন নিষ্ঠাবান হিন্দুকে যদি আজও জিজ্ঞাসা

করা যায়, ব্রাহ্মণ ভূদেব হইল কেন? ক্ষত্রিয় দেশের রাজা ও ব্রাহ্মণ প্রজা হওয়া সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ কেন ক্ষত্রিয়ের উচ্চ হইল? শূদ্র সকলের নিচে কেন রহিল?—তিনি সেই মুহূর্তেই বলিবেন; যেহেতু ব্রাহ্মণ ব্রহ্মকে জানে ও তাহার ব্রহ্মতেজ আছে, অপরের সে জ্ঞান বা তেজ নাই। কিংবা তিনি বলিবেন, পূর্ব জন্মের কর্মফল। অথবা তিনি পণ্ডিত হইলে বলিবেন, পুরুষের (ঈশ্বরের) মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উদর হইতে বৈশ্য ও পদ হইতে শূদ্র জন্মিয়াছিল বলিয়া। এ তিনটিই হইল ধার্মিক ব্যাখ্যা। ইওরোপীয়দের মধ্যে জার্মান পণ্ডিত ডাঃ ম্যাকসওয়েবার এই মতবাদী ছিলেন। দ্রষ্টব্য এই যে, ধার্মিক ব্যাখ্যাকারীরাই বিশ্বাস করেন যে, প্রাচীন ভারত ছিল ভূস্বর্গ, দেবভূমি, তপোবন, পূণ্যতীর্থ ইত্যাদি।

কিন্তু ইওরোপীয়েরা এই ধার্মিক মনোবৃত্তি অনেকদিন পরিত্যাগ করিয়াছে। সুতরাং ইওরোপীও পণ্ডিতগণ ধার্মিক ব্যাখ্যা না দিয়া racial ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন। কারণ আজ সাম্রাজ্যবাদী যুগে একটি প্রবল race বা nation অন্য দুর্বল বা পশ্চাদ্বর্তী race বা nation-এর উপর আধিপত্য করিবে ইহা একান্ত স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। নাৎসীদের Nordicism এই মনোবৃত্তির চরম বিকাশ হইলেও ইহা তাহাদের একচেটিয়া নহে। সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশেই অল্প বিস্তর এই মনোবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। সেইজন্য কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ভারতীয় জাতি প্রথার এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন—বৈদিক যুগে চতুর্বর্ণ ছিল। বর্ণ মানে ত্বকের বর্ণ। ব্রাহ্মণের গাত্রবর্ণ ছিল শ্বেত, ক্ষত্রিয়ের লোহিত, বৈশ্যের পীত ও শূদ্রের কৃষ্ণ। অর্থাৎ এই চারিবর্ণ Blumenbach বর্ণিত চারিটি বিভিন্ন race-এর লোকদ্বারা গঠিত ছিল। দ্বিতীয় প্রকারের মত এই যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই প্রথম তিন বর্ণ দ্বিজ ও ইহারাই আর্য ও শ্বেত বর্ণ। শূদ্র কৃষ্ণ বর্ণ, অনার্য ও ভারতের আদিম অধিবাসী। সুতরাং এই মতানুসারে আর্যদিগের নিজেদের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না—সংগ্রাম ছিল শ্বেতবর্ণ আর্য ও কৃষ্ণবর্ণ অনার্য এই দুটি race-এর মধ্যে এবং বর্ণ বিভাগ এই সংগ্রামের ফল।

The Peoples of India ও The Caste and Tribes of Bengal গ্রন্থের লেখক Sir Herbert Risley জাতিভেদের উৎপত্তির প্রকরণ এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন : আর্যেরা যখন ভারতে প্রথম আসেন তাঁরা অনার্যদের ঘৃণা করিতেন বটে কিন্তু তাদের রমণী গ্রহণ করা ছাড়া উপায় ছিল না, কিন্তু নিজেদের রমণী তাঁরা অনার্যদের দিতেন না। কালক্রমে অনার্যদের সঙ্গে সর্বপ্রকার আদান প্রদান তাঁরা বন্ধ করিয়াছিলেন। ফলে এই হইল যে, যে সব আর্যদের সঙ্গে অনার্যদের কোন সংমিশ্রন হয় নাই তাঁরা প্রথম বর্ণ; যাঁদের মধ্যে যে পরিমাণে সংমিশ্রণ হইয়াছে তাঁরা সেই অনুপাতে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বর্ণ হইলেন ও শুদ্ধ অনার্যেরা সর্ব নিম্নে রহিল। এই মতবাদ হইতে Risley সাহেব এই সাধারণ সূত্রটি রচনা করিয়াছেন যে, যে জাতির মধ্যে আর্যরক্ত যত বেশী, সে জাতির সামাজিক মর্যাদা তত বেশী, পক্ষান্তরে যে জাতির মধ্যে অনার্য রক্ত যত বেশী, তার সামাজিক মর্যাদাও তত কম। এই সূত্রটিকে তিনি বৈজ্ঞানিক ভাষায় এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—"কোন জাতির নাক ও মাথা যত চওড়া তার সামাজিক আসন তত নিম্নে, যার নাক ও মাথা যথাক্রমে যত সরু ও লম্বা তার আসন তত উচ্চে।" এটি বৈজ্ঞানিক মতবাদ বলিয়া মনে হইতে পারে। Risley সাহেব নাকি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকদের মাথা ও নাক মাপজোপ করিয়া তাঁর প্রতিপাদ্য প্রমাণ করিয়াছিলেন। অথচ ডাঃ দত্ত তাঁরই মাপ হইতে এবং

নিজের স্বতন্ত্র মাপ হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে, Risley সাহেবের মতের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই।

ডাঃ দত্তের মত উপরোক্ত ধার্মিক নৃতাত্ত্বিক দুই মতেরই বিরোধী কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্তকে সংক্ষেপে বিবৃত করা অসম্ভব। তিনি চতুর্দশ অধ্যায়ে ও ৪০০ পৃষ্ঠায় ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃতি, ও প্রামাণিক সাহায্যে যে মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্তসার ২।৪ পৃষ্ঠার মধ্যে দিতে যাওয়া বাতুলতা। অথচ তা না দিলেও কর্তব্যচ্যুতি ঘটে। কেন না গ্রন্থখানির আসল কোনই পরিচয় দেওয়া হয় না। তাই নিচে তাঁর মতবাদের রক্তমাংসহীন একটি শুষ্ক কঙ্কাল মাত্র দেওয়া হইল।

পূর্বে জাতি ছিল না, বর্ণ ছিল। ঋগ্বেদে মাত্র পুরুষ সূক্ত ভিন্ন অন্য কোথাও শূদ্র বর্ণের উল্লেখ নাই। অনেকে কিন্তু এই সূক্তটিকে পরবর্তী কালের প্রক্ষিপ্ত রচনা বলিয়া বিবেচনা করেন। শুক্ল যজুর্বেদে ও ঐতরেও ব্রাহ্মণে শূদ্রের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈদিক যুগের লোকেরা নিজেদের 'আর্য' ও শত্রুদের দাস, দস্যু ও অসুর বলিতেন। আর্য শব্দ race বাচক নয়, সংস্কৃত সাহিত্যে সর্বত্রই সংস্কৃতি বাচক; কৌটিল্যে—রাজনৈতিক অবস্থা বাচক, অর্থ স্বাধীন নাগরিক (free citizen)। ৫০০ খৃঃ পূর্বাব্দে যাস্কের নিরুক্তে কিকট বা মগধ দেশবাসী সম্বন্ধে 'অনার্য' কথা প্রথম ব্যবহৃত হয়। অনার্য শব্দের ব্যবহারও race অর্থে নয়। চতুঃবর্ণ বিভিন্ন—স্বদেশী ও বিদেশী—সমাজের লোকদ্বারা গঠিত হয় নাই। চারিবর্ণই একই আর্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শূদ্রও আর্য ছিল। বৈদিক যুগে সাধারণ জনগণের নাম ছিল বিশ্ এবং সমস্ত বিশ্কেই আর্য বলা হইত। বৈশ্য মানে বিশের সন্তান। বৈশ্য ও শূদ্র দুই বর্ণেরই কাজ একপ্রকার ছিল। অনেক দিন পর্যন্ত সেইজন্য বৈদিক সাহিত্যে 'শূদ্রার্যৌঃ' কথা পাওয়া যায়। তারা উভয়েই কৃষিকার্য, পশুপালন ও শিল্প কর্ম করিত। রাজা হর্ষবর্ধনের সময় বৈশ্যেরা কৃষি ও পশুপালন ছাড়িয়া বাণিজ্য আরম্ভ করে। এই সময় হইতে শূদ্রেরা একাই কৃষিকার্য ও পশুপালন করিতে থাকে। শূদ্রেরা দাস বা ভূমিদাস ছিল না। যে কোন বর্ণের আর্য বর্ণাধিকার হারাইলেই শূদ্র বর্ণে পরিণত হইত। বর্ণের মানে ছিল বর্গ (class)। যদি বর্ণ মানে রং হয় তাহা হইলে গাত্রবর্ণ নয়; বস্ত্রবর্ণ হইতে পারে। পারস্য ও জার্মানীতে বিভিন্ন বর্ণের বস্ত্রবর্ণ ছিল বিভিন্ন। আলঙ্কারিক অর্থেই বর্ণ শব্দ ব্যবহৃত হওয়া সম্ভব। ব্রাহ্মণের কর্ম পবিত্র, অতএব শ্বেত; শূদ্রের কর্ম মলিন অতএব কৃষ্ণ।

বিশ্ হইতে ক্ষত্রিয় বা রাজন্য উদ্ভূত হয়। রাজা একাধারে ছিলেন শাসক, বিচারপতি ও পুরোহিত। ব্রাহ্মণেরা প্রথমে ছিলেন রাজকুলের ভাট বা কবি। তাঁরা রাজাদের স্বগোত্র। পরে ক্রমে ক্রমে তাঁরা পুরোহিতের কার্য রাজার নিকট হইতে কাড়িয়া লন। কিন্তু বিনা সংগ্রামে এই অধিকার তাঁরা পান নাই। বেদে বেণ রাজা, রাজা নহুস্, রাজা পুরুরবস্ ইত্যাদির উপাখ্যানে শত রুদ্রীয়, ব্রহ্মজায়া ও ব্রহ্মগবী মন্ত্রে তার প্রমাণ আছে। কার্তবীর্যার্জুন ও পরশুরামের যুদ্ধের কাহিনীর মধ্যেও সেই সংগ্রামের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। পুরোহিতের অধিকার প্রাপ্তি ভিন্ন অন্য সব বিষয়ে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়ের কাছে হার হইল—ক্ষত্রিয় প্রথম বর্ণ হইল। সমস্ত বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য ও ব্রাহ্মণের উপর মর্যাদা স্বীকৃত হইয়াছে। আরণ্যক ও উপনিষদের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া শিশুনাগ বংশের

শাসনকাল অবধি ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্যের যুগ। পরবর্তী—নন্দ বংশ শূদ্র বংশ। ব্রাহ্মণ কৌটিল্যের সাহায্যে আর এক শূদ্র চন্দ্রগুপ্ত মগধে শূদ্র সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। সম্রাট অশোক মৌর্য সাম্রাজ্যে শূদ্র ও ব্রাহ্মণের মধ্যে ব্যবহার সমতা ও দণ্ড সমতার প্রবর্তন করেন। মৌর্য বংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করিয়া ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র স্নঙ্গ বংশ স্থাপন করেন। ভারত ইতিহাসে এই প্রথম ব্রাহ্মণ বংশ রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিল। ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে মনুসংহিতার শ্রেষ্ঠত্ব এই সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়। স্নঙ্গ বংশের পর উত্তর ভারতে কণ্ববংশ, অন্ধ্র বংশ ও বাকাটক বংশ এই তিনটি ব্রাহ্মণ বংশ রাজত্ব করে। দক্ষিণাপথেও অন্ধ্র বংশের পর পল্লব বংশ, কদম্ব বংশ ও গঙ্গা বংশ এই তিনটি ব্রাহ্মণ বংশ রাজত্ব করে। মধ্যে উত্তর ভারতে ভারশিব ও গুপ্ত বংশ ব্রাহ্মণ না হইলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পরম পোষক ও রক্ষকরূপে কার্য করে। দক্ষিণাপথের শেষ হিন্দু রাজবংশ বিজয় নগর ব্রাহ্মণ না হইলেও গুপ্তদের মত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গোঁড়া সমর্থক ছিল। এইরূপ দীর্ঘকাল রাজত্বের ও রাজসম্মান লাভের ফলে ব্রাহ্মণ সমাজের প্রথম বর্গ ও ভূদেব হইয়াছেন। মনুসংহিতার জন্য নয়।

ভারশিব, বাকাটক ও গুপ্ত সম্রাটগণের রাজত্বকালে নব ব্রাহ্মণ্য ধর্ম জন্মলাভ করে। ভারশিবেরা শৈব ধর্ম ও গুপ্তেরা বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করে। তৎপূর্বে শক ও কুষাণগণ উত্তর পশ্চিম ভারতে রাজ্যবিস্তার করে। কুষাণগণ বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁদের সময় মহাযান বৌদ্ধ-ধর্মের প্রসার হওয়ায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম নিজরূপ পরিবর্তন করিতে বাধ্য হয়। বৈদিক যাগযজ্ঞ অর্থাৎ হিংসা ছাড়িয়া দিয়া, জাতিবৈষম্য শিথিল করিয়া, সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া বৌদ্ধধর্মের বিনাশ সাধনে সচেষ্ট হয়। এই সময়ে অধিকাংশ পুরাণ রচিত হয় ও মহাভারত বর্তমান রূপ প্রাপ্ত হয়। এই সময়েই রামায়ণ ও মহাভারতের ক্ষত্রিয় বীরদ্বয় ভগবানের অবতার রূপে স্বীকৃত হন। এই সময়েই বৈষ্ণব ধর্মের কৃপায় ও পুরাণাদির প্রসাদে আচার, বিচার, শুচি, অশুচির উপদ্রব আরম্ভ হয়।

তারপর হর্ষবর্ধনের সময় প্রথম বৈশ্য বংশ রাজা হয়। হর্ষবর্ধন বৌদ্ধ ছিলেন। বাঙলার গোঁড়া ব্রাহ্মণ রাজা শশাঙ্কের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। এই ঘটনার প্রায় ১০০ বৎসর পরে বাঙলায় শূদ্র পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল। প্রায় চারি শত বৎসর এই বৌদ্ধ বংশ বাংলায় রাজত্ব করে। জলন্ধর পর্যন্ত উত্তর ভারতে ইহাদের রাজত্ব বিস্তৃত হয়। এই সময়ে পশ্চিম ভারতে মুসলমান আক্রমণ শুরু হইয়া যায়। তখন নানা অস্পৃশ্য জাতি, যথা গুজর, আভির, জাঠ, হুণ ইত্যাদির মধ্য হইতে ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ করিয়া অর্থাৎ অগ্নি পরিশুদ্ধ করিয়া চার অগ্নিকুল 'রাজপুত' জাতির সৃষ্টি করে। তারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পরম পরিপোষক হয়। পাল রাজত্বের শেষের দিকে বাঙলায় বাহির হইতে শূর, বর্মণ ও সেনবংশ আসিয়া বাস করে। সেন বংশ ব্রহ্মক্ষত্রিয় বংশ। এই বংশ পালদের উচ্ছেদ করিয়া নিজেদের রাজত্ব স্থাপন করে। পরে মুসলমান আক্রমণে হিন্দু রাজত্বের অবসান হয়। সেন রাজ্যের পতন এবং চৈতন্য, রঘুনন্দনের উদয়—এই সময়ের মধ্যে বাঙলার জাতি ব্যবস্থা বর্তমান রূপ ধারণ করে। অধিকাংশ লোক মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করে, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও উচ্চ শ্রেণীর বৌদ্ধরা তান্ত্রিক হিন্দু হয়; সাধারণ বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণ নেতৃত্বে চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের পশ্চাদ্দ্বার দিয়া হিন্দু সমাজে প্রবেশ করে ও আচরণীয় অর্থাৎ সৎশুদ্র বা নবশাখ রূপে পরিগণিত হয়। যে সব বৌদ্ধ সদ্ধর্ম ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইল না ও সেই সব আদিম

অধিবাসী যারা তাদের ঔপজাতিক ধর্ম লইয়া রহিল তাহারা অনাচরণীয় বা অসৎ শুদ্রে পরিণত হইল। ধর্ম সংঘর্ষ ও অস্পৃশ্যতা উভয়ই বর্ণ সংগ্রামেরই বিভিন্ন রূপমাত্র।

আদিতে শুদ্ধ বর্ণ বিভাগ ছিল। বর্ণ বিভাগ সামাজিক শ্রমবিভাগ মাত্র। প্রথমে উচ্চ নিচ ধারণা তার মধ্যে ছিল না। এক বর্ণের লোক অনায়াসে বর্ণবৃত্তি ত্যাগ করিয়া অন্যবৃত্তি গ্রহণ করিতে কিংবা অন্য বর্ণের সহিত আহার ও বিবাহাদি করিতে পারিত। অনুলোম প্রতিলোম দুই রকম বিবাহ পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল। পরে বৌদ্ধ যুগে একই বর্ণের মধ্যে সামাজিক প্রয়োজনে কর্মের বিভাগ ও উপবিভাগ হইয়া নানা সঙ্কর বা মিশ্র জাতির সৃষ্টি হইল। বৌদ্ধযুগে আসিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, এক একটি পেশার লোকেরা এক একটি শ্রেণী (guild) গঠন করিয়াছে। প্রথমে Craft-guild গুলির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যথা, তৈলিক, তন্তুবায়, চর্মকার ইত্যাদি। মৌর্য যুগে বহু Craft-guilds-এর সন্ধান পাওয়া যায়। পরে Trade-guilds উদ্ভূত হয়। হর্ষবর্ধনের সময় Trade-guildsগুলি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। শ্রেণীগুলির কার্যনির্বাহ, আইন প্রণয়ন ও বিচার এই ত্রিবিধ ক্ষমতাই ছিল। একটি নির্বাচিত কমিটি বা সভা শ্রেণীর কার্য নির্বাহ করিত। কমিটির সভাপতির নাম ছিল মহামাত্য, অন্য তিন বা পাঁচজন সদস্য তাঁহাকে কার্য পরিচালনায় সাহায্য করিত। পরে সামন্ত প্রথা যতই দৃঢ় হইতে লাগিল রক্তশুদ্ধি, খাওয়া, ছোঁওয়া, শুচি, অশুচির বিচার ততই বাড়িতে লাগিল। এইরূপে শ্রেণীগুলির মধ্যে পরস্পর আহার ও বিবাহ বন্ধ হইল। একই শ্রেণীর মধ্যে পেশাও তেমনি কতকগুলি পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ হইল ও শেষ পর্যন্ত পিতা পুত্র ক্রমে অনুসরণীয় (hereditary) হইল। এই প্রকারে বিভিন্ন শ্রেণীগুলি বর্তমান কালের অসংখ্য জাতি ও উপজাতিতে পরিণত হইল। শ্রেণীর আইনকানুন জাতি ধর্ম বা আচার, শ্রেণীর সভা, জাতি পঞ্চায়েত ও শ্রেণীর দেবতা জাতি দেবতা হইয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বর্ণের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের কর্ম বিভাগ না থাকায় শ্রেণী সংগঠন দেখা যায় না। মুসলমান যুগের আদিকাল পর্যন্ত শ্রেণীর অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। তারপর আর পাওয়া যায় না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মুসলমানদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীগুলি প্রস্তরীভূত হইয়া বর্তমান জাতিগুলিতে পরিণত হইয়াছে। আবার জাতিগুলি আদি নিবাস অনুযায়ী নানা উপজাতিতে বিভক্ত হইয়াছে। বর্তমানে বর্ণ নয়, জাতিও নয়, উপজাতিই সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেমন ব্রাহ্মণদের মধ্যে ঔদীচ্য, সারস্বত, গৌড়, নাগর, রাঢ়ী, বারেন্দ্র ইত্যাদি। নাগভট্ট মতে মহারাষ্ট্রে ও রঘুনন্দন মতে বঙ্গদেশে বর্তমান কালে মাত্র দু'টি বর্ণ আছে—ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। মধ্যদেশে ছত্রি (ক্ষত্রিয়) ও বাণিয়া (বৈশ্য) বর্ণও আছে। কোন কোন জাতির মধ্যে গোত্র-চেতনা ও কোন কোন জাতির মধ্যে দেশ-চেতনা প্রবল। একটি আর একটির পরিপন্থী। যে সব জাতির মধ্যে গোত্র-বন্ধন বিদ্যমান, যেমন রাজপুত জাতি, তারা দেশ হিসাবে উপজাতি গঠন করে নাই। কায়স্থ জাতির মধ্যে গোত্রানুযায়ী উপজাতি যেমন অম্বষ্ঠ, শকসেনা, আবার দেশানুযায়ী উপজাতি যেমন মাথুর দুই-ই দেখা যায়।

বর্তমান কালেও যে নূতন উপজাতির সৃষ্টি হওয়া একেবারে বন্ধ হইয়াছে তাহা নয়। একই জাতির মধ্যে যে অংশ আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে সক্ষম হয় সে অংশ নিজেকে অবশিষ্ট হইতে পৃথক করিয়া উন্নত জাতিতে পরিণত করে, যেমন গোয়ালা ও সদ্‌গোপ,

ধোপা ও চাষা ধোপা, কৈবর্ত ও চাষী কৈবর্ত, তেলী ও কলু ইত্যাদি। অধুনা সাধারণত অবস্থা পরিবর্তনের উপায় হইতেছে কৃষিকার্য অবলম্বন করা অর্থাৎ ভূস্বামী হওয়া। শেষ পর্যন্ত ভূস্বামী যারা হইতে পারিয়াছে তারা নিজেদের 'রাজপুত' বলিয়া প্রচার করিয়াছে ও কোন কোন জায়গায় রাজা পর্যন্ত হইয়াছে, যেমন ছোটনাগপুরের নাগবংশী মহারাজা, পঞ্চকোটের গোবংশী রাজা ও বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা। আর যারা অবস্থা ফিরাইতে পাবে না— তারা অস্পৃশ্য, ভুঁইয়া বা ভূমিজই থাকিয়া যায়।' স্বতরাং দেখা যাইতেছে যে, জাতি একটি সামাজিক পদ মাত্র। আর্থিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শাসন ক্ষমতা হাতে আসে অথবা রাজকীয় শক্তির সাহায্য পাওয়া যায়, তখন সামাজিক পদোন্নতি অর্থাৎ নীচ জাতি হইতে উচ্চ জাতিতে উন্নতি আপনা হইতেই হয়। বল্লাল সেন, মালাকার, কুম্ভকার, কর্মকার ও চাষী কৈবর্তকে আচরণীয় অর্থাৎ সৎশূদ্রে উন্নীত করিয়াছিলেন। আবার উল্টা দিকে তিনি স্বর্ণবণিককে অনাচরণীয় জাতি বা অসৎশূদ্রে পরিণত করেন। বাংলাদেশে প্রত্যেক অসৎ-শূদ্র জাতির পৌরহিত্যের জন্য পৃথক পৃথক ব্রাহ্মণ আছে। তাদের 'বর্ণ ব্রাহ্মণ' বলে। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ এমন কি সৎশূদ্র পর্যন্ত এই ব্রাহ্মণদের ছোঁওয়া খায় না। ইহাদের নিজেদের মধ্যেও খাওয়া ছোঁওয়া বা বিবাহ নাই। পক্ষান্তরে আসামে ও চিত্রল হইতে নেপাল পর্যন্ত পার্বত্য হিন্দু রাজ্যসমূহে উচ্চ নীচ জাতির মধ্যে আহারাদি ও অনুলোম বিবাহ এখনও প্রচলিত আছে। তার কারণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এই সব স্থানে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

ইসলামের আবির্ভাবের পর হিন্দু সমাজে জনগণের অদৃষ্ট সহনীয় করিবার জন্যই হউক বা মুসলমান ধর্মে জনগণের দলে দলে দীক্ষা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই হউক, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে নিম্নশ্রেণীর মধ্য হইতেই কতকগুলি সংস্কারমূলক বা প্রতিবাদমূলক ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। তাদের মধ্যে কর্ণাটের বীর শৈব বা লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়, গৌড়ের বৈষ্ণব সম্প্রদায়, মধ্যদেশের কবীর ও দাদূ সম্প্রদায় ও পঞ্জাবের নানক বা শিখ সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য। এগুলির প্রত্যেকেরই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—জাতিভেদ তুলিয়া দেওয়া। তার মধ্যে লিঙ্গায়েত ও শিখ সম্প্রদায়ই এই দিকে সর্বাপেক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, সব সম্প্রদায়গুলির মধ্যেই জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণ পৌরহিত্য ফিরিয়া আসিয়াছে অর্থাৎ যে হিন্দু সমাজের জাতিপ্রথাকে তারা উচ্ছেদ করিতে গিয়াছিল শেষ পর্যন্ত তাহারা নিজেরাই সেই হিন্দু সমাজের এক একটি স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে। এদের মধ্যে শিখেরা নিজেদের অবস্থা অনেকাংশে সংশোধন করিতে পারিয়াছে। বীর শৈবরা স্বতন্ত্র জাতি হইয়াছে, তাহাদের আচার্য ও জঙ্গমেরা ব্রাহ্মণের অনুরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙালী বৈষ্ণব যাহাদের জাতি ছিল না তাহারা "জাতবোষ্টম" হইয়াছে। বর্তমানে অনেক অন্ত্যজ ও অনাচরণীয় জাতি দেখিতেছে যে, বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ জাতির আনুগত্য স্বীকার ও অনুগ্রহ লাভ ভিন্ন জাতে উঠিবার আর কোন উপায় নাই। তাই তাহারা আদাজল খাইয়া গোব্রাহ্মণ সেবা করিতে ও ব্রাহ্মণানুমোদিত আচার অর্থাৎ বিধি-নিষেধ পালন করিতে লাগিয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পৈতা লইয়া বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় হইবার হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে।

এই হইল সংক্ষেপে ডাঃ দত্তের মতবাদ। স্বত্রাকারে এই মতটিকে প্রকাশ করিতে হইলে বলা চলে "বর্ণ—শ্রেণী—জাতি।"

জিজ্ঞাস্য হইবে, এই পুস্তকটিতে কি তবে কোনো ত্রুটিই নাই? নিশ্চয়ই আছে, কয়েকটির এখানে উল্লেখ করিলাম। প্রথম, প্রচুর বর্ণাশুদ্ধি। বাস্তবিক পক্ষে এত ছাপার ভুল আছে যে, পড়িতে পড়িতে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। বাক্যবিন্যাসেরও দোষ যথেষ্ট দেখা যায়। বোঝা যায় না বাক্যের মধ্য হইতে কতগুলি শব্দ ছাপার সময় পড়িয়া গিয়াছে, না, মূল পাণ্ডুলিপিতেই ছিল না। যদি ছাপার দোষে এরূপ হইয়া থাকে, পরবর্তী সংস্করণে বিশেষ সাবধানতার সহিত প্রুফ দেখিয়া এই দোষগুলি দূর করা দরকার। নয় পাণ্ডুলিপি সংশোধন করা দরকার। দ্বিতীয়, মূল্যের অনুপাতে কাগজ, বাঁধাই ও মলাট আরও ভাল হওয়া উচিত ছিল। গ্রন্থখানির তৃতীয় ত্রুটি হইল পুনরুক্তিদোষ। একই কথা বহু স্থানে বা বহু অধ্যায়ে পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ অনুমান হয় এই যে, বিভিন্ন অধ্যায়গুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশের জন্য স্বতন্ত্রভাবে রচিত হইয়াছিল। পরে বিশেষ কিছু পরিবর্তন না করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই তিনটি ত্রুটি হইল আঙ্গিক।

ইহা ছাড়া আরও দুইটি বিষয় আছে যাহা আমার কাছে আপত্তিজনক মনে হইয়াছে। দুইটিই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সহিত জড়িত। প্রথম, গ্রন্থটির নাম "ভারতীয়" সমাজপদ্ধতি না হইয়া "প্রাচীন ভারতীয" অথবা "হিন্দু" সমাজপদ্ধতি হওয়া উচিত ছিল। কারণ, গ্রন্থখানিতে মুসলমান সমাজব্যবস্থার কোনই আলোচনা নাই, আছে মাত্র হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থার। তাহাও মুসলমান যুগে আসিয়াই থামিয়া গিয়াছে। যে সামান্য কয়েকটি পৃষ্ঠায় মুসলমান যুগের উল্লেখ আছে তাহাতে হিন্দু সমাজব্যবস্থারই পরিণতি বিচার করা হইয়াছে। সমগ্র গ্রন্থখানির মধ্যে "উপসংহার" শীর্ষক শেষ অধ্যায়ে মাত্র সওয়া দুই পৃষ্ঠায় (৪৬০ পৃষ্ঠার শেষ হইতে ৪৬২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত) লেখক ভারতীয় মুসলমানগণ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ভাবে দু'চার কথা বলিয়াছেন। যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহার মতো স্বাধীন চিন্তাশক্তিসম্পন্ন প্রগতিশীল লেখকের উপযুক্ত হয় নাই। এখানে আসিয়া তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক ও বাস্তব দৃষ্টি হারাইয়া গতানুগতিক মনোবৃত্তিব পরিচয় দিয়াছেন। অর্থাৎ মুসলমানদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহার ভাবা কথা নয়, শোনা ও শেখা কথা। তাই তাঁহাব বক্তব্যের মধ্যে আত্ম-সংগতির পরিবর্তে স্ববিরোধ প্রকাশ পাইয়াছে।

জাতিপ্রথার ভূত ও বর্তমান আলোচনা করিবার পর গ্রন্থের উপসংহারে লেখক তাহার ভবিষ্যত বিচার করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণে হিন্দু সমাজে জাতিপ্রথা ভাঙিয়া যাইতেছে ও তাহার স্থানে একজাতীয়তা (nationhood) গড়িয়া উঠিতেছে। এই সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মণ্য ধর্ম হিন্দুকে রাষ্ট্রনৈতিক একতা না দিলেও সাংস্কৃতিক একতা দিয়াছে। হিন্দুদের মধ্যে এক সাধারণ সংস্কৃতি, সাধারণ ঐতিহ্য ও সাবারণ রীতিনীতি আছে। সংস্কৃতির দিক হইতে হিন্দু এক জাতি।" তাহা হইলে লেখকের পক্ষে মুসলমানেরা এক পৃথক জাতি—একথা স্বীকার করা ছাড়া উপায় থাকে না, এবং তিনি অন্যত্র (২৬৯ পৃষ্ঠায়) এই কথা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকারও করিয়াছেন। তিনি সেখানে বলিয়াছেন "Islam not only brought a foreign religion but it also brought a civilisation rival to the Indian (Hindu ?) one in every respect. Thus an Indian being converted to Islam had to change himself in every way, he had to break away completely from the Indian traditions.

Moreover the international outlook of Islam was incompatible with Hindu Orthodoxy." এই স্বীকৃতির পরেও তিনি বলিতেছেন (৪৬০ পৃঃ): "An impartial observer will say that the Muslims of India do not form a separate group. They are as much Indians as the others are."

এত অমিল সত্বেও হিন্দু ও মুসলমান কি করিয়া এক nation হইল? দু'টি বিষয়ে তাহাদের ঐক্য আছে বলিয়া। প্রথম ঐক্য হইল ethnic unity. Ethnic unity-র ঠিক অর্থ কি বোঝা কঠিন। তাহার উপর বৈদিক ধর্ম এই ethnic unity গড়িয়াছে বলিলে উহা বুঝিবার পক্ষে আরও কঠিন হইয়া পড়ে। বৈদিক ধর্ম যখন ছিল তখন মুসলমান ছিল না। সুতরাং অনাগত মুসলমানের উপর কি ভাবে কার্য করিয়া বৈদিক ধর্ম হিন্দু মুসলমানকে মিলাইয়া এক race-এ পরিণত করিল বুঝিবার আদৌ উপায় নাই। ব্যাপারটি একটি হেঁয়ালির মতো হইয়া দাঁড়ায়। হিন্দু মুসলমানগণের মধ্যে দ্বিতীয় ঐক্য হইল এইখানে যে, হিন্দুর ছোঁয়াচ মুসলমানেও লাগিয়াছে। মুসলমান সমাজেও উচ্চ-নীচ জাতিভেদ ও ছুতাছুত সংক্রামিত হইয়াছে। কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হইতে পারে, কিন্তু একথা যে তিনি লিখিয়াছেন তাই নয়, নিজের উক্তির সমর্থনে দুইজন ইংরাজ Mr. M. Titus ও Sir Edward Gait, একজন হিন্দু Mr. S. Roy ও একজন মুসলমান Sir M. Iqbal-এর গ্রন্থ হইতে দুই পৃষ্ঠাব্যাপী উদ্ধৃতি দিয়াছেন। হিন্দু সমাজে জাতিভেদের কারণে ঐক্য নাই, মুসলমান সমাজেও ঐ একই কারণে ঐক্য নাই। সুতরাং হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের ভিত্তি হইল উভয়ের সামাজিক অনৈক্য। ডাক্তার দত্ত নিজেই বুঝিবেন, ইহা মোটেই অখণ্ড জাতীয়তার স্বপক্ষে যুক্তি নয়। বরং তিনি এই যুক্তি প্রয়োগ না করিয়া যদি বলিতেন যে, বাউল, সাহেব ধনী, সত্যধর্মী, নাগরচি, কীর্তনিয়া, চিত্রকর, নৈতা, মালকানা, মোতিয়া, মোমনা, শেখ, মোলেসালাম্‌, সঙ্গহর, সংযোগী, কবিরপন্থী, দাদুপন্থী, পাঁচপীরিয়া ইত্যাদি ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্য দিয়া হিন্দুমুসলমানের ধার্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে তাহা হইলে তাঁহার কথার কিছু মূল্য থাকিত। কিন্তু এই যুক্তি না দিয়া উপরোক্ত উদ্ভট যুক্তি প্রয়োগ করিলেন কেন, বুঝিতে পারিলাম না। শেষোক্ত যুক্তি প্রয়োগ করিলেও সমস্যার মীমাংসা হইত না। কারণ ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মসম্প্রদায়গুলি হিন্দু ও মুসলমান সমাজকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে নাই, দুই সমাজের বাহিরে তাহারাই একঘরে হইয়া এক মহৎ প্রয়াসের ব্যর্থতার সাক্ষ্য স্বরূপ কোন গতিকে টিকিয়া আছে।

সমস্যার সমাধান ঐ দিক দিয়া হইবার নহে। যে-দিক দিয়া হইতে পারে তাহার ইঙ্গিত তিনি নিজেই অন্যত্র দিয়াছেন। ৪০৬-৭ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন "The stage of nationhood is not yet reached in India, except in the provinces of Bengal and Maharastra where the people have evolved into the stage of provincial nationality." অর্থাৎ একজাতীয়তা গড়িয়া উঠিবে নিখিল ভারতীয় ভিত্তিতে নয়, প্রাদেশিক ভিত্তিতে; বাংলা ও মহারাষ্ট্র প্রদেশের অধিবাসিগণ বাঙালী ও মারাঠা জাতিতে পরিণত হইয়াছে। অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীরা এখনও সে-অবস্থায় পৌঁছাইতে না পারিলেও বিবর্তনের মধ্য দিয়া সকলেরই পরিণতি যে জাতীয়ত্বে তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং ভারতে একজাতীয়ত্বের কল্পনা ভুল। ভারত বহু জাতির দেশ।

এই কয়টি ত্রুটি সত্ত্বেও গ্রন্থকার আমাদের যাহা দিয়াছেন তাহা অমূল্য। তিনি ভারতে প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা বা ভ্রম দূর করিয়াছেন, তিনিই সর্বপ্রথম রাজনৈতিক বা রাজা রাজড়ার ইতিহাসের পরিবর্তে সামাজিক অর্থাৎ প্রকৃত জনগণের ইতিহাস লিখিয়াছেন। তিনি নূতন পথপ্রদর্শক। পথপ্রদর্শকের কাজের মধ্যে গোড়ায় কিছুটা অসম্পূর্ণতা থাকা স্বাভাবিক। তিনি ভারতের সামাজিক ইতিহাসের যে খসড়া বা কাঠামো তৈয়ার করিয়া দিয়া গেলেন তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণকারিগণ পরবর্তী কালে আরও অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়া নিশ্চয়ই তাঁহার আরব্ধ কার্যকে পরিপূর্ণতার দিকে লইয়া যাইবে। কিন্তু তাহাতে পথপ্রদর্শকের সম্মান আদৌ লাঘব হইবে না—চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে।*

রাধারমণ মিত্র

জাপানী গল্প

য়্যাটম্ বম্ব !……

যুদ্ধে পূর্ণচ্ছেদ টানলো কিনা কে জানে, কিন্তু হিরোশিমার ওপরে পড়লো বিরাট একটা জিজ্ঞাসা চিহ্নের আকারে।

হিরোহিটোর আসন টললো। শুরু হ'লো আত্ম-সমর্পণ, আর হারা-কিরি। কোন' ব্যক্তি বিশেষের হারা-কিরি খুব কিছু একটা ব্যাপার নয়। কিন্তু এ একটা জাতির হারা-কিরি।

তারপরে খবর এলো সুভাষ বোসের মৃত্যু-(?)……

তা'তেও জিজ্ঞাসা-চিহ্ন।

সন্দেহ আর মেটে না বিশ্বনাথের। চৌরিঙ্গির ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলে, আর ভাবে সে,—বিরাট দুনিয়ার কথা, বিচিত্র সমস্যার কথা। পরাধীন দেশের মাটিতে পা রেখে সে সত্যিই ভাবে, একটা জাতির পরাজয়ের কথা।

একজন মার্কিন সৈনিকের গায়ের ওপর এসে প'ড়ে চমক ভাঙ্গে বিশ্বনাথের। মার্কিন সৈন্য সহজ অবস্থায় না থাক, দোষ কিন্তু বিশ্বনাথেরই। সমস্ত চিন্তাধারা তার টুক্রো টুক্রো হ'য়ে যায়। কিন্তু চুপ ক'রে সেখানে একটু দাঁড়াবার অধিকার তার নেই। প্রগল্‌ভ জনস্রোত অবিরাম ব'য়ে চলেছে। যেদিকেই যাও—প্রায় উজান ঠেলেই যাওয়া। আর একবার একটু অসাবধান হয়ে থামলেই ধাক্কায় ধাক্কায় কোথায় যে নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই।

বিশ্বনাথ কেন জানি আজ পথ চলতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। সেটা সে দু'তিনটে ধাক্কা খাওয়ার পরেই বেশ বুঝতে পারলো। শেষ ধাক্কাটা কোনরকমে সে সাম্‌লেছে—শুধু সামলানো নয়—একেবারে একটা কেলেঙ্কারির হাত থেকে সে বেঁচেছে।

---

*Studies in Indian Social Polity By Dr. Bhupendra Nath Datta. Purabi Publishers, Calcutta. pp. 464 + IV. Rs. 6/8

আর সেটা সম্যক উপলব্ধির জন্যে একপাশ হয়ে সে একটা বইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। বই দেখার জন্যেই ঠিক নয়—একটু ভিড়ের বাইরে এসে দাঁড়াবার জন্যেই।

কেলেঙ্কারি একটা হতে যাচ্ছিল—হয়নি। তিনটি বিলিতি ধরনের নেপালী মেয়ে—সাজ-গোজে চৌরিঙ্গি অঞ্চলে ঘুরে বেড়াবার অধিকার অবশ্যই তারা অর্জন করেছে এবং সেই তাদেরই একটির সঙ্গে সামান্য ছোঁয়া—ধাক্কাটা লাগলো অবশ্য মনে। বিশ্বনাথের চালু মন রীতিমত হোঁচট খেল।

বিশ্বনাথের নজরে পড়লো—Hard Facts ... Erotic Edna ... Chungking Diary ...Rainbow...এমন কত কিছু বই। ফুটপাতে ভিড়ের যেমন জাত নেই, এখানে বইয়েরও তেমন জাত নেই। একজন লম্বা-চওড়া সুপুরুষ মার্কিন সৈন্যের কোমর জড়িয়ে ধরে হয়তো চলেছে অতি কুৎসিৎ কালো বেঁটে বসন্তের দাগে মুখ-ছাওয়া ঘাঘ্‌রা-ফ্রক্-পরা, উমা দাস লেনের একটা মেয়ে, নয় তো সুরূপা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান একটি মেয়েকে জড়িয়ে ধরে' চলেছে হয় তো দৈত্যের আকার মার্কিনী নিগ্রো, আর—নয় তো এমন একটা কিছুর সংমিশ্রণ হয়েছে যে, হাসি চাপতে পারা কঠিন। এখানে বইয়ের ব্যাপারেও ঠিক তাই। জল কেমন ঘুলিয়ে উঠেছে—ভাল-মন্দের বিচার গেছে ঘুচে।

হঠাৎ বিশ্বনাথের কানে আসে—হাটিয়ে বাবু হাটিয়ে। বই লেবে না, খালি ভিড় করবে।

বিশ্বনাথ চম্‌কে চেয়ে দেখে, বক্তা বারো-চৌদ্দ বছরের একটি হিন্দুস্থানী ছেলে। তার বলার ভঙ্গীটি নিতান্ত বিরক্তিজনক।

বিশ্বনাথ নিজেকে রীতিমত অপমানিত বোধ করে। মুহূর্তের জন্যে একবার সে ভাবে, দেবে নাকি ছেলেটার গালে বেশ জোরে একটা চড় বসিয়ে। আবার নিজেই কেমন সাম্‌লে নেয়। এত ওদের দেমাক হয়েছে যে বাঙালী খদ্দেরকে ওরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না, অপমান করতে সাহস পায়। যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেল এবারের মত —মার্কিন সৈন্যরা তো সব দেশে ফিরবে—তখন তাদের দেমাক যাবে কোথায়? ব্যবসাদার ওরা—ওরা সব পারে—তখন হয় তো আবার বিশ্বনাথেরই হাত জড়িয়ে ধরে বলবে, লিয়ে যান বাবু, লিয়ে যান।...

ঐ হিন্দুস্থানী ছেলেটির চোখে এখনও সে দুর্দিনের ছবি ভেসে ওঠেনি।

বিশ্বনাথ একটা ধমক দিয়ে ওঠে, বলে, হামরা খুশি, হাম খাড়া রহেগা, তোম্ কোন হাটানেওয়ালা?

ছেলেটা কেমন যেন ঘাব্‌ড়ে যায়। ঘাব্‌ড়ে গিয়ে বই সামলাতে ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে। দোকানের আর একদিক থেকে মালিক—অর্থাৎ, বয়স্থ একজন হিন্দুস্থানী ব'লে ওঠে, নেই, নেই বাবু, ও' লেড়্‌কা কা বাত ছোড় দিজিয়ে।

বিশ্বনাথ সসম্মানে বিদায় নেয় সেখান থেকে। আবার ধাক্কা খেতে খেতে সে এগিয়ে চলে।

বিচিত্র বাজার বসেছে ফুটপাতে। জনস্রোতের আর বিরাম নেই। য়্যাটম্ বম্ব আবিষ্কার হ'য়েছে......যুদ্ধ কি থামলো চিরদিনের মত, না, বিশ্রাম-কাতর মানুষ কিছুকালের মত বিশ্রাম নিল?

বিশ্বনাথের চিন্তা বিপর্যস্ত, মনে তাই ভেসে ওঠে ;—হিরোশিমা.........হিরোহিটো.........হারা-কিরি!

আর একটা কথা তার মনে জাগে;—শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানের হারা-কিরি হবে না তো? পৃথিবী করবে না তো হারা-কিরি?

বিশ্বনাথের মুখে ফুটে ওঠে অস্পষ্ট হাসি।

মেট্রো পার হ'য়ে ফ্রেস্কো ছাড়িয়ে মোড়ে এসে ফুটপাত ধ'রেই ডান দিকে বেঁকে যায় বিশ্বনাথ। রীতিমত ভিড় ফুঁড়ে ফুঁড়ে তাকে এগুতে হয়, আর ধাক্কা এড়াতে হ'লে পাকা ফুটবল খেলোয়াড়ের মত আগু-পেছু পাশ কাটাতে হয়। বিস্ময় আর আনন্দ যে তা'তে নেই একেবারে তা নয়, কিন্তু আতঙ্কটাই বেশি। সময় সময় টাল সাম্‌লে ওঠা দায়। রাস্তার রূপও অদ্ভুত। ফুটপাতে কসরৎ যত মানুষের, আর রাস্তায় কসরৎ চলে হাজারো রকমের যান-বাহনের—ট্রাম, বাস, লরি, মিলিটারি ট্রাক্, ট্যাক্সি, রিক্সা, ফীটন প্রভৃতির। তার ওপরে আবার মানুষ।

গেঞ্জি-মোজা এবং খাতা-বাঁধাইয়ের দোকানগুলো পার হ'য়ে, চার্চটা ছাড়িয়ে বিশ্বনাথ এসে পড়ে মিনে করা গ্লাস, য়্যাশ-ট্রে, ট্রে, বোতাম এবং হরেক রকম জিনিসের দোকানগুলোর কাছে। এখানে এলে বিশ্বনাথ একবার দোকানগুলোর সাজানো জিনিসের ওপর কেন জানি দৃষ্টি না ফেলে চ'লে যেতে পারে না। প্রয়োজন তার নেই হয় তো কোন বিশেষ জিনিসেরই; তবু তার ভাল লাগে চোখ বুলোতে, আর ভাল লাগে তার খুঁজতে এমন একটা কিছু জিনিস যার অভাব সে আজও বোধ করেনি। হয় তো ভবিষ্যতে অভাব বোধ করবে সেই আশাতেই সে খোঁজে। এটা তার একটা বিলাস বলা যেতে পারে। এরকম দেখতে দেখতে সে একটা কিছু যে কোনদিন কিনে ফেলেনি তা নয়, তবে কিনেছে এমন খুব কম দিনই। দেখেছে কিন্তু বহুদিন বহু আগ্রহ নিয়েই। খেয়াল হ'লে দাম করেছে; নইলে হয় তো দেখেই শুধু চ'লে গেছে। এখানে ভিড় একটু বেশি হ'লেও তাড়না কম, কাজেই দেখার পক্ষে বাধা বিশেষ কিছু নেই।

বিশ্বনাথ দাঁড়ালো এরই একটা দোকানের সামনে। চোখ তার পড়েছিল দোয়াতের ওপর। কাঁচের ছোট দোয়াত, কিন্তু জিনিসটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে লোকের সহজেই। বিশ্বনাথ দর করলো। দরটা একটু অস্বাভাবিক—চার টাকা চার আনা। বিশ্বনাথ লজ্জা পেয়ে যেন আঙুলটা সরিয়ে নিল।

ফিরতে গিয়েই সে খেলে একটা ধাক্কা পেছন থেকে। তারপরেই কান ভরে গেল খিল খিল হাসিতে। মনে হ'লো পেছনেই একটা সাপ যেন খল্ বল্ ক'রে উঠলো।

চম্‌কে গেল বিশ্বনাথ।

আর চম্‌কে গেল সেই মেয়েটি বিশ্বনাথের পানে চেয়ে। মেয়েটি বিশ্বনাথের গ্রামেব।

গ্রামের মেয়ে সে আর নেই। এখন সে চাল-চলনে যা হ'য়েছে তাতে তাকে চেনাই দুষ্কর।

বিশ্বনাথ এত কাছে, আর এত আলোর মধ্যে তাকে না দেখলে পরে হয় তো চিনেই উঠতে পারতো না। ভাবতেই পারতো না যে, এই সেই ধনঞ্জয় কেওটের মেয়ে সুভদ্রা।

বিশ্বনাথ চম্‌কে একবার চতুর্দিকে চেয়ে দেখলো, কোন মার্কিন সৈনিকের হাত ধ'রে আবার আসেনি তো স্বভদ্রা? বিচিত্র কি! মন্বন্তরে কেওটদের বংশে কেউ বেঁচে আছে ব'লে তো শোনা যায় না। স্বভদ্রা বেঁচে আছে। বাঁচলো কি করে? অবশ্য তার বাঁচার ইতিহাসের ইঙ্গিত তার বেশ-বাস চাল-চলনে নিহিত আছে ঠিকই। কাজেই মার্কিন-সৈনিক-সহচরী ভাবায় বিশ্বনাথের অপরাধ বিশেষ কিছু হয়নি। সে বরং ভাল ছিল। স্বভদ্রার সঙ্গে এমন একজন ছিল যার কাজ ঠিক ক'রে ধরতে পারা শক্ত। সৈনিক শ্রেণীভুক্তই সে, কিন্তু ভারতীয় সৈনিক। মাদ্রাজ অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর লোক হওয়ারই সম্ভাবনা তার বেশী। অবশ্য তা নাও হ'তে পারে।

বিশ্বনাথ নিজের যুক্তিহীন চিন্তাধারায় নিজেই মনে মনে একটু হাসলো। তারপরে ভাবলো, স্বভদ্রা মন্বন্তর কাটিয়ে বেঁচে আছে নিজের দেহ বিক্রয় ক'রে। খদ্দেরের বাদ-বিচার করলে তার চলবে কেন? এ প্রশ্ন বিশ্বনাথের পোশাকি মনে উদয় হওয়া সম্ভব, কিন্তু স্বভদ্রার আটপৌরে মনের সে বালাই গেছে ঘুচে। কাজেই অপরিচিতের গায়ের ওপরে এসে প'ড়ে থল্ বল্ ক'রে উঠতে স্বভদ্রার বাধে না একেবারেই।

বিশ্বনাথের ক্ষণিকের জন্যে একবার মনে হ'লো, আমরা যেন সব একটা বিরাট জাহাজের খোলের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছি, আর মহাসাগরে জাহাজ যেন ভীষণ দোল খাচ্ছে এবং আমরা যেন স্থানভ্রষ্ট হ'য়ে একবার এখানে একবার সেখানে যখন যাকে কাছে পাচ্ছি তাকেই আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছি। কোন স্থিরতা নেই, কোন বাধা-বন্ধ নেই, কোন বাছ-বিচার নেই, কোন আইনশাসন নেই।

স্বভদ্রা মুখ তুলে কি যেন বিশ্বনাথকে বলতে যাচ্ছিল, বিশ্বনাথও কি যেন বলবে ভেবেছিল,······কিন্তু বলা কারোরই হ'লো না। দু'জনারই কোথায় যেন গেল বেধে।

স্বভদ্রা ভিড়ের মধ্যে আবার হারিয়ে গেল। বিশ্বনাথ আবার ভিড়ের মধ্যে পথ কেটে চলতে লাগলো ফুটপাত ধ'রে। যেতে হবে তার ওয়েলিংটন্ স্কোয়ার পর্যন্ত। সেখানে একটা চায়ের দোকানে তার জন্যে অপেক্ষা করবে বাঙলা দেশের কোন একটা বিখ্যাত মাসিক পত্রের সম্পাদক। বিশ্বনাথের লেখা তার ভাল লাগে, কিন্তু বিশ্বনাথকে ব'লে ব'লে কিছুতেই আর লেখানো যায় না—এমন কুঁড়েমি তার লেখা সম্বন্ধে। কিন্তু এবার সম্পাদক ঠিক করেছে যে, পূজা সংখ্যায় বিশ্বনাথকে দিয়ে একটা লেখা লেখাবেই। বিশ্বনাথের গল্প একটা তার চাই। দেখা করার উদ্দেশ্য আর তার কিছুই না।

বিশ্বনাথও আজ ক'দিন ধ'রে ভাবছে, আর ভাবছে। কাজেই স্বভদ্রাকে দেখেই সে ভাবতে শুরু ক'রে দিয়েছে তার গল্পের কথা।

পথ চলতে চলতে বিশ্বনাথের মনে পড়ছে, কত বিচ্ছিন্ন রূপ, কত টুক্‌রো টুক্‌রো কথা, আর কত ভাসা ভাসা মুখ। চরিত্র আসছে, চিত্র আসছে, কাহিনী আসছে; কিন্তু দানা বেঁধে উঠছে না কেন জানি কিছুই।

এতখানি পথ হেঁটে সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার উদ্দেশ্যও বিশ্বনাথের এই গল্প লেখা। পথ চলতে চলতে যদি তার মনে জাগে একটা গল্পের কাঠামো। অনেক কিছুই মনে জাগছে তার সত্যি, কিন্তু গল্প রূপ পেতে পারে এমন কিছুই জাগছে না তার মনে।

পৃথিবী আজ বিধ্বস্ত—সংঘর্ষে বিক্ষুব্ধ চঞ্চল—বিচূর্ণ। মনও মানুষের আজ ঘা খাওয়া, ক্লান্ত। গল্প সেখানে আজ তাই তেমন দানা বেঁধে ওঠে না। আসে বিক্ষিপ্ত দাবি, আসে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কাহিনী, আসে সামঞ্জস্যহীন চরিত্র।

তা' হোক্, সম্পাদক তাকে দিয়ে পূজা সংখ্যায় গল্প একটা লেখাবেই।

সম্পাদকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সংকল্প আরও দৃঢ়তর ক'রে বাসায় ফিরে এলো বিশ্বনাথ একটু বেশি রাতেই।

স্ত্রী ঘুমিযে পড়েছে। ছেলে-মেয়েরা বে-ঘোরে ঘুমুচ্ছে। দরজায় ধাক্কা দিতে স্ত্রী ঘুমের চোখে এসে দিল দরজা খুলে।

বিশ্বনাথ ঘরে ঢুকে বললো, যাও তুমি শোও গে', খাওয়া-দাওয়ার আমার দরকার নেই।

স্ত্রী বললো, সে কি, ভাত বেড়ে রেখেছি যে!

তা' হোক, আমার ক্ষিদে নেই।

তাই কি হয়। আপিস থেকে কোথায় গিছলে যে এত রাত হ'লো ফিরতে?

সে সব কাল শুনো। এখন শোওগে,' আমাকে গল্প লিখতে হবে।

স্ত্রীর ঘুম-চোখেও হাসি ফুটে উঠলো।

বিশ্বনাথ বললো, হাসি নয়, গল্প এবার আমাকে লিখতেই হবে। নামও আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি—"এক মুঠো ভাত"। আজ আর কোন' বাধা নয়। সম্পাদককে আমি কথা দিয়ে এসেছি। "এক মুঠো ভাত"-এ মন্বন্তরকে আমি মূর্ত ক'রে তুলবো, এতদিন যে লিখিনি তার প্রায়শ্চিত্ত করবো।

স্ত্রী বললো, তা বেশ, কিন্তু এক মুঠো ভাত খেযে নিয়ে শুরু করলেই তো ভাল হ'তো।

না, না, না। ভাত আমি খাবো না, খাবো না।

বিশ্বনাথ ঘরের মেঝেয় একপাশে একটা মাদুর বিছিয়ে নিয়ে লেখার প্যাড্ সাম্‌নে খুলে বালিশে বুক দিয়ে চেপে বসলো। লিখতে তার হবেই।

স্ত্রী অগত্যা আবার শয্যায় গিযে শুয়ে পড়লো, কিন্তু চোখের নিদ্রা তার তখন কেটে গেছে একেবারে।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটলো তাদের। তারপরে বিশ্বনাথ যখন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হ'য়ে সন্ধানী চক্ষুকে সন্ধানী-আলোর মত পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরিয়ে- ফিরিয়ে গল্প-বস্তুটিকে ধরবার চেষ্টা করছে তখনই ঠিক শোনা গেল একটা চিৎকার, একটা বিশ্রী স্ত্রী-কণ্ঠের চিৎকার।

ও বাবা গো! মেরে ফেললে গো! খুন করলে গো!

এত রাত্রে এই বীভৎস চিৎকারে পাড়ার অনেকেই আতঙ্কিত হ'য়ে উঠলো। বিশ্বনাথ ধড়্ মড় ক'রে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বিশ্বনাথের স্ত্রীও লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

কান্নার আওয়াজ তখনও তীব্র কঠিন হ'য়েই কানে এসে লাগছে।

বিশ্বনাথ দরজার খিল খুলতে গেল। স্ত্রী বললো, না, কোথায় যাবে আবার এত রাত্রে। না, গিয়ে তোমার আর কাজ নেই।

কি যে বলো তুমি! একটা লোক খুন হ'য়ে যাচ্ছে, আর একটু দেখতে যাবো না। আর এ যে মেয়েছেলের কান্না!

ও আমি বুঝেচি। আমাদের বাড়ির পেছনের এই ভাঙ্গা একতলা বাড়িটার বৌয়ের কাণ্ড এ নিশ্চয়। তোমার আর যেতে হবে না।

বিশ্বনাথ বললো, ছাতে দাঁড়িয়ে ও-বাড়ির সবই তো দেখা যায়, একবার ছাতে দাঁড়িয়েই দেখে আসি না হয়। খুন-টুন যদি সত্যিই একটা হ'য়ে যায়।

ব'লে বিশ্বনাথ দরজা খুলে ছাতে গিয়ে দাঁড়ালো। একতলা বাড়ির উঠানে মহা হৈ চৈ কাণ্ড। একটি বৌ উঠানে চেপে-ব'সে কান্না জুড়ে দিয়েছে; আর তার পাশে এসে বসেছে একটি বয়স্থা মহিলা এবং আর একটি যুবতী মেয়ে। বাইরের দরজার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে একটি রোগামত ভদ্রলোক—গায়ে একটা হাফ সার্ট বোধ হয়। আর ভেতরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে ফকির চাটুজ্যে, খালি গা, গলায় একটা শাদা মোটা পৈতে জড়ানো। পাড়ার সকলেই তাকে চেনে জুয়াড়ী ও দালাল হিসাবে।

বাইরের দরজার লোকটি ব'লে চলেছে তখন,—খোরপোশের দাবীতে নালিশ করা হ'য়েছে, ওদিকে আবার বেশ্যার ব্যবসা শুরু হ'য়েছে। বলি, নিজে না মরবি মর, তা আবার সঙ্গে এনে জোটানো হ'য়েছে বোনঝিটাকে। নিজের গতরে বুঝি আর কুলিয়ে ওঠে না, নইলে ওটার আবার সর্বনাশ করা কেন? আমাকে অপমান করা, আমিও দেখে নেব শালা ফকির চাটুজ্যেকে। পরের মাগ-মেয়ে ভাগিয়ে এনে শালার দালালি। ওকে যদি না জেল খাটাই তো আমার নামই না।……

বিশ্বনাথের কাছে সমস্ত কিছুই আজ স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। এই রহস্যময় একতলা বাড়ির কোন কিছুই যেন আর তার কাছে অজানা রইলো না। অনেক দিনের দেখা টুক্‌রো টুক্‌রো চিত্র আজ কে যেন তার সাম্‌নে একেবারে গ্রন্থিবদ্ধ ক'রে তুলে ধরলো। মন্বন্তরের মধ্যেই এরা এসে এখানে ডেরা বাঁধে। সন্দেহ অনেক কিছুই বিশ্বনাথের মনে জেগেছে ওদের দেখে, অনেক কথাই ওদের সম্বন্ধে বিশ্বনাথ ভেবেছে, কিন্তু এক মুঠো ভাতের জন্যে যে ওরা এতকাল ফকির চাটুজ্যের দালালির সাহায্য নিচ্ছে তা স্পষ্ট ক'রে কোনদিন ভেবে দেখেনি কিন্তু।

এখন তার মনে হ'চ্ছে, এতদিন যা কিছু সে দেখেছে ওদের—তার সমস্ত কিছুই তো সাক্ষ্য দিচ্ছে ঐ নূতন আগন্তুকের কথার।

বিস্মিত হ'লো না বিশ্বনাথ, হ'লো বিক্ষুব্ধ আর চঞ্চল। সর্বত্র ধরেছে ভাঙ্গন।

ঘরে ফিরে এলো বিশ্বনাথ। গল্প তার দানা বেঁধে উঠেছিল, কিন্তু লিখতে আর তার মন চায় না। "এক মুঠো ভাত"-এর যে ইতিহাস, যা নিয়ে সে চেয়েছিল গল্প লিখতে তা অতি ন্যক্কারজনক। নিজেরই কেমন্ যেন গা ঘিন্ ঘিন্ ক'রে ওঠে।

স্ত্রী বলে, গল্প লেখা আর তোমার হ'য়েছে। তার চেয়ে বরং খেয়ে নিলেই পারতে।

বিশ্বনাথ বলে, এখন্ তাই মনে হ'চ্ছে বটে! না, গল্প লেখা আজ আর হ'লো না। দাও, ভাতই দাও বরং। দাঁড়াও, তিনটে কথা শুধু লিখে রাখি, ভুলে না যাই আবার। এ তিনটে কথা লেখা থাকলেই গল্প একদিন লিখে দিতে পারবো।

ব'লে বিশ্বনাথ লিখে রাখলো,—য়্যাটম্ বম্ব……হিরোশিমা……হিরোহিটো!

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

অভিযান

(সাত)

পাঁচমতী বাবু পাঁচমতী, খালি মোটর; আট আনা সিট। শুধু আট আনা। ট্যাক্সি মোটর বাবু। যাবেন বাবু, যাবেন?

চৌরাস্তার মোড়ে রামা দাঁড়িয়ে হাঁকছিল। নরসিং গাড়ী নিয়ে গিয়েছিল—মোটর একসেসেবিজ সাপ্লাইয়ের দোকানে; তেল ভবে নিয়ে এল সে। নিতাই সঙ্গে গিয়েছিল। নবসিং এসেই ধমক দিলে।

হাঁকিস না উল্লুক।

হাঁকব না? বিস্মিত হ'ল রাম।

না। এখনও সার্ভিসের লাইসেন্স মেলে নাই। কেস হয়ে যাবে।

তবে?

নরসিং বললে—ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডায় নজর রাখ্। প্যাসেঞ্জার এলেই ডেকে আস্তে বল্। দেখতে দেখতে চারজন প্যাসেঞ্জার জুটে গেল। ঘোড়ার গাড়ীর শেয়ারও আট আনা, মোটবের শেয়ারও আট আনা। মোটর ছেড়ে লোকে ঘোড়ার গাড়ীতে যাবে কেন? নরসিং স্টিয়ারিংয়ে বাঁ হাতটা রেখে অলসভাবে সিগারেট টানছিল। দৃষ্টি ছিল তার ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডার উপর। দিদিয়াব ভাঁড়ার ঘরের সামনে সকালবেলায় উঠে গিয়ে সে বসত, জলখাবার খেত—মুড়ি, ছোলা ভিজে আর গুড়। তাব সঙ্গে থাকত জেঠা মাধব সিংয়ের পাতের প্রসাদ একখানা রুটি। পিঁপড়ে বেড়াত ঘুরে ভাঁড়ার ঘরের সামনে। রুটির টুকরোটা ছিঁড়ে সে ফেলে দিত। দেখতে দেখতে জুটে যেত রুটিব টুকরোটার চারিপ্রান্তে পিঁপড়ের ঝাঁক। রুটির টুকরোটা টেনে নিয়ে যেত গর্ত্তের দিকে। হঠাৎ এসে যেত একদল ডেয়ো পিঁপড়ে, প্রায় লাফিয়ে পড়ত টুকরোটার উপর। ছোট ছোট পিঁপড়েগুলো চঞ্চল হযে প্রথমটা ছটকে পড়ত, তারপর তারা আসত আরও দলে ভারী হয়ে, এসে টানত অন্যপ্রান্ত ধরে। অবশেষে আক্রমণ করত ডেয়ো পিঁপঁড়েকে।

ঘোড়ার গাড়ীর কোচোযানরা এরই মধ্যে চঞ্চল হযে উঠেছে। ট্যাক্সিটার দিকে তাকিয়ে কি বলাবলি করছে।

নরসিংয়ের মনে পড়ে গেল পুরানো আমলের কথা। সে চোখে দেখে নাই, জেঠা মাধো সিংয়ের কাছে শুনেছে। মাধো সিংয়ের ছেলেবেলাকার কথা। তখন ওই জোসেফদের পূর্ব্বপুরুষেরা পাঁচমতী থেকে শ্যামনগর পর্য্যন্ত যাত্রী বয়ে নিয়ে যেত। ডুলি ছিল ওদের, এক এক ডুলি চার বেহারা; পাঁচমতী থেকে চলত শ্যামনগর, শ্যামনগর থেকে শহর মুরশিদাবাদ। মাধো সিং বলে—একদিন এল কেরাঞ্চি গাড়ী। দুই ঘোড়া, ভিতরে বসবার গদি, খপ খপ জোড়া ঘোড়া চলে জোর কদম; ডুলিতে লাগত দু ঘণ্টা, কেরাঞ্চি একঘণ্টাকে অন্দর পঁহুছ দিলে। বাস—বাতিল হয়ে গেল ডুলি।

কেরাঞ্চির নসীবে আগুন ধরাতে সে নিয়ে এসেছে তার 'ট্যাক্সি কার'কে—তার জবরদস্ত থাঁকে। বহুৎ আরামদার গদি, মজবুত স্প্রীং; হাওয়া গাড়ী—হাওয়ার মত জোরসে ছুটতে পারে,— সে যখন এসেছে কেরাঞ্চিকে তখন যেতে হবে বই কি। হাড্ডিসার—চোখে পিচুটি জানোয়ারগুলোকে দেখে তার মায়া হয়, ঘেন্নাও হয়। ছেড়ে দে ওগুলোকে, ছেড়ে দে।

একজন কেউ আসছে। হাতে চামড়ার কাগজ রাখা ব্যাগ—কি বলে যেন?—এ্যাটাচি কেস! হাঁ, এ্যাটাচি হাতে আসছে; পরনে সৌখীন জামা কাপড়।

নরসিং বললে—নিতাই মার হ্যাণ্ডেল।

আর একটু দেখবেন না?

হয়ে গিয়েছে নে। নরসিং জানে ওই লোকটা মোটরে জরুর যাবে। কেবল একটা খোঁচ আছে। লোকটা পুরা গাড়ী ভাড়া ক'রে চাল মেরেও যেতে পারে।

কি বাবু? পাঁচমতী যাবেন? আয়েন বাবু—আয়েন। আমার ঘোড়া ভাল।

আমি 'হুজুর' এখুনি ছাড়ব। এ দিকে 'হুজুর'। ভাল গাড়ী।

নরসিং গাড়ীখানা ছেড়ে দিয়ে ভদ্রলোকের পাশে দাঁড়াল।—মোটরে যাবেন স্যার? আট আনা ভাড়া।

মোটর? ট্যাক্সি।

হ্যাঁ স্যার। আসুন স্যার। দুটো সিটের দাম দিলে সামনেটা গোটা পাবেন।

লোক বসেছে যে একজন।

আপনি একটু ভেতরে যান তো দাদা। পিছনটা চার জনেরই সিট। হ্যাঁ, চারজনের। দেখুন না সামনের সিটের চেয়ে কতখানি চওড়া! সামনেটা যদি তিন জনের হয় তবে ওটা চারজনের কিনা আপনারাই বিচার করুন। বসুন স্যার, বসুন। গীয়ারের হাতলের মাথাটা বাঁ-হাতে চেপে ধরে সে পায়ে চাপ দিলে এ্যাকসিলেটারের উপর। গর্জ্জন ক'রে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে নরসিংয়ের গাড়ী ছুটল। শহরের ভিতরের রাস্তা অতিক্রম ক'রে গাড়ী এসে পৌঁছে গেল তেমাথায়; এইখান থেকে পাঁচমতীর শড়ক শুরু। বাঁ দিকে একটা মন্দির। নরসিং প্রণাম করলে—যে দেবতাই থাক—প্রণাম তোমাকে, কিছুটা দূরে একটা মসজিদের মিনারের আধখানা দেখা যাচ্ছে—সেলাম—আল্লাহতায়লা-খোদাতায়লা। তোমাকেও প্রণাম। নরসিং আরম্ভ করলে নতুন কারবার, নতুন পথে পা বাড়ালে, গাড়ী ছুটালে। তোমরা মঙ্গল করো। হঠাৎ মনে পড়ল জোসেফকে। জোসেফের গির্জ্জার গড—তোমাকেও প্রণাম।

আরে উল্লুক বেকুবের দল, গরুর গাড়ীর সারি নিয়ে আমিরী চালে হুকা টানতে টানতে চলেছে দেখ; চলেছে আবার রাস্তার মাঝখান জুড়ে। হঠাও, হঠাও—হঠাও গাড়ী। গাড়ীর গতি মন্থর ক'রে সে হর্ণ দিতে আরম্ভ করলে—ভোঁপ—ভোঁপ—ভোঁপ। তারপর দিলে ইলেকট্রিক হর্ণে হাত। তীব্র চীৎকারে হর্ণটা বেজে উঠল। হঠাও। হঠাও। জলদি করো। হঠ যাও।

নিতাই প্রশ্ন করলে—দড়িটা বার করব না কি।

না। নয়া জায়গা।

গাড়ীগুলো সরে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে সরছে। গাড়ীর প্যাসেঞ্জারদেরও মোটরে চড়ার নেশা লেগেছে। নরসিংয়ের পাশের বাবুটি বললে, উল্লুকদের চাবুক মারা উচিৎ।

মনে পড়ছে মেজবাবুকে। মেজবাবু চাবুক চালাতেন। দুর্দ্দান্ত মেজবাবু, কাউকে ভয় করতেন না, কিছুকে ভয় ছিল না তাঁর।

মোটর বাস কিনে নিয়ে এলেন। সোনালী রঙের বাসখানা বাহারের বাস ছিল। ক'লকাতা থেকে রহমৎ ড্রাইভার এল, বাস চালিয়ে এসেছিলেন মেজবাবু, রহমত ছিল পাশে বসে। প্রথম গেলেন সদর, সেখান থেকে বাস লাইসেন্স করিয়ে এনে পরের দিন বাস সার্ভিস খোলা হ'ল। সে দিন তিনটে ট্রিপের দুটো ট্রিপে বাস ট্রেণ মিস্ করলে।

মেজবাবু রেগে আগুন হয়ে গেলেন।—রহমৎ—এ কেয়া বাত?

রহমত ছিল বাঙালী মুসলমান, সে বললে—কি করব হুজুর। যাবার পথ চাই তো! গরুর গাড়ীর এলাকা আপনাদের; এক এক দফায় দশ বিশখানা গাড়ী সারিবন্দী চলবে, মাঝখান চেপে চলবে। রাস্তা না ছাড়লে আমি যাই কি ক'রে! রাস্তায় তখন মাল-বওয়া গরুর গাড়ী চলত। গাড়োয়ানেরা ছিল ইমামবাজারেরই পাশের গ্রামের পেশাদার গাড়োয়ান। তাদের স্বভাবই ছিল ওই। রাস্তা তারা কিছুতেই ছাড়বে না।

মেজবাবু বললেন—আচ্ছা কাল থেকে আমি যাব।

পরের দিন থেকে মেজবাবু বসলেন বাঁ ধার ঘেঁষে, হাতে নিলেন চাবুক।

ফিরে এসে রহমত বললে—বাপরে বাপ! কাম ছেড়ে দোব আমি!

নরসিং তখনও কাজ করছে কয়লার ডিপোয়। সে বললে—কি হ'ল?

কি হ'ল? মেজবাবু এক ধার সে চাবুক চালিয়ে গেলেন।

নরসিং হেসেছিল। রহমত মেজবাবুকে জানে না।

রহমত বললে—মেজবাবু বরাবর থাকবেন না। তখন যদি সকলে মিলে বাস আটকায় আমার জান মেরে দেবে।

মেজবাবু না থাকে, মেজবাবুর নাম থাকবে। নরসিং আবার হেসেছিল। রহমত কিন্তু শুনলে না, বললে মেজবাবুকে। মেজবাবু হা-হা ক'রে হাসলেন।—এ ক'লকাতা নয় রহমত, গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানেরা এখানে দাঙ্গা করে না। যে চাবুক চালালাম তার সাঁই সাঁই শব্দ আর পিঠের জ্বালা ভুলতে লাগবে ছ'বছর। তা ছাড়া ঘণ্টায় ষাট মাইল ছুটবে তোমার গাড়ী—তার ধাক্কার ভয় নাই?

হুজুর, সামনে একখানা গরুর গাড়ী খাড়া ক'রে দিলেই ত' হ'ল। গাড়ী তো লাফিয়ে পার হওয়া যাবে না বাবু!

মুসলমানের বাচ্চা তুমি, লড়তে পারবে না?

লড়তে পারি হুজুর। কিন্তু একা আমি কি করব?

আচ্ছা। তোমার সঙ্গে জবরদস্ত লোক দোব আমি। ডাকলেন নরসিংকে। নরসিং তখন কাঁচা বাঁশের মত সোজা লম্বা হয়ে উঠছে। আর সঙ্গে দিলেন নিতাইকে। নরসিং কণ্ডাক্টার, নিতাই ক্লীনার। বললেন—এদের নিয়ে পারবে তুমি?

হ্যাঁ—হুজুর। এরা থাকলে তবু সাহস থাকবে।

মেজবাবু তাদের নিয়ে আরও ক'দিন চললেন বাসের সঙ্গে। নিতাইকে এবং নরসিংকে দু'ধারে দাঁড় করিয়ে দিলেন। হাঁক—হঠাও! হঠাও! হঠাও!

রহমত হাজার হলেও পাকা লোক। সে ঠিক বুঝতে পেরেছিল। রহমত বলত—মানুষে আর মেঘে কোন তফাৎ নাই রে ভাই। যে মেঘ পানি ঢালে, গলে গলে ঝরে পড়ে, সেই মেঘ হঠাৎ একসময় চড়াক্ ক'রে বিজলী হেনে দেয়। কখন যে চিড় খাবে, বিজলী হানবে সে তাক করা সোজা নয়।

আটকালে তারা গাড়ী। সামনে গরুর গাড়ী রেখে দিয়েছিল। নরসিং আর নিতাই হাঁকলে—হঠাও।

তারা দমলে না। বললে—আয় নেমে আয়।

নরসিং এবং নিতাই নামছিল। মেজবাবু তার আগেই নামলেন। মৃদুস্বরে বললেন—ডাণ্ডা বের কর। বলে গট গট ক'রে এগিয়ে গেলেন। গাড়ীতে লাথি মেরে বললেন—হঠাও।

তারা গর্জ্জে উঠল। চাবুক মারার শোধ নোব আজ। চাবুক চালানো বার করব।

মেজবাবু বাঁ হাত পকেটে পুরে, ডান হাতে চাবুক নাচিয়ে বললেন—চাবুকের সঙ্গে আজ পিস্তল চালাব।

নরসিং এবং নিতাই তার পাশে তখন দাঁড়িয়েছে ডাণ্ডা হাতে। মেজবাবু বললেন—বে-একতিয়ারী কাজ করলেই চাবুক খেতে হবে।

একজন বললে—কিসের বে-একতিয়ারী? রাস্তা—সরকারী রাস্তা। এতে সবারই চলবার একতিয়ার আছে।

আছে। মেজবাবু হাসলেন। তারপর বললেন—কে আগে চলবে, কে পরে চলবে তারও একটা একতিয়ার আছে।

যে বড় লোক সেই আগে চলবে—না কি?

হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন মেজবাবু—সে হাসিতে হাওয়াও চমকে ওঠে। হেসে বললেন—উল্লুক একটা তুমি।

লোকটা থতমত খেয়ে গেল। অন্য একজন বললে—গাল দেবেন না মশায়।

মেজবাবু বললেন—গাল কি তোমাকে দিই, না মানুষকে দিই। গাল দিই মানুষের বে-আক্কেলকে। বেকুফিকে।

কেনে? কি বে-আক্কেলী কথা বলেছি?

বড় লোকের আগে যাওয়ার একতিয়ার নাই। যে সে কথা বলে সে বেকুফ, বে-আক্কেল। আগে যাবে সেই যার সব চেয়ে জোরে যাবার তাকদ আছে। গরুর চেয়ে ঘোড়ার জরুর আগে যাওয়ার একতিয়ার আছে। ঘোড়ার চেয়ে মোটরের একতিয়ার আগে যাওয়ার। যে যত জোরে চলবে তার তত আগে যাবার একতিয়ার, যে আস্তে চলবে তাদের সরে পথ দিতে হবে জলদি যানেওয়ালাকে। হঠাও—গাড়ী হঠাও।

আশ্চর্য্য! তারা সরিয়ে নিলে গাড়ী।

মেজবাবু গাড়ীতে চেপে বললেন—গাড়ীতে প্যাসেঞ্জার রয়েছে। কারও আছে মামলা, কারও হয় তো আপনার জনের অসুখ, ওষুদ আনতে চলেছে। আর তোমরা মাঝখানে

গাড়ীর সারি চালিয়ে—'সখী আমার মনের ব্যথা তুমি, বুঝলে না' বলে গান ধরে চলবে আপন মনে—তা হবে না। তোমার সখী মনের কথা বুঝল না বলে মন উদাস হয়ে থাকে তো পথের একপাশে গাড়ী রেখে, গাছ তলায় বসে মনের দুঃখে গাঁজা খাও, মদ খাও, কাঁদো হাসো নাচো কিছু বলব না আমরা।

তারাও হেসে উঠল কথা শুনে,।

মেজবাবু বললেন—না হয় তো—আমার গাড়ীর আগে ছুটে চল।

একজন বললে—তা আজ্ঞে, আমাদের গাড়ী তো বেমক্কা পড়তে পারে, গরু অনেক সময় বেকায়দা হয়ে যায়।

নিশ্চয়। সে সময় আমার গাড়ী দাঁড়াবে। আমার লোকজন নেমে তোমার গাড়ী নিরাপদে পাশে সরিয়ে দিতে সাহায্য করবে। তোমরাই বল না, আজ আট দিন এই কাণ্ড চলছে, চাবুক আমি চালিয়েছি, কিন্তু এমন কোন গাড়ীর গাড়োয়ানের উপর আমি চাবুক চালিয়েছি? চালিয়ে থাকি, আমি কসুর মানব—মাফ চাইব।

তারা চুপ ক'রে রইল।

হঠাৎ একজন বললে—আমাদের কিন্তক একদিন গাড়ীতে চাপতে দিতে হবে।

মেজবাবু বললেন—খুব খুশি হব আমি। চাপ একদিন গাড়ীতে। তা' ছাড়া বলে দিচ্ছি আমি ড্রাইভারকে—হঠাৎ কারও কোন অসুখ হয় তোমাদের গাড়ীতে তুলে নেবে। পৌঁছে দেবে ইমামবাজার বিনা ভাড়ায়।

তারা বললেন—সেলাম বাবু। প্রণাম বাবু।

মেজবাবু বললেন—চলো রহমত।

রহমত গাড়ী ছাড়বার আগে একটা সেলাম দিয়ে বললে—সেলাম হুজুর আপনাকে।

গাড়ী পাঁচমতী ঢুকছে।

পাঁচমতী গিরবরজার মা লক্ষ্মীর কৃপায় ধনে দৌলতে ঝলমল করছে। বড় বড় বাড়ী, ধনী জমিদারের বাস। উকীল, মোক্তার, আদালতের আমলার বাস। শ্যামনগরের মত না হ'লেও বেশ বড় জায়গা। দু'তিন জন জমিদারের মোটর আছে, কয়েক জনের ঘোড়ার গাড়ী আছে, কয়েক বাড়িতে হাতী আছে। দোকান পশার, হাট বাজার। নিতাই বললে, বেশ জায়গা গুরুজী।

একটা চায়ের স্টলের সামনে গাড়ী থামালে নরসিং।—নে, আর একদফা চা খেয়ে নে। রামা, জোরে জোরে হাঁক, শ্যামনগর খালি মোটর যাচ্ছে। আট আনা সিট।

চায়ের স্টলের দোকানদারের কাছে বসল সে। আপনার দোকান? আপনার নামটি কি দাদা? চিমড়ে পাকদেওয়া চেহারা লোকটির, দেখেই বুঝতে পারা যায় চিমড়ে শরীর হ'লেও ভয়ানক শক্ত শরীর; একটা চোখ টেরা। মাথায় ঢেউ খেলানো চুলে চেরা সিঁথি। লোকটার মেজাজও অদ্ভুত খারাপ। মনে হ'ল, সে তাকালে নিতাইয়ের দিকে কিন্তু তাকালে সে নরসিংয়ের দিকেই। ট্যারা চোখের চাউনীর দিক নির্ণয়ের হদিস জানা আছে নরসিংয়ের। রামার বোন তার স্ত্রী ছিল টেরা। মনটা কেমন হয়ে গেল নরসিংয়ের। তাকে মনে পড়ে গেল।

লোকটা বললে আমার নাম নিয়ে তোমার কাম কি হে বাপু। চা খাবে চা খাও। পয়সা দাও—চলে যাও, বাস্। পয়সা ফেল মোয়া খাও আমি কি তোমার পর?

নিতাই বললে, ও বাবা। এযে একেবারে মিলিটারী।

রামা খি-খি ক'রে হাসতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছেঃ লোকটার চাউনি দেখ মাইরী। হি-হি-হি-হি! চায়ের চুমুক দিয়ে বিষম খেলে—খক-খক ক'রে কেশে সারা হ'ল—তবু তার হাসির নিবৃত্তি নাই।

লোকটা উত্তর দিলে নিতাইয়ের কথার—তুম বি মিলিটারী—হাম বি মিলিটারী। তুমি বি ভালো হাম বি ভালো। তুমি ধরো লাঠি—হামি ধরি ডাণ্ডা, তুমি বল ভাই, তো আমি বলি দাদা। বাবা—সুরেশ দাসকে প্লেটে মুখে এক বাত। কোই কো বান্দা নেহি হাম। এ বাবা পাঁচমতী। এতনা বড়া পাজী জায়গা আর নাই। যত কটি বড় লোক—উকীল—মোক্তার—সব এক এক চিজ। এক চুল এদিক ওদিক হয়েছে কি বাস, মামলা এক নম্বর—কি মারপিট। হিঁয়া চালাকী মাৎ করো। ত্রিশ বছর বয়স হ'ল—চল্লিশ পঞ্চাশ নম্বর ফৌজদারী মামলার আসামী করেছে আমাকে, আমিও করেছি বিশ—ত্রিশ নম্বর। সে করেও ঠিক আছি বাবা।

নরসিংহের ভারী ভাল লাগে সুরেশকে। বসুন বন্ধু বসুন। চটছেন কেন। আমরা হ'লাম বিদেশী লোক। এসেছি আপনার এখানে। বন্ধু বলছি—

বাস্—বাস্। আপনি আমাকে বন্ধু বলছেন—আমিও বলছি বন্ধু—মিতা—দোস্ত। বসুন, আরাম করুন। চা খান। সিগারেট খান। দিনে যদি থাকেন তবে আমার বাড়িতে খান। আমি জাতিতে বৈষ্ণব।

এই তো। এই তো ভাই বন্ধু। হয়ে গেল মিতালী।

সুরেশের মুখে হাসি ফুটে উঠল। —আপনারা কোথায় যাবেন?

যাব না—এলাম।

এলেন? মোটর নিয়ে—কার মোটর?

মোটর আমার নিজের। ট্যাক্সি। পাঁচমতী থেকে শ্যামনগর সার্ভিস খুলবার মতলব আছে।

বলেন কি? জয় নিতাই রাধেশ্যাম। বহুৎ আচ্ছা। তা খুব চলবে আপনার। কেরাচীওয়ালারা বেশ কামায়। তবে খুব হুঁসিয়ার। এখানকার ওই মোক্তার উকীল আমলারা বড় পাজী। একটু থেমে বলে, ভাল লোকও আছে দু'চার জন। এই যে এই যে। হরিনারাণ বাবু মাষ্টার, ভাল লোক। মাষ্টার মশায়—।

খদ্দরপরা অল্প বয়সী এক ভদ্রলোক হাসিমুখে দাঁড়ালেন।—কি সংবাদ সুরেশ!

এই ইনি এসেছেন ট্যাক্সি গাড়ী নিয়ে। পাঁচমতী শ্যামনগর সার্ভিস খুলছেন। তা আপনি তো রোজকার খদ্দের একজন।

হ্যাঁ। তা'—তা' বেশ তো।

চড়ুন গাড়ীতে। চড়ুন।

সুরেশের ট্যারা চোখ জ্বল জ্বল করছে।

শ্যামনগর। শ্যামনগর। ট্যাক্সি কার!

সুরেশ হাঁকলে, এই চলে যায়। হর্ণ—হর্ণ দাও হে!

ভোঁ—ভোঁ—ভঁপ্—ভঁপ্।

মাষ্টার মশায় ডাকলেন, ও অরবিন্দবাবু—।

কি ? মোটর কোথাকার মশায় ?

আসুন। আসুন। ট্যাক্সি। সার্ভিস খুলছে শ্যামনগর পাঁচমতী।

ভাড়া ?

ভাড়া ওই আট আনা সিট।

বহুৎ আচ্ছা। ফইজুর মড়া ঘোড়া—আর ভাঙা গাড়ী নিয়ে আর চলছিল না বাবা। আরে নবগোপাল—প্রতুল! এদিকে—এদিকে। ট্যাক্সি—চলে এস।

হরিনারাণ বললে নরসিংকে—আপনি এক কাজ করবেন, আমাদের সব যাবার সময় বাঁধা আছে। এক্ এক ট্রিপের প্যাসেঞ্জারদের নাম লিখে রাখবেন, টাইম বাঁধা ক'রে নেবেন। বাস—ঠিক সময়ে এসে আমরা চেপে বসব।

নরসিংয়ের গাড়ী আবার ছুটল শ্যামনগর।

পাঁচমতী—শ্যামনগর!

বাদশাহী শড়কের উপর পহেলা ট্রিপের দাগ এখনও মিলায় নাই।—তার উপরে পড়ল দ্বিতীয় ট্রিপের রবার টায়ারের বরফি কাটা ছকের ছাপ।

রামা এখনও হাসছে: দাদাবাবু লোকটার চোখ দুটো কি রকম?—হি-হি-হি-হি!

নরসিংয়ের মনে পড়ছে রামার বোনকে। তার স্ত্রীকে। ভাসা পালকের-মত স্বভাব রামার। নিজের বোনকে—মার পেটের বোনকে মনে পড়ে না।

নিতাই হাঁকলে—গুরুজী!

হুঁসিয়ার করছে নিতাই। এ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেত। হাসলে নরসিং। চোখে জল এসে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল সামনেটা।

ঝাপসা হবে না? জান্কীকে মনে পড়ছে যে! জান্কী ব'লে বাড়ির লোকে ডাকত। জানকী! জানকী ছিল তার নাম! চোখ দুটি ছিল ট্যারা। বার তের বছরের হিলহিলে লম্বা জান্কী হঠাৎ তার মনের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল।

মামী নিয়ে এসেছিল ভাইঝি আর ভাইপোকে; মামা তার বোনের ছেলেকে এনেছে যখন—তখন সেই বা আনবে না কেন? মতলব ছিল মামার ভালবাসাটা পড়ে গিয়ে তাদের উপর। নরসিং যখন বিদায় হয়েছে—তখন এইটাই বড় সুযোগ। নরসিং কিন্তু থুথু ফেলেছিল। আরে সীতারাম! মামার আছে কি, তাই নেবে? একখানা খড়ে ছাওয়া ঘর আর ক' বিঘে জমি? তার জন্যে নরসিং ঘর ছাড়ে নাই। তবু প্রথম প্রথম তার আক্রোশ হয়েছিল এদের দুজনের উপর। মধ্যে মধ্যে মামা তাকে নিমন্ত্রণ করত। সে আসত মামার বাড়ি। আসত' শুধু মামার জন্য। তা'ছাড়া তার জেঠা মাধো সিং বলেছিল—উসকে বদন্ হাম নেহি দেখেগা। পরের ঘরে ভাত ভিক্ষে ক'রে খায়?

বাবা কোন কথাই বলত না। কিন্তু একবারও খোঁজ নেয় নাই। নরসিং বাবুদের ঘরে শুধু বইগুলোর দুর্বোধ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে মাথা কুটে মরত। তাকে উদ্ধার করতে হবে—দিদিয়ার গল্পের সেই গিরবরজাব ছত্রিদের হারানো মতিকে।

সে রবিবার দিন যেত মামার বাড়ি। তখন জান্‌কী ছোট। ট্যারা চোখে কার দিকে সে চাইত নরসিং বুঝতে পারত না। ভারী যত্ন করত তাকে। সোমবার যখন সে চলে আসত—বলত—আবার কবে আসবে? কাদার মত স্বভাব ছিল তার। লেপটে লেগে থাকতে চাইত।

বলত—তোমার মত রামকে লিখাপড়া শিখবার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ো তুমি। তোমার পুরানো কেতাবগুলি দিয়ো। রেখে দিব। বড় হ'য়ে রাম সিং পড়বে।

প্রথম প্রথম নরসিং জান্‌কীকে কিছু বলত না। মামীর ভাইঝি, মামী তা' হ'লে বাকী রাখবে না। তারপর সাহস বাড়ল। সে জান্‌কীকে রূঢ় ভাষায় বলত, ভাগো হিঁয়াসে ভাগো। কুকুরের বাচ্ছার মত পায়ের কাছে এসে লেজ নাড়তে হবে না—ভাগো।

তারপর তাকে প্রহার দিতে শুরু করলে।

সেদিন রবিবার। পরের দিন সোমবারে রথযাত্রা। ইমামবাজারে রথের মেলা।

জান্‌কী এসে হেসে বলেছিল—রথের মেলাতে আমাকে রাম সিংকে কি দিবে তুমি নরসিং ভাই?

অসহ্য মনে হয়েছিল নরসিংয়ের। সে ঠাস ক'রে এক চড় বসিয়ে দিয়েছিল—আবদার! যাও, আবদার কর গিয়ে তোমার পিসীর কাছে!

রামটা আজন্ম ওই 'গাধার মত উল্লুক।' খুব যে বোকা, তাকে নরসিং ওই কথা বলে—'গাধাকে মাফিক উল্লু।' জান্‌কীকে মারলে সে খি-খি ক'রে হাসত।

জান্‌কী কেঁদে উঠেছিল, চড়টা জোরেই পড়েছিল। 'নেকড়ানী' ঠিক এই সময়টিতেই ঘরে ঢুকেছিল—কোথাও গিয়েছিল। 'নেকড়ানী'—নেকড়ে বাঘিনী। 'নেকড়ানী' থমকে দাঁড়িয়ে ভ্রূ দুটো কুঁচকে তাদের দিকে চেয়ে রইল; মনে হ'ল, চোখের তারা দুটো যেন সদ্য-আগুনে পোড়ানো রাঙা গুলতি-বাঁটুল—ধনুকে লাগিয়ে টান দিয়ে ধরেছে—লক্ষ্য করছে নরসিংকে। নরসিং মনে মনে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। জান্‌কী—রাম তারাও পিসীকে দেখছিল। পিসীর ওই গুলতি-বাঁটুল জোড়া ধনুকের মত চাউনী এবং ভ্রূভঙ্গী দেখে তারাও ভয় পেয়েছিল—রামার খি-খি হাসি তখন বন্ধ। হনুমান শিকারীর হাতের বাঁটুল জোড়া ধনুক দেখে গাছের মাথার হনুমানগুলোর যেমন সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে যায়—তখন তার অবস্থাটাও তেমনি। বাঁচালে জান্‌কী। পিসীর ঠোঁট নড়বার আগেই সে কাঁদতে কাঁদতে বললে—পায়ে হুঁচোট লাগল!

এবার বাঁটুল ছাড়লে মামী। নেকড়ানীর মতই দাঁতে দাঁত ঘষে বললে, চোখ ছিল কোথা? চোখ? হারামজাদী—ট্যারা চোখী?

ছুটে আসতে গিয়ে—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মামী বললে, হারামজাদী নাচনেওয়ালী, এত নাচনা কিসের লাগল তোর? ছুটলি কেনে তুই? বলতে বলতে সে আক্রোশভরে এসে ধাঁ ক'রে বসিয়ে দিলে এক চড় জান্‌কীর গালে। নেকড়ানী মারলে তার থাবা।

নরসিংয়ের ইচ্ছে হয়েছিল চীৎকার ক'রে উঠতে। কিন্তু পারে নাই। আশ্চর্য—গোটা জীবনেই সে পারে নাই নেকড়ানীর প্রতি ভয়টাকে মুছে ফেলতে। কতবার সে ভেবেছে—কিসের ভয়? মামার খায় না সে আর! সে গিরবরজার সিংহরায় বংশের ছেলে—মামা

ধরণী সিং সিংহরায়দের চেয়ে ইজ্জতে অনেক ছোট, মামী আরও ছোট ঘরের মেয়ে, তার পায়ের ধুলো পড়লে তাদের কৃতার্থ হয়ে যাওয়ার কথা—কেন ভয় করবে সে?

চাকরী ক'রে যে দিন সে মাইনে পেলে, সেদিন পাঁচটা টাকা নিয়ে সে গিয়েছিল মামার বাড়ি। সেদিন সে ভেবেছিল—পাঁচ টাকা দিয়ে সে প্রণাম করবে মামাকে। মামীকে সে প্রণামই করবে না। মাইনে বলবে—পঁচিশ টাকা। মামীর চোখ দুটো বড় হয়ে উঠবে। মামী বলবে, কি বাবা? মামী এত ছোট হ'ল? মামাকে দিলে পাঁচ টাকা—আর মামীকে মনেই পড়ল না!

সে বলবে, গিরবরজার সিংহরায় আমরা। আমরা ছোট জাতকে প্রণাম করি না। সে মামীর বাপ তুলে, জাত তুলে গাল দেবে। বহুত বহুত কড়া কথা শুনিয়ে দেবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা—মামীকেই সে প্রণাম করলে আগে টাকা দিয়ে। চারটে টাকা দিয়ে ফেললে।

মামী খুশি হ'ল। সে বললে, বস বেটা। বেঁচে থাক। বহুৎ রোজকার করো। মামী বলে মনে রাখিয়ো। একঠো বেটা নাই আমার যে আখেরে আমাকে দেখবে! একঠো বেটি নাই যে জামাই আসবে একটা—সে পেটের বাচ্ছার মত যতন করবে! তুমি ছাড়া কে আছে আমার!

তারপর মামী ডাকলে—জান্‌কী! জান্‌কী! আরে—হারামজাদী বদমাশ! দেখ্‌ বেটা দেখ্‌। ভাইয়ের বেটিকে আনলাম কি আমার সুখ দুখ দেখবে। হারামজাদীকে করণ দেখ্‌। কোথায় গেল—পাত্তা নেই।

মামী বকতে বকতে উঠে গেল। উঠে গিয়েছিল—নরসিংয়ের জন্যে মিঠাই কেনবার ব্যবস্থা করতে। এই সময় বাড়ি ঢুকল জান্‌কী। বিকেল বেলা পুকুরে গা ধুয়ে এল সে—গায়ে ভিজে কাপড় সেঁটে লেগে গিয়েছে।

নরসিংয়ের বুকের ভিতরটায় হঠাৎ মোটরের ইঞ্জিন স্টার্ট নিয়েছিল। কিশোরী জান্‌কীর দেহে তখন যৌবনের রঙ ধরতে আরম্ভ করেছে। এতদিন চোখে পড়ে নাই। আজ হঠাৎ সেটা পড়ে গেল। নরসিংয়ের হয় তো এতদিন চোখ ছিল না; চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে তার মেজবাবু। সেদিন ডিপোর ঘরের স্মৃতি মনে পড়ল! বুকের মধ্যে আগুন ধরে গেল।

মেজবাবু বলতেন—এই ঘটনার ঠিক দু দিন আগে মেজবাবু বলেছিলেন, স্বকর্ণে শুনেছিল নরসিং; মেজবাবু বলেছিলেন তাঁর এক বন্ধুকে—ঘাটে বাসন মাজছিল দুপুর বেলায়, আমি নামলুম ঘাটে পা ধুতে। এক হাত ঘোমটা দিলে—সরে দাঁড়াল এক পাশে। কুড়িটা টাকা আলগা ক'রে রুমালে বেঁধে বুক পকেটে রেখেছিলাম, ঝম ক'রে ফেলে দিলাম ঘাটে, যেন পড়ে গেল পকেট থেকে। উঠে চলে এলাম। থাকল পড়ে ঘাটের জলে। পাঁচ মিনিট পর ফের গেলাম। দেখলাম রুমাল নাই। উঠে আসবার সময় বলে এলাম, হাত ভরে দোব টাকায়। সন্ধে বেলা থেকো ঘাটে।

হা-হা ক'রে হেসেছিলেন মেজবাবু। বলেছিলেন, বিশে না হয় পঞ্চাশ, পঞ্চাশ না হয় এক শো, শয়ে না হয় হাজারে! তাতেও না হয়, একটু তাকে থাকতে হবে। যখন একলা নির্জ্জনে পাবে জোরসে টেনে নাও। ব্যস চুপ হয়ে যাবে। আবার হাসি—হা-হা-হা-হা!

শয়তান! শয়তান! সে হাসি মধ্যে মধ্যে আজও কানের পাশে বাজে।

জান্‌কী, তুই—তুই বাঁচিয়ে দিয়েছিস নরসিংকে। নইলে নরসিংয়ের দুনিয়া হয়ে যেত মেজবাবুর দুনিয়া, শয়তানের দুনিয়া!

মনের আগুনের আঁচে অধীর হয়ে মেজবাবুর ওই মন্তরের মায়ায় নরসিং তাকে টাকা দিয়ে লোভ দেখাতে চেয়েছিল। আশ্চর্য্য—ছোটবেলার কাদার মত নিরীহ বোকা মেয়ে, তার সেই ট্যারা চোখে বিজলী খেলে গেলে সেদিন। নরসিং কটা টাকা হাতে নিয়ে লুফছিল। বাড়িতে আর কেউ ছিল না তখন। জান্‌কী আগুন ছড়ানো ট্যারা দৃষ্টিতে চেয়ে বাব কয়েক শুধু থুথু ফেললে—থু! থু! থু! থু!

নরসিং এবার আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না, মেজবাবুর মন্তর মনে পড়ল তার, সে জান্‌কীকে টেনে বুকে চেপে ধরলে।

সঙ্গে সঙ্গে জান্‌কী তার হাতের ভারী রূপোর কাঁকণি দিয়ে মারলে নরসিংয়ের ভ্রূর উপর। কেটে গেল ভ্রূটা। দরদর ক'রে রক্ত ঝ'রে নরসিংয়ের মুখ ভাসিয়ে জান্‌কীর মুখের উপর ঝরে পড়ল।

শ্যামনগর এসে গিয়েছে।

ডান হাতে স্টিয়ারিংয়ে পাক দিয়ে গাড়ীটার মুখ পাশের রাস্তায় বেঁকিয়ে দিলে নরসিং! বাঁ হাতখানা আপনি গিয়ে পড়েছিল ভ্রূর উপরে একটা কাটা দাগের উপর। জান্‌কী তাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গিয়েছে।

পালিয়ে এসেছিল নরসিং। ভয়ে তার বুক ঢিপ-ঢিপ করেছিল সমস্ত রাত্রি। পরের দিন রাম এসেছিল। গাধার মত উল্লুক-রামা। কোন দিন তার বুদ্ধি ছিল না—কোন দিন হবেও না। এসে তার হাতে একটা টাকা দিয়ে বলেছিল—দিদি বললে—এক টাকার আফিং কিনে দিতে। টাকাটা সে নিয়েছিল। বলেছিল,—বলিস আমি নিয়ে যাব সন্ধ্যের সময়।

সন্ধ্যেয় গিয়ে মামীকে বলেছিল—মামী জান্‌কীকে আমি বিয়ে করব। দেবে?

*　　　*　　　*

রজপুতের মেয়ে জান্‌কী—বড় হয়ে হয়ে উঠল সোজা তলোয়ারের মত লম্বা—সে কালের রজপুতের তলোয়ারের মত ঝকমকে ধারালো হয়ে উঠেছিল মনে, মেজাজে। আশ্চর্য্য। ছোট বেলার সেই কাদার মত মেয়ে।

মদ খেলে সে কিছু বলত না। মদ তো খায় রাজপুত মরদ। মদ যদি না খাবে তো রক্ত চন-চন করবে কিসে? কিন্তু ব্যভিচারের কথা যদি ঘুণাক্ষরে তার কানে যেত তবে সে তলোয়ারের ধারের দিকটার মত ধারালো হয়ে দাঁড়িয়ে বলত'—খবরদার! কখনও ছোঁবে না তুমি আমাকে। কখনও না!

ভয় পেত' নরসিং।

জানকী বলত—আমাতে তোমার মন না ওঠে, দিল না ভরে, আর একটা দুটো তিনটে শাদী করো তুমি। কিন্তু এ কাজ—এ পাপ ক'রে আমাকে ছুঁতে পাবে না তুমি।

জান্‌কী তোকে হাজারো লাখো আশীর্ব্বাদ! অক্ষয় স্বর্গে বাস হবে তোর।

জানকীর দৌলতেই তার এ সমস্ত কিছু। সেই বলেছিল ট্যাক্সি করতে। সেলাম মেজবাবু, তোমাকেও সেলাম! তুমি শয়তানই হও আর যাই হও তোমাকেও সেলাম। তুমিই বলেছিলে—নরসিং, রহমতের কাছে ড্রাইভিংটা শিখে নে দেখি! রহমতটাকে জবাব দোব আমি। মুখের উপর উত্তর করে ও আমার!

রহমতের কাছে সে ড্রাইভিং শিখেছিল। এ ইচ্ছাটা তার বুকের ভেতর আগে থেকেই জেগেছিল। গাড়ীখানা ছুটে চলে, হু-হু ক'রে যেন উড়ে যায়, ইঞ্জিনটা গোঁ-গোঁ শব্দ করে, গরম হাওয়ায় সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা ধরে, হোই দূর দূরান্তরের ছোট্ট জিনিসটা দেখতে দেখতে বড় হয়ে কাছে চলে আসে, ঘণ্টায ত্রিশ মাইল দূর চলে আসে পায়ের তলায়। নেশা—অদ্ভুত নেশা। মদের নেশায় দুনিয়া টলে। এতে তার পায়ের তলা দিয়ে ছুটে পিছনে চলে যায়। চলো—চলো—চলো। কোই রোখনেওয়ালা হ্যায়? নেহি হ্যায়। চলো—চলো—চলো। পাশ দিয়ে পিছনের দিকে ছুটে চলে যায়—গাছ পালা, রাস্তার ধারের যা কিছু—সব কিছু, আর দূরে পাশে ঘুরপাক খেয়ে ঘোরে সমস্ত কিছু। এত বড় দুনিয়া—এতটুকু—এইটুকু ছোট হয়ে গেল। চলো—চলো—চলো।

নিতাই বললে—স্পীড কমান সিংজী। এই মোড়েই তো সব নামবেন।

নরসিংয়ের সম্বিত ফিরে এল। এ্যাকসিলেটর থেকে পা তুলে নিলে।

জোসেফ দাঁড়িয়ে আছে—মোড়ের মাথায়।

(ক্রমশঃ)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নতুন বৌ রেণু

ভাড়াটে এলো ওরা। নতুন বৌ রেণু, ঠাকুরপো আর স্বামী। নতুন ভাড়াটে। দোতলার দু'টো ঘর—একটা বড় ঘরেরই দু'ভাগ, তাতে ওর গৃহস্থালি বসলো। খিলখিল হাসি, কালো চোখের দীপ্তি আর পাতলা ছিপছিপে শরীরের মসৃণ দ্রুততা নিয়ে ও খুট্‌খাট্‌-ঠুক্‌ঠাক্‌ শব্দে সংসারের শ্রী এনে দিলো চটপট। বেশি নয়, বড় জোর উনিশ-কুড়ির প্রবীণতায় ওর দাবী চলবে। ডুরে আটপৌরে কাপড় পরে, জড়িয়ে জড়িয়ে নয়; এমনি নামহীন সাধারণ বৌ-শাশুড়ীর মত, আর তারপর আঁচলটা কোমরের সঙ্গে পাকিয়ে নিয়ে খুব খুশিখুশিভাবে ও রান্না করে। করে—তিন হাত চওড়া পাঁচ হাত লম্বা এক জায়গায়। একটা কোণ মত হয়ে ঐ অল্প স্থানটুকু বেরিয়ে গেছে ভিতরের ছোট্টো উঠোনটার মাথার ওপর। সেটাকেই ত্রিকোণীভাবে দু'হাতি পাঁচিল তুলে এবং আকাশের উৎপাত থেকে রক্ষা করার জন্য টিনের একটা চাল দিয়ে রান্নাঘরের সৃষ্টি হয়েছে। রেণু উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালে পাঁচিলের ওপাশে সিঁড়ির নিচে মাসীমার সেঁকা

রুটি আর বেগুন ভাজা তুলে নিতে পারে। মাসীমারা থাকেন সামনের দিকে। দু'টো বড় ঘর আর একটা তাদের নিচের—ভাড়াটে হয়ে। অবশ্য সামনের বারান্দাটাও আছে। সংকীর্ণ হ'লেও, সেটার অস্তিত্ব স্বীকার না করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। রান্না করেন—বাড়িওয়ালা-অভিমুখে যে সিঁড়িটা উঠে গেছে তারই তলায়। সেটা প্রায় রেণুর ত্রিকোণীরও গায়ে গায়ে।

"ও মাসীমা, আজ যে সুন্দর ঘি-এর গন্ধ পাচ্ছি।" রেণু নিজের পিঁড়ীর উপর বসে চচ্চড়ি নাড়তে নাড়তে বলে।

প্রবীণ মাসীমা অল্প হাসেন, বলেন, "কী করি বল, আজ ছোট জামাই আসছে।"

"তাই বুঝি?"

"নইলে কী আর আমাদের এ সখ পোষায়।" রেণু ক্ষণকাল স্তব্ধ রইল। তারপর বলে ওঠে, "তা যাই বলুন, আমার কত্তাটির আবার লুচি ভিন্ন রোচেই না।"

মাসীমা অলক্ষ্যে হাসেন মুচকে, বলেন, "তবু ভালো, সস্তায় ভেজিটেবিল পাওয়া যাচ্ছে।"

"কেন?"

"নইলে এই আক্কারার বাজারে..."

"কিন্তু আমি তো ভেজিটেবিল ব্যবহার করিনে।"

"অ, করিস্ নে।"

"না"

"হবে। কোনো দিনই ঘি-এর গন্ধ পাইনি কিনা, তাই..." বাকীটুকু মাসীমা পরোক্ষ রাখলেন। রেণুও কোনো প্রত্যুত্তর করল না। চচ্চড়িটা নিয়ে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

নিচে; একতলায় আর এক ভাড়াটে আছেন। স্বামী-স্ত্রী আর এন্তার ছেলেমেয়ে। চোদ্দ থেকে আট বছরের পাঁচটি, তারপর তিন বছরের একটি। এ ভিন্ন আগতপ্রায় একজন! আটজন প্রাণীর বাসভূমি দু'টি ঘর। যেমন অন্ধকার তেমনি ভ্যাপ্সা। দিন রাত্রি জমি থেকে ভাপ উঠছে; ঠাণ্ডা জলীয় ভাপ। যে-কোনো সময় নিউমোনিয়া হওয়াই স্বাভাবিক এ-স্থলে। তাতেই আছেন ওঁরা। রোগ শোক দুঃখ দৈন্য নিয়ে চালিয়ে চলেছেন জীবন। এই যুদ্ধের দিনে আঠারো টাকা ভাড়া যে মাত্র!

ওঁরা কেমন কেমন একটা মন নিয়ে নতুন বৌ রেণুর দাম্পত্য-ছাখেন। ওদের ঘর থেকে টল্‌মল্ ক'রে মাঝে মাঝে সঘন হাসি ভেসে আসে, তখন অকারণে বা স্বল্প কারণেই নিচের গিন্নি অনেক সময় তিন বছরের মেয়েটাকে চড়-চাপড় ছান। কর্তাকে হঠাৎ হয় তো বলে বসেন, "অত উচ্ছ্বাস কিসের বাবা!"

আত্মবিস্মৃত স্বামী চোখ দু'টো স্ফীত ক'রে বলেন, "কী বলছো; কাকে?"

উৎকটরূপে মুখটাকে সঞ্চালন ক'রে গিন্নী ঝেঁঝে ওঠেন, "ন্যাকা সেজো না; গা জ্বলে যায়।"

"তার মানে?"

"কাকে বলি বোঝ না: ঐ যে যিনি সর্বদা চুলবুল করছেন।" ভদ্রলোক কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়ে চুপ ক'রে যান।

"আমাদেরও ছিলো গো কাল—আমাদেরও ছিলো। এ আর নতুন কী দেখালে!" গিন্নি কর্তার নির্বিকার মুখের দিকে চেয়ে গরম হ'য়ে চুপ ক'রে যান। মোটা বুদ্ধির প্রতীক! কেবলমাত্র কেরানীগিরিরই যোগ্যতা আছে!

তা হলেও, মনের ঐ উত্তাপ থাকলেও, একই বাড়ির বাসিন্দে তো, সুতরাং আলাপ হয় বৈ কি। পরস্পরের কথাবার্তার কামাই নেই।

একতলার উনিই সে দিন রেণুকে বলেন, "বাঃ, রেণু এ ঢাকাইটি বেশ কিন্তু!"

রেণুর সামান্য দ্বিধাও হয় না, বলে, "হ্যাঁ; কিন্তু অদ্ভুত দাম নেয় আজকাল। মশাইকে হাজারবার বললাম, চাই না—চাই না—চাই না, কিছুতে কী কানে নিলেঃ সেই পঁয়ষোট্টি টাকা গচ্চা দিয়ে এনে পরালে, তবে ছাড়লে।"

"কবে কিনলে?"

"কবে আর, এই তো পরশু রাত্রে দোকান থেকে আসার সময়।"

একতলার গিন্নি দোতলায় মাসীমার ঘরে ঢুকলেন। ধপ ক'রে মেঝেতে ব'সে পড়ে মুখটাকে উৎকট ক'রে তোলেন।

"কী?" মাসীমা জিজ্ঞাসু।

"বলো কেন ভাই; সেই একই ব্যাপার, ঢং আর মিথ্যের পাহাড়।"

"রেণুর কথা বলছো?"

"নইলে আর কার!"

"ঘটনাটা বলো শুনি।"

"শোনার আর মাথামুণ্ডু কী আছে! ঐ কালো ঢাকাইটার একটু সুখ্যাতি করেছি—ব্যস আর তর সইল না; বলে দিলে ওর সোহাগের স্বামী পরশু পঁয়ষোট্টি টাকা দিয়ে ওর জন্যে কিনে এনেছে।"

"অথচ," মাসীমা চোখ দু'টো সংকুচিত ক'রে মৃদু হেসে বলেন, "সে দিন ওর বাক্স দ্যাখাতে দ্যাখাতে কী বলেছিল?"

"হ্যাঁ; বলেনি যে ওর এক বড়লোক বন্ধু বিয়ের সময় দিয়েছিল?"

"সে কী আর মনে রেখেছে" মাসীমা গলাটাকে আর এক পর্দা নামিয়ে ফিসফিস ক'রে বলেন, "পোড়ারমুখী কী মিথ্যেই বলতে জানে!"

সময় হলেই সভা ভেঙে যায়।

চাপা কথা, চাপা হাসি, চোখের কোণ দিয়ে চাওয়া আর উষ্ণতা—মনের কথার ঝাঁঝে নির্গত হয়ে গেলে গিন্নিরা একটু শান্তি অনুভব করেন।

একই বাড়িতে বাড়িওয়ালা-ভাড়াটে। সুতরাং সংযোগ আছে। বাড়িওয়ালার বড়ভাই প্রবাসী; এসেছেন কিছুদিনের জন্যে সম্প্রতি। তারই মেয়ে মমতা। রেণু তার সঙ্গে আলাপ করে। আলাপ করাই ওর স্বভাব।

কোনোদিন হয় তো রেণু দ্যাখে, সুন্দর রেশমী শাড়ীতে সুন্দর দেহটাকে মুড়ে মমতা চলেছে। বাইরে, বাবা-মা-ভাই সকলে দল বেঁধে। চারটেতে তখন কলে জল এসেছে,

রেণু বসেছে রাজ্যের বাসন নিয়ে। কলতলায় তখন বিশ্রী নোংরা। ভাতে-ডালে-কাঁটায়-ছালে-ছায়ে জলে শুকিয়ে সব কুৎসিত দুর্গন্ধময় হয়ে উঠেছে।

ওরা সকলে পাশের সিঁড়ি দিয়ে নেমে ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

রেণুর সমস্ত শরীর কেন অমন শিরশির ক'রে ওঠে? ওরা চলে গেলে ওর কান দুটো লাল হয়ে ওঠে। মুখের ত্বকের তলে অদ্ভুত একটা আগ্নেয় ভাব।

পরের দিন রেণু উপরে আসে; মুখ ভার-ভার, শুক্‌নো মতন।

মমতা হেসে ফেলে, বলে, "কী ব্যাপার, রেণু?"

রেণু নিরুত্তর।

"কত্তার সঙ্গে আড়াআড়ি হয়েছে রাতে?"

"না।" রেণু একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও কষ্ট ক'রে বুঝি শব্দটা উচ্চারণ করে।

"তা হলে ভাই আমি আঁচ করতে পারলাম না। বলেই দাও।" রেণুর কোমর জড়িয়ে ধরে মমতা।

"যাও—আমার ভালো লাগে না।" রেণু কোমর ছাড়ানোর একটা ক্ষীণ চেষ্টা করে।

"কেন, মন খারাপ?"

ঘাড় নেড়ে রেণু সমর্থন করে।

"কিসের জন্যে তা'তো বললে না?"

"এই ছাখো না; চার টাকার সিটে দেওর সিনেমা গ্যালো, অথচ আমার জন্যে একটা টিকিট আনতে মনে রইল না।"

মমতা কোমরের বন্ধন মুক্ত ক'রে সামান্য সরে গেছে। ওর মুখের সেই স্নিগ্ধ কৌতুকের ছায়া এখন কেমন কর্কশ হয়ে ওঠে।

রেণু ব'লে চলে, "কী জানো ভাই—আমার ভয়ানক সিনেমা দেখার অভ্যেস। তা সে যতই টাকা পড়ুক, সপ্তাহে দুটো না দেখলে আমি থাকতে পারিনে।"

"ও।"

মমতা কেমন জানি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যায়। কথা বলে না; উত্তর দেয় সংক্ষিপ্ত। কিছুক্ষণ অনর্গল নিজের অভ্যেসের বেআদবি সম্বন্ধে ব'কে অবশেষে আপনা থেকেই রেণু থেমে যায়। নেমেও আসে।

কিন্তু মনের মধ্যে এক বিশ্রী গ্লানি নিয়ে এলো। ধরা-পড়া চোর। ছোট্ট আরশিটায় হঠাৎ নিজের মুখ দেখতে পেয়ে নিজেই লাল হয়ে ওঠে। ঘেমে—নেয়ে, শেষে কালো হয়ে আসে। চোখ দুটো সজল হয়ে, দু'বিন্দু-জল চোখের পাতার উপর কাঁপতে থাকে।

"ছি-ছি-ছি রেণু; ছিঃ, এ অভ্যেস তো ছিল না!" উত্তপ্ত জ্বালার সঙ্গে কথাগুলো জলে ভ'রে বেরিয়ে আসে।

আশীষকুমার বর্মণ

নিবেদন

পবিচযের কযেকটি সুপরিচিত বিভাগকে এ-সংখ্যায় আমরা স্থানাভাবে বাদ দিতে বাধ্য হইয়াছি। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে অনেক গুরুতর বিষযেরও সামান্য স্বীকৃতি বা উল্লেখও এই কারণে সম্ভব হইতেছে না। সেই সব বিষয় অনেক ক্ষেত্রে সাময়িক; এই সময়েই তার সমধিক গুরুত্ব। কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়েব সম্বর্ধনার প্রস্তাব এমনি একটি বিষয়। বাঙালী লেখক ও পাঠক সমাজ সর্বান্তঃকরণে এই প্রস্তাবে সাড়া দিবেন, ইহা আমরা বিশ্বাস কবি। সাহিত্য সংস্কৃতিব নানা ক্ষেত্রের এরূপ আলোড়ন ও অনুষ্ঠান ছাড়াও অন্য দুই একটি বিষয় যথোচিতভাবে উল্লেখ করিতে না পারিয়া আমরা সত্যই মর্মাহত। ইহার মধ্যে দুইটি কথা বলিতেছি—পেশোয়ারের ডাক্তার চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশযেব মৃত্যু, ও তক্ষশিলার মিউজিয়মের কিউরেটর মণীন্দ্র দত্তগুপ্ত মহাশয়েব মৃত্যু। সীমান্তের জাতীয় জীবনে ডাক্তার ঘোষ ও তক্ষশিলার পুরাবস্তুর সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যাপাবে দত্তগুপ্ত মহাশয় বাঙালীর সুনাম বর্ধিত করিয়া গিয়াছেন; আর ইঁহাদের আতিথেয়তা ও আত্মীযতার কথা বহু বাঙালীবই চিরদিন মনে থাকিবে। অন্যান্য সামযিক গুরুতর ঘটনায ইঁহাদের অভাব বাঙলা সাময়িকপত্রেও যথোচিতভাবে এখনো স্বীকৃত হয় নাই বলিযাই আমাদেব দুঃখ আরও বেশি।

ত্রুটি স্বীকার

আশ্বিনসংখ্যা 'পরিচয়ের' "তিনটি কথা" নামীয অনুবাদ কবিতাটির অনুবাদকের নাম ভ্রমক্রমে স্নেহাংশুকান্ত আচার্য বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে। স্নেহাংশুবাবু ও পাঠকগণ এ ভুল ক্ষমা করিবেন। —সম্পাদক, পরিচয়

পরিচয়

পঞ্চদশ বর্ষ—১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ, ১৩৫২

ডাঃ কোটনিস

ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে কংগ্রেসের উদ্যোগে যে পাঁচজন ডাক্তারকে মেডিক্যাল মিশনে চীনদেশে পাঠানো হয় তাদের মধ্যে আমি দেশে ফিরি সকলের শেষে। মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার নেই যে, আমাদের মধ্যে একজনের শেষ পর্যন্ত দেশে ফেরা হয়নি। ভারতের বীর সন্তান ডাঃ কোটনিসের সেবার স্মৃতি চীনদেশ সগৌরবে আপন বক্ষে বহন করছে। ভারতবর্ষেও তাঁর স্মৃতি ম্লান হবার নয়। কি ভাবে তার ব্যবস্থা হতে পারে ও তার চেষ্টা হচ্ছে সেই কথাই বলব।

কোটনিসের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা ১৯৩৮ সালে বম্বের ভিক্টোরিয়া টারমিনাস স্টেশনে। মাথায় বেঁটে, আয়তনে পাতলা, পায়জামা ও শার্ট পরা, খাঁটি মারাঠি চেহারা। চীনযাত্রী পাঁচজন ডাক্তারই তখন বম্বেতে জমা হয়েছেন। কোটনিসের দেশ শোলাপুরে, কিন্তু আমাদের মতো তিনি হোটেলে ওঠেননি। বিদায়কালে উপস্থিত থাকার জন্যে তাঁর পিতামাতাও বম্বেতে এসেছিলেন। আমি কোটনিসের সঙ্গে তাঁদের দেখতে গেলুম।

দু'দিন পরে যাত্রা শুরু। ডাঃ অটলের নেতৃত্বে আমরা পাঁচজন জাহাজে উঠেছি। বিদায় উৎসবের নেত্রীত্ব করলেন শ্রীযুক্তা নাইডু। তিনি বলেছিলেন, "তোমরা আজ যে কাজে যাচ্ছ তা বিপদসঙ্কুল। হয়ত তোমাদের প্রাণ দিতে হবে চীনা ভাইদের সঙ্গে চীনা স্বাধীনতার জন্য।" আমাদের মধ্যে অন্তত একজন নিজের জীবন দিয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণ করেছেন।

জাহাজে দেখা গেল কোটনিসের গলাতেই মালার ভার সবচেয়ে বেশি। তিনি বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তাঁর অসংখ্য বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন বিদায়দিনে জাহাজঘাটায় হাজির ছিলেন। সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তাঁর বৃদ্ধ পিতামাতা, ছেলের শুভকামনায় যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন। মালার বহর দেখে আমি রহস্য ক'রে কোটনিসকে বলেছিলুম, "আপনি দেখছি মালার ভারেই মারা পড়বেন।" তখন কি ভাবতে পেরেছিলুম, আনন্দের মুহূর্তের সেই টিপ্পনি একদিন দুঃখের সঙ্গে স্মরণ করতে হবে।

কোটনিসের চরিত্রের গভীরতা ও শক্তিমত্তা প্রথম থেকেই প্রকাশ হয়ে পড়ল। তাঁর নিয়মনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলাবোধের জন্য তিনি ডাঃ অটলের কাছ থেকে উপাধি পেলেন 'কর্নেল'

জ্ঞানস্পৃহা ছিল তাঁর অদম্য উৎসাহে পূর্ণ। জাহাজে ছিলেন কয়েকজন চীনা সহযাত্রী। তাঁদের মধ্যে দু'জনকে বেছে নিয়ে কোটনিস চীনা ভাষা আয়ত্তের চেষ্টা আরম্ভ করলেন। নতুন ভাষা শেখার প্রথম প্রয়োগে যা হয়, মাঝে মাঝে বিভ্রাটেরও সৃষ্টি হোতো। যেমন ক্যান্টনে নেমে এক খাওয়ার দোকানে ঢুকে মেনু দেখে কোটনিস কিছুতেই বোঝাতে পারলেন না যে তাঁর মুরগী চাই। শেষে এঁকে দিতে হোলো। ফলে প্লেটে সজ্জিত হয়ে দেখা দিল —একটি ব্যাঙ। এ দুরবস্থা কোটনিসকে বেশি দিন সইতে হয়নি। তিনি বেশ তাড়াতাড়ি দুর্বোধ্য চীনা ভাষাকে আয়ত্তে আনলেন। [ডাঃ অটল তাঁকে আবার উপাধি দিলেন— প্রোফেসর।] তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি তাঁর ছিল। চীনা আচারব্যবহার ধরনধারণও তিনি বেশ সহজে শিখে নিতে পারলেন। তাঁর এই অনুকরণ-পটুতায় ও সামাজিকতা গুণে তিনি স্বচ্ছন্দে চীনাসমাজে প্রবেশের পথ কেটে নিলেন।

ছ'মাস চীনদেশে কাটানোর পর আমরা তখন চুংকিং-এ। চীনা সরকারের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও য়েনানে যাবার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে এমন সময় খবর এলো কোটনিস পিতৃহীন হয়েছেন। তাঁর অবর্তমানে দরিদ্র পরিবারের কি দুরবস্থা হবে এই ভেবে কোটনিসের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। তবু তিনি সংকল্পচ্যুত হলেন না। য়েনানে যাওয়াই স্থির হোলো।

য়েনানে অষ্টম রুট আর্মির পরিবেশ কোটনিসকে সঞ্জীবিত ক'রে তুলল। একান্ত নিষ্ঠায় তিনি নিজের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। হাসপাতালের গুরু পরিশ্রমের পরও তাঁর বিশ্রাম ছিল না। তুলি ও কলম নিয়ে তিনি বসে যেতেন চীনাভাষাকে অন্তরঙ্গভাবে শিখতে। তাঁর অভিনিবেশ ও অধ্যবসায় দেখে ডাঃ অটল ঠাট্টা করে বলতেন এক জার্মান অধ্যাপকের কথা যিনি চীনা ভাষার পাঁচহাজার ইডিয়ম আয়ত্ত করার চেষ্টায় শেষটা উন্মাদ হয়ে যান। ভারতবর্ষের কথা তিনি চীনাভাষায় চীনদেশের অধিবাসীর নিকট বিবৃত করতে প্রবৃত্ত হলেন। ভাষায় দখল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কথাবার্তার ভিতর দিয়েও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অজ্ঞাত কাহিনী অষ্টম রুট আর্মির সেনাদলকে শোনাতে লাগলেন। তাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা দিনে দিনে বেড়ে চলল।

ডাক্তারির দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রখর। যুদ্ধের মধ্যে শস্ত্রবিদ্যা অভ্যাসের সুযোগ পাওয়া যায় প্রচুর। বিশেষত চীন-জাপান যুদ্ধে—যাতে প্রায় নিরস্ত্র জনবলের বিরুদ্ধে আধুনিক বিজ্ঞানের মারণাস্ত্রে সজ্জিত বাহিনীর অভিযান মর্মান্তিক সত্য হ'য়ে উঠেছিলো। ওয়ার সার্জারিতে বিশেষজ্ঞ হবার সুযোগ কোটনিস একটুও অবহেলা করেননি।

মাঝে মাঝে হতাশার বিষাদ তাঁকে আচ্ছন্ন করত, দেশ থেকে যখন আসত অভাবের কথা, দারিদ্র্যের কথা, বাড়ি নিলামে ওঠার কথা। কিন্তু যে ব্রত নিয়ে তিনি বিদেশে এসে-ছিলেন তার গুরুত্ববোধই আবার তাঁকে শক্তি দিত। ব্যক্তিগত সমস্যা তাঁর দেশপ্রেমকে, মানবহিতৈষণাকে ব্যাহত করতে পারত না। এ আমি অনেকবার দেখেছি।

১৯৪০ সালে আমরা দু'জনে গিয়ে পড়ি জাপ অধিকৃত লাইনের পিছনে। জাপানীদের পাহারা এড়িয়ে আমাদের ঘুরে-বেড়াতে হয় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও ঘোড়ায় চড়ে; সময় কাটাতে হোতো কখনও খোলা মাঠে, কখনও কৃষকের কুঁড়ে ঘরে। এই সময়েই আমাদের দু'জনের বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় হয়। আমরা যেখানেই গিয়েছি,

ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে সম্মান পেয়েছি। অভিনন্দনের প্রতিভাষণ কোটনিস চীনাভাষায় দিতে পারতেন। তাতে আমাদের প্রতিপত্তি আরো বেড়ে যেত। অশিক্ষিত কৃষকেরা বলত, এরা ত বিদেশী নয়। আবার চেহারা দেখে বলতো, বোধ হয় দক্ষিণ দেশের লোক হবে।

যে সব গ্রাম জাপানী অধিকার থেকে মুক্ত করা হোতো, সেখানে দু'এক জায়গায় বিপদেও পড়তে হয়েছে। জাপানী শাসনের প্রভাবে সেখানে ভীতির সঞ্চার এমন প্রবল ছিল যে, যা কিছু খাঁটি চীনা নয় তাকেই সেখানকার লোকেরা ভাবত জাপানী। আমাদের চীনা বন্ধুরা সময় মত রক্ষা না করলে অনেকবার আমাদের দস্তুরমতো বিপদে পড়ার সম্ভাবনা ছিল।

উত্তর চীনের প্রচণ্ড শীত কোটনিসের স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল ছিল না। নিয়ম শৃঙ্খলায় ব্যাঘাত ঘটায় বলে রাত্রের মার্চও তাঁর পছন্দসই ছিল না। কিন্তু প্রবল ইচ্ছাশক্তি দিয়ে তিনি তার মধ্যেও নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারতেন। ঘোড়ার পিঠে ঘুমিয়ে নিয়ে তিনি নিজেকে তাজা ক'রে তুলতেন। অনেক রাত্রে বিশ্রামের সময় পাওয়া যেত মাত্র পাঁচ মিনিট। আমি দেখেছি, কোটনিস তারই মধ্যে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে নিয়েছেন। আবার তাই নিয়ে আমরা রসিকতা করলেও তিনি শুনতে পেতেন। ঘুমভেঙে আমাদের ঠাট্টা আমাদেরই শুনিয়ে দিয়ে তিনি কতবার আমাদের অপ্রতিভ ক'রে দিয়েছেন। অথচ সত্যই তিনি বিশ্রাম করতেন, এও দেখেছি।

মনে পড়ছে তাঁর একদিনের ধৈর্য পরীক্ষার ঘটনা। জাপানীরা তখন ঘিরে ফেলেছে প্রায় চারিদিক, গ্রাম থেকে গ্রামে নিকিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আমরা কেবলই সরে যাচ্ছি, আর দেখছি জাপসৈন্য বেশি দূরে নয়। ন'দিন ন'রাত্রি এই পলায়নকৌশলের পর আমরা একটা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় পেলুম। ঘুমের অভাবে আমরা তখন একান্ত অবসন্ন। কিন্তু ইতিমধ্যেই সংবাদ রটে গেছে যে, দু'জন ভারতবাসী গ্রামে উপস্থিত। তখনই আয়োজন হয়ে গেল সভার ও বক্তৃতার। চল্লিশটি প্রশ্নসমেত এক পত্র আমাদের কাছে এসে পৌছাল। আমার চীনাভাষায় জ্ঞান ছিল কম, আমি তাই রেহাই পেয়ে পাশ ফিরে শুয়ে রইলুম। কোটনিস ভারতবর্ষের সমস্ত মর্যাদা কাঁধে নিয়ে উঠে চলে গেলেন।

ক্রমে কাজের চাপে আমাদেরও ছাড়াছাড়ি হোলো। চীনে তখন অভিজ্ঞ ডাক্তারের এত অভাব যে, একই স্থানে দু'জনকে রাখা সম্ভব বা যুক্তিযুক্ত ছিল না। অমি চলে এলুম য়েনানে। কোটনিস রইলেন হোপেই-চাহার-শান্‌সি সীমান্ত প্রদেশে তাই-হান-সান পর্বতের সানুদেশে কো-কুম নামক গ্রামে। আমাদের সে বিদায়দৃশ্য আমার স্মৃতি থেকে কোনোদিনই মুছবার নয়।

কোটনিসের ওপর ভার পড়ল বেথুন হাসপাতাল ও মেডিক্যাল স্কুল পরিচালনার। বেথুন ছিলেন একজন ক্যানেডিয়ান কমিউনিস্ট। চীনা ছাত্রদের চিকিৎসাবিদ্যা শেখাতে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করেন। কি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাঁকে এই কর্তব্যকাজ চালাতে হয় তা বুঝতে পারা যায় এই থেকে যে, তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে ব্লাড পয়জনিং-এ। এটুকুরও প্রতিকার এই চিকিৎসা কেন্দ্রে ছিল না। তাঁর মৃত্যুতে নেতৃত্ব এসে পড়ল কোটনিসের ওপর। চীনাবাসীরা সানন্দে তাঁর পরিচালনা মেনে নিলে। কারণ তিনি তখন তাদেরই একজন হয়ে গেছেন। চীনা চলতি ভাষায় বেথুন-এর নাম হয়ে ছিল নেই-

তাই-ফু অর্থাৎ সাদা ডাক্তার। কোটনিসের নাম হওয়া উচিত ছিল খো-তাই-ফু। কিন্তু চীনারা একটু বদলে নামটা ক'রে নিলে 'খে-তাই-ফু' অর্থাৎ কালো ডাক্তার। তাঁর গুণে আকৃষ্ট হয়ে তারা আর একটা নামও দিয়েছিল—চুংগো হায়জা অর্থাৎ 'চীনের সন্তান'। কোটনিস এ নাম সার্থক করেছিলেন।

এই হাসপাতালেই কোটনিসের জীবনে বৃহত্তম পরিবর্তন ঘটে। তিনি বিবাহ করেন। তারিখ, ১৯৪১-এর ২৫শে নভেম্বর। পাত্রীর নাম কো-চিং-লান—পেপিং-এর সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে, তিনি তথাকার ইউনিয়ন মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষিতা। যুদ্ধের সূচনায় পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, আরো হাজার হাজার যুবক-যুবতীর মতো পালিয়ে কয়েক শ' মাইল পায়ে হেঁটে তিনি পরে অষ্টম রুট আর্মিতে যোগ দেন। কোটনিসের পরিচালিত হাসপাতাল ও স্কুলে তিনি ছিলেন নার্সিং-এর শিক্ষয়িত্রী। বুদ্ধিমতী, শ্রীময়ী, আনন্দময়ী যুবতী, লম্বায় প্রায় পাঁচ ফুট, গোল চাঁদ-পারা মুখ, চোখে মোটা চশমা। স্বচ্ছন্দে ইংরেজী বলতে পারেন। সহজেই কোটনিসের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। এই ভাবের পরিণতি বিবাহে। এই বৈদেশিক বিবাহ নিম্নস্তরের সৈনিকদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল বটে, কারণ তারা অধিকাংশই অশিক্ষিত কৃষক। কিন্তু অফিসারেরা একে সম্পূর্ণ আন্তরিকভাবে অনুমোদন করেন ও এই বিবাহের গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বিশদভাবে বুঝিয়ে দেন।

মেয়েটিকে আমি আগে দেখেছিলুম, কিন্তু বিয়ের খবর পাই পত্রযোগে। চিঠি পেতে মাসকয়েক লেগে যেত, কারণ চিঠি পাঠাতে হোতো পত্রবাহকের মারফৎ—যাকে আসতে হবে জাপানী লাইন ভেদ ক'রে। অনেক চিঠি কোনো দিনই গন্তব্য স্থানে পৌছাত না। কাজেই একই কথা অনেকবার অনেক চিঠিতে জানানোর দরকার ছিল, যাতে কোনো না কোনো চিঠি যথাস্থানে পৌছায়। আমার সৌভাগ্যক্রমে কোটনিসের লেখা এই সময়ের অনেকগুলি চিঠি আমার কাছে পৌছেছিল। তাতে তাঁর মানসিক অবস্থার খবর পাওয়া যায়। বিবাহের অল্প দিন পরে 'পার্ল হারবার'। বিশ্বযুদ্ধের গতিতে নতুন মোড়। ভারতবর্ষের জন্য উদ্বেগ। তিনি লিখছেন আমায়—আমরা দু'জনে এক সঙ্গে দেশে ফিরব ও একযোগে কাজ করব। একটি সার্জারির বই লিখছি ও একটি বেবির জন্মের প্রত্যাশায় আছি। এ দু'টি কাজ সম্পন্ন হলেই ফিরতে পারব।

তাঁর এ আশা পূর্ণ হয়নি। বই শেষ হোলো, ছেলেটিও নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হোলো, কিন্তু কোটনিসের দেশে ফেরা হোলো না। অতিরিক্ত শীতে, অত্যন্ত পরিশ্রমে, জাপানী 'নিকিয়ে-নেওয়া' অভিযানের অনিয়মে ও বিশৃঙ্খলায় তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। ১৯৪২-এর ৯ই ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে মাদাম সুন-ইয়াৎ-সেন লিখেছিলেন: "ডাঃ কোটনিসের স্মৃতির অধিকার শুধু আমাদের দু'টি বৃহৎ জাতিরই নয়; সমগ্র মানব জাতির মুক্তি ও প্রগতির জন্য অদম্য যোদ্ধার যে মহৎ বাহিনী লড়াই করিতেছে, তাহারাও ইহার অধিকারী। বর্তমানের অপেক্ষা ভবিষ্যৎ তাঁহাকে আরো বেশি সম্মান করিবে, কারণ ভবিষ্যতের জন্যই তিনি সংগ্রাম করেন ও প্রাণ দেন।"

আমি দেশে ফিরি ১৯৪৩ সালে। সংকল্প, আবার একটা মেডিক্যাল মিশন গড়ে নিয়ে চীন দেশে ফিরে যাব। বলা বাহুল্য, সে সংকল্প আজও পূর্ণ হয়নি। ঐ বছরের আগস্ট মাসে, আমি তখন বম্বেতে; সুপরিজ্ঞাত লেখক ও সাংবাদিক মিঃ কে. এ. আব্বাস আমার সঙ্গে

আলাপ করতে এলেন চীন দেশের গল্প শোনার জন্য, বিশেষ ক'রে ভারতীয় মেডিক্যাল মিশনের কার্যাবলীর। সঙ্গে ছিলেন একজন মারাঠী লেখক, শাঠে। কোটনিসের জীবন-কাহিনী তাঁদের অভিভূত ক'রে ফেলেছিল। এই আত্মত্যাগী দেশপ্রেমিকের নাটকীয় ও শোচনীয় জীবনবৃত্তান্ত ফিল্‌মে তোলার প্রস্তাব তাঁরা করেন প্রসিদ্ধ পরিচালক মিঃ শান্তা-রামের কাছে। মিঃ শান্তারামও আকৃষ্ট হন, কিন্তু চৈনিক পটভূমিকা পাওয়া কি ভাবে সম্ভব সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। সন্দেহ দূর হোলো আমার এলবাম দেখে, তাতে চীন দেশের নানা দৃশ্যের ও ঘটনার ছবি ছিল এক হাজারেরও বেশি। তখন ভয় সরকারী চাপের, এ ধরনের রাজনৈতিক বিষয়ে সরকারী অনুমতি পাওয়া যাবে কি না। ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে কথোপকথনের ভিত্তিতে রচিত মিঃ আব্বাসের লেখা বই And One did Not Come Back প্রকাশিত হয়ে বহু সংখ্যায় বিক্রি হতে লাগলো দেখে মিঃ শান্তারাম অনেকটা সাহস পেলেন।

তখন আব্বাস ও শাঠে দু'জনে মিলে ইংরেজীতে একটা সিনারিও-র খসড়া রচনা করেন। সেটা আমাকে '৪৪ সালে দেখানো হয়। আমি দেখে খুশি হই যে ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে দূরে সরে না গিয়ে গল্পটির নাটকীয়ত্ব বেশ বজায় আছে। উৎসাহ বেড়ে গেল, প্রস্তাব হোলো হিন্দি ও ইংরেজী দু'ভাষাতেই ছবিটি তৈরি করা হোক্, যাতে দেশে ও দেশের বাইরে এর প্রচারে বাধা না থাকে। এ সংবাদ চীন দেশে পৌছালে শ্রীমতী কোটনিস, মাদাম স্থন-ইয়াৎ-সেন ও চু-তে তাঁদের সানন্দ অভিনন্দন জানান।

কোটনিসের বাল্যজীবনের মালমশলার জন্য তাঁর আত্মীয়দের কাছে যাওয়া হয়। বৃদ্ধা মা ও ভাইয়েরা খানিকটা সহায়তা করেন। মৃত পুত্রের এই স্মৃতির আয়োজনে মা একটি সুন্দর চিঠিতে তাঁর অনুমোদন লিখে পাঠান। তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের কাজ এগিয়ে যেতে লাগল। পথে বাধাও ছিল বিস্তর। সরকারী সেন্সরের অনুমতি ইত্যাদি পেতে মিঃ শান্তারামকে অনেক ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর দেশপ্রেমিক উৎসাহ তাতে দমে যায়নি। স্থির হোলো তিনি নিজেই ডাঃ কোটনিসের ভূমিকা অভিনয় করবেন, আর তাঁর সহধর্মিণী সুবিদিতা ফিল্ম-তারকা জয়শ্রী নেবেন শ্রীমতী কোটনিসের ভূমিকা। এ সংবাদে ভারতের ফিল্ম-জগতের সর্বত্র সাড়া পড়ে গিয়েছিল ও অনেক স্থান থেকে অভিনন্দনজ্ঞাপক চিঠি পাওয়া গিয়েছিল। খুঁটিনাটি তদারকের ভার স্বভাবত-ই আমার হাতে এসে পড়ে। কিন্তু আমি তখন পিপলস রিলিফ কমিটি ও বেঙ্গল মেডিক্যাল রিলিফ কোঅর্ডিনেশন কমিটির কাজে বাংলা দেশে আটকে পড়েছি। মিঃ শান্তারাম নিজেদের অনেক অসুবিধা করেও আমার জন্যে যথাসম্ভব সময়ের ও যাতায়াতের সুবিধার ব্যবস্থা করেছিলেন।

'৪৫ সালের জানুয়ারী মাসে শুটিং শুরু হয়। তত্ত্বাবধানের জন্য একজন ইংরেজ ও একজন চীনা মহিলা পাওয়া যায়। দেখা গেল, এই নতুন ধরনের বিষয়বস্তুতে দেশপ্রেমের উদ্দীপনা থাকায় অভিনেতা ও কর্মচারীদের ভিতর প্রচুর উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে। এই সূত্রে তাঁরা আমার কাছে আগ্রহের সঙ্গে কংগ্রেস মেডিক্যাল মিশনের সমুদয় বৃত্তান্ত শুনতে চাইতেন।

আমি থাকার সময়েই ডাঃ অটল কারামুক্ত হয়ে শুটিং দেখতে এলেন। তখন তোলা

হচ্ছিল, চুং কিং-এ জাপানী এয়ার রেড ও তথাকার বেসামরিক অধিবাসীগণকে সহায়তা করার দৃশ্য। তিনি দেখে অবাক্ হয়ে গেলেন কি রকম নিখুঁতভাবে পাঁচজন ভারতীয় ডাক্তারকে অনুকরণ করা হয়েছে, তাঁদের আকৃতি, আয়তন, এমন কি মুখের হাবভাব পর্যন্ত।

ভারতবর্ষে বসে উত্তর চীনের পটভূমি; তার জমি, পাহাড়, গুহা, 'থাং', কৃষকের কুটীর ইত্যাদি ফুটিয়ে তোলা সহজ ব্যাপার নয়। আমার পরিদর্শনের এখানেই ছিল বিশেষ দায়িত্ব। আর আমাকে অধিকার দেওয়া হয়েছিল যতক্ষণ না কোনো কিছু প্রামাণিক হয়ে ওঠে ততক্ষণ তাকে নাকচ করার। ক্রমে আমার চারিপাশে এমন একটি পরিবেশ গড়ে উঠত যাতে আমার চীনবাসের স্মৃতি জাগ্রত হয়ে যেন আমাকে আবার সেই দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেত।

নতুন সংকটের উদ্ভব হোলো চীনা সরকারের ব্যবহারে। আমাদের এ-প্রচেষ্টায় তাঁদের বিশেষ সহানুভূতি ছিল না। তাঁদের ভয় এতে কুয়োমিনটাঙকে খাটো ক'রে কমিউনিস্টদের বড়ো ক'রে দেখানো হবে। মিঃ শান্তারাম চীনা কনসালের সঙ্গে দেখা ক'রে অনেক বোঝালেন যে, কোনো রকম রাজনৈতিক প্রচারের অভিসন্ধি তাঁর নেই। তা সত্ত্বেও তাঁদের সহযোগিতা পাওয়া গেল না।

সকলেই জানেন নাটকে যাকে বলে 'মব-সীন' তার জন্যে বহুলোকের প্রয়োজন হয়। বম্বেপ্রদেশে প্রবাসী যত চীনা আছেন—আগে তাঁরা সানন্দে স্বীকৃত হয়েছিলেন এই সব দৃশ্যে আমাদের সহায়তা করতে। চীনা কনসালের মনোভাবে তাঁদের উদ্যম হ্রাস পেল। যে চীনা মহিলার ওপর ভার ছিল গৃহস্থালীর সাজসজ্জার ইনটিরিয়র ডেকরেশান-এর তিনিও প্রথমে ঢিলে দিয়ে পরে সরে গেলেন। কিন্তু তাতেও আমাদের কাজ আটকে রইল না।

এক হাজার নেপালী নরনারী যোগাড় ক'রে তাদের সাজিয়ে গুজিয়ে বাহিরের জনতার দৃশ্যের জন্য তৈরি করা হোলো। জাপানী সৈন্য ও সেনাপতিদের ভূমিকাতেও নেপালী অভিনেতা পাওয়া গেল। একটি দৃশ্য আছে যাতে ডাঃ কোটনিস জাপানীদের হাতে বন্দী হন ও পরে তাদের চোখ এড়িয়ে পালিয়ে আসেন। এ সব দৃশ্যেও সত্যের মর্যাদা রক্ষা করা হয়েছে।

বেশির ভাগ দৃশ্য তোলা হয়েছে বিজাপুরে শিবাজীর স্মৃতিমণ্ডিত পানহালা দুর্গের কাছাকাছি। এখানকার ভূমির সংস্থান অনেকটা উত্তর চীনের মতো। এর দুর্গপ্রাকার চীনদেশের বিখ্যাত প্রাচীর শ্রেণীর অনুরূপ। এখানে যখন এম্বুলেন্স কার, ট্রাক ইত্যাদি চলাফেরা করত, আমার তখন ভুল হয়ে যেত আমি ঠিক কোন দেশে আছি।

এই চিত্রে চীনা সংগীতও স্থান পেয়েছে, চীনা জাতীয় সংগীত, চীনা গেরিলাদের গান ইত্যাদি। ইংরেজী ও হিন্দি কথা চীনা সুরে বসানো হয়েছে।

প্রথমে কাজে লাগার সময় আমার মনে গভীর সন্দেহ ছিল এ ধরনের চিত্র আমাদের প্রস্তুত করা সম্ভব হবে কি না। সম্ভব হলেও তার মর্যাদা হয়ত উচ্চস্তরের হবে না। এখন আমার বিশ্বাস হয়েছে চীন সম্বন্ধে বিদেশে প্রস্তুত যে সব চিত্র সারা জগৎ জুড়ে দেখানো হয় এ-ছবি তাদের সঙ্গে তুলনীয় হবে। গুড আর্থ-এর কথা স্বতন্ত্র, কেননা এমন ছবি-চিত্র জগতেই খুব কম হয়েছে। কিন্তু "ড্রাগন-সীড" আমাকে তুষ্ট করতে পারেনি। যাঁরা

চীনদেশকে প্রত্যক্ষভাবে জানেন তাঁদেরকেও তুষ্ট করতে পারবে না। কারণ এতে সত্যের যথাযথতা নেই। আমি এটুকু বলতে পারি এ অভিযোগ "ডাঃ কোটনিস"-এর বিরুদ্ধে খাটবে না। এতে আনন্দ উপভোগের অংশ যেমন আছে শিক্ষার অংশ তার চেয়ে কম নয়। এবং সে শিক্ষা ইতিহাস ভূগোল ও সমাজতত্ত্বের বিরোধী নয়।

য়েনান থেকে চু-তে আমাকে জানিয়েছেন যে সেখানে কোটনিসের নামে একটি স্থায়ী হাসপাতাল খোলার ব্যবস্থা হচ্ছে। এ-সংবাদে প্রত্যেক ভারতবাসীর কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত। সেই সঙ্গে উচিত এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কাজে এখান থেকে অর্থ সাহায্য করা। সম্ভব হলে এদেশেও কোটনিসের নামে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাও করা উচিত। জাপানী অভিযানে চীনদেশের দুর্দশার অবসানও এখনও ঘটেনি। সুতরাং দ্বিতীয় মেডিক্যাল মিশন চীনদেশে পাঠানোর প্রয়োজন আজও আছে। ভারত ও চীনের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় করা আজ আমাদের অগ্রগণ্য কর্তব্যের অন্যতম। এই সমস্ত কর্তব্যের কথা ভেবে মৃত বন্ধুর স্মৃতির অনুপ্রেরণায় আমি এই অনভ্যস্ত কাজে নামি। আমি অকুণ্ঠে জানাচ্ছি এই কর্মসূত্রে মিঃ শান্তারামকে বন্ধুভাবে পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। তাঁর চারিত্রিক বিশেষত্ব, তাঁর প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছে। মাঝে মাঝে মনে হোতো তিনি নিজেই যেন ডাঃ কোটনিসের আত্মার স্পর্শে অনুপ্রেরিত হয়েছেন। বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করেছি কাজের মধ্যে বিশ্রামের অবসরে খাওয়াদাওয়ার সময় অধস্তনদের সঙ্গে তাঁর অমায়িক ব্যবহার, তাতে উচ্চ নীচ ভেদাভেদের লেশমাত্রও থাকত না। তিনি তাঁর সমগ্র দেশপ্রেম ও পূর্ণ উদ্যম নিয়ে ডাঃ কোটনিসের স্মৃতি রক্ষার প্রচেষ্টায় নিজেকে নিযুক্ত করেছেন। এই চিত্র শীঘ্রই মুক্তিলাভ ক'রে ভারতের সর্বত্র দেখানো হবে। আমার একান্ত অনুরোধ যেন ভারত-বর্ষের সমস্ত চিত্রানুরাগী দর্শক তাঁদের সহযোগিতা দিয়ে মিঃ শান্তারামের মহৎ উদ্দেশ্যের সাফল্য সুনিশ্চিত ক'রে তোলেন।

বিজয়কুমার বসু

কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে

ভোর পাঁচটায় বোধ হয় ব্যাঙ্গালোরে গাড়ী পৌছলো। মাদ্রাজ থেকে ব্রজেন্দ্রনাথকে টেলিগ্রাম করা হয়েছিলো। বৃদ্ধ মহা খুশি হয়ে কবিকে নিতে স্টেশনে এসেছেন, সঙ্গে আমার স্বামীও। অধ্যাপক তো অবাক। ব্যাঙ্গালোরে পৌছেই খবর পেলেন যে আমরাও পরদিন ভোরে পৌছাচ্ছি, অথচ রওনা হবার আগে কিছুই শুনে আসেননি।

ট্রেনে আসবার সময় কবি খুব হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "প্রশান্ত বেজায় জব্দ হবে। ভেবেছিলো ও একাই ব্যাঙ্গালোর বেড়িয়ে যাবে, আর আমরা এই গরমে মাদ্রাজে পড়ে থাকবো। কেমন সকালে বোললো যে, আচ্ছা আপনারা থাকুন, আমি দৌড়ে একবার ডক্টর শীলকে দেখে আসি।—কেনরে বাপু, আমিই বা কী অপরাধ করলুম? তাঁকে তো আমিও

একবার দেখে যেতে পারি। বেশ মজা হয়েছে, কি বলো?" কবির সেই ছেলেমানুষের মতো ফুর্তি—আজও স্পষ্ট সে চেহারা দেখ্‌তে পাচ্ছি।

মনে পড়ছে এরকম ঘটনা আরো একদিন ঘটেছিলো। ১৯২৬ সালে নভেম্বর মাসে তখন আমরা হাঙ্গেরীতে। বুডাপেষ্ট থেকে একশ মাইল দূরে ব্যালাটন হ্রদের ধারে একটা স্বাস্থ্যনিবাসে কবি তখন বিশ্রাম করছেন। ব্যালাটনফ্যুরেডের এই স্যানিটেরিয়াম কার্বনিক য়্যাসিড বাথের জন্য বিখ্যাত।

বুডাপেষ্টে কবি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন খবর পেয়ে এই স্যানিটেরিয়াম এর কর্তৃপক্ষ কবিকে নিমন্ত্রণ ক'রে এখানে বিশ্রামের জন্য নিয়ে আসেন।

জায়গাটা যেমন নির্জন তেমনি সুন্দর। স্যানিটেরিয়ামের বাড়িটার চারিদিকে অজস্র ম্যাগনোলিয়া ফুলের বড় বড় গাছে ফুল ফুটে রয়েছে। আমি অতগুলো ম্যাগনোলিয়া গাছ একসঙ্গে আগে আর কখনও দেখিনি। ছোট্ট গ্রামখানি, চারিদিকে শস্যক্ষেতে ফসল পেকে সোনার মতো রং ধরেছে, তার মাঝে মাঝে চাষাদের ছোটো ছোটো কুঁড়ে ঘর। সারাদিন নানারকমের পাখীর ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। তখন হেমন্তকাল চতুর্দিকের গাছপালায় যেন আগুন ধরেছে এমনি লাল আর সোনার রং—ঠিক ঝরে পড়বার আগে পাতাগুলোর যেন শেষ চেষ্টা মানুষের মন ভোলাবার। য়ুরোপের এই হেমন্ত-কালের চেহারা আমার কাছে অনির্বচনীয় সুন্দর মনে হয়েছিলো। স্বাস্থ্যনিবাসের যোগ্য পরিবেশ বটে এই ব্যালাটনফ্যুরেড গ্রাম।

ব্যালাটনফ্যুরেড্ থেকে ষাট সত্তর মাইল দূরে বহুদিনের পুরোনো একটা monastery আছে, যেটা অনেক লোক দেখতে যায়। একদিন সকালে কবি বসে লিখছেন এমন সময় মঠের যিনি বড় পাদ্রী তিনি এলেন কবির সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর ইচ্ছে কবিকে একবার তাঁদের মঠে নিয়ে যান।

কোথাও যেতে হবে শুন্‌লেই কবির মন তখন বেঁকে বোস্‌তো, বোধ হয় শরীর ক্লান্ত বলে। বল্‌তেন, "আর পারিনে বাপু, তোমরা ঘুরে এসো।" সেদিনও তাই হোলো। কিছুতেই এতটা পথ যেতে রাজি হলেন না। কি একটা লেখা তখন লিখছিলেন সেটাও তার একটা কারণ।

অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে সেই Father-এর কাছ থেকে ছুটি নিলেন। কিন্তু আমাদের দু'জনকে একরকম জোর করেই পাঠিয়ে দিলেন নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে আস্‌তে।

ফসল ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে চমৎকার রাস্তা চলে গেছে—মোটরে যেতে যেতে চারিদিক যেন ছবির মতো লাগছিলো। এক জায়গায় মনে আছে অনেকক্ষণ ধরে খুব সোজা একটা রাস্তা পার হতে হয়, তার দু'ধারে লম্বা লম্বা পপ্‌লার গাছের সারি, যতোদূর চোখ যায় পথটার যেন শেষ নেই, সাদা সরু ফিতের মতো মাটিতে পড়ে রয়েছে আর তার দু'পাশে এই পপ্‌লার গাছের বীথি। দেখতে এত সুন্দর লেগেছিলো যে আজও ছবিটা মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

প্রায় ঘণ্টাদেড়েক পরে গিয়ে পৌঁছলাম সেই মঠে। চারিদিকে যা কিছু দেখবার সকলকেই খুব যত্ন করে দেখালেন। সেই বৃদ্ধ পাদ্রী আমাদের হ্রদের ধারে (ব্যালাটন হ্রদেরই আর এক প্রান্তে এই মঠ) বেড়াতে নিয়ে গেলেন, ছবি তুল্‌লেন। তারপর অনেকক্ষণ এদিক

ওদিক ঘুরে আমারা যখন দুপুরে মঠে ফিরে এসে খেতে বসেছি আর ভাবছি কবি এতক্ষণে একা একা বসে খাচ্ছেন" এমন সময় মঠের একজন তরুণ সন্ন্যাসী খুব উত্তেজিত হয়ে এসে বৃদ্ধকে খবর দিলেন যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত। ঘরশুদ্ধ সবাই মুহূর্ত্তের মধ্যে খাওয়া ছেড়ে উঠে গিয়ে কবিকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন। সকলেরই আনন্দ আর ধরেনা। খেতে বসে কবি হেসে আমাকে বল্‌লেন, "ভেবেছিলে একাই বেড়িয়ে যাবে আর আমার কাছে গিয়ে নানা রকম গল্প করবে, না? আমিই বা কেন বাদ যাবো? স্যানাটেরিয়ামের ডাক্তার যখন বল্‌লেন এই পথটা এবং এই মঠ দু'টিই দেখবার যোগ্য তখন দুঃখ হতে লাগলো তোমাদের সঙ্গে আসিনি বলে। ডাক্তার বল্‌লেন আমি যদি রাজি থাকি তাহলে তিনি তাঁর নিজের মোটরে করে এখনি আমাকে নিয়ে আসতে পারেন যাতে খাওয়ার আগেই পৌঁছে যাবো, তাই চলে এলুম। আসল কথা তোমার কাছে কিছুতেই হার মান্‌বো না।"

ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেকদিন পরে কবির দেখা—দু'জনেই খুব খুশি পরস্পরকে কাছে পেয়ে।

প্রকাণ্ড বাড়ি ব্যালাক্রুই—আমাদের খুব আরামেই থাকবার ব্যবস্থা হোলো।

স্টেশন থেকে বাড়ি পৌঁছে চা খেয়ে যখন সবাই স্থির হয়ে বসেছেন তখন ভয়ে ভয়ে কবিকে খবর দিলাম যে, "কাপড়ের বাক্সটা আসেনি।" "আর লেখবার বাক্স?"

"সেটা ঠিকই আছে।"

"আচ্ছা তাহলে আপাতত অমিট্‌ রায়কে নিয়ে পড়া যাক্‌। আর ইতিমধ্যে আরিয়ামকে টেলিগ্রাম ক'রে দাও আজই জিনিসটা নিয়ে চলে আসুক।" একটু হেসে বল্‌লেন, "আসলে আরিয়ামেরও এখানে আস্‌তে ইচ্ছে ছিলো তাই বাক্সটা দিতে ভুলে গেছে। আমার কথা বিশ্বাস না হয় বৈজ্ঞানিককে জিজ্ঞাসা করো সাইকোয়্যানালিস্টরা কি বলে।"

মনে ভয় ছিলো কতো না জানি বিরক্ত হবেন খুঁৎ খুঁৎ করবেন। এত সহজেই শেষ হয়ে গেলো—আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

লেখ্‌বার বাক্স এসেছে—খুশি মনে গিয়ে টেবিলে গিয়ে বস্‌লেন। স্নানের সময় পেরিয়ে যায়, তবু লিখ্‌ছেন। গরম জল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে খবর দেওয়াতে বল্‌লেন, "কাপড়ই নেই যখন তখন স্নান করে কী হবে?" মুখ ধোবার বাক্সে স্নানের মতো কাপড় এনেছি শুনে মহা খুশি হয়ে টেবিল চাপড়ে বল্‌লেন, "এই তো গিন্নিপনা। মেয়ে মানুষ না হলে কি এত বুদ্ধি হয়? সংসার করবার সময় যে অনেক ভেবে চিন্তে হঠাৎ দরকারের জন্যে অনেক জিনিস হাতে রেখে দিতে হয়—তাই তো আজ স্নানটা হবে। এ কি আমার সায়েন্টিস্ট বা আরিয়ামের মতো পুরুষ মানুষের কর্ম? সাধে আর তোমাকে সঙ্গে এনেছি? তোমার বুদ্ধির উপর আমার বেজায় ভরসা। (কথাটা এমন মজা ক'রে বল্‌লেন, না হেসে পারলাম না।) যদি স্নানই করতে পারবো তবে তো কোনো ভাবনাই নেই।"

কবির বরাবরই যেটা হয়ে গিয়েছে সেটাকে মেনে নেওয়া স্বভাব। কোনো কিছু নিয়ে ক্রমাগত খুঁৎ খুঁৎ করতে দেখিনি; তাই যখন শুন্‌লেন কাপড়ের বাক্স মাদ্রাজে পড়ে আছে, সেটা অত্যন্ত অসুবিধার ব্যাপার হলেও মনে মনে অবস্থাটা তৎক্ষণাৎ মেনে নিয়ে সহজেই লেখার মধ্যে ডুব দিলেন। তখনই স্থির ক'রে নিয়েছিলেন যে আরিয়াম পরদিন বাক্স

২

নিয়ে না আসা পর্য্যন্ত স্নানও করবেন না, কাপড় তো নেই, কাজেই ছাড়বেনই বা কেমন করে? কাজেই স্নান করতে পারা যাবে এটা ওঁর কাছে অপ্রত্যাশিত সুখবর।

ব্যাঙ্গালোরেও "যোগাযোগ" এবং "শেষের কবিতা" দুখানা বইই পাশাপাশি লেখা চল্‌লো। একটু একটু ক'রে লেখা যেমন এগোতো আমাদের পড়ে শোনাতেন। ভারি আশ্চর্য্য লাগতো যে দুটো লেখার ভাষা ও ধরন সম্পূর্ণ আলাদা হলেও কবির একই সঙ্গে দুখানা বই লিখ্‌তে কিছুই অসুবিধা হতো না। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, "কি ক'রে এই লেখা আপনি এক সঙ্গে লিখছেন? দুটো গল্প যে একেবারে আলাদা ধরনের, ভাষাও আলাদা, কাজেই আপনার অসুবিধা হয় না?"

"অসুবিধা হবে কেন? আমি যে সারাদিন ওদের দেখতে পাই, কথাবার্ত্তা বলি ওদের সঙ্গে। কাজেই লিখতে বাধে না। কুমুর সঙ্গে যখন কথা বলি তখন বিপ্রদাস, মধুসূদন সকলে ভিড় ক'রে এসে দাঁড়ায়। প্রত্যেকেরই মুখের কথা আপনিই আমার কথাতে এসে যায়। আবার অমিট্ রায়দের নিয়ে যখন পড়ি তখন সিসি, লিসি, কেটি, ওদের ফ্যাসানেবল সমাজ, সমস্ত য়্যাট্‌মস্‌ফিয়ারটা মাথার মধ্যে জ্বমে উঠে। এর মধ্যে লাবণ্য, লাবণ্যর মাসী একেবারে অন্য জাতের মানুষ। লাবণ্যর সঙ্গে যেন আমার চেনা শোনা আছে, খুব যেন তাকে দেখেছি।" এত ভালো লাগতো কবির মুখে এই রকম ওঁর লেখার কথা শুনতে। যখন চুপ ক'রে বসে থাকতেন, মুখ দেখে বুঝতে পারতাম এদের নিয়ে মনটা ভরে রয়েছে।

ব্রজেন্দ্রনাথ একদিন বল্‌লেন, "আপনি যে নতুন গল্প লিখছেন প্রশান্তর কাছে শুন্‌ছিলাম। আমাকে কিন্তু পড়ে শোনাতে হবে। কবি বল্‌লেন, একেবারে শেষ করে নিয়ে তারপর শোনবো।

ব্যাঙ্গালোরের স্বাস্থ্যকর ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে কবির শরীর তাড়াতাড়ি অপেক্ষাকৃত তাজা হয়ে উঠলো। আরো সুবিধা যে বাড়িতে আমরা ছাড়া আর অন্য কোনো লোক নেই। বাইরের সামাজিকতার দাবী মনের উপর একটুও চেপে বসেনি, কাজেই লেখা নিয়ে কবির আনন্দে দিন কেটে যেতে লাগলো।

ব্রজেন্দ্রনাথ একা মানুষ, তার উপরে গৃহস্থালি বিষয়ে একেবারে আনাড়ি বল্‌লেই হয়। আমি যাবার দুদিন পরে আমাকে ডেকে বল্‌লেন, "রানী, কবি কি খান্ বা না খান্, কোন্‌টা কখন্ দরকার না দরকার আমি কিছুই বুঝিনে। আমার চাকর-বাকররাও অত্যন্ত দুষ্টু—আমার কোনো কথা শোনে না, কাজেই তোমরা যতোদিন আছো তোমার হাতে আমি ভাঁড়ারের চাবী খরচের টাকা সব কিছু দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই, কারণ আমার ইচ্ছে কবি যতোদিন আমার কাছে আছেন কোনো সময় কোনো কারণেই যেন ওঁর কিছু অসুবিধা না হয়।

যখন যা দরকার তুমি নিঃসঙ্কোচে নিজে হুকুম করে চাকরদের দিয়ে করিয়ে নিও—বাস তাহলেই হোলো।" খবর নিয়ে জান্‌লাম ডক্টর শীলের বাবুর্চি দুদিন ধরে আমাদের জন্যে ত্রিশ টাকা করে দিনে শুধু বাজার খরচ নিচ্ছে, তা ছাড়া চাল ডাল তো সব ঘরেই আছে। এ সত্ত্বেও রোজ টেবিলে খাবার সময়ে অত্যন্ত মোটামুটি রকমের ভোজ্য পদার্থ উপস্থিত হচ্ছে পরিমানেও খুব বেশি নয়। বৃদ্ধ অসহায়ভাবে দু'দিন তাই দেখে তারপর আমার শরণ নিতে

বাধ্য হয়েছেন। পাঁচজন মানুষের জন্যে ১৯২৮ সালে ত্রিশ টাকা ক'রে রোজ বাজার খরচ; শুনেই তো আমার চক্ষুস্থির। গৃহস্থালির ভার হাতে নিয়ে যখন ঐ সব চাকরদের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটলো তখনই বৃদ্ধের ব্যাকুলতার অর্থ বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমার কাছে তাদের বিশেষ সুবিধা হবে না বুঝে একটু সাম্‌লে যেতে বাধ্য হোলো—ত্রিশ টাকা থেকে ছ'টাকায় খরচ নাম্‌লো। প্রতিদিন মোটর নিয়ে বেরোলেই একবার বাজার ঘুরে আসতাম, দেখাও হোতো কাজও হোতো। ফিরে এলে কবি উৎসাহ করে জিজ্ঞাসা করতেন, "আজ কী নতুন জিনিস আবিষ্কার করলে? দইবড়া না আচারের দোকান?" আমি হয়তো সেদিন খুব ভালো 'মৈশোর পাক' (দক্ষিণের বিখ্যাত মিষ্টি) নিয়ে এসেছি—বললাম, "না, আজকের আবিষ্কার মিষ্টি।"

"উঃ! কী উৎসাহ খাবার জিনিস খুঁজে বের করতে, আর বিশেষ করে মিষ্টি—তা না হলে এ রকম পূর্ণচন্দ্রের মতো মুখ হবে কেমন করে? কেমন দিব্যি মোটাসোটা গোলগাল। সত্যি, এই উৎসাহ নিয়ে যদি স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্‌-এ মন দিতে তাহলে অধ্যাপক ঘরেই একটি য়্যাসিস্টেন্ট পেতো—কতো পরিশ্রম বেঁচে যেতো।" শুনে আমরা সকলে যখন হেসে অস্থির তখন হঠাৎ মাঝখানে বলে উঠলেন, "না, না, তোমাকে এ পথে উৎসাহ দেওয়া ঠিক নয়। ভাগ্যি তুমি সে চেষ্টা করোনি তাই তো তোমার বাড়ি গিয়ে থাকি, তা না হ'লে স্টাটিসটিক্‌স্ এর 'স্টিক্স' এর ভয়ে আর ওমুখোই হতে পারতুম না, বলে নিজেও আমাদের সঙ্গে হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। এ রকম হাসির খোরাক আমাদের সবারই বরাদ্দ ছিলো। একদিন বাজার থেকে এসে বল্‌লাম, "আজকে যা জিনিস আবিষ্কার করেছি আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।"

"শুনি কি রকম?"

"আটশ' (৮০০৲) টাকা দামের রেশমের শাড়ী; তার পাড় হচ্ছে, যে চেট্টি ফরমাস দিয়েছে তার নিজের নামটাই বার-বার করে লেখা, আর শাড়ীর জমিটাতে সারা গায়ে জরী দিয়ে প্রাইমাস্ ষ্টোভ তার উপরে সস্‌প্যান্ আঁকা। কোনো এক চেট্টি তাঁর স্ত্রীর জন্যে এই অপূর্ব্ব নক্সার কাপড় ফরমাস দিয়ে করিয়েছেন। অথচ এখানকার পুরোনো পুরোনো শাড়ীর যে কি চমৎকার নমুনা দেখলাম তা বল্‌তে পারি না। দুঃখের বিষয় সে রকম শাড়ী বাজারে তৈরী কিন্‌তে পাওয়া যাবে না, ফরমাস দিলে ক'রে দিতে পারে। এর কারণ জিজ্ঞাসা করাতে দোকানী বোল্‌লো এখানকার লোকেদের আর এসব পুরোনো নক্সা পছন্দ হচ্ছে না, তাই তারা ওরকম কাপড় তৈরী রাখে না। চেট্টির পছন্দ দেখেই বুঝলাম কথাটা ঠিক, নইলে আর নিজেদের দেশের এত চমৎকার বাঘ, সিংহ, হাতির নক্সা ছেড়ে প্রাইমাস স্টোভ দিয়ে শাড়ী বানায়। তার উপর আবার আটশ' টাকা দাম দিয়ে।

কবি শুনে এত দুঃখিত হলেন। বল্‌লেন এমনি করেই আমাদের দেশের সব শিল্পকলা নষ্ট হযে গেলো। দেশের ধনী যারা তাদেরই এটা রক্ষে করবার দায়িত্ব ছিলো কিন্তু আমাদের দেশের ধনী সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ লোকই সংস্কৃতি বর্জ্জিত। এমনি করেই ঢাকাই সাড়ী যা আমাদের গৌরবের জিনিস ছিলো তা মরতে বসেছে। তার জায়গা নিয়েছে খেলো ঝক্‌ঝকে সিফন্, জর্জ্জেট। এও সেই আধুনিক নুতনত্বের মোহে। তোমাদের দু'চারজন মেয়েরও অন্তত এর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করা উচিৎ। তোমরা

কি চোখের সামনে আমাদের এই রকম সব ভালো ভালো জিনিস লোপ পেয়ে যেতে দেবে ?”

আমি বল্লাম, “আমাব আর কতটুকুই বা সাধ্য বলুন না। তবু তো আমি যেখানে যাই প্রাণপণ চেষ্টা করি পুরোনো জিনিস খুঁজে বের করতে। অনেক সময় অনেক জিনিস সংগ্রহ করেছি শুধু নক্সার লোভেই, হয়তো এত পুরোনো এবং নষ্ট যে আমার কোনোই কাজে লাগেনি সে জিনিস।” কবি বললেন, “হ্যাঁ, বৌমাকেও দেখেছি, এ বিষয়ে তাঁর উৎসাহ আছে। দেখে আমি খুব খুশি হই। ওঁর তো উৎসাহ হওয়াই উচিৎ; কারণ অতবড় আর্টিস্টের ঘরে মানুষ হয়েছেন, তাছাড়া নিজেও যে আর্টিস্ট। তোমরা দু’চারজন মিলেও এরকম চেষ্টা না করলে কিছুদিন পরে আমাদের দেশে কতো যে সুন্দর জিনিস তৈরী হোতো তা লোকের মনেও থাকবে না। এই জন্যেই তো মহাত্মাজীর সঙ্গে আমার বনে না। শুধু যদি খদ্দর পরতে আরম্ভ করি তাহলে এই সব মাদ্রাজী রেশমী শাড়ী, আমাদের বাংলাদেশের ঢাকাই শাড়ী, এদের কি দশা হবে? শেষকালে তাঁতীরা এসব নক্সাই যে ভুলে যাবে।” কবি শুনে খুশি হলেন যে, আমি একটা শাড়ী ফরমাস দিয়ে এসেছি। বল্লেন, “আমার জন্যেও একটা তৈরী করতে বলে দাও, মীরুকে দেবো।”

ব্যাঙ্গালোরে কবির শরীরও ভালো মনও খুশিতে ছিলো তাই কুনুরের মতো পালাই পালাই করে অস্থির হননি। কলম্বো থাকৃতেও উনি লিখতেন, কিন্তু এত বেশি না। তখন শরীর আরো খারাপ এবং ভাপ্‌সা গরমে মনে ততো উৎসাহ ছিলো না। কলম্বোতে যোগাযোগটাই বেশি লেখা চল্‌তো, মাঝে মাঝে শেষের কবিতা।” ব্যাঙ্গালোরে ব্রজেন্দ্র-নাথ শেষের কবিতাটা শোন্‌বার দাবী করায় ওটার দিকেই বেশি মন গেলো। আমরা বোধ হয় দিন দশ বারো ছিলাম ওখানে—ঠিক মনে নেই। চলে আসবার দু’তিন দিন আগে কবি ব্রজেন্দ্রনাথকে বল্‌লেন, “প্রায় শেষ হোলো। কাল আপনাকে শোনাতে পারবো। রাত্রে খাবার পর সাড়ে এগারোটা বারোটা পর্য্যন্ত আরাম চৌকিতে বসে তারপরে শুতে যাওয়া কবির অভ্যাস। উনি শুতে গেলে সব ঠিক ক’রে দিয়ে ঘরের আলো নিবিয়ে পরে আমি শুতে যাই। সেদিন খেয়ে উঠে পড়বার ঘরের দিকে যেতে দেখে অবাক লাগলো, কারণ ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা বলে তখন রাত ঢের হয়ে গেছে। আমি আপত্তি করাতে বল্‌লেন, “বন্যার লেখাটা আর অল্প বাকি আছে। ওটা শেষ না করা পর্য্যন্ত সব মাথার মধ্যে ঘুর ঘুর করবে, ঘুমোতে পারবো না। তারচেয়ে ওটুকু লিখে ফেলেলেই একটু পরে বেশ আরাম করে ঘুমোনো যাবে। তুমি লক্ষীটি গোলমাল ক’রো না, শুয়ে পড়ো, আমি নিজেই আজ আলোটালো নিবিয়ে শোবো, কোনো হাঙ্গাম হবে না।” অগত্যা শুতে চলে গেলাম কিন্তু মনটা ঠিক স্বস্তি পেলো না। রাত একটায় ঘুম ভেঙে দেখি তখনও কবির ঘরে আলো জল্‌ছে। ভাবলাম এইবারে হয়তো শুতে এসেছেন। আবার একঘুম দিয়ে তিনটের সময় জেগে দেখি তখনও আলো জ্বালা। এবারে বিছানা থেকে উঠে পড়তেই হোলো। পা টিপে টিপে শোবার ঘরে গিয়ে দেখি যেমন বিছানা করে এসেছিলাম ঠিক তেম্‌নিই রয়েছে। মশারীর মধ্যে কোনো সময়ে কারো ঢোকা হয়নি তা বুঝতে বাকি রইলো না। শোবার ঘরের পাশেই পড়বার ঘর—খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে কবি তখনও টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে লিখছেন। খুব

আস্তে আস্তে চেয়ারের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম—টেরই পেলেন না, এত মগ্ন লেখার মধ্যে। আমি আরো একটু কাছে এগিয়ে ঝুঁকে দেখবার চেষ্টা করলাম কোন্ জায়গায় এসেছেন। তখন মঝে মাঝে নিজের মনে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে একটা কবিতার কয়েকটা লাইন পড়ছেন। একবার মনে হোলো এরকম লুকিয়ে শোনা ঠিক হচ্ছেনা ফিরে চলে যাই, কিন্তু লাইন কটা এত ভালো লাগলো যে দাঁড়িয়ে বাকিটা শোনবার লোভ সামলাতে পারলাম না। এসেছিলাম রাত জেগে লেখার জন্যে ওঁকে ভং‌র্সনা করতে কিন্তু পাছে আমার উপস্থিতিতে লেখার ব্যাঘাত হয় তাই প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। কয়েকলাইন ক'রে লিখছেন আর চেঁচিয়ে আবৃত্তি করছেন। মাঝে মাঝে পছন্দ হচ্ছেনা, আবার কাটাকাটি অদল বদলের পর নতুন ক'রে লিখে চেঁচিয়ে পড়ছেন। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুন্‌লাম :

"শুক্লপক্ষ হ'তে আনি রজনী গন্ধার বৃন্তখানি
যে পারে সাজাতে
অর্ঘ্য থালা কৃষ্ণপক্ষ রাতে,
যে আমারে দেখিবারে পায় অসীম ক্ষমায়
ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি
এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।
তোমারে যা দিয়েছিনু তার পেয়েছো নিঃশেষ অধিকার
হেথা মোর তিলে তিলে দান
করুণ মুহূর্ত্তগুলি গণ্ডুষ ভরিয়া করে পান
হৃদয় অঞ্জলি হ'তে মম।
ওগো, তুমি নিরুপম,
হে ঐশ্বর্য্যবান, তোমারে যা দিয়েছিনু
সে তোমারি দান,
গ্রহণ করেছো যতো ঋণী ততো করেছো আমায়
হে বন্ধু, বিদায়।।"

আর দাঁড়াতে সাহস হোলো না পাছে আনন্দ চেপে রাখতে না পেরে সামনে গিয়ে বলে ফেলি "কি চমৎকার।" ঘরে ফিরে এসে ঘড়িতে দেখি প্রায় চারটে বেজেছে—কবি তো অন্যদিন এর আগেই বিছানা থেকে উঠে পড়েন, কাজেই একটা রাত বিনা ঘুমেই কাটলো। সকালে চায়ের টেবিলে যেমন কথাবার্ত্তা বলেন তাই, কোনোরকম ক্লান্তি বা রাত জাগার চিহ্ন নেই চেহারায়। শুধু মুখ দেখলে বোঝা যায় যে, অন্যদিনের চেয়ে সেদিন মনটা একটু বেশি খুশি আছে। আমি যখন বল্‌লাম, "এরকম শরীর খারাপ নিয়ে কি সারারাত জাগা ভালো হোলো? হেসে বল্‌লেন, "তুমি কি ক'রে জানলে যে আমি রাত জেগেছি? কাল কি আমাকে স্পাই করছিলে নাকি?" হেসে উত্তর করলাম, "তা একটু করেছি বই কি। যদিও ইচ্ছে করে নয়। মনে মনে সত্যিই অস্বস্তি হচ্ছিলো অপনাকে না জানিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম বলে কিন্তু 'হে বন্ধু বিদায়'-টা শোনবার লোভ সামলাতে পারলাম না, তাই দাঁড়িয়ে শুনতেই হোলো।" "ঐ ত্যাখো, চুরি ক'রে আমার কবিতাটি পর্য্যন্ত শুনে নিয়েছো? আজকে পড়ে যে চম্‌কিয়ে দেবো তা আর হোলো না।" বল্‌লাম, "চমক্ আমার এখনও ভাঙেনি। সে যাই হোক,

আপনি কাজটা কিন্তু ভালো করেননি। আপনি অসুস্থ শরীর নিয়ে যদি এ রকম অনিয়মই করবেন তাহলে মিথ্যে আমাকে সঙ্গে রেখে আর লাভ কি? বল্লেন, "না, না, তোমরা কিছু বোঝো না। আমি তোমাকে বল্‌ছি এতে শরীর খারাপ হয় না। লেখাটা মাথার মধ্যে এত বেশি ঘুর ঘুর করছিলো যে শুলেও উঠে পড়তে হোতো। এ রকম অবস্থায় লিখতে না পারলেই শরীর বেশি খারাপ হয়। এখন কেমন মনটা নিশ্চিন্ত লাগছে তাই শরীরেও কোনো ক্লান্তি বোধ করছিনে।"

সন্ধ্যেবেলা ব্রজেন্দ্রনাথের কাছে লেখাটা চেঁচিয়ে পড়লেন। বৃদ্ধ তো আনন্দে অস্থির—বসে বসে শুন্‌ছেন আর লম্বা দাড়ির মধ্যে আঙুল চালাচ্ছেন; আর মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসিত হয়ে মাথা নেড়ে "বাঃ" "ব্রিলিয়েণ্ট" "চমৎকার" এই সব বল্‌ছেন। পড়ার শেষে অনেকক্ষণ সকলে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। একে শেষের কবিতার মতো বই, আর তাতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পড়া—এর তো আর তুলনা আছে কিনা জানিনে। ডক্টর্‌ শীল কেবলি বল্‌তে লাগলেন, "এখনও এই রকম লেখা বেরোচ্ছে? এই বয়সেও? এত অসুস্থ শরীর, তাতেও কিছু এসে যায় না? কী আশ্চর্য্য!" কবি স্মিত মুখে চুপ করে বসে রইলেন।

রানী মহলানবিশ

জন্মান্তর

১

মানুষের জীবনের এখানেই শেষ;
মানি না তাহার আছে কোন পরলোক,
ছেড়ে যাবো এ পৃথিবী—এই শুধু শোক;
হয়না জীবন কেন অনন্ত অশেষ,
এর বেশী আশা করা মূঢ় ভাবাবেশ;
পেরেছ কি কেহ কোন ফেলিতে আলোক
তার'পর বলি যারে নরক গোলোক?
কেন মানো নাহি যার প্রমাণের লেশ?

তোমারে যেটুকু পাই মেটে নাক' আশ,
আরো চাই আরো বেশী পেতে আমি চাই;
মিরাক্‌ল্‌ ঘটে না ত দু'দিন অন্তর:
তবুও হবো না আমি হবো না হতাশ,
বুদ্ধির সমস্ত যুক্তি পুড়ে হোক ছাই
তোমারে লভিতে যাচি জন্মজন্মান্তর।

২

র'বো প্রতীক্ষায় ধরি জন্মজন্মান্তর,
এ আশ্বাসে বলো হায় কোথায় সান্ত্বনা
অনুক্ষণ যার সঙ্গ লভিতে কামনা
অধীর করিয়া তোলে আমার অন্তর।
এ জীবনে পেতে চাই ক্ষণ-অবসর,
পরজন্ম লাগি মোর নহে আরাধনা ;
কি হবে করিয়া মিছে অলীক কল্পনা,
পথের এ পরিচয়ে নাহি "তার পর"।

অবসর লাগি আজো আছি অপেক্ষায়
জানি না লভিব কবে বাঞ্ছিত সে বর ;
জানি শুধু "জীবনের এখানেই শেষ" ;
তবু কতদিন যাবে এমনি বৃথায়।
সময় ফুরালে যবে ছাড়িব এ ঘর
তখন শুনিব কিগো আহ্বানের রেশ ?

অমলা দেবী

আমি—জিম রজার্স

[আমেরিকার প্রগতিশীল লেখক স্ট্যান্‌লী বার্ণস্‌'-এর লেখা "আমি—জিম রজার্স" কবিতার মর্ম্মানুবাদ]

আমি, জিম রজার্স।
তাকে আমি দেখেছি—
আমায় তোমরা বিশ্বাস করতে পারো।
মধুর মিথ্যায় ভরা সংবাদপত্রের চেয়ে
আমায় তোমরা বিশ্বাস করো,
নিজের চোখে তাকে আমি দেখেছি।
আমরা অসহায় নরনারীর দল
বসেছিলাম যখন আকুল আগ্রহে
বিশ্রামকক্ষে,
কখন আমাদের ডাক আসে এই আশায়—
তখন সে এল।

কিন্তু আমাদের সবার চেয়ে
বিবর্ণ তার মুখ—
উদাস দৃষ্টি তার চোখে,
আর ব্যাকুলভাবে একটি জিনিস
সে ধরে আছে তার বুকে চেপে।

মধ্যাহ্নে তাকে কে যেন বলল,
'আজ বেজায় ভীড়, ভারী ব্যস্ত
কাল একবার এসো।'

জিনিসটিকে বুকে চেপে ধ'রে
সে আস্তে গেল বেরিয়ে—
এই দিনে যখন সবাই
এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।
পরদিন সকাল বেলায়
আবার সে এল।
আমরা কি কেউ জানতাম
এই দুরন্ত শীতের দিনে
দু'বার তাকে তিন মাইল করে হাঁটতে হয়েছিল ?
জানি না সে কেমন করে হাঁটলো…
কিন্তু আমি বুঝতে পারি,
কিসের তীব্র প্রয়োজনে
তার কঙ্কালসার দেহ এসেছিল এগিয়ে।
সে জানতে চাইলো,
তার বুকের মাঝে ছিন্ন বসনে
যাকে গরম করে রেখেছে
সেই জিনিসটি কেন নীরব, নিথর ?
কাপড়ের আড়াল থেকে
সে খুলে দেখালো
এক বিবর্ণ, রুগ্ন শিশু।
যে লোকটি তাকিয়ে দেখছিলো—
আমার আঙ্গুলের মত শীর্ণ
শিশুর হাত দুটি দেখে
সে উঠলো চমকে।
ছোট্ট ঘোলাটে নীল চোখ দুটিতে
স্থির অপলক দৃষ্টি।

লোকটি উত্তর করে,
—"এতো প্রাণহীন,"
উদাস চোখে সে একবার তাকালো
তারপর ধপ্ ক'রে পড়লো মাটিতে।
কেউ তাকে তুলে ধরলো,
কেউ বা সংবাদপত্রের রিপোর্ট লিখলো।
—"এক আমেরিকান শিশু—উপবাসে মৃত্যু
ঠিকানা…?"
তারা জিজ্ঞাসা করে।
সে চেয়ে থাকে নির্ব্বাক,
আবার তাদের প্রশ্ন আসে—
বিশুষ্ক কণ্ঠে সে এবার জবাব দেয়,
"কী বলছ তোমরা ?
বাছার আমার প্রাণ নেই !
ওরে চোরের দল—
কাউকে দেব না আমি
আমার এমন তাজা ছেলেটিকে—
দাও, দাও তাকে আমায় ফিরিয়ে দাও।"

সেই সন্ধ্যায়
সে করলো নিরুদ্দেশ যাত্রা,
কে জানে কোথায়।
কিন্তু এই দিনে যখন সবাই
এক জায়গায় চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে,
আমি তাকে খুঁজছি।
অনেক কথাই আমি শুনেছি…
গত ছ'মাস
সে যে চার্লস স্ট্রীটে বাস করেছিল
সেখানে আমি তার খোঁজ ক'রেছি।
জানলাবিহীন এক বিশ্রী ঘরে
সে কোনমতে থাকত।
তার স্বামীর বাৎসরিক দান
ঐ ছোট্ট শিশুটিকে দেহের কোলে লুকিয়ে।
একদিন জারসি মিলের
সব মজুরকে যখন জবাব দিলো,
তার স্বামী গেল স্টীমার ঘাটে।

কারো কাছ থেকে ধার করলো এক সেণ্ট,
তাই সম্বল ক'রে স্বামী চড়লো স্টীমারে।
পাঁচ মিনিট পরে…
"লোকটা ডুবে গেল"
উঠল এক মহাকোলাহল।
আমি বেশ জানি
এতেও তাকে অধীর করেনি,
হয়ত বিশ বছরের যৌবনের গুণ।
কোনমতে আস্‌বাবপত্র গুছিয়ে
তৈরী হ'ল তার নূতন আবাস,
তাতে নূতন শিশুর হ'ল আবির্ভাব।
খেলনায়, মোজায় কাগজ মোড়বার
চাকরীও জুটলো একটা,
ফোর্টিন্থ্‌ স্ট্রীটের এক দোকানে।
এই দিনে যখন সবাই
এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে…

রোজ সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৮টা
একটা জাতির শিশু একটিকে গ'ড়ে তুলতে
মায়ের যোগ্য পরিশ্রমই বটে।
কিন্তু তার মুখে কোন নালিশ নেই।
অবশেষে তারাই করলো প্রতিবাদ—
"বড়ো দুর্ব্বল—ধীর, সময় নষ্ট করে,"
মালিক জবাব দিয়ে বলে,
"আরও হাল্‌কা কাজ পেলে
তোমার ভাল হবে।
দোকানের শুভেচ্ছা গ্রহণ করো,
নমস্কার।"

তারপর সে এলো চার্লস স্ট্রীটে।
ভিক্ষা করতে মন সায় দেয় না,
দেহে মনে লড়বারও জোর নেই।
যে নিষ্ঠুর সংসার
তার মাথায় পড়ছে ভেঙে,

তার মনকে করছে চূর্ণ—
করছে অবসাদগ্রস্ত
তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করারও সাহস নেই।
হয়ত এই শহরেরই কোন রাস্তায়
এই দিনে যখন সবাই এক জায়গায়
চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে,
সে দ্বিধাগ্রস্ত মনে হয়ত ভাবছে,
সাগরবুকে তার স্বামীর কাছে যাবে
না আবার বাঁচবে।
সে এখনো হাঁটছে,
যদি আমি জানতাম সে কোথায়,
আমি চীৎকার ক'রে তাকে বলতাম,

"কোথায়? কোথায় তুমি?
আমায় জবাব দাও।"

"এমন ক'রে পালিয়ো না;
আমার একটি কথা শোন।
কৃপণ কুকুরের দল তোমায় তাড়িয়েছে,
তাই কি তুমি পালাচ্ছ?
শোন—তুমি আজ একা নও।
কত লক্ষ অগণন তোমার সাথী—
যারা আজ এক জায়গায়
চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে,
তোমার কাহিনী শুনলে

সবাই এগিয়ে যাবে
তোমার সাথে এসে।"

আমার কথা তোমরা যারা শুনছ,
কোনো এক বিকেলবেলায়,
যদি তোমরা দেখ,
একটি নুয়ে পড়া শাদা কঙ্কাল হেঁটে চলেছে,

যাকে দেখলে মনে হবে,
এই দেহেও একদিন প্রবাহিত হ'ত
উষ্ণ নারীরক্ত—
যদি তাকে দেখতে পাও,
চোখে গভীর ব্যথার কালো রেখা আঁকা
চলেছে সে পথ বেয়ে,
তখন তাকে ব'লো—

আমি, জিম রজার্স,
যা কিছু আমার আছে
সামান্য খাদ্য, ছোট্ট গৃহ—
তাই তাকে আমি দিতে চাই।
হয়ত এ বেশী কিছু নয়—
তবু সামান্য বিশ্রাম,
তার দেহে কিছু মাংস।
আর সংসারের যে কুকুরের দল
তাকে বিধ্বস্ত করতে চায়,
তাদের কাছ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে
একটি সবল মুষ্টির পক্ষে
এই তার যথেষ্ট।

তাকে ব'লো, এই তাকে আমি দিতে চাই,
যতদিন না আমাদের শত লক্ষ নীরব ভাইবোন
যারা কারখানায়, জমিতে মাথার ঘাম ফেলছে পায়ে,
বিপ্লবের জন্যে যারা তৈরী হ'চ্ছে,
যতদিন না এই নৈরাশ্যজনক বিশ্বকে ভেঙে
আমরা নূতন জগত করবো সৃষ্টি,
সেইখানেই গড়বো তার
যোগ্য বাসস্থান।

পূর্ণেন্দু দস্তিদার

"বাবু সা'ব"

আমীরের ঘুম ভাঙ্গলো।

যমুনার পথে স্নানার্থিনীদের শোভাযাত্রা শুরু হয়েছে। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে গরুগুলো দাঁড়িয়ে পড়েছে রুটির লোভে। কোনো কোনো চায়ের দোকানে 'আংগেঠী'তে আঁচ পড়েছে। ছোকরা হকার ইয়াসীন জুম্মা মসজিদের সিঁড়িতে দৈনিক কাগজগুলো সাজাতে সাজাতে চিৎকার জুড়েছে—"গান্ধী-জিন্না মোলাকাৎ—তাজা খবর পড়িয়ে—আন্‌জাম্, অর্জ্জুন্, হিন্দুস্থান টাইমস্।"

আর আকাশে পড়েছে আলোর ছায়া—ফাটা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সিঁদুরে রঙ। জুম্মা মসজিদের সোনার চূড়াটা ইতিমধ্যেই সুপ্রভাত জানিয়েছে যমুনার পারে, বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সূর্য্যকে। লাল কেল্লার সিংহ দরজায় ইউনিয়ন জ্যাক হাওয়ায় পৎপৎ করছে, কাঁদছে গান্ধী-জিন্না মোলাকাতের আশু সম্ভাবনার কথা ভেবে; বড়লাটের বাড়ির কালো গম্বুজটা সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছে দূরে, পশ্চিমে, সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে।

আর কুষ্ঠরোগী ভিখারীটা প্যারেড গ্রাউণ্ডের সাম্‌নে মুখ ক'রে বসে একঘেঁয়ে গেঙ্গিয়ে চলেছে—"আল্লা-আল্লা—আল্লা-আল্লা—আল্লা-আল্লা।"

আমীর ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো মাথার শিয়রে টাইমপীস্‌টায় সাড়ে ছ'টা বেজেছে। বিরক্তিতে মনটা বিষিয়ে গেল তার। এখনি উঠতে হবে তাকে।

তার ওঠা উচিৎ ছিলো ছ'টায়। এলার্ম টা আর বাজে না, বিগড়ে গিয়েছে। অর্থাভাবে সারানো হয়ে ওঠে না। ঘুমের সঙ্গে লড়াই করার অন্য কোনো হাতিয়ার নেই। ইয়াসীনের চিৎকার, কুষ্ঠরোগীটার গোঙ্গানী কিংবা ট্রামের ঝন্‌ঝনানি শব্দ তার তন্দ্রালোকে সাড়া জাগায় না। আর ঘুমেরই বা দোষ কি?—আমীর নিজেকে প্রবোধ দেয়—কাল শুতে তার হ'য়েছিল পৌনে দু'টো।

দেরীই যখন হয়ে গিয়েছে তখন তাড়াতাড়ি ক'রে আর লাভ কি? আমীর পাশ ফিরে আবার চোখ বুজলো। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই দেখা গেল সে উঠে বসেছে। ঘুমের সঙ্গে লড়াইএ হারলেও আলস্যের কাছে এত সহজে সে মাথা নোয়াবে না। চামড়ার পোর্টফোলিওটা টেনে বার করলো শিয়র থেকে। বার করলো নোট বইটা। পাতা উল্টে চোখ বুলিয়ে গেলো আজকের এন্‌গেজমেণ্টগুলোর ওপর—

সাড়ে সাতটা—লোকো শপ—শপ্ কমিটির মিটিং;

৯টায় ক্যারেজ ও ওয়াগনে—ইব্রাহীম;

১০॥ টায় শান্টিং পোর্টার মদনলাল;

১২ টায় গ্যাং মেন, মিটিং মিঠাইপুল;

৪টায় লোকো ক্লিনার্স—লোকো ইয়ার্ড,

৫টা—৮টা ইউনিয়ন অফিস;

৯টা স্টাডি ক্লাশ—ভারতের ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন।

আমীর আর একবার ঘড়ির দিকে তাকালো। ১৫ মিনিটে যদি সে তৈরী হয়ে নিতে পারে ত নির্দ্ধারিত সময়ে লোকো-শপে পৌছতে পারবে। আর পাঁচ-দশ মিনিট দেরীই যদি হয়ে যায় ত নয় দু'টো কথা শুনবে। ফিটার আবদুল হাকিম পকেট থেকে তার নিকেলের ঘড়িটা বার ক'রে সামনে মেলে ধরে দেবে—'কি বাবু সা'ব, ঘুম ভাঙ্গতে দেরী হয়ে গিয়েছিল বুঝি? কার স্বপ্ন দেখছিলে?' চটে গেলে আবদুল হাকিম আর আমীরকে 'কমরেড' বলে সম্বোধন করে না—করে 'বাবু সা'ব' বলে।

যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি করেও আমীরের বার হতে হোলো সওয়া সাতটা। গালে হাত দিয়ে দেখলো তিন দিনের না কামানো দাড়ী বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কাল সে খানিকটা সময় পেয়েছিলো দুপুরের দিকে, স্বচ্ছন্দে কামিয়ে নিতে পারত। কিন্তু কুড়েমিকে প্রশ্রয় দিয়ে কামায়নি সে। সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে পোর্টফোলিওটা ঝুলিয়ে সে বার হোলো।

কিন্তু দু'ফার্লংও যেতে হোলো না, নামতে হোলো। সামনের চাকাটা ঘটাং-ঘটাং শব্দ শুরু করছে। হেঁটেই চললো। এ পথে সাইকেলের দোকান চোখে পড়ে না। আর থাকলেও কেই বা তার জন্যে এই সাতসকালে দোকান খুলে রেখেছে। সামনের টিউবটা একেবারে পচে গেছে, এরকমভাবে তালি দিয়েই বা আর ক'দিন চলবে। অথচ নূতন একটা কিনবার পয়সাই বা কোথায়?

একটা পানওয়ালার দোকানের ঘড়ি তার চোখে পড়লো—সাড়ে সাতটা বেজেছে। এখন হেঁটে লোকো-শপে পৌছতে আটটা বেজে যাবে, আটটায় ওদের শিফ্‌ট শুরু, অথচ সে নিরুপায়। আবদুল হাকিম আর তার সাথীরা কি মনে করবে। কালও সন্ধ্যায় ইউনিয়ন অফিস থেকে ওঠবার সময় মনে করিয়ে দিয়েছিলো, 'কমরেড, ঠিক সকাল সাড়ে সাতটা মনে থাকবে ত?' আমীর হেসে জবাব দিয়েছিল, 'আগের থেকে আমার উন্নতি হয় নি কি?' আবদুল হাকিম উত্তর না দিয়ে চলে গিয়েছিল; হয়ত সন্দেহ ছিল তার মনে। আবদুল হাকিমকে বিশ্বাস করাবার মত একটা মিথ্যে অজুহাত তাকে খাড়া করতেই হবে।

এই কিছুক্ষণ আগে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় যে বিরক্তিতে তার মন বিষিয়ে গিয়েছিল সেই বিরক্তি আবার দেখা দিল সময়ে ঘুম না ভাঙ্গার জন্যে। পৌনে দু'টায় শোয়ার কারণে আর সে প্রবোধ পেল না। সত্যিই কোনো অর্থ হয় না শেষ শো'তে নির্ম্মলার সাথে সিনেমা যাওয়া, তার সঙ্গে হাঁটা আর আবোল তাবোল বকার। নির্ম্মলাকে ভালোবাসা দূরের কথা—ভাল লাগাও মুস্কিল। অতি সাধারণ স্তরের মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, মেয়ে ছাড়া আর কোনো পরিচয়ই তার নেই। তবে কি সেইটেই একমাত্র আকর্ষণ!

"গান্ধী-জিন্না মোলাকাৎ—তাজা খবর পড়িয়ে"—একটা হকার সাইকেলে ক'রে চলে গেল। আমীর এসে ঢুকলো একটা চায়ের দোকানে, সাইকেলটা দেয়ালের গায়ে ঠেসান দিয়ে রেখে।

এ দোকানটা আবার কাগজ রাখে না। আমীর একবার ভাবলো উঠে যায়। কিন্তু ছোকরাটা সামনে এসে দাঁড়াতে আর ওঠা হোলো না। 'একটা বান আর একটা চা নিয়ে এসো' আমীর তাকে বললো। 'বান নেই, টোষ্ট নিয়ে আসবো?' ছোকরাটা জিজ্ঞেস করলো। 'না থাক শুধু চাই নিয়ে এসো'। টোষ্ট খাবার মত পয়সা তার পকেটে নেই।

ঘড়ি দেখলো সাতটা পঁয়ত্রিশ। আবদুল হাকিম এতক্ষণে তার কাজ শুরু ক'রে দিয়েছে। অনর্থক বসে থাকবার ছেলে সে নয়। শপ কমিটির সে-ই সেক্রেটারী। সবাইকে জড়ো ক'রে সে বোঝানো শুরু করেছে—'মজুরদের একতাই মজুরদের একমাত্র হাতিয়ার।' তার আগে সে আমীরের অনুপস্থিতির একটা যুক্তিযুক্ত কারণ নিশ্চয়ই দেখিয়েছে। আমীরের দোষ-গুলো সে এদের কাছে কখনো প্রকাশ পেতে দেয় না। সে আমীরের দোষ দুর্ব্বলতাগুলোকে নিজের দোষ দুর্ব্বলতা বলে মনে করে। তাই বলে সে আমীরকে ক্ষমা করে না। একলা পেলে তাকে কঠিন আঘাত করে। সময় সময় আমীরের মনে হয় সে বুঝি ভেঙে পড়বে। 'তুমি আমার চেয়ে বেশি জানো, তুমি আমার চেয়ে বেশি বোঝ, তুমি আমার চেয়ে ভালো ভাবে এদের বোঝাতে পারো—এই জন্যই তোমাকে আমরা আমাদের মধ্যে চাই। আমিও জানবার বোঝবার চেষ্টা করছি, আর কিছুদিন পরে তোমাকে হয়ত আমাদের দরকার হবে না।' আবদুল হাকিমের কথাগুলো তার কানে এখনো বাজে।

চা শেষ ক'রে আমীর উঠে পড়লো।

ন'টায় ইব্রাহীমের সঙ্গে দেখা করতে হবে। কিছুটা সময় আছে হাতে। দৈনিকে চোখ বুলিয়ে নেয়া দরকার। সাইকেলটা কোথাও ফেলে যেতে হবে। আমীরের মনে পড়লো ভৈদ্‌জীর দোকানটার কথা। ভৈদ্‌জী হিন্দুস্থান টাইম্‌স রাখে।

ভৈদ্‌জী তাঁর দোকানের সম্মুখে চার পাইএ চাদর মুড়ি দিয়ে বসে দাঁতন করছিলেন। আমীরকে দেখে বলে উঠলেন, আরে কমরেড যে, কি খবর! এত সকালেই বার হয়েছ! তোমরা দেশটাকে স্বাধীন না ক'রে আর ছাড়বে না দেখছি। সঙ্গে সঙ্গে দাঁত-বার-করা একগাল হাসি। অর্থহীন।

আমীর ভৈদ্‌জীর ব্যঙ্গে অভ্যস্ত। সাইকেলটা ঠেস্ দিয়ে রেখে সে চার পাইয়ের ওপর থেকে কাগজটা তুলে নিল।

'তোমদের গান্ধী-জিন্না মোলাকাৎ ফাঁসবে নাত হে?' ভৈদ্‌জী দাঁতনটা মুখ থেকে বার ক'রে হাতে নিলেন।

'না। না। ফাঁসবে কেন?' আমীর তাড়াতাড়ি হেড লাইনগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে চললো।

'তোমাদের স্ট্যালিন কমরেড়কে ত এবার আর কুইবেকে ডাকলো না। ইউরোপের ভাগ বঁটোয়ারা কি তাহলে চার্চ্চিল-রুজভেল্টই করবে নাকি?'

আমীর শুধু হাসলো। ভৈদ্‌জী তর্কের জন্যে তাল ঠুকছেন। আমীরের সময় নেই। কাগজটা সে নামিয়ে রাখলো। 'আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে, অন্য সময় এসে কথা কইবো। সাইকেলটা রইলো ভৈদ্‌জী' আমীর পালিয়ে যেন বাঁচলো।

ভৈদ্‌জীর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। তিনি নিষ্ঠাবান কংগ্রেসসেবী। দেশের জন্য ত্যাগও করেছেন যথেষ্ট। কিন্তু এখন পেছিয়ে পড়েছেন। দুঃখ এই, তিনি যে পেছিয়ে পড়েছেন সে কথা তিনি স্বীকার করতে নারাজ। ইতিপূর্ব্বে আমীর মধ্যে মধ্যে এসে তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করতো। এখন ক্বচিৎ আসে।

স্টেশনে এসে যখন আমীর পৌছল তখন প্রায় পৌনে ন'টা। বুকে **C & W** ব্যাজ লাগানো একটি মজুরকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলো 'ইব্রাহিম কোথায়?'

'ইব্রাহিম ন' নম্বরে'। মজুরটা চলে যাচ্ছিল আমীরকে চিনতে পেরে ফিরে দাঁড়ালো।

'সেলাম আলেকম্'।

'আলেকম্ সেলাম'। আমীর হাত বাড়িয়ে তার প্রসারিত হাতটা টেনে নিলো।

"আমাদের মাংঘাই-এর কি হোলো? বাড়বে কিছু?"

'তোমরা চেষ্টা করলেই বাড়বে।'

'চেষ্টা ত আমরা করছি। এই ত সেদিন গান্ধী গ্রাউণ্ডে মিটিং হোলো। কিন্তু কই কিছুই ত হোলো না।'

'কিন্তু ক'জন তোমরা গিয়েছিলে মিটিং-এ? দিল্লীতে তোমরা সংখ্যায় প্রায় আট হাজার। আর গান্ধী গ্রাউণ্ডে মিটিং-এ পাঁচশ'ও তোমরা জড়ো হতে পারলে না। বলো রেলওয়ে বোর্ড কি ক'রে বিশ্বাস করবে যে তোমরা সত্যিই মাংঘাই চাও। চাইলে রেলওয়ে বোর্ডের সাধ্যে কি যে 'না' ক'রে পারে।"

'কিন্তু আমি ত গিয়েছিলাম মিটিং এ।'

তুমি ত গিয়েছিলে। কিন্তু তোমার সাথীদের ক'জন গিয়েছিল? তুমি ত 'ইউনিয়নের মেম্বার, কিন্তু তোমার সাথীদের ক'জন ইউনিয়নের মেম্বার। তোমাদের মধ্যে একতা কই? এই একতা যত শীঘ্র আসবে তত শীঘ্র আমরা আমাদের দাবী মেটাতে পারবো। একতার কাছে রেলওয়ে বোর্ড ত কোন ছার, ভারত গভর্ণমেণ্টও ঝুঁকতে বাধ্য হবে।'

আমীর থামলো। মজুরটা চলে গেল।

মেল ইন্ করছে। আমীর দ্রুতপদে চললো এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে।

'নমস্তে বাবুজী'।

আমীর চেয়ে দেখলো ঝাড়ুদার বত্তন জোড়হাতে কুঁচকে আছে।

'কি খবর!' কাছে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখলো। বেচারা আরো সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে।

'আমার আরজীর কি হোলো বাবুজী? কোনো উত্তর ত এল না আজও?'

আমীর চিন্তিত মুখে রেলের ঘড়িটার দিকে তাকালো। ৯টা বাজে। বত্তনের কি আরজী লিখেছিল তা মনে পড়ছে না। অথচ একটা উত্তর কিছু দেওয়া চাই। একটু পরে বললো—

'আরজীর কপি আছে তোমার কাছে?'

বত্তন বার করলো তার পকেট থেকে একটা ময়লা ব্রাউন রং-এর সরকারী খাম। তার মধ্যে থেকে অতি সন্তর্পণে একটা টাইপ করা শাদা কাগজ। আমীর পড়ে দেখলো "বাকী মাহিনার" আরজী। বেচারা মাহিনার দিন পৌছতে পারেনি বলে মাহিনা বাকি পড়ে গিয়েছে। কিছু কাঠখড় না পোড়ালে তা পাবার উপায় নেই।

'তুমি সন্ধ্যার সময় এসো ইউনিয়ন অফিসে', আমীর বললো।

'আপনি থাকবেন ত?'

'হাঁ নিশ্চয়ই!'

আমীর এগুলো।

'আমীর।'

আমীর থমকে দাঁড়ালো। পরিচিত—অনেক দিনকার পরিচিত কণ্ঠ যেন। একটা সেকেণ্ড ক্লাশ কামরার সামনে একরাশ লগেজের মধ্য থেকে ডাক এসেছে। আমীর খুঁজতে লাগল—কার কণ্ঠ।

একরাশ লগেজের পাশে দাঁড়িয়ে শান্তা না?

আমীর কাছে এগিয়ে গেল।

"তুমি তাহ'লে আমার 'তার' পেয়েছিলে? এ কি চেহারা হ'য়েছে তোমার, মাগো! হাতে ওটা কি, জর্দ্দা বিক্রী শুরু করেছো নাকি আজকাল?"—বল্‌তে বল্‌তে খিল্ খিল্ ক'রে শান্তা হেসে উঠলো।

আমীর এক পলকে শান্তাকে দেখে নিলো। ভেলভেট স্যাণ্ডাল, সিল্কের সালওয়ার কামিজের ওপর মখমলের চুন্নী. ভ্যানিটি ব্যাগ, সোনার চেনওলা রিষ্ট ওয়াচ আর কয়েকগাছি চুড়ী, বব্-করা চুলে পার্ম ওয়েভ! এই সেই শান্তা!

"হাঁ ক'রে দেখছো কি? এই কুলী, চলো, ট্যাক্সী।"

কুলীরা মালপত্রগুলো মাথায় করে নিলে শান্তা আমীরের হাত ধরে এগুলো।

"তারপর মাসীমা কেমন আছেন? জানো, এখন আমি ভালো চাকরী করি। বদলি হ'য়ে এসেছি, এবার দিল্লীতেই থাকবো। আচ্ছা আমায় দেখে খুব অবাক হ'যে গিয়েছো, না? কতদিন পরে দেখা হোলো, প্রায় পাঁচ বছর, না?"

অনর্গল কথার স্রোত। আমীর ঘড়িটার দিকে তাকাতে গিয়ে চোখোচোখি হ'য়ে গেল ইব্রাহীমের সঙ্গে। ইব্রাহীম স্তূপীকৃত পার্শ্বেলগুলোর আড়ালে স'রে গেল।

"আমি একটু..." আমীর শান্তার হাতের মধ্যে থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না।

"ভয় নেই গো। তোমার ঘাড়ে আর চাপবো না। আমায় না হয় একটা হোটেলেই তুলো। ইয়র্কে'ই গিয়ে না হয় উঠবো। আচ্ছা ইয়র্ক তোমার মনে আছে? সেই চা খেতে যেতাম তোমার সঙ্গে! ওঃ সে কত দিন হয়ে গেল। আজ স্বপ্নের মত মনে পড়ে।"

মালপত্রগুলো ট্যাক্সীতে বোঝাই হোলো। ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে কুলীদের মজুরী আর বকশিস দিয়ে শান্তা ভেতরে উঠে বসলো। "এসো।"

সম্মোহিতের মত আমীর গিয়ে বসলো শান্তার পাশে।

ইব্রাহীম লুকিয়ে পড়লো কেন? সে হয় ত ভেবেছে অন্য কিছু। সাহস হয়নি এগিয়ে সামনে আসার। এলে ভালো করতো। শান্তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যেতো। শান্তা বুঝতো নিশ্চয়ই আমীরের কাজের গুরুত্বটা। ইলেক্‌ট্রিকের মজুরদের ইব্রাহীম কথা দিয়েছে আজ আমীরকে নিয়ে আসবে। সে কথার খেলাপ হবে। কি ভাববে কে জানে?

একটা জার্ক দিয়ে ট্যাক্সীটা স্টার্ট নিলো।

"চলো ইয়র্ক, কনট প্লেস্"—শান্তা ট্যাক্সী চালককে বললো।

গেটের সামনেই ট্যাক্সীর মুখে পড়লো একটা রেলের মজুর। সজোরে ব্রেক কসায় অল্পের জন্যে সে বেঁচে গেলো। গাড়ীটা দুলে উঠলো। শান্তা হেলে পড়লো আমীরের গায়ে। ট্যাক্সীচালক মুখ খিস্তি ক'রে মজুরটাকে গাল দিলো। মজুরটাও তেড়ে এলো হাত গুটিয়ে।

কিন্তু আমীরের চোখে চোখ পড়তেই সে চুপসে গেল। অপ্রস্তুতভাবে একটা সেলাম ক'রে সে স'রে পড়লো। আমীরের প্রতি-সেলাম করা হোলো না। তার হাতটা শান্তার হাতের মধ্যে আর শান্তা তখনো লেপ্টে রয়েছে তার গায়ে। ট্যাক্সী আবার ছাড়লো।

মজুরটা তাকে চেনে নিশ্চয়ই। সমস্ত ব্যাপারটা আমীরের কেমন যেন বিশ্রী মনে হোলো।

"কি ভাবছো আমীর?" শান্তা ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে স'রে বসেছে।

"কিছু না।" শুষ্কভাবে আমীর জবাব দিলো।

"তুমি আজকাল করো কি? চাকরীবাকরী যে করো না তা ত চেহারা দেখেই মালুম হচ্ছে। তবে করো কি? তোমার উস্কখুস্ক চুল, তোমার ময়লা ছেঁড়া খদ্দর আর না-কামানো দাড়ী দেখে মনে হচ্ছে তুমি একজন দেশসেবক বনে গেছো। নামও বদলেছো নাকি? আমীরচাঁদ আজাদ।"

শেষের কথাটায় আমীরের হাসি পেলো। "আচ্ছা ওসব বাজে কথা এখন থাক। আমি জানি তোমার মাথায় একটা না একটা আজগুবি খেয়াল সব সময়েই লেগে আছে। এখন বলো আমার তার পেয়ে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলে, না? মাসীমা কি বললেন?"

"মাসীমা এখানে নেই—তিনি অমৃতসরে চলে গেছেন।" আমীর জবাব দিলো।

"তবে বাড়ীতে কে আছে? তুমি বিয়ে করেছো নাকি?"

"বাড়ী ছেড়ে দিয়েছি অনেক দিন। বিয়ে এখনো করিনি।"

"তবে আমার 'তার' কি ক'রে পেলে?"

'তার' ত পাইনি।"

"তবে জানলে কি ক'রে আমি এই ট্রেনে আসছি?"

"জানতাম না, আমি এমনিই স্টেশনে এসেছিলাম একটা কাজে।"

বাঁমে লাল কেল্লা, ডাহিনে প্যারেড গ্রাউণ্ডের কোলে জুম্মা মসজিদ। ট্যাক্সী উড়ে চলেছে।

দেখা হলে পর ইব্রাহীমকে যা হয় একটা বুঝিয়ে বলতে হবে। শান্তাকে ইয়র্কে তুলে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারে তাকে ফিরতে হবে। শান্টিং পোর্টার মদনলালকে কথা দিয়েছে সাড়ে দশটার সময়ে দেখা করবে। বেচারা সস্পেণ্ড হয়ে আছে আজ তিন দিন হোলো। কিন্তু আমীর ফিরবে কি ক'রে? টাঙ্গায়! পয়সা নেই পকেটে। শান্তার কাছে চাওয়াও যায় না। হেঁটেই ফিরতে হবে।

"কত দিন বাড়ী ছেড়েছো?"

"হোলো অনেকদিন, তুমি চলে যাবার পরই।

"তা হলে আমার একটাও চিঠি পাওনি?"

"তোমার কোনো চিঠিই পাইনি। তুমি বেঁচে আছ যে সে কথাও জানতাম না।"

"এম, এ, টা পাশ করেছিলে?"

"না।"

"তা হলে এখন করছো কি?"

"দেশের কাজ।"

"চলে কি-ক'রে ?"

"চলে যায়।"

"বাড়ী থেকে টাকা আনাও বুঝি।"

"বাড়ী ত ছেড়ে দিয়েছি অনেকদিন।"

"আশ্চর্য্য! তোমার শেষে এই হোলো!"

"আমিও তোমার সম্বন্ধে ঠিক সেই কথাই ভাবছি।"

ট্যাক্সী এসে দাঁড়ালো ইয়র্কের নীচে।

হোটেলে কামরা পাওয়া গেল। কামরাটা ভালো সাজানো।

আমীর বললো, "আচ্ছা আমি এখন তা হলে আসি। আমার কাজ আছে।"

শান্তা আমীরের একটা হাত ধরে তাকে জোর ক'রে চেয়ারে বসালো।

"এইখানে চুপটি ক'রে বোসো। লক্ষ্মী ছেলেটির মত। আমি একটু হাতে মুখে জল দিয়ে এখুনি আসছি।"

বয়কে চা আনতে ব'লে সে পাশের কামরায় ঢুকলো।

আমীর তাকালো জানালার বাইরে। হুমায়ুন টুম্বের চূড়োটা আকাশে ভাসছে।

শান্তা!

এই শান্তাকে নিয়ে পাঁচ বছর আগে মনে মনে স্বপ্নরচনা করেছে সে।

"তুমি হবে ভারতের রোজা লুক্সেমবুর্গ। তুমি হবে লা পাসিয়োনারা। তুমি হবে আমার সত্যকারের সহধর্ম্মিনী, সহকর্ম্মিনী।"

এই ইয়র্কেরই নীচে চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে সে কতদিন কত কথা বলে গেছে শান্তাকে। শুধুই কি ইয়র্কে? কুতব মিনারের পাশে জঙ্গলে গাছের ছায়ায় বসে, যুধিষ্ঠির কেল্লার নরম ঘাসের ওপর পাশাপাশি শুয়ে। নয়ত কোনো মেঘলা দ্বিপ্রহরে কলেজ পালিয়ে যমুনার ধারে বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে।

আমীরের হাসি পেলো। কত ছেলেমানুষ ছিল সে তখন। শুধু আদর্শের ব্যাখ্যায়, শুধু কথায় শান্তা তুষ্ট রইলো না। একদিন তাকে ছেড়ে চলে গেল। আজ শান্তাকে দেখে সে অবাক হয়েছে নিশ্চয়ই। অবাক হয়েছে তার বেশভূষায়, তার আচরণে। এই হয়ত ছিল শান্তার আকাঙ্ক্ষা। আজ সে তাই সুখী।

আর সে নিজে! হ্যাঁ, তার যে সাধনা ছিল, তার যা স্বপ্ন ছিল তা সে পেয়েছে। তার ছেঁড়া ময়লা খদ্দরের পোশাক, তার রুক্ষ চুল আর দাড়ীতে। শান্তাও অবাক হয়েছে তাই।

কিন্তু আশ্চর্য্য, অজিত সিং-এর কথা শান্তা একবারও বললো না। অজিত সিং তার শান্তাকে তার আশ্রয় থেকে চিলের মত ছোঁ মেরে নিয়ে গিয়েছিল একদিন। ভালই করেছিল হয় ত। বেঁচেছে তাই আমীর,—স্বপ্ন তার ভেঙে গিয়েছে, মোহ মিলিয়ে গেছে।

স্বপ্ন! স্বপ্ন! স্বপ্ন ধূলায় মিলিয়ে গেছে। শান্তার মৃত্যু ঘটেছে অজিত সিং-এর মোটারের চাকার তলায়।

আমীর পোর্টফোলিও থেকে নোট বইটা বার ক'রে একবার চোখ বুলালো। না। এখান থেকে এখুনি উঠতে হবে। কোন মোহে এতদূর সে এসেছে। এখনো বসে আছে? শান্তা আর সে এখন সম্পূর্ণ বিভিন্ন জগতের লোক। তার আপনার জন,

তার আত্মীয় এখন আবদুল হাকিম, ইব্রাহিম আর মদনলালেরা। তাদের সঙ্গে রুটির টুকরো ভাগ ক'রে খেতে এখন তার ভাল লাগে। তারা প্রশ্ন করে না ছেঁড়া ময়লা খদ্দরের, উস্কখুস্ক চুলের, না-কামানো দাড়ীর।

নির্ম্মলা তবু ভালো—সে শান্তার মত মিথ্যার আবরণে নিজেকে ঢেকে রাখেনি।

পায়ের শব্দে আমীরের চমক ভাঙ্গলো। শান্তা এসে দাঁড়িয়েছে। সদ্য স্নাতা। শাড়ী পরেছে সে। হ্যাঁ, এই ফ্রেমেই শান্তাকে মানায়। মিথ্যা রোজা লুক্সেমবুর্গ, মিথ্যা লা পাসিয়োনারা।

"কি, আমায় গিলে খাবে নাকি?" শান্তা মুখ টিপে হাসলো।

বয় এসে চায়ের ট্রে-টা টেবিলের ওপর রেখে চলে গেল। যাবার আগে আড় চোখে দেখে গেল আমীরকে। আমীরকে চিনেছে সে। তাদের হোটেল কর্ম্মচারীদের এক সভায় আমীর বক্তৃতা দিয়েছিল কিছুদিন আগে।

"এসো, চেয়ারটা এগিয়ে নিয়ে বসো," শান্তা একটা চেয়ার টেনে বসে বললো, "আজ কতদিন পরে তোমায় নিজের হাতে চা তৈরী ক'রে খাওয়াবো।" সে চা তৈরীতে মন দিলো। একবার আমীর চমকে উঠ্ল—কেমন মোহ যেন জীইয়ে দিলে সে কণ্ঠস্বর। কিন্তু ভুল ভুল। কোথায় তার শান্তা! শান্তার মৃত্যু হয়েছে।

আমীর উঠে দাঁড়ালো।

"শান্তা, আমি চলি আমার সময় নেই আজ।" আমীর অতি কষ্টে কথাগুলো উচ্চারণ করলো।

"দুষ্টুমি কোরো না আমীর। চেয়ারটা টেনে লক্ষ্মী ছেলেটির মত বোসো, চা খাও। আমার অনেক কথা বলার আছে, তাই আমি তোমাকে তার করেছি—তোমার আশায় এসেছি এতটা পথ, না শুনে যেতে পাবে না।" শান্তা একটা পেয়ালা আমীরের দিকে এগিয়ে দিলো সেই প্রত্যাশাভরা দৃষ্টি তার চোখে।

ছলনাময়ী! কিন্তু এ ছলনা আমীর এখন বুঝতে শিখেছে। চেয়ারটা এগিয়ে নিয়ে হেসে বসে পড়লো সে। বেশ তো, শুনুকই না আমীর, কি বলে শান্তা। চলে যাবার শক্তি হারায় নি সে।

শুনতে লাগল শান্তা তারই জন্য উন্মুখ হয়ে এসেছে সমস্ত পথ, উন্মুখ হয়ে ছিল দিন, মাস, বছর—কত বার লিখেছে তাকে চিঠি।

"শান্তা"।

"সব শুনবো, কিন্তু তার আগে তুমি আমার কথা শোনো। বিশ্বাস করো, আমি তোমার কাছেই আবার ফিরে এসেছি। কই, চা খাচ্ছো না যে?" শান্তা নিজের পেয়ালাটায় একটা চুমুক দিলো। তার পর ধীরে ধীরে বললো—

"অজিতের মোহ কাটাতে ছ'মাসও লাগলো না। বুঝতে পারলাম, ভুল করেছি। ভালো আমি তাকে বাসিনি—আর কাউকে ভালোবাসতে আমি পারবও না। কিন্তু তখন আর ফেরবার উপায় নেই—অজিতের সন্তান আমার গর্ভে। হয়ত পাগল হয়ে যেতাম, হয়ত আত্মহত্যা করতাম। কিন্তু একটা বিশ্বাসেই আমি মাথা ঠিক রাখতে পেরেছিলাম। বিশ্বাস ছিল তোমার ওপর। তোমাকে ত জানি—তুমি আমাকে বুঝবে।

আমি জানতাম আমার ভুল তুমি ক্ষমা করবে। হাসপাতালে একটা মরা ছেলের জন্ম দিয়ে নিজে বেঁচে গেলাম। কিন্তু হাসপাতাল ছাড়লাম না। নার্সিং শিখতে লাগলাম। আজ যুদ্ধের কল্যাণে একটা চাকরী পেয়েছি। তোমাকে সব কথাই জানিয়েছিলাম পর পর কয়েকটা চিঠিতে। উত্তর পাইনি একটারও। উৎকণ্ঠা বেড়ে গেল আমার, অভিমানও বাড়ল। কেঁদেছি, দুঃখ পেয়েছি। কি ক'রে জানব তুমি একটা চিঠিও আমার পাওনি? পেলে নিশ্চয়ই আমায় ভুল বুঝতে না। জানো আমি দিনের পর দিন অপেক্ষা করতাম তোমার কাছ থেকে একটা লাইন পাবার আশায়?"

শান্তার গলা ধ'রে এলো। আঁচল দিয়ে চোখটা মুছে নিলো সে।

আমীরের মুখে আবেগের রেখা ফুটে উঠেছে।

মিঠাইপুলের নীচে গ্যাংম্যানেরা তার জন্যে অপেক্ষা করছে। ঘুসখোর পি. ডবলু. আইটার বিরুদ্ধে তারা বিরক্ত, একটা কিছু করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

—"আমীর", গলা পরিষ্কার করে নিয়ে শান্তা বললো, "আমার কোনো ভারই তোমায় বইতে হবে না। শুধু বলো আমায় ঠেলবে না।"

আবার চমকে উঠলো আমীর। শক্ত হবে আমীর শক্ত হবে।

"অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে শান্তা। আর হয় না। অনেক দূরে। এত সহজে তা জোড়া লাগবে না। আর তা ছাড়া তোমার পথ আর আমার পথ এক নয়। আমরা এখন বিভিন্ন জগতের মানুষ।" বল্‌তে বল্‌তে আমীরের চোখ এসে ন্যস্ত হোলো শান্তার চোখের ওপর। শান্তার চোখ চিক চিক করছে।

"তোমার পথে তুমি আমাকে টেনে নাও। আমাকে তোমার মত ক'রে গ'ড়ে তোলো।" শান্তা ধীরভাবে বললো।

"পারবে না, সে অসম্ভব।"

"আমি পারবো না?— আর তুমি পেরেছ?"

"না সে হয় না।" আমীর উঠে দাঁড়ালো।

"তুমি চললে?" শান্তার কণ্ঠে আকুতি।

"হ্যাঁ।"

"আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো।"

আমীর বার হয়ে গেল।

আমীর সিঁড়ি দিয়ে নামছে, হোটেলের বয়টা এসে তাকে সেলাম ক'রে দাঁড়ালো।

"আপনি একবার অফিস ঘরে আসুন—খাতায় সই করতে হবে," বয়টা বললো।

খাতাটা হাতে নিয়ে আমীর ফাঁকা কলমগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে গেল একবার। একটু ভাবলো, তারপর ভরে দিলো ফাঁকগুলো। "মিঃ ও মিসেস্ আমীরচাঁদ কাপুর" লিখতে একটু হাত কাঁপলো। সই ক'রে উঠে পড়লো সে।

আমীর অন্যমনস্কভাবে চলতে লাগ্‌ল। কোথায় যাবে সে এখন জানে না। চলতে চলতে যন্তর-মন্তরে ঢুকে পড়লো। নয়া দিল্লীতে এ জায়গাটাই বোধ হয় অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। ছায়া দেখে একটা গাছের নীচে সে বসলো।

স্ত্রী কণ্ঠের উচ্চ হাসিতে চকিত হয়ে আমীর দেখলো অদূরে ঝোপের আড়ালে একটি বিদেশী সৈনিকের বাহুলগ্না একটি কালো ফিরিঙ্গী মেয়ে।

চামড়ার পোর্টফোলিওটা মাথার নীচে রেখে শুয়ে পড়লো আমীর। সে ভাবতে চায়; বিশ্রাম চায়; সে একা থাকতে চায়। ভালো লাগে না এখন তার কাজে যেতে—লোকের ভিড়ে, কথার ভিড়ে—কচকচিতে—

ঘর অন্ধকার ক'রে শান্তা শুয়ে ছিল। পায়ের শব্দে চেয়ে দেখলো দরজায় কে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে তার সিগারেট।

"কে, আমীর ?"

"হ্যাঁ।"

শান্তা উঠে আলোটা জাললো।

আমীর এগিয়ে এসে ধপ ক'রে বসে পড়লো চেয়ারটায়।

শান্তা লক্ষ্য করলো আমীরের নতুন বেশ, নতুন রূপ, মুখে সিগারেট। হাতে তার চামড়ার পোর্টফোলিওটা নেই। শান্তা পাশে একটা চেয়ার টেনে বসলো।

* * *

আবদুল হাকিম তার নিকেলের ঘড়িটা পকেট থেকে বার ক'রে দেখলো ন'টা বেজে পনের হয়েছে। একবার কানের কাছে তুলে পরখ ক'রে নিলো চলছে কিনা। আমীর এল না এখনো, মজুরেরা বিরক্ত হচ্ছে, আমীর প্রায়ই এরূপ করে। সমবেত গুটি ১৫।১৬ মজুরকে সম্বোধন ক'রে হাকিম অগত্যা শুরু করলো—"সাথীরা, কমরেড আমীরের আজ ক্লাশ নেবার কথা ছিল ন'টায়, বোধ হয় কোনো বিশেষ জরুরী কারণে কোথাও তিনি আটকে গেছেন। কাজেই সময় নষ্ট না ক'রে আমরা আমাদের ক্লাশ শুরু করি। আমি অবশ্য তৈরী হয়ে আসিনি তবে ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে গত পাঁচ বছর ধ'রে কাজ করার ফলে আমার নিজের যতটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে সেইটেই বলবো।"

আবদুল হাকিম বলে চললো।

* * *

মাস দেড় পরে "হিন্দুস্তানে" বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছে স্টেট্‌মেণ্ট—"কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙন। কমরেড কাপুরের পার্টি ত্যাগ।" "যাঁরা আমীরচাঁদ কাপুরের নাম জানেন তাঁরা জানেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ও কংগ্রেসকর্মী আমীরচাঁদজী কি ভাবে দিল্লীতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়েছিলেন। আজ তাঁরা দেখতে পাবেন—কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদেব আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি কি ভাবে এমন কর্মীকেও সে পার্টির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদে বাধ্য করেছে।"

বিনয় চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় সমাজ পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রাচীন অনুশাসনগুলি আলোচনায় দেখা যায় যে, পেশা দ্বারা গণ্ডীভূত জাতি (caste) দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্তও উদ্ভূত হয় নাই, এবং গিল্ডগুলিও তখন অচলায়তনে পরিণত হয় নাই। পুরাতন একই গিল্ডের (শ্রেণী) লোক নানা পেশা অবলম্বন করিতেছে ; স্মৃতি-কল্পিত বর্ণগুলিও (class) স্থানুবৎ নহে ; অজ্ঞাত বর্ণীয় গুপ্ত সম্রাটেরা রাজা হইতেছেন, বৈশ্য ক্ষত্রিয় রাজার কর্ম্ম করিতেছে এবং বর্ণাশ্রমের রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া মান্য হইতেছেন। শূদ্রবংশীয় বৌদ্ধ রাজা ধর্ম্মপাল শাস্ত্রশাসন হইতে বিচলিত ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমূহকে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিজ নিজ ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন বলিয়া তাম্রলিপিতে (১) (দেবপালদেবের মুঙ্গের লিপি) উল্লিখিত হইতেছেন। এই সকল বাস্তব দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মীয় পুস্তকসমূহে বর্ণিত সমাজব্যবস্থা একটা কল্পিত আদর্শ মাত্র।

এই প্রসঙ্গে এই সংশয় জাগে যে, প্রাচীন গ্রীস ও রোমের ন্যায় ভারতের প্রাচীনকালে পৌরহিত্য কর্ম্ম কি রাষ্ট্রশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত ? মাধ্যন্দিন শতপথ ব্রাহ্মণ (২।৪।১।১৫) পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, যিনি একটি জনপদের (অর্থাৎ তৎকালীন কৌমগত) রাষ্ট্রের পুরোহিত হইতে পারেন তাহাই তাঁহার পরমোৎকর্ষ। যিনি দুইটি রাষ্ট্রের পুরোহিত হইতে পারেন তাঁহার পরম উৎকর্ষতা সম্বন্ধে আর কি বক্তব্য আছে। (২) ঋগ্বেদে স্পষ্টই উক্ত আছে, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র এই প্রকারের একটি কৌমগত রাষ্ট্রের পুরোহিত ছিলেন। ঐতিহাসিক যুগে কৌটিল্য রাজানুজ্ঞা অমান্যকারী পুরোহিতের কর্ম্মচ্যুতির কথা বলিয়াছেন। রাজশক্তি দ্বারা পুরোহিত পদ নিয়ন্ত্রিত না হইলে এই সকল উক্তি প্রাচীন পুস্তকাদিতে উল্লিখিত হইত না।

স্মৃতিসমূহের ব্যবস্থা যে, বাস্তব জগতে প্রচলিত ছিল না তাহা কৌটিল্যের রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকারের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়। তিনি দুর্গে শুষ্ক মাংস সঞ্চয় করিয়া রক্ষা করিবার কথা বলিয়াছেন (২।২।৪৯)। সৈন্য দল সম্পর্কে তিনি পুরুষানুক্রমিক সৈন্য দল (মৌল), মাহিয়ানা প্রাপ্ত ভাড়াটিয়া সৈন্যদল (ভৃত্য) এবং শ্রেণী সমূহের সৈন্যদল এই তিন শ্রেণীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। (২।৩৩।১৪০) তিনি বলিতেছেন, "আমার গুরু বলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিম্বা শূদ্র সৈন্যদের মধ্যে প্রথমে যাঁহারা উল্লিখিত হইয়াছে বীরত্বের জন্য পরে উল্লিখিত বর্ণাপেক্ষা তাহাদেরই পল্টনে ভর্ত্তি করা উচিত। এতদ্দ্বারা স্মৃতি বর্ণিত মত যে, ক্ষত্রিয়ই কেবল যুদ্ধ কার্য্যে লিপ্ত থাকিবে—এই মতবাদ নষ্ট হইয়া যায়। এই বিষয়ে গুরুর মতের প্রতিবাদে কৌটিল্য বলেন, "না, প্রণিপাত দ্বারা ব্রাহ্মণ-সৈন্যদের শত্রু ভাঙ্গাইয়া লইতে পারে, এইজন্য অস্ত্রে সুশিক্ষিত ক্ষত্রিয় সৈন্য আরও উত্তম, কিম্বা সংখ্যাধিক্য হেতু বৈশ্য বা শূদ্র সৈন্যরা আরও উত্তম (৯।২।৩৪৫)। এই স্থলে

১। গৌড় লেখমালা—পৃ : ৪১-৪৪

কৌটিল্য ও তাঁহার গুরুর বাক্য এই সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সকল বর্ণ হইতেই সৈন্য সংগ্রহ করা হইত। মৌর্য্য সাম্রাজ্য স্থাপয়িতার প্রধান মন্ত্রীর এই উক্তি বাস্তব ঘটনারই সাক্ষ্য প্রদান করে। এই সাক্ষ্য স্মৃতিসমূহের বিধানকে খণ্ডন করে। আবার তিনি বলেন, "যে-কেহ রাজ্যে লোভ করে বা বিদ্রোহ করিবার চেষ্টা করে অথবা পল্টন বিগড়াইবার চেষ্টা করে তাহাকে আপাদমস্তক পোড়াইয়া মারিবে। যদি ব্রাহ্মণও এ কার্য্য করে তাঁহাকে জলে নিমজ্জিত করিবে।" (২) এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তৎকালে ব্রাহ্মণ অবধ্য ছিল না। কৌটিল্য পুনরায় বলিতেছেন, "স্ত্রী পুরুষের মধ্যে পরস্পরের দ্বেষ ও কলহের ফলে বিবাহ ছিন্ন (divorce) হইতে পারে। "পরস্পরমদ্বেষাম মোক্ষ" (১৩।১৫৫); শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণদেব স্ত্রীলোকেরা দীর্ঘ নিরুদ্দেশ, অনুপস্থিত স্বামীর জন্য কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে (২।৪।১৫৪); বিচারকের অনুজ্ঞা ও আদেশ লইয়া একজন স্ত্রীলোক যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে" (২।৪।১৫৯)। সৈন্যদল সংগঠন বিষয়ে তিনি বলিতেছেন, "দশজন পদাতিকের উপর 'পাদিকা' নামক উপরিস্তরের কর্ম্মচারী, দশজন 'পাদিকার' উপর সেনাপতি, দশজন সেনাপতিব উপর একজন নায়ক নিযুক্ত হইবে" (১০।৬।৩৭৭)। এই প্রকারের সৈন্যগঠন ব্যবস্থা নূতন বলিয়া প্রতীত হয়। রাজকোষের ধন বৃদ্ধি করিবার জন্য তিনি মন্দির বা দেবতা স্থাপন করিযা বা নানাধর্ম্মের ভাণ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে বলিয়াছেন (৫।২।২৪৪)। এতদ্বারা বোধগম্য হয় যে, ধর্ম্মস্থলকে রাজার শোষণের একটি যন্ত্রে পরিণত করা হইয়াছিল।

অতি অর্ব্বাচীন অর্থ শাস্ত্র শুক্রনীতি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, "বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, মাতঙ্গ, নারদ ও অন্যান্যেরা তপঃ দ্বারা উন্নত হইয়াছিলেন, জন্ম দ্বারা নহে" (৪।৪।৮১)। এই উক্তিতে জন্ম দ্বারা বর্ণ বা পদ অবধারিত হয়—এই মত খণ্ডিত হয়। অতঃপর আরও বলা হইয়াছে, "স্বাত্বিকের লক্ষণ হইতেছে শ্বেত, রাজসিকের লক্ষণ হরিদ্রা ও রক্ত বর্ণ, তামসিকের কৃষ্ণবর্ণ" (৪।৪।৩১২-৩১৩)। এই উক্তি দ্বারা জন্মগত বর্ণ এবং বিরাট পুরুষ কর্ত্তৃক চারিবর্ণের সৃষ্টির কাহিনীর প্রতিবাদ বা বিরোধিতা করা হয়। শুক্র বলেন, বর্ণগুলি লোকের চরিত্রের লক্ষণ দেখিয়া রূপক কল্পনা করা হইয়াছে। কপিল তাঁহার সাংখ্যশাস্ত্র ও মানুষকে তিন গুণ অনুসারে বিভক্ত করিয়াছেন। পারসিক জারতুষ্ট্রীয় ধর্ম্মে তৎকালীন সমাজের বর্ণ বিভাগকে রূপক বলিয়া অবধারিত করা হইয়াছে। শুক্রনীতিতে উল্লিখিত হইয়াছে, "দক্ষিণে ব্রাহ্মণেরা মাতুল কন্যা বিবাহ করে; মধ্যদেশের কর্ম্মকার ও শিল্পীরা গোখাদক, পুরুষেরা মাংসভোজী। স্ত্রীলোকেরা পরপুরুষের সহিত সংসর্গ করে (গবাচীন), উত্তরে স্ত্রীলোকেরা মদ্যপায়ী, খস-দেশের পুরুষেরা ভ্রাতার বিধবাকে বিবাহ করে (৪।৫।৯৭-৯৯১)।" "ইহা তাহাদের প্রাচীন প্রথা বলিয়া তাঁহারা প্রায়শ্চিত্ত ও শাস্তিভাজন হইতে পারে না" (৪।৫।১০০-১ ১)। এই স্থলেও সমাজের বাস্তব ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কাল্পনিক আদর্শ দ্বারা ইহা ব্যাহত হয় নাই। তৎপর শুক্র বলিতেছেন; "পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ও গুরু শত্রুভাবাপন্ন হইলে আত্মরক্ষার নিমিত্ত লোকে তাহাদিগকে যুদ্ধে নিহত করিতে পারে। ইহাই শ্রুতি বা বেদের বিধান। যে ব্রাহ্মণ হত্যার উদ্দেশ্যে আসে সে শত্রুতুল্য, যে হত্যার জন্য আসে তাহাকে নিহত করিলে কোন পাপ নাই"

২। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী কর্ত্তৃক অনূদিত ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৬

(৪।৭।৬৪৯-৫০)। এই অভিমতের দ্বারাও এই তথ্যই পাওয়া যায় যে, রাজনীতিশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ অবধ্য—এই কথা অজ্ঞাত। শুক্রের বড় কথা এই যে, রাজা দেশগত, জাতিগত, শাস্ত্রসম্মত, গ্রামগত, 'গণ' বা নিগম (Corporation) গত এবং গোষ্ঠীগত রীতি যত্ন-সহকারে বিচার ও বিবেচনা করিয়া তাহার কর্ত্তব্য পালন করিবে (৪।৫।৮৯।৯১)। আইনের বিচার বিষয়ে তিনি বলেন, "কুল-সমূহ (families) যে মোকদ্দমার বিচার করে না, শ্রেণী-সমূহ (guilds) তাহার বিচার করিবে, শ্রেণীসমূহ যে বিচার করে না গণসমূহ (করপোরেশন) সেই বিচার করিবে। ইহারা যে বিচার করে না রাজকর্ম্মচারীগণ সেই বিচার করিবে (৪।৫। ৫৯—৬০)।" এই তথ্যই হিন্দু আইনের অনুসন্ধানকালে পাওয়া গিয়াছে; স্মৃতির খামখেয়ালী বিধান রাজার নিকট আইন ছিল না এবং স্মৃতি দ্বারা লোকের মামলা মোকদ্দমার বিচার হইত না। স্মৃতির সেইরূপ দাবী মিথ্যা। এই যৎকিঞ্চিৎ তুলনামূলক পাঠে বোধগম্য হয় যে, হিন্দুর প্রাচীন রাজনীতিশাস্ত্রের সহিত পুরোহিততন্ত্রের শ্রেণীস্বার্থজ্ঞাপক পুস্তক-সমূহের অনেক বিশিষ্ট স্থলেই মিল নাই। অবশ্য ইহা সত্য যে, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের দাবীও ব্রাহ্মণ বিরচিত অর্থশাস্ত্রে ঘোষিত আছে।

এক্ষণে হিন্দুর বিজ্ঞানশাস্ত্রের একাংশ হইতে প্রাচীন ভারতীয় সমাজপদ্ধতির রূপ অনুসন্ধান করা যাউক।

চিকিৎসাশাস্ত্র হিন্দুর একটি বিশিষ্ট বিজ্ঞানশাস্ত্র। ইহার অন্যতম বিশিষ্ট শাস্ত্র হইতেছে; "সুশ্রুত সংহিতা।" ইহার উৎপত্তি বিষয়ে কথিত হইয়াছে, "ভগবান ধ্বন্বন্তরি সুশ্রুত ঋষিকে এই সংহিতা বিষয়ক যে-সমস্ত উপদেশ দেন, নাগার্জ্জুন তৎসমুদয় উপদেশ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন (৩)। ইহাতে উক্ত হইয়াছে, কাশীরাজ ও দিবোদাস নামধেয় ব্যক্তিই অমর শ্রেষ্ঠ ধ্বন্বন্তরি। তিনি আত্মপরিচয় দিতেছেন, "আমি সাক্ষাৎ ধ্বন্বন্তরি। আমি আদিদেব এবং আমিই অমরগণের জরা ব্যাধি ও মৃত্যুনাশক (সূত্র স্থান ১ম অধ্যায় ১৭)।" হিন্দুর দেবতাগণ যে বড় রাজা ছিলেন, পরে অমরত্ব প্রাপ্ত হন, এতদ্বারা পূর্ব্বোক্ত সেই তথ্যই গৌণভাবে সমর্থিত হয়। যাস্কের মত এই যে, দেবতারা বড় রাজা ছিলেন। বৈদিক মহাভারতেও (শান্তিপর্ব্ব) স্বীকৃত হয় এবং ভাষ্যকার মহীধরও তাহা স্বীকার করেন। মধ্যযুগীয় দুর্গাপর্যের অনুরূপ মত এই শ্লোকে গৌণভাবে প্রমাণিত হয়। সুশ্রুত সংহিতা পাঠে দৃষ্ট হয় যে চিকিৎসাকালে ইহা নানা প্রকারের শল্যের (Instrument) ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়াছে। এই যন্ত্রগুলি হয় লৌহ, না হয় দন্ত শৃঙ্গ-দারু ও মাছের আইস দ্বারা নির্ম্মিত হইত (২।৮)। আজকালও কোন কোন মাছের আইসে অনেক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রস্তুত হয়। প্রাচীনকালে এইসব দ্রব্য হইতে চিকিৎসার জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করা তৎকালের হিন্দুর বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার উচ্চতার পরিচায়ক ছিল। তৎকালে চিকিৎসা শাস্ত্রের পাঠ সমাপন করিয়া বৈদ্যকে রাজার অনুমতি গ্রহণ করিয়া চিকিৎসাপথে প্রবেশ করিতে হইত (২।২)। এতদ্বারা সাধারণী কাজ কর্ম্মের প্রতি তৎকালীন রাষ্ট্রের সচেতনতা প্রকাশ পায়। খাদ্যদ্রব্যের গুণ বর্ণনাকালে সুশ্রুত নানা প্রকার মদ্যের উল্লেখ করিতেছেন

(৩) সুশ্রুত সংহিতা কবিরাজ শ্রীদেবেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক অনূদিত ও প্রকাশিত।

(৪৫।১৫৫-১৫৭)। পুনরায় বলিতেছেন, গ্রাম্য কুক্কুটও বন্যকুক্কুটবৎ, অপিচ ইহা গুরু এবং বাত রোগ, ক্ষয়বমি ও বিষম জ্বরনাশক (৪৬।৬৩)। আবার গুহাশয়া অর্থাৎ সিংহ ব্যাঘ্রাদি পশুর মাংসেরও গুণ বর্ণনাকালে এই গ্রন্থ বলিতেছে, ইহা নেত্র রোগাক্রান্ত ও গুহ্য রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণেব নিত্য হিত (৪৬।৭১)। গোমাংস শ্বাস কাস প্রতিশ্যায় ও বিষম জ্বরনাশক। ইহা শ্রমশীল ও তিক্ষাগ্নি পক্ষে হিতকর। গোমাংস পবিত্র ও বায়ুনাশক (৪৫।৮৯)। ইহা হিঙ্গ (৪৬।২৩৯), রস্থন পলাণ্ডু, ক্ষীর পলাণ্ডু প্রভৃতির গুণ বিশ্লেষণ করিয়াছে (৪৫।২৫৬-২৫৭), আরও বলা হইয়াছে, ঘৃতে পক্ক পরিশুষ্ক মাংসকে অনুশ ছিন্ন করিয়া পিষ্টবৎ করিলে পাচকেরা তাহা উল্লুপ্ত মাংস বলিয়া থাকে (৪৬।৩৯৩)। ইহাকেই আজকাল সামী (Syrian) কাবাব বলা হয়। ঐ পরিশুষ্ক মাংসই লৌহাদি শলাকায় গ্রথিত অঙ্গারাগ্নিতে পরিপাচিত করিলে তাহা কিঞ্চিৎ গুরুপাক হয় (৪৬।৩৯৪)। ইহাকে আজকাল শিক কাবাব বলা হয়। এই পুস্তক আবার বলিতেছে, "উল্লুপ্ত ভর্জ্জিত, পিষ্ট, প্রত্যপ্ত, কুণ্ডু পাচিত, পরিশুষ্ক, প্রদগ্ধ শূল্য এবং ঈদৃশ অন্য মাংস তৎসমুদয়ই শূল্যমাংস নামে অভিহিত (৪৬।৩৯৫)। প্রকৃতপক্ষে এই স্থলে নানাবিধ কাবাবের নাম পাওয়া গেল। আহার বিষয়ে এই পুস্তক আবার বলিতেছে, "মহানঘা অর্থাৎ রন্ধনাগার পবিত্র ও বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক, সেখানে কেবল বিশ্বস্ত লোক থাকিবে (৪৬।৫০১)। চিকিৎসাশাস্ত্রে পাঁচ প্রকার ধূমপানের ব্যবস্থা আছে। ধূমবর্ত্তি একটি নলে প্রবেশিত করিয়া সেই ধূমপান করিতে হয় (শারীর স্থান—৪০।৪)। অবশ্য ইহা আমেরিকায় আবিষ্কৃত তামাক নহে। এই পুস্তকে ঘৃতাদি স্নেহ, মাংস, ফল, কন্দ, ডাল ও অম্ল দ্রব্যের সংযোগে তণ্ডুল পাক করিবার কথার উল্লেখ আছে (৪৬।৩৮৭)। ইহাই এক প্রকারের ভারতীয় পলান্ন বা পোলাও। আকবরনামাতে আট প্রকারের হিন্দুস্থানী পোলাও-এর নামোল্লেখ আছে।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

মনের নূতন সীমান্ত

পঞ্চাশ বছর আগে যে জ্ঞানের আবির্ভাবে বিজ্ঞানজগতে তুমুল চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয় বাস্তবক্ষেত্রে সেই জ্ঞানেরই প্রথম ব্যাপক প্রয়োগে আণবিক বোমার সুসম্পন্ন সৃষ্টি। এই সৃষ্টিতেও অনুরূপ চাঞ্চল্যেরই সঞ্চার হইয়াছে। ১৮৯৫ সালে রোয়েণ্টগেন (Rontgen) কর্তৃক রঞ্জনরশ্মি আবিষ্কৃত হয়; এবং পরে বেকারেল (Bequerel) আবিষ্কাব করেন রেডিও-একটিভিটি (Rodio-Activity)। এই দুইটি আবিষ্কারই ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। বস্তুজগতের যে একটি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট রূপের ছবির ধারণা লইয়া ঊনবিংশ শতাব্দী পরিতুষ্ট ছিল এই দুইটি আবিষ্কারের ফলে তাহা ভাঙিয়া যায় এবং বৈজ্ঞানিক মতবাদের ক্ষেত্রে শুরু হয় একটি বড় রকমের বিপ্লব। তারপর আসিল রাদারফোর্ডের মতবাদ—এটমেব অভ্যন্তরে

দেখা দিল ভারী কেন্দ্রবিন্দু (nucleus) ও তৎসহ ইলেকট্রন। ইহার ফলে বস্তুজগতের যে নূতন ছবি দেখা গেল তাহা পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট ধারণা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; Planck ও Bohr-এর কোয়ানটাম মতবাদে দেখা গেল সেই বস্তুর ব্যবহার সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতে আরও কত পৃথক।

এই মতবাদগুলি হইতে শুরু হইল আবিষ্কারের পর আবিষ্কার—নিউট্রন, পজিট্রন, মেসন —অবশেষ যুদ্ধের ঠিক আগে ইউরেনিয়ামের আইসোট্রোপ ভাঙা সম্ভব হইল। ইহাই আণবিক বোমার ভিত্তি। এই বোমাই পঞ্চাশ বছরের গভীর মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রথম ব্যাপক বাস্তব ফল।

এই আণবিক শক্তির ব্যবহারের ফল মনুষ্যসমাজে কি দাঁড়াইবে তাহা এখনও স্পষ্ট বোঝা যায় না। যাঁহারা এ সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী জানেন তাঁহারা সামরিক গোপনতার জন্য কোন বৃত্তান্ত দিতে পারেন না। আমি এই কার্য্যের সহিত কখনও সংশ্লিষ্ট ছিলাম না বলিয়াই এ সম্বন্ধে লিখিতে পারি। এটমের কেন্দ্রবিন্দুগুলির গতিপ্রকৃতির প্রয়োগের আশু ব্যবহারিক সম্ভাবনা সম্পর্কে নির্ভুল হিসাবই আজ বড় কথা নহে; সমাজে এই প্রয়োগের কি প্রতিক্রিয়া অনিবার্য্যরূপে দেখা দিবে তাহাই ভাবিবার বিষয়। একটি কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে,আজ আমরা এমন শক্তির সমাবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছি যাহা পূর্ব্বেকার শক্তি অপেক্ষা দশ লক্ষ গুণ বেশী। কিন্তু ইহা হইতে একথা বুঝা যায় না যে এই গ্রহের সঞ্চয়যোগ্য শক্তির পরিমাণ আমরা কিছুটা বাড়াইতে পারিয়াছি। মূল বস্তুর দুষ্প্রাপ্যতা, সক্রিয় আইসোট্রোপ-গুলি বাহির করিবার নানা প্রকারের বাস্তব অসুবিধা এবং উহা ভাঙিবার প্রণালীতে সুনিপুণতার অপরিহার্য্য অভাব—এই সকলের ফলে এই শক্তির প্রতি ইউনিটের উৎপাদনব্যয় কয়েক বৎসর তেল ও কয়লা অপেক্ষা বেশী পড়িবে। কিন্তু আণবিক বোমা তৈয়ারীর কাজে যে পরিমাণ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বাস্তব নৈপুণ্যের প্রয়োগ হইয়াছে তাহা যদি অব্যাহত রাখা হয় তবে কয়েক বৎসরের মধ্যেই এ সকল অসুবিধা দূর হইবে বলিয়া আশা করা অন্যায় হইবে না।

কিন্তু সেদিন আসিবার পূর্ব্বেই আণবিক বোমার মত শক্তির সঞ্চিত উৎসকে নানা ভাবে কাজে লাগানো যাইতে পারে। এমন কি কয়লা অথবা তেল হইতে বেশী ব্যয়সাধ্য হইলেও এই প্রয়োগ স্থানবিশেষে চলিতে পারে। পৃথিবীর যে-সকল দূর স্থানে কয়লা অথবা তেলের বহনব্যয় অত্যধিক সে সকল অঞ্চলে এই নূতন শক্তি স্বভাবতই বিশেষ মূল্যবান হইবে। এই সকল স্থানেই আণবিক শক্তি প্রথমে সস্তা হইবে। অবশ্য একথা মনে করা ভুল হইবে যে, সব ক্ষেত্রেই আণবিক শক্তি সব চেয়ে সহজে যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত হইবে। ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব হইবার বহু পূর্ব্বেই অত্যন্ত বেশী তাপ ও চাপ সৃষ্টির কাজে এই আণবিক শক্তি ব্যবহৃত হইতে পারে; নূতন ধাতুবিদ্যায়, পাত্রাদিনির্ম্মাণকার্য্যে এবং ব্যাপক পূর্ত্তকার্য্যে সাংঘাতিক শক্তিসম্পন্ন বিস্ফোরক হিসাবে ইহার ব্যবহার চলিতে পারে। আশাতীত ও কল্পনাতীত পরিমাণ নানা প্রকারের Radio-active বস্তু এখন পাওয়া যাইতেছে; এইগুলির সাহায্যে রসায়ন, জীববিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার এত দ্রুত প্রসার হইতে পারে যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী সকল বৈজ্ঞানিকের কীর্ত্তিকেই বহুগুণে ছাড়াইয়া যাইবে। তারপর, আজ হোক কাল হোক এমন সময় আসিবে যখন আণবিক শক্তিকে হিসাব করিয়া ব্যয় করিলে

পরোক্ষভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে মানুষের কতকগুলি আশু অভাব অভিযোগ মিটিতে পারে। এই শক্তি স্থূলতমভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে পাম্প করিয়া জল তুলিবার কাজে অথবা 'ফার্টি-লাইজার' তৈয়ারীতে। ইহাতে কৃষিকার্য্যের ব্যাপকতা ও গভীরতা দুই বাড়িবে। সঙ্গে সঙ্গে যানবাহনের সুবিধাও এই শক্তি বহুগুণে বাড়াইয়া তুলিবে। ফলে কৃষিজাত দ্রব্য অনেক দ্রুত লোকের কাছে পৌছিবে। ইহার অর্থ খাদ্য সরবরাহের আসল যে অসুবিধা আজিকার পৃথিবীতে তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে তাহা দূর হইবে।

ধনের কোন নূতন উৎস আবিষ্কৃত হইলেই যে সঙ্গেসঙ্গেই তাহার দ্রুত ব্যাপক ব্যবহার শুরু হইবে তাহার কোনো মানে নাই। কলম্বাস কর্ত্তৃক নূতন ভূভাগ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই মধ্যযুগীয় ইউরোপের জীবনযাত্রার পরিবর্ত্তন আসে নাই; কিন্তু দেখা দিয়াছিল এক নূতন জগৎ, এবং যথাসময়ে চির-বিস্তারশীল সেই নূতন জগৎ পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা ও জীবনযাত্রার মান বাড়াইয়া তুলিয়াছিল বিপুলভাবে। আণবিক বোমার আবিষ্কারের মধ্যে আবার এক সঙ্কেত পাওয়া গেল যে, এক নূতন সীমান্ত দেখা দিয়াছে; পর্ব্বতপ্রান্তরের ভৌগলিক সীমান্ত অপেক্ষা এ সীমান্ত আরও উচ্চস্তরের; কারণ পৃথিবীর কোনো ভৌগলিক সীমান্তরেখা দ্বারা ইহা আবদ্ধ নহে। মানুষের বুদ্ধি ও সহযোগিতা করিবার শক্তির উপর ইহা নির্ভর করে। নূতন জগৎ যখন আবিষ্কৃত হয় তখন মানুষের মধ্যে যাহারা দুঃসাহসিক তাহারা যেমন পুরাতন জগতের বাধানিষেধ মানিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই, তেমনি এখন হইতে পুরাতন উৎপাদন-রীতির সঙ্কীর্ণতার মধ্যে স্বভাবতই মানুষ অধীর হইয়া উঠিবে এবং বিজ্ঞান তাহার হাতে যে নূতন শক্তি দিয়াছে তাহার দ্রুততম, প্রকৃষ্টতম বিকাশের দাবী জানাইবে।

আণবিক বোমা যে ভয়াবহতা ও আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা অমূলক নহে, কিন্তু নিস্কৃতির পথ রহিয়াছে এইখানেই। গোপন অথবা সঙ্কীর্ণ-সীমাবদ্ধ রাখিয়া এই শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। ভয় ও সন্দেহ হইতে মুক্তি পাইবার প্রকৃত পথ এই ভাবে নিয়ন্ত্রণ নয়, দ্রুত সম্প্রসারণ। বলা হয় আমাদের এ যুগের, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের মত শিল্পোন্নত দেশের পক্ষে অধিকাংশ সমস্যার কারণ নাকি ইহা যে, সম্প্রসারণের যুগ শেষ হইয়াছে এবং শেষ সীমান্ত বন্ধ হইয়াছে। সম্প্রসারণের অবাধ সম্ভাবনার সম্মুখে পরস্পরের প্রতি সন্দেহ এবং বাঁচিয়া থাকিবার মত স্থানটুকুর জন্য লড়াই আর থাকিবে না। উত্তেজনা, অনিশ্চয়তা, আশা ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন লইয়া মানুষ তখন বিশ্বব্যাপী নূতন সৃষ্টিপ্রচেষ্টায় আত্ম-নিয়োগ করিবে।

নূতন জগত আবিষ্কারের উপমাকে বেশী দূর টানা ঠিক হইবে না। আমেরিকা আমাদের যাহা দিয়াছিল তাহার সহিত মানুষের পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় ছিল—ভূমি, অরণ্য, খনি—আমেরিকা এইগুলিই তাহাকে দিল স্বপ্নাতীত অধিক পরিমাণে। আমাদের নূতন সম্পদ বস্তুজগতের সামগ্রী নহে; বিজ্ঞানের তিলে-তিলে গড়িয়া-ওঠা সুসম্বদ্ধ ঐতিহ্যের অবদান; অতএব সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রগতির সাহায্যেই তাহার ফল ভোগ সম্ভব।

যে অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক সংগঠন ও শিল্পোৎপাদনের ফলে আণবিক বোমা সম্ভব হইয়াছে, পরমাণু বোমার চেয়ে সেই সংগঠন ও উৎপাদন কম বিস্ময়কর নহে।

তিন বছর আগেও যাহা ছিল লেবরেটরীর গবেষণা মাত্র, প্রায় ঘরে-তৈরী যন্ত্রপাতির

সাহায্যে এবং অনুবীক্ষণ যন্ত্রে-দৃশ্যমান দ্রব্যের চাইতেও কম জিনিসে যে গবেষণা চলিয়াছিল, তিন বছরের মধ্যে সেই গবেষণাই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এমন শক্তির আবির্ভাব ঘটাইল যাহা পূর্ব্বের যে কোনো শক্তি অপেক্ষা হাজার হাজার গুণ বেশী। বস্তুজগতের যে কোনো আবিষ্ক্রিয়া অপেক্ষা ইহার গুরুত্ব ও তাৎপর্য্য বেশী। কোনো কাজ করিবার নূতন পদ্ধতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার শেষ নাই, সামাজিক আবিষ্ক্রিয়ার কারণ চিন্তাজগতের কোনো বিশিষ্ট ক্ষেত্রে ইহা আবদ্ধ নহে। আমাদের শত্রুর ভাগ্যে যে আঘাত আমরা হানিয়াছি সেই আঘাত আমাদের উপর না পড়ে এই একান্ত উৎকণ্ঠার ফলে বৈজ্ঞানিকেরা বহুদিন ধরিয়া যাহা বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলেন তাহার সত্যতা প্রমাণিত হইল।

আধুনিক বিজ্ঞানের সম্ভাবনা যে বাস্তবে পরিণত হইতে পারিতেছে না তাহার কারণ বোঝা খুবই সহজ—বিজ্ঞানের পিছনে যথেষ্ট শক্তি ব্যয়-করা হইতেছে না।

বিজ্ঞান একাধিক উপায়ে আধুনিক জীবনযাত্রাকে যে ভাবে প্রভাবিত করিতেছে তাহাতে জনসাধারণ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে দেখা গিয়াছে যে, সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে বিশৃঙ্খলভাবে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও তাহার প্রয়োগ চলিতেছে তাহাতে অধিকাংশ লোকই সন্তুষ্ট। এই অধিকাংশের দলে বহু বিজ্ঞানী পর্য্যন্ত আছেন। এই পদ্ধতি বা পদ্ধতিহীনতা এখন আর চলিবে না। আণবিক বোমা-প্রস্তুতিতে ব্যয় হইতেছে ২০০ কোটি ডলার, গবেষণা চলিয়াছে বৈজ্ঞানিক, শিল্প ও সামরিক সংগঠনগুলির পরিপূর্ণ সম্মেলনে। ইহা হইতে বুঝা যায় এই ধরনের কাজ যদি বৃহৎভাবে, ব্যাপকভাবে করা যায় তবে কতখানি ফল পাওয়া যাইতে পারে।

আণবিক বোমার মত এতখানি চাঞ্চল্যকর না হইলেও সমান গুরুত্বপূর্ণ এমন বহু শত পরিকল্পনা বিজ্ঞানে আছে, থিওরির দিক হইতে দেখিলে সেগুলি কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব। এ যুদ্ধে ইহাদের একটির পরিচয় আমরা পাইয়াছি,—পেনিসিলিন। আণবিক বোমায় যত মানুষ মরিয়াছে বা মরিতে পারে তাহা অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী মানুষ পেনিসিলিন বাঁচাইয়াছে। এখানেও দেখা গেল, পঞ্চাশ বছরের স্বাভাবিক প্রগতিকে যথাযোগ্য কর্ম্মপ্রচেষ্টার দ্বারা দুই বৎসরের মধ্যেই সম্ভব করা হইল। এই ধরনের আরেকটি পরিকল্পনা রহিয়াছে প্রোটিনের গঠনপ্রকৃতি সম্পর্কে; কৃষি, খাদ্য ও ব্যাধির সহিত ইহার সম্পর্ক রহিয়াছে। আর রহিয়াছে নূতন ও প্রয়োজনীয় জীবসৃষ্টির জন্য জননবিজ্ঞান নিয়ন্ত্রণের সমস্যা। দেহ ও মনের সম্পর্ক লইয়া শরীরতত্ত্ব-মনস্তত্ত্বগত বিরাট সমস্যাও রহিয়াছে।

ইউরেনিয়ামের পূর্ব্ব যুগের বৈজ্ঞানিক প্রগতি লইয়া যেটুকু সে জানে সেইটুকু জানিয়াই মানুষ যতদিন সন্তুষ্ট ছিল, মাত্র কয়েকজন চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক ছাড়া এতদিন বিজ্ঞানের উপযুক্ত বাস্তব প্রয়োগের সম্ভাবনার কথা কেহ ভাবিয়া দেখে নাই। সে দিন তাহাদের কথা কেহ শোনে নাই। কিন্তু আজ যখন সকলেই দেখিতেছে প্রগতির গতি কতখানি দ্রুত হইতে পারে তখন বৈজ্ঞানিক কেতাবের সম্ভাবনাগুলিকে তাহারা আর নাতি-নাতনীদের ভোগের জন্য রাখিয়া যাইতে রাজী নহে; নিজেদের জীবিতকালের মধ্যেই ঐ সম্ভাবনাকে তাহারা সম্ভব দেখিতে চাহে। যে নূতন আণবিক যুগের আজ সূচনা হইল, সে যুগে বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞানের প্রয়োগ মানুষের অসাধারণ কাজের পরিবর্ত্তে প্রধান কাজ হইবে। যুদ্ধের পূর্ব্বে শিল্পোন্নত আধুনিক রাষ্ট্রের জাতির আয়ের শতকরা ১

ভাগের ১।১০ হইতে ১।৩ পর্য্যন্ত বিজ্ঞান গবেষণায় ব্যয় হইত। যুদ্ধে ইহা বাড়িয়া হইয়াছে শতকরা ১ ভাগের বেশী। কিন্তু বিজ্ঞানের যে নূতন সম্ভবনা আজ দেখা দিয়াছে তাহা সম্যক উপলব্ধি করিলে কেহই আর এই স্বল্প ব্যয়ে খুশি হইতে পারিবে না। বছর বছর এই সংখ্যা ক্রমে বাড়িয়া এমন একটি স্থানে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইবে তাহা নির্দ্ধারণ করা এখন আমাদের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু আমাদের জীবিতকালের মধ্যেই শতকরা ২০ ভাগ উঠিতে পারে। ইহার অর্থ শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢালিয়া সাজা।

কিন্তু কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক কাজ বাড়াইলেই চলিবে না; সত্যকার ভালো কাজের সহিত তাহাকে সংযুক্ত করিতে হইবে। কি করিতে হইবে—অর্থাৎ বিজ্ঞানের বাহিরের কাজ নির্ভর করে সমাজের অবস্থার উপর। কখনও কখনও যুদ্ধের মত অস্বাভাবিক অবস্থায় বিজ্ঞানকে উৎকৃষ্টতর ধ্বংসপদ্ধতি আবিষ্কার করিতে হয়, কিন্তু সাধারণতঃ বিজ্ঞানের লক্ষ্য প্রত্যেক মানুষকে তাঁহার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন করিয়া তোলা—এই শক্তি ও সম্ভাবনা আর্টেই হোক বিজ্ঞানেই হোক আর সহজ মানবীয় সম্পর্কেই হোক। জগতের বর্ত্তমান জনসাধারণকে খাদ্য, আশ্রয় ও কাজের মৌলিক প্রয়োজন মিটাইতে হইবে এবং ভবিষ্যতে বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাকে সংগঠিত করিতে হইবে—পৃথিবীব্যাপী ভিত্তিতে। ক্ষুদ্র, বিচ্ছিন্নভাবে বিজ্ঞানের কাজ চলে না। কেবল মাত্র পৃথিবীর সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের সম্মেলন ও মতের আদানপ্রদানের দ্বারাই উপযুক্ত পরিমাণ পারস্পরিক অনুপ্রেরণার সৃষ্টি হইতে পারে। বিজ্ঞানের প্রগতি কেবল মাত্র এইভাবেই সম্ভব।

আণবিক শক্তির সম্ভাব্য প্রয়োগের যে ভবিষ্যৎ চিত্র আমরা দেখিতেছি তাহা আসল চিত্রের সামান্যতম অংশ মাত্র। পদ্ধতি ও নীতি সম্পর্কে গোপনতা ও বিশেষ বিশেষ দেশের মধ্যে উহা সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা বিপজ্জনক হইবে দুই দিক হইতে। প্রথমতঃ আণবিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি শ্লথ হইয়া আসিবে, দ্বিতীয়তঃ পরস্পর পরস্পরকে সন্দেহের ফলে আণবিক শক্তির প্রয়োগ বন্ধ হইয়া যাইবে। শেষটি হইবে বেশী মারাত্মক। স্বাধীন আলোচনার বিস্তীর্ণতম ক্ষেত্র না পাইলে বিজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নহে। প্রকাশ ও নিয়ন্ত্রণ পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংবদ্ধ। যদি কিছু প্রকাশ না করিয়া নিয়ন্ত্রণ চলিতে থাকে আমাদের সন্দেহ কোনো দিন দূর হইবে না, ফলে বৈজ্ঞানিক উদ্যম ব্যাহত হইবে। এই নীতির ফলে শক্তির জীবন্ত উৎসগুলি রুদ্ধ হইবে এবং যত দ্রুত উৎপাদন চলিবে তত দ্রুত ব্যবহৃত না হইয়া যুদ্ধের উদ্দেশ্যে উহা জমা হইতে থাকিবে; পৃথিবীর অগ্রণী বৈজ্ঞানিকরা ইতিমধ্যেই ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন। স্যার জেম্‌স্ চ্যাডুইক্ বলিয়াছেন ঃ

"আণবিক বোমার মূল নীতি এত বেশী জানা ব্যাপার যে বৃটেন ও আমেরিকার গোপন তথ্য না জানিলেও প্রত্যেক দেশের পক্ষেই উহা বাহির করা সময়ের প্রশ্ন মাত্র। আমাদের দেশ এ গোপন তথ্য জানে বলিয়া এ দেশকে নিরাপদ ভাবা ঠিক নহে। ইহার ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু চেষ্টা আবশ্যক।"

দায়িত্ব অতি দুরূহ। অনেকে মিলিয়া উহা বহন করিতে হইবে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাত হইতে সমস্ত দেশকে মুক্ত করিয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলি তাহাদের প্রথম কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছে। যে অস্ত্রে ইহা সম্ভব হইয়াছে তাহারই আতঙ্কে ঐ দেশগুলি আচ্ছন্ন হইয়া না

পড়ে, তাহা এবার তাহাদের দেখিতে হইবে। সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত রাজনৈতিক প্রজ্ঞা প্রয়োগ করিয়া এবার তাহাদের নিজেদের জয় করিতে হইবে।

জে. ডি. বার্ণাল

যুদ্ধান্তের দ্বন্দ্ব

যুদ্ধ শেষ হয়েছে প্রায় তিন মাস, কিন্তু শান্তি এখনো দূরে। এমন কি অনেকেরই সংশয় আছে যে, এ তিন মাসে শান্তি নিকটতর হয়েছে, না দূরতর হয়ে পড়েছে; যুদ্ধশেষের দিনকে আমরা ছাড়িয়ে এসেছি, না যুদ্ধের দিকেই আরো এগিয়ে গিয়েছি। আমাদেব দেশের অনেক রাজনীতিকের ও সাংবাদিকের কথা ও লেখা দেখলে অবশ্য এরূপ সংশয়েরও কারণ থাকে না। আমরা নানা সূত্রেই ভাবতে চাই—আর একটা মহাযুদ্ধ শুরু হ'ল বলে। তবু একটা সাধারণ হিসাব মনে রাখা ভালো : একটা মহাযুদ্ধের পরে আর একটা মহাযুদ্ধ শত কারণেও তখন-তখনি বাধে না; ছোটখাট লড়াই চলতে পারে। কিন্তু দেশের যে জেনারেশন সর্বগ্রাসী যুদ্ধে শ্রান্ত হয়ে একবার যুদ্ধোত্তর যুগে পৌছয় তারা আর সহজে নূতন মহাযুদ্ধের কথায় সাড়া দেয় না। সে নামে মাততে পারে নতুন এক জেনারেশন—বিশ পঁচিশ বছর পরে যারা যৌবনে পদার্পণ করে। অতএব খুব শীঘ্র কোনো মহাযুদ্ধ বাধা আর সহজ নয়। অবশ্য, 'এ যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ' এমন কথা ভাবাও দুঃসাহস। কারণ মানুষের ইতিহাসের মূল সমস্যার একটিরও পুরোপুরি সমাধান এখনো হয় নি। যে বৈষম্য ও বিরোধে যুদ্ধ বাধে সে সব একেবারে দূর হওয়া সহজ কথা নয়। তিন চার হাজার বছরের সামাজিক বৈষম্য ভাঙ্‌তে ভাঙ্‌তেও সময় নেয। কিন্তু সে সবকে দূর করবার প্রাথমিক আয়োজন হয়ে থাক্‌লেও আমরা মনে করতে পারি—শান্তির বনিয়াদ তৈরী হচ্ছে। এই তিন মাসের ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে তাই লক্ষ্য করতে হয়—জনশক্তির বনিয়াদ কোথায় কতটা দৃঢ় হয়েছে।

জাপানের আত্মসমর্পণের (১৪ই আগষ্ট, ১৯৪৫) ফলে সংগ্রামের সশস্ত্র পর্ব শেষ হয়। সঙ্গে সঙ্গেই প্রধান হয়ে উঠেছে এশিয়া খণ্ডের সমস্যা। প্রধানত তা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও তার ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার প্রশ্ন। অবশ্য যুদ্ধান্তে এশিয়ার প্রথম কথা হল পরাজিত জাপানের ভাবী ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য, সেদিকে ম্যাকআর্থারের নীতি প্রথম দিকে অতিমাত্রায় জাপ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন বলে মনে হয়েছিল, এখন হয়তো তা একটু সাবধান হচ্ছে। কিন্তু একথা ঠিক যে, জাপানী সামন্ততন্ত্র, ক্ষাত্রতন্ত্র ও সম্রাটতন্ত্রের ধ্বংস সাধন করে সত্যকারের জাপানী গণতন্ত্রের উদ্বোধন এরূপভাবে সম্ভব হবে না। এমন কি, জাপানী প্রতিক্রিয়াশীলদের উচ্ছেদ ম্যাকআর্থারের নীতিতে লক্ষ্য কিনা তাও সন্দেহস্থল। সোভিয়েট সরকারেব দাবি মত মার্কিন, ইংরেজ, সোভিয়েট, চীন—এই চতুঃশক্তির পরিচালনা-পরিষদ জাপানে গঠিত হলে এই নীতি পরিত্যক্ত হয় কিনা দেখা যাবে।

কথা এই, যে জাপান, এশিয়ার মহাযুদ্ধের এক মূল কারণ, সেই জাপানে জনশক্তির প্রতিষ্ঠা না ঘটলে এশিয়ায় প্রতিক্রিয়ার পথ খোলা থাকবে।

কিন্তু এশিয়ার প্রধান প্রশ্ন পরাধীন দেশের প্রশ্ন—উপনিবেশের সমস্যা। কারণ, সমস্ত এশিয়াই প্রায় উপনিবেশে পরিণত। এ সব দেশগুলির এখন অবস্থা কি ?

রাজনীতিক সম্পর্কের দিক থেকে এশিয়ার এই পরাধীন দেশগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দেখা চলে। যেমন, আমরা এক সঙ্গে ভাবতে পারি বর্মা, মালয়, ইন্দোচীন, যবদ্বীপের কথা। শ্যাম ও ফিলিপিনের সমস্যা একটু স্বতন্ত্র। জাভা, মালয় প্রভৃতি দেশগুলি আগে ছিল পাশ্চাত্য সামাজ্যবাদীর দখলে, এ যুদ্ধে জাপান তা দখল করেছিল। এখন জাপান পরাস্ত হতেই প্রত্যেক দেশের জনশক্তি আপনার স্বাধীনতা দাবি করছে। কিন্তু পূর্বতন সাম্রাজ্যবাদীরা চাইছে নিজেদের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে। মালয়ে তাতে কেউ বাধা দেয় নি, সেখানকার জনশক্তি এখনো অচেতন। বর্মায়ও সশস্ত্র বাধা নেই, কিন্তু বর্মীনেতা আউঙ্‌ সান, থুন্‌ টুন প্রভৃতির সম্মিলিত গণ আন্দোলনের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার কোনো মীমাংসায় পৌছতে পারে নি, আবার সঙ্ঘবদ্ধ বর্মী গণশক্তিকে অস্বীকার করবার মত সাহসও তার নেই। জাপানের তাঁবেদার মন্ত্রীরাই ব্রিটেনেরও মন্ত্রী হচ্ছে। কিন্তু বর্মী যুবকনেতাদের সঙ্ঘশক্তি, রাষ্ট্রচেতনা ও দৃঢ়তা দেখে আশা করা যেতে পারে তাঁদের পথ যদিও এখনো দুস্তর, তবু তাঁরা লক্ষ্যস্থলে উত্তীর্ণ হবেন। ইন্দোচীনে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের কিছুই প্রায় ছিল না। কিন্তু তবু তাদের আসন পুনঃস্থাপনে সাহায্য করছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের ফৌজ। সাম্রাজ্যবাদীদের ফ্রণ্ট সে অঞ্চলে অভেদ্য রয়েছে, কিন্তু ইন্দোচীনের বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠী তাদের ফ্রণ্ট গড়ে তুলতে পারেনি, জনশক্তি সেই জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের অপেক্ষা এ অঞ্চলে দুর্বল। ইন্দোনেশিয়ায় এই সতরঞ্জ খেলার চমকপ্রদ অঙ্ক এখন অভিনীত হচ্ছে। সোকর্ণ ও মহম্মদ হাতার নেতৃত্বে "ইন্দোনেশীয় সাধারণতন্ত্র" একদিকে যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অন্য দিকে ওলন্দাজীরা ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অনুরূপ ক্ষুদে কমনওয়েলথ গঠনের ভাঁওতা দিচ্ছে; এবং ইংরেজের এবং জাপানেরও সহায়তা নিয়ে জাভার জনশক্তিকে অস্ত্রবলে পরাস্ত করতে চাইছে। সোকর্ণের জাতীয়তাবাদীরা কিন্তু পৃথিবীর প্রগতি শক্তির সঙ্গে সংযোগ হারায় নি। এদিকে অষ্ট্রেলিয়ার বন্দরে বন্দরে সব শাদা মজুরেরা, জাভা ও সুমাত্রার এবং আমাদের ভারতীয় মজুরেরা জাভার উদ্দেশ্যে প্রেরিত সাম্রাজীবাদীদের মাল জাহাজে বোঝাই করতে অস্বীকার করছে। অন্যদিকে জাভায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের ভারতীয় সৈন্যদের দিয়ে জাভার স্বাধীনতা আন্দোলন ধ্বংস করছে, আমরা তাতে বাধা দিতে পারছি না; ব্রিটিশ শ্রমিক দলও তাদের শ্রমিক সরকারের এই জঘন্য কাজে বাধা দিতে পারছে না। এক কথায় এই জনবহুল ক্ষুদ্র দ্বীপটিতেই এই মুহূর্তের পৃথিবীর আসল রূপটির একটি আভাস পাওয়া যায়ঃ যুদ্ধপ্রভাবে এশিয়ার একটা পশ্চাৎপদ দেশে জনশক্তি কতটা সচেতন ও সবল হয়েছে; যুদ্ধের পরেও ক্ষুদে ও বড় সাম্রাজ্যবাদীরা পুরাতন শোষণই অব্যাহত রাখ্‌বার উদ্দেশ্যে কেমন একত্র হচ্ছে; আর যুদ্ধের ফলে আন্তর্জাতিক শ্রমিক শক্তি কতটা বিদেশের জনমুক্তির আন্দোলনকে সক্রিয় সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়, আর বিলাতের লেবর সরকারের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবে কতটা বিলাতের ও পৃথিবীর জনমুক্তির আন্দোলন বিপন্ন হচ্ছে। সমস্ত ঔপনিবেশিক দেশের

স্বাধীনতাকামীদের নিকটে এই সব কারণে যবদ্বীপের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিচ্ছেদ এক শিক্ষণীয় ইতিহাস হয়ে উঠছে, তা বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে ধরা যায় চীন-মহামণ্ডলের দেশগুলি। মোটামুটি এই যুদ্ধে ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদের পরাজয়ে যে সব দেশে জনমুক্তি নিশ্চিত হয়েছে তার মধ্যে চীনই প্রধান। এরূপ অন্যান্য দেশ হল—মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া ও কোরিয়া। সোভিয়েট শক্তি এযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়াতে যে যুদ্ধ সত্যসত্যই কতটা এশিয়া ক্ষেত্রেও জনমুক্তির কারণ হয়েছে, তা এসব অঞ্চলের কথা মনে করলে আজ বুঝতে পারা যায়। যেদিন (১৪ই আগস্ট, ১৯৪৫) জাপান আত্মসমর্পণ করে সে দিনই চীনের চুংকিং সরকারের সঙ্গে মস্কোতে সোভিয়েট সরকারের সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। তারই ফলে মাঞ্চুরিয়ার বিচ্ছিন্নতার অবসান হল, চীনের অখণ্ডতা সুনিশ্চিত হল, বহির্মঙ্গোলিয়ার আত্মকর্তৃত্বের অধিকার স্বীকৃত হল, কোরিয়ার স্বাধীনতা সুনিশ্চিত হল। লক্ষণীয় এই যে, সোভিয়েটের লাল ফৌজ ও বহির্মঙ্গোলিয়ার লালঝাণ্ডা ফৌজ এ সব দেশে অগ্রসর হয়ে এসেছে; সহজে তারা এসব দেশ ছেড়ে চলে যাবে কেউ তা ভাবেনি—হয়ত জার্মানি ও অষ্ট্রিয়ার মত মাঞ্চুরিয়া-মাঙ্গোলিয়ার একাংশ দখল করে তারা বসে থাকবে, নিজেদের তাঁবেদারি সরকার প্রতিষ্ঠা করবে,' অন্তত য়িনানের চীন কমিউনিস্ট সরকারকেই এসব স্থানে স্থাপন করবে, এ মর্মের ইংরেজ-মার্কিন প্রচার আমরাও পরিপাক করে বসেছিলাম। কিন্তু দেখা গেল সোভিয়েট নীতি ১৯১৭-১৮র মূল সূত্র বিস্মৃত হয়নি। চীনের যে অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা তখন বিপ্লবী সোভিয়েট ঘোষণা করে এবার বিজয়ী সোভিয়েট তা'ই কার্যে পরিণত করলে। সঙ্গে সঙ্গে বরং বহির্মঙ্গোলিয়ার ও কোরিয়ারও স্বাধীনতা সুনিশ্চিত হল, এবং তৃতীয় একটি নীতিরও সূচনা হল—চীনের সমস্যা তার নিজ সমস্যা, সেখানে কোনো বৈদেশিক রাষ্ট্রের (বিশেষ করে, মার্কিন ধনিক শক্তির) হস্তার্পণ করা অবাঞ্ছনীয়। ('আজ যখন চুংকিং য়িনানের সঙ্গে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে একত্রিত হতে অস্বীকৃত হচ্ছে, তখনো তাই মার্কিন সেনাপতি ও রাষ্ট্রবিদরা একেবারে সরাসরি কুয়োমিন্‌টাং বাহিনীর সঙ্গে মিলে চীনা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জেহাদে যোগ দিতে দ্বিধা করছে।) সোভিয়েট এশিয়ার যুদ্ধে নিযুক্ত হওয়ায় এশিয়ার আধা-ঔপনিবেশিক (যেমন চীন) ও ঔপনিবেশিক (যেমন, মাঞ্চুকো, কোরিয়া) অঞ্চলগুলি আত্মনিয়ন্ত্রণের সুযোগ পেল, আমরা মোটামুটি এই ক্ষেত্রে তা দেখতে পাই। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি সামরিক ও ভৌগলিক কারণে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া ইন্দোচীন বর্মা প্রভৃতি দেশগুলিকে সোভিয়েট এ সহায়তা এরূপ প্রত্যক্ষভাবে দিতে না পারায় তারা কতটা বিপাকগ্রস্ত হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক শক্তি সেখানে কতটা নানা ওজরে হস্তার্পণ করছে।

সোভিয়েটের সম্পর্কে এসে এ যুদ্ধে এজন্য যে অন্য একটি দেশের গণশক্তি প্রভাবিত হয়েছে তা ঈরান। এ যুদ্ধকে 'মুক্তিযুদ্ধ' বলে গণ্য করবার সময়ে সোভিয়েট নেতারা ঈরানের নাম উল্লেখ করেছিলেন। তারপর তেলের ইঙ্গ-মার্কিন মালিকদের প্রচারে ঈরানে সোভিয়েটের লোভ ও কুচক্রের কাহিনী বহুবার শোনা গিয়েছে। সম্প্রতি আমাদের দেশে তারই অনুরূপ আর একটি 'গাঁজাও' বোম্বাইতে ছড়িয়ে যায়—করাচী বন্দর সোভিয়েট চায়। অথচ আমাদের অনেকেরই আজ লক্ষ্য নেই যে, প্রতিশ্রুতি মত যুদ্ধশেষের ছ'মাসের মধ্যেই সোভিয়েট ফৌজ ঈরান ত্যাগ করে নিজ দেশে ফিরে যাচ্ছে,

ঈরানে রইলো বরং পাশ্চাত্য তৈল-সাম্রাজ্যবাদীরা। প্রসঙ্গত একটা কথা বলা উচিত: ইঙ্গ-মার্কিন প্রচারকদের 'লাল সাম্রাজ্যবাদের' ভাঁওতায় যারা বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে তারা এই চীনে ঈরানে সোভিয়েটের এই দৃষ্টান্তগুলি ভুলে যায়; আবার তারাই অনেকে মনে করে সোভিয়েট চীনের সঙ্গে সন্ধি করে চীনা কমিউনিস্টদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে—যেন সোভিয়েট জোর করে 'বিপ্লব' চাপাবে বিদেশের ঘাড়ে।

এশিয়ার নিকট ও মধ্যপ্রাচ্যের সিরিয়া, পালেস্টাইন ও আরব রাষ্ট্রগুলিকে আর এক শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। এখানে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের পরস্পরের বাণিজ্যিক ও সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে, আবার জনশক্তিরও মুক্তিপ্রয়াস রয়েছে। নিকটপ্রাচ্যে ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদকে প্রায় নিঃশেষ করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সিরিয়া লেবাননের জাতীয় শাসনকে অনেকটা সুযোগ করে দিয়েছে, অথচ পালেস্টাইনে ইংরেজ তার সাম্রাজ্যবাদী অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতেই সচেষ্ট। য়িহুদীদের গত যুদ্ধের পরে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরাই পালেস্টাইনে স্থাপন করে। এভাবেই য়িহুদী-আরব সমস্যার সৃষ্টি হয়। আজ ইংরেজ আরব-মণ্ডলের পৃষ্ঠ-পোষক হয়ে আফ্রিকাস্থ বৃহত্তর আরব-জগতের (মিশর ও ইতালির ভূতপূর্ব উপনিবেশ গুলির) মোড়লী চায়। তাই য়িহুদী বন্ধুদের আর বেশি আস্কারা দেওয়া তার এখন প্রয়োজন নয়। কিন্তু সে দায় ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছে য়িহুদীবন্ধু মার্কিন দেশ। এই য়িহুদীদের নামেই আমেরিকা নিকটপ্রাচ্য-মণ্ডলে তার তেল ও এরোপ্লেনের জন্য প্রয়োজনীয় ঘাঁটি বাঁধতে ইচ্ছুক। এই সব বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের বৈষম্য নিকটপ্রাচ্যের এই ঔপনিবেশিক অঞ্চলে যুদ্ধকালে প্রচ্ছন্ন ছিল, এখন তা প্রকট হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, ধনিকতন্ত্রের অন্তর্বিরোধ লেগেই থাকে; এটাই গণতন্ত্রীদের সুবিধা।

ভারতবর্ষ এশিয়ার মধ্যে একটি বিশিষ্ট প্রশ্নরূপে গণ্য হবার মত। বিশেষ করে এই তিন মাসে ভারতীয় রাজনীতিতে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। তাতেও এশিয়ার যুদ্ধান্তের সমস্যারই জটিলতা দেখতে পাওয়া যাবে, তা আমরা পরে দেখব।

মোটামুটি দেখ্‌ছি—যুদ্ধান্তের এই তিন মাসে এশিয়ার ক্ষেত্রে যে সমস্যা প্রকট হয়েছে তা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী বনাম জনশক্তির সমস্যা। এশিয়ায় বনিয়াদী সাম্রাজ্যবাদীরা আসন স্থাপন করেছিল; তারা ভাব্‌ছে জাপানের পরাজয়ে তারা যুদ্ধ-পূর্ব ব্যবস্থাই আবার প্রচলিত করবে। 'ষ্টেটাস কো এ্যান্টিতে' ফেরা এসব সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণীর কাম্য—সে শাসক চার্চিলই হোন্, কিংবা হোন্ দ্য গল্, কিংবা ক্ষুদে ওলন্দাজ কর্তা। এই যুদ্ধের ফলে অবস্থাটা জটিলতর হয়েছে। যুদ্ধ সময়ে জাপান যে সব দেশে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের বিতাড়িত করে নিজেদের আসন স্থাপন করছিল সেখানে জাপানের শাসন বা আসন পাকা হয় নি। তা পাকা করবার জন্য অনেকখানেই ফ্যাসিস্ত জাপানও স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এবিষয়ে তার চালটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অনুরূপই ছিল—'কমনওয়েল্‌থ্' কথাটির প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করে সেও 'কো-প্রোস্‌পারিটি স্ফিয়রের' মহিমা কীর্তন করত; ভারতের দেশীয় রাজাদের মত মাঞ্চুকুতে প্রতিষ্ঠা করেছিল রাজা; নানকিংএ স্থাপন করছিল তাঁবেদারী শাসন, বর্মায়, ইন্দোচীনে, জাভায় প্রায় সর্বত্রই গঠন করছিল, বল্‌তে পারি, এক ধরনের নিজেদের মনোনীত 'একসিকিউটিব্ কাউন্‌সিল'। শুধু এ প্রসঙ্গে মনে রাখা যেতে পারে, এ সব 'স্বদেশী' গবর্ণমেন্টের সঙ্গে ইংরেজের রচিত একসিকিউটিব্ কাউন্‌সিলের তফাৎ দেখা যায়

কি বিষয়ে। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা একনেতৃত্ব-নীতির (অথরিটেরিয়ান্) অনুসরণ করে 'স্বদেশী' সরকার গঠন করে, তার শাসনের লক্ষ্য বা পদ্ধতিতে জনমতের, অর্থাৎ নির্বাচনমূলক সরকার (রিপ্রেজেণ্টেটিব্ গবর্ণমেণ্ট) গঠনের কোনো কথাই নাই। ওয়াংকে চীনারা নির্বাচিত করে নি, বা মকে বর্মীরা নির্বাচিত করেনি; তারা ছিল জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের মনোনীত শাসক; আর তারাই নিজেরা আবার স্থির করে তাদের অধীন রাখে শাসন ব্যবস্থা—সেখানেও জনমতের কোনো বালাই নেই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা নির্বাচনমূলক নীতি ও প্রতিষ্ঠান দিয়েই তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে চায়; কখনো তা 'ডায়ার্কি' হয়, কখনো 'স্বায়ত্ত শাসন' হয়, 'প্রাদেশিক আত্ম-কর্তৃত্ব' হয়। কিন্তু গণতান্ত্রিক নীতি যেখানেই তাদের স্বার্থের পক্ষে বাধাদায়ক হয়ে ওঠে সেখানেই তারা চেষ্টা করে ছলে বলে কৌশলে গণতন্ত্রকে চাপা দিতে (৯৩ ধারা চলে, নবাব-নাইটদের নিয়ে এক্‌সিকিউটিব্ কাউন্‌সিল হয়)। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাশিস্ত সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে একটা বড় তফাৎ এই—দুইই সাম্রাজ্যবাদ, কিন্তু একটা 'ফ্যুহ্রার (নেতাজী) প্রিন্‌ৎসেপে' গড়া হয়, আরটি গড়া হয় গণতন্ত্রের ভাঁওতা দিয়ে। ফ্যুহ্রার নীতির অর্থ জনমতকে নিষ্পেষিত রাখা, আর তাই গণতন্ত্রকে সরাসরি ধ্বংস করা। আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যনীতির অর্থ জনমতকে ভুলিয়ে রাখা, গণতন্ত্রকে পরোক্ষভাবে চাপা দেওয়া। মূল কথা এই, এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী বা ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী, ফ্যাসিস্ত বা বনিয়াদী সাম্রাজ্যবাদী, কেউ তার উপনিবেশের জনসাধারণের মুক্তি সহ্য করতে পারে না।

জাপানও যখন পরাহত, পুরাতন শাসকের দল যখন পলায়িত, তখন এশিয়ার ঔপনিবেশিকদেশের জনশক্তির পক্ষে সুযোগ হয়েছে নিজ অধিকার আয়ত্ত করে বসে যাওয়ার। অবশ্য এ প্রয়াস সার্থক হতে হলে চাই—প্রথমত, প্রত্যেক দেশের জনশক্তির সত্যকারের রাজনীতিক চেতনা, দ্বিতীয়ত তাদের যথেষ্ট রকমের বিস্তৃত ও ঐক্যবদ্ধ সংগঠন; তৃতীয়ত, তাদের নেতৃত্বের সুস্থির বাস্তব দৃষ্টি। অর্থাৎ বোঝা চাই আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির মূল ধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে কি করে করতে হবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চেষ্টাকে বান্‌চাল; নিজের জনশক্তি, প্রতিপক্ষের অস্ত্রশক্তি ও পৃথিবীর অন্যান্য বিজয়ী শক্তির বিভিন্ন ধারার শক্তির পরিমাণ বুঝে নিজের উদ্দেশ্যকে জয়ী করে তোলা। এই হল নেতৃত্বের কাজ। জাপানের আত্ম-সমর্পনের পরে যেখানে এই জনমুক্তির আন্দোলন এই সব বিষয়ে যতটা অগ্রসর হতে পেরেছে সেখানেই তার ততটা প্রয়াস সার্থক হবে। স্পষ্টই দেখেছি, ভৌগলিক ও রাজনীতিক কারণে যে দেশ সোভিয়েট প্রভাবের যতই নিকটতর, সে সব জাতির আন্তর্জাতিক সুযোগ বেশি লাভ হচ্ছে—যেমন চীন, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়ার। আবার, সে সুযোগের অভাবে যবদ্বীপে, ইন্দোচীনে, বর্মায় জনমুক্তির আন্দোলন এদিকে তত প্রত্যক্ষ সহায়তা পাচ্ছে না। কিন্তু মোটামুটি পৃথিবীর জাগ্রত জনশক্তিই যে তাদেরও এক বড় বন্ধু, এ চেতনা তাদের সম্পূর্ণই আছে—আছে তা সোকর্নের, মহম্মদ হাতার, আছে তা আউঙ্গ সানের।

এশিয়ার ক্ষেত্রে গণশক্তির দুর্বলতা পরিষ্কার, অনেকটা সহজবোধ্যও। ইউরোপের জনশক্তি তত দুর্বল ছিল না, নেইও। কাজেই সেখানে তার দুর্বলতার লক্ষণ দেখলে স্বভাবতই মনে সংশয় জাগে—সত্যই কি যুদ্ধে তবে জনশক্তি জয়ী হতে পারেনি? গণতন্ত্রের পথ পরিষ্কার হয়নি? গত তিন মাসের মধ্যে ইউরোপ আমেরিকার রাজনীতিক গতি দেখেও এ প্রশ্ন

অনেকের মনে উদিত হবে। সে রাজনীতির প্রধানতম ঘটনাগুলির হিসাব নেওয়াই এখানে সম্ভব, তার আলোচনা করা সম্ভব নয়। তার প্রধান ঘটনা এই : লণ্ডনে মলোটভ্, বেভিন, ও বির্ণেস্ এই তিন বৈদেশিক সচিবদের বৈঠক ইউরোপের যুদ্ধোত্তর ব্যবস্থা সংবন্ধে কোনো মীমাংসায় পৌছতে পারেনি। এ সম্পর্কে বিলাতী কাগজ যে সাফাই গেয়েছে আমরা চোখ কান বুজে তা উদরস্থ করছি। নইলে মলোটভের সাংবাদিক বৈঠকের (২৫শে অক্টোবর) বিবৃতি থেকে বুঝতে পারতাম ব্যর্থতার কারণ কি। সোভিয়েট একটা গণস্বার্থের নীতি অনুযায়ী প্রথমত তিন বৃহৎ শক্তিকে নিয়ে ইউরোপের সমস্যা সংবন্ধে এক মত হতে চায়, পরে সে সিদ্ধান্ত সমস্ত শক্তিদের নিকট দাখিল করবে। নইলে রাষ্ট্র শক্তিদের সম্মেলন হয়ে দাঁড়াবে শুধু মাত্র আড়াআড়ি করার ক্ষেত্র—আর্জেন্টিনা, পেরু, ইরুগুয়া প্রভৃতি তথাকথিত 'বাধ্য' শক্তিদের নিযে বড় বড় শক্তিদের ভোটাভুটির তামাসা (দ্রষ্টব্য মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান)। বলা বাহুল্য, পূর্বেকার "বার্লিন কন্‌ফারেন্সে" পঞ্চশক্তি এই সোভিয়েট প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে সম্মত ছিলেন। এবার বেভিন্ বির্ণেস তা আর মান্য করলেন না (হয়ত তাঁদের ভরসা আণবিক বোমা, কোনো কোনো মার্কিন সাংবাদিক এরূপ মন্তব্য করছেন)।

দ্বিতীয়ত সোভিয়েটের সঙ্গে এই মতানৈক্যের পূর্বে ও পরে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদের প্রচারে ও প্রয়াসে একটা সোভিয়েট বিরোধিতা ক্রমেই বেড়ে উঠেছে। তার প্রাধান প্রধান দিক হল এই : সোভিয়েট প্রভাবের বিরুদ্ধে ইউরোপে "পশ্চিম ব্লক্" গঠন। ফ্রান্সের রক্ষণশীলদের সঙ্গে ব্রিটেনের "লেবর" (যথা অধ্যাপক লাস্কি) ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কথাবার্তা বলছেন। "পশ্চিম ব্লকের" কথা ছাড়াও "পূর্ব ইউরোপের" বিষয়ে সচেষ্ট অপপ্রচার চলেছে। পূর্ব ইউরোপকে সেভিয়েট্ শক্তিই ফ্যাশিস্ত কবল থেকে মুক্ত করেছে। আজ সহজেই সেখানে ফ্যাশিস্ত-বিরোধী গণতান্ত্রিক শাসন অস্থায়ী ভাবে চল্‌ছে—কোনো রাষ্ট্রেই কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি, এমন কি যুগোশ্লাভিয়ায়ও না। সর্বত্রই অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠিত হয়েছে ফ্যাশিস্ত-বিরোধী গণতন্ত্রী দলগুলি সম্মিলিত করে। এসব দেশগুলিতে 'নব্য গণতন্ত্রের' আদর্শানুযায়ী অনেক খানেই পুরানো জমিদার, সামন্ত ও ফাশিস্ত ধনিকদের ক্ষমতা লোপ পেয়েছে, জমি কৃষকদের হাতে দেওয়া হয়েছে, দেশের মূল শিল্পগুলিও অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়েছে—অর্থাৎ এসব কারণে প্রতিক্রিয়ার ভিত্তি স্থায়ীভাবে ভেঙ্গে যাচ্ছে। ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীলরা তাই তাদের এসব দেশের বন্ধুদের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ফলে পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া (বেনেস্‌ও আর নিস্তার পাচ্ছেন না), অষ্ট্রিয়া, রুমানিয়া, বুল্‌গেরিয়া এসব দেশের গণতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে বিলাতী প্রচার মুখর হয়ে উঠেছে—যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে প্রচারের তো কথাই নেই। অন্য দিকে গ্রীসে ব্রিটিশ বেয়নেটে রক্ষিত দামোস্কিনোস্ আর মন্ত্রী খুঁজে পাচ্ছেন না, সাধারণ নির্বাচনেরও আয়োজন করতে পারছেন না, তবু প্রতিক্রিয়ার ঘাঁটি আগ্‌লে বসে আছেন। অথচ পূর্ব ইউরোপের অধিকাংশ দেশে সে সব অস্থায়ী সরকার নূতন নির্বাচনের আয়োজন করছেন। কিন্তু সমস্ত ইউরোপে যুদ্ধের ফলে প্রতিক্রিয়ার আজ পরাজয় ঘটছে ও ঘটবে, দুর্দিনের ভয়ে তাঁই এসব দেশের ফাশিস্ত-বন্ধু প্রতিক্রিয়াশীলরা নির্বাচন বয়কট করতে চায়, সেই ছলে ইঙ্গোমার্কিন কর্তৃপক্ষের সহায়তা তারা যাজ্ঞা করেছে।

তৃতীয়ত, খাঁটি জার্মানির সোভিয়েট-অধিকৃত মণ্ডল সংবন্ধে এবং পূর্ব জার্মানির গৃহত্যাগী জার্মানদের দুঃখে ইংরেজ মার্কিন গলদশ্রু হয়ে পড়েছে। এমন কি, তাদের আধিকৃত জার্মান এলেকা থেকে জার্মান বৈজ্ঞানিকেরা যে পালিয়ে সোভিয়েট দেশে চলে যাচ্ছেন এ ব্যাপারেও তারা আভাস পাচ্ছে সোভিয়েট দুষ্কৃতির।

চতুর্থত, ভূমধ্য-মণ্ডলে সোভিয়েটের দৃষ্টি পতিত হওয়ায় পুরাতন সাম্রাজ্যবাদীরা উচ্চকিত হচ্ছে—যেন, ভূমধ্য-মণ্ডল সোভিয়েটের অপেক্ষা ইংরেজ বা মার্কিনের নিকটতর এলেকা!

পঞ্চমত, আণবিক বোমার তথ্য গোপন রাখবার হাস্যকর সংকল্প আমেরিকা বারে বারে ঘোষণা করে পৃথিবীকে বোঝাতে চায়—সোভিয়েটের আর কোনো ভরসা নেই। বৈজ্ঞানিকেরা অবশ্য বলেন এই নতুন আণবিক আবিষ্কার কারো একচেটিয়া থাকতে পারে না, আর আণবিক শক্তির আবিষ্কারে ক্রমে শিল্পের উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি পাবে, তাতে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটবে;—ধনিকতন্ত্রেরই দিন ফুরিয়ে আসবে, সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য হয়ে পড়বে।

আসল কথাটা এই, বিশ্ব রাজনীতিতে সোভিয়েট এবার প্রবেশ করেছে প্রগতির অগ্রদূত হিসাবে, পৃথিবীর জনশক্তির প্রধান প্রতিনিধি হিসাবে। বিশ বছর তাকে পুরাতন রাষ্ট্রশক্তি-গুলো পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন ও নিঃসম্পর্কিত করে রাখতে পেরেছিল। এই যুদ্ধের শেষে সোভিয়েট সেই বিচ্ছিন্নাবস্থার অবসান ঘটিয়ে এসে পৃথিবীর মধ্যখানে দাঁড়িয়েছে—যে অঞ্চল ভৌগলিক ভাবে তার যত সন্নিকট ও রাজনীতিক ভাবে সচেতন স্বভাবতই সে অঞ্চলেই তার প্রভাব সহজে বর্ধিত হচ্ছে। অন্য অঞ্চলেও জনশক্তি তার প্রেরণায় আপনাকে সংগঠিত করতে পারছে। মোটামুটি, সমস্ত প্রগতিশীল চিন্তায় ও প্রয়াসে সোভিয়েটের ছাপ পড়ছে, আর সমস্ত প্রগতিশক্তি বুঝছে তারা আর নেতৃহীন নয়। সোভিয়েটের এই বিশ্বনেতৃত্ব নূতন সভ্যতার স্রষ্টা হিসাবে নেতৃত্ব, এই জন্য ইউরোপে বিশেষ করে জনশক্তি সচেতন থাকায় প্রগতির বনিয়াদ সমস্ত ইউরোপ জুড়ে প্রোথিত হচ্ছে নব্যগণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

বিশ্বরাষ্ট্রনীতিতে সোভিয়েট রাষ্ট্রের ও সভ্যতার স্বরূপ যাঁরা বুঝতে চান না, তাঁরা আজকের বিশ্বরাজনীতির চাবিকাঠিরই সন্ধান পান না। ফলে তাঁদের নিজ দেশের রাজনীতিকেও তাঁরা সচল রূপ দান করতে পারেন না। বর্তমান মুহূর্তের ভারতীয় রাজনীতির দিকে তাকালেও এই কথারই প্রমাণ মিলবে। কিন্তু তার পূর্বে আর দু'একটি কথাও পরিষ্কার করে বোঝা দরকার। প্রথমত, দেখা যাক্ বিজয়ী ধনিকরাষ্ট্রের অবস্থা। ব্রিটেন ও আমেরিকাই তাদের মধ্যে প্রধান। প্রতিক্রিয়ার প্রধান ভরসা তারা। এখান হতেই তারা দেশে দেশে ভেঙেপড়া প্রতিক্রিয়ার ঘাটিগুলিকেও টিকিয়ে রাখতে চায়। এমন কি, কলোনিতেও ভাগ-বাঁটোয়ারা করে একটা কলোনিয়াল বুর্জোয়া বন্ধুগোষ্ঠী কলোনিয়াল শোষিত জনতার বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে যত্নপর। অবশ্য, ব্রিটেনে টোরিদের শোচনীয় পরাজয়ে তাদের খানিকটা অসুবিধা ঘটেছে। কিন্তু ব্রিটেনের লেবর গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্রনীতিতে প্রতিক্রিয়ার প্রভাব ও পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। লেবর কর্তৃপক্ষ স্বদেশে সমাজতন্ত্রের পদ্ধতি কিছু কিছু প্রবর্তন করতে চায়, কিন্তু বিদেশে 'ঔপনিবেশিক শোষণকে'ও একেবারে বর্জন করতে চায় না, তারা 'সাম্রাজ্যবাদ'কে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নয়। ফলে লেবরের পররাষ্ট্র-

নীতি অনেকটা পরাজিত প্রতিক্রিয়ার পরিপোষক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সোভিয়েট-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলদের নিকট 'সোশ্যাল ডিমোক্রাট' বেভিন্ রক্ষণশীল ইডেনের অপেক্ষাও বেশি গ্রাহ্য। লেবর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাধারণ ব্রিটিশ শ্রমিকের যে কত তফাৎ ঘট্ছে তারই প্রমাণ বিলাতের ৪৩ হাজার ডক্-মজুরের এই সুদীর্ঘ ধর্মঘট। অপরদিকে, বর্তমান জগতে মার্কিনের সঙ্গেই ব্রিটিশ-স্বার্থ একত্র চলে তার বিশ্বাধিকার রক্ষা করতে চায়, কিন্তু না ঋণ-ইজারার না আণবিক বোমার ব্যাপারে অর্থাৎ না আর্থিক-বাণিজ্যিক না সামরিক-রাজনীতিক কোন সুস্থ মীমাংসায় ব্রিটেন ও মার্কিন শক্তি পৌছতে পারছে। মীমাংসার গরজ দুই ধনিক স্বার্থেরই রয়েছে, কিন্তু ধনিকস্বার্থের পরস্পরবিরোধিতাও তেমনি প্রবল। মার্কিন রাষ্ট্র যুদ্ধের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। বর্তমান পৃথিবীতে তারা বাণিজ্য-সাম্রাজ্য চায়—রাজ্য ততটা চায় না, মুখ্যত চায় বাজার ও মাল। অতএব, পৃথিবীর জনবহুল দেশগুলিতে শান্তি ও স্বরাজ তাদের কাম্য হতে পারে। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ১২ দফায় এই উদার পররাষ্ট্রনীতি ব্যাখ্যা করেছেন (২৭শে অক্টোবর)। কিন্তু তাদের ভরসা বৃহত্তম বাহিনী ও আণবিক বোমার উপর। অপর দিকে যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই শিল্প-সমৃদ্ধির দেশ আমেরিকায় লাখ লাখ মজুরের ধর্মঘট লেগে গেল। সমৃদ্ধি থাকলেও ধনিক সভ্যতার সমস্যা মিটে না। আরও ঘনিয়ে ওঠে। তাই বলে ধনিকশ্রেণী হাল ছেড়ে দিয়েছে তা নয়। বরং ফ্যাশিস্ত যুগের শেষে কি করে আবার দেশে বিদেশে, এমন কি উপনিবেশের রাজ্যেও নতুন করে শোষণের ঘাঁটি বাঁধা যায়, তারই চেষ্টা চলেছে। যুদ্ধশেষের তিন মাসে এ দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়েছে, তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। অর্থাৎ প্রগতির বনিয়াদ যখন স্থাপিত হচ্ছে তখনো প্রতিক্রিয়া একেবারে নিশ্চল হয়ে বসে নেই।

তবু এ তিন মাসে পাশাপাশি জনশক্তিই যে প্রবল হচ্ছে, তা আমরা অনেক সময় ভুলে গেছি। আমরা কেউ কেউ যেন আশা করেছিলাম, যুদ্ধও শেষ হবে আর অমনি সব দেশে সোভিয়েট স্থাপিত হবে। অন্তত পরাধীন দেশগুলি অমনি হয়ে পড়বে স্বাধীন, তাদের জনশক্তি যতই দুর্বল বা নিশ্চেষ্ট বা বিভ্রান্ত থাক্। মূলত, জনশক্তি যে আজ প্রবল হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, আর ফ্যাশিজম্-এর পরাজয়ে প্রতিক্রিয়া শক্তির মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু কোন্ দেশে জনশক্তি কতটা প্রবল হবে তা নির্ভর করে প্রধানত সে দেশের জনতার নিজের উপর, কতটা তারা সচেতন হতে পেরেছে তার উপর। ইউরোপের মোট অবস্থা আমরা দেখেছি। সেখানেও জনশক্তির প্রতিপত্তি সর্বত্র সমান তালে অগ্রসর হচ্ছে না। গ্রীসের জনশক্তির অবস্থা এখনো অনিশ্চিত, জার্মানিতে তা সবে জন্ম নিচ্ছে। অন্যদিকে দেখছি পোল্যাণ্ড ও সমস্ত বল্কান্ অঞ্চল, এমন কি ফ্রান্স ইতালি ব্রিটেনেও পর্যন্ত জনতা অগ্রসর হচ্ছে। অবশ্য বাঁধাও যথেষ্ট তারা পাচ্ছে। ফ্রান্সের সাধারণ নির্বাচনে ফরাসী কমিউনিস্টরাই প্রধান শক্তি হয়ে উঠল, প্রগতিবাদী সোশ্যালিস্ট ও কাথোলিক রিপাব্লিক্দল তাদের নিচে স্থান লাভ করেছে—চিহ্ন নেই ফ্রান্সে পুরাতন প্রতিক্রিয়াবাদী রক্ষণশীলদের। বিলাতের মিউনিসিপাল নির্বাচনে পুরাতন টোরিরা প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে, শ্রমিক সদস্যরা জোয়ারের মত সব ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে। পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নির্বাচনের যে কি ফল হবে, তাও অনুমান করা সহজ। আবার, এই নানা বিভ্রান্তির মধ্যেও একদিকে সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোর পরিকল্পিত 'সম্মিলিত জাতি সংগঠনের' প্রতিষ্ঠা রীতিমত

সাধিত হয়েছে। অন্য দিকে সোভিয়েট ট্রেড ইউনিয়ন শুদ্ধ 'বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন সঙ্ঘের' প্রতিষ্ঠাও হল। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে যে এটা কত বড় ঘটনা, তা বিস্মৃত হবার নয়। পৃথিবীর শ্রমিক এভাবে আজ সোভিয়েট শ্রমিকের সহিত প্রকাশ্যে সম্মিলিত হবার ক্ষেত্র তৈরী করে নিচ্ছে; আগে তার এ সুযোগ প্রায় ছিল না।

তাই দেখছি এ তিন মাসে প্রতিক্রিয়া শক্তি যদি নিশ্চল না থেকে থাকে প্রগতি-পক্ষীয় শক্তিও হয়েছে সবল; যুদ্ধের বিপ্লবী সম্ভাবনা রূপ নিচ্ছে, প্রতি-বিপ্লবও মাথা তুলতে চাইছে।

ভারতবাসীর বিড়ম্বিত মনে পৃথিবী-জোড়া এই প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বের রূপটি যদি যথাযথ ধরা না পড়ে তা হলে বিস্ময়ের কারণ নেই। সাম্রাজ্যবাদের পায়ের তলায় বহুদিন পড়ে আছি বলে আমরা চোখ খুললেই দেখি—সাম্রাজ্যবাদীদের কুৎসিত দাপট। পৃথিবীর অন্যশক্তি আর আমাদের চোখেই পড়তে চায় না। এশিয়ার বিভিন্ন ঔপনিবেশিক দেশেরও অবস্থা অনেকটা এরূপ। কিন্তু সে তুলনায়ও ভারতবর্ষের অবস্থা আরও জটিল। আমাদের জাতীয় মুক্তির আন্দোলন এতদিন এশিয়ার অন্য জাতিদের মুক্তি-আন্দোলনের প্রেরণা দান করেছে। তার ইতিহাস পুরনো, তার ঐতিহ্যও সুস্থ—পৃথিবী-জোড়া প্রগতি-আন্দোলনের সঙ্গে তা নিজের সংযোগ অকুণ্ঠ ভাবে মেনে নিয়েছে, পৃথিবী-ব্যাপী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে তা নিজের বিরোধিতা পূর্বাপর ঘোষণা করেছে। তারপর সাম্রাজ্যবাদের আওতায় এল তার যুদ্ধকালীন জটিলতা। আগস্ট প্রস্তাবেও দেখি ভারতবাসীর দৃষ্টিভঙ্গিতে (পলিসি) ত্রুটি নেই, শুধু ত্রুটি ঘটছে তা পরিপূরণের কৌশলে (ট্যাক্‌টিক্‌সে)। সে অধ্যায়ের শেষে কারামুক্ত নেতারা সিমলার যুদ্ধে আবার সাম্রাজ্যবাদের নিকট পরাস্ত হলেন। সেনাপতি ওয়েভল্‌ সে যুদ্ধে জয়লাভ করলেন দ্বিধাবিভক্ত ভারতীয় আন্দোলনের উপর—কংগ্রেস নেতৃত্বও তাঁর মুখাপেক্ষী হয়ে পরাহত হলেন, লীগ নেতৃত্বও তাঁর মুখাপেক্ষী হয়ে পরাহত হলেন। তারও পরে তবু কংগ্রেস নেতৃত্ব ব্রিটিশ লেবর পার্টির বিজয়ে তাদের অভিনন্দিত করেন—আরও আশাভঙ্গ কংগ্রেস নেতাদের ললাটে লেখা ছিল। তা ঘটতে না ঘটতেই ভারতের দ্বিধাবিভক্ত ও আশাহত জাতীয় আন্দোলন অন্যরূপে প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। বোম্বাইতে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে কংগ্রেস নেতৃত্ব পরোক্ষে তাঁদের বরাবরকার ফ্যাশিস্ত-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির এবং আগস্ট প্রস্তাবের মূল বিষয়কে (পলিসিকে) বিসর্জন দিলেন। পরিবর্তিত ও পরিবর্তমান পৃথিবীতে তাঁরা প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বকে বাস্তব দৃষ্টিতে দেখতে আজ সমর্থ নন। সোভিয়েটের ভূমিকাও বুঝ্‌তে অনিচ্ছুক। নিজেদের আন্দোলনের ঐতিহ্যকেও তাঁরা আর তাই সর্বাংশে স্বীকার করতে পারছেন না। ইতিহাস তাঁদের চক্ষে হয়ে উঠছে নিছক "পাওয়ার পলিটিক্‌সের" ব্যাপার, বিভিন্ন রাষ্ট্রের জুয়া খেলা। নিজের ভাগ্যও তাঁদের মতে অনেকাংশে একটা সুবিধাবাদী চা'লের জিনিস—অপাব্‌চুনিষ্টিক্‌ মুভ্‌এর আয়ত্ত। আর জাতীয় আন্দোলনে যা ছিল দুর্বলতা—ভারতবাসীর আভ্যন্তরীণ পার্থক্য—তাকেই ফাঁপিয়ে, বাড়িয়ে তুলে এখন একেবারে আভ্যন্তরীণ সংগ্রামে পরিণত করা চলেছে। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ভেদনীতিকেই মেনে নিয়ে তাকে করা হচ্ছে জয়ী, জাতীয়তাবাদের মিলননীতিকে করা হচ্ছে সাময়িক ভাবে ব্যাহত। এই কথা কংগ্রেস ও লীগ দুই জনপ্রিয় সংগঠন সংবন্ধেই সমান সত্য। তাই

যেখানে জনশক্তি আপনাকে এরূপে দ্বিখণ্ডিত করছে সেখানে জনমুক্তির সংবন্ধে অচিরে আশা করবার কি আছে ?

অবশ্য ভারতীয় রাজনীতিতে এই পরিণতিও ঘটেছে অতীতের আশাভঙ্গের ফলে, আর এই পরিণতি ঘটছে অনেকাংশে নির্বাচনের তাগিদে। সেই জন্যই আজাদ হিন্দ্ ফৌজ নিয়ে উন্মাদনা সৃষ্টিরও প্রয়োজন হয়েছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার করবার অধিকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নেই, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এ দেশে সাধারণত যে ব্রিটিশ-বিরোধী বিক্ষোভ সহজেই ফ্যাশিস্ত-শত্রুর পক্ষপাতী হয়ে পড়ে, এক্ষেত্রে সেই ভুলটিকেই হয়ত নেতারা প্রশ্রয় দিচ্ছেন। অবশ্য তাঁদের আশা এই, নির্বাচনের শেষে এই বিক্ষোভকেই পুঁজি করে তাঁরা অচিরেই এক নতুন সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন—যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাঁদের হাতে তখন ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে না দেয়। কিন্তু আপাতত এই বিক্ষোভ নির্বাচনের দায়ে যে খাদে প্রবাহিত হচ্ছে তা হচ্ছে অন্তর্বিরোধ,—যেমন, কংগ্রেসের লীগ-বিরোধ, লীগের কংগ্রেস বিরোধ, উভয়েরই কমিউনিষ্ট বিরোধ; দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস ও লীগ কলোনিয়াল্ বুর্জোয়া বা দেশী ধনিকের সহায়তাকে পুঁজি করে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও কৃষক সভায় সঙ্ঘবদ্ধ মজুর কৃষককে খণ্ড খণ্ড করতে সচেষ্ট হয়ে উঠছে, ছাত্র ও যুবক দলকে তো স্বদলে টানতে গিয়ে তারা বিভক্ত করবেই। তৃতীয়ত, নিজেদেরই ব্যর্থতার বিকৃতিতে তারা পৃথিবীর প্রগতিশীল শক্তিদের জয়যাত্রার ইঙ্গিত ও তাদের সহানুভূতিকে আর স্থিরচিত্তে সহজবুদ্ধিতে পরিমাপ করতে পারছে না; হতাশার বশে বরং পরাজিত প্রতিক্রিয়াশীলদের পরিত্যক্ত পদ্ধতিগুলিকেই গ্রহণ করছেন, যথা প্রভুত্বপরায়ণতা—অথোরিটেরিয়ানিজম (প্রমাণ মিঞা ইফ্তিখার উদ্দীনের প্রতি ব্যবহার), টোটেলিটেরিয়ানিজম্ (প্রমাণ, সকল সংস্থান, সকল শ্রেণীর-প্রতিষ্ঠানকে নিজের কুক্ষিগত করবার চেষ্টা), ভূয়া জঙ্গিবাদ এবং মিথ্যা বিক্ষোভ সৃষ্টি করা (হিটলার য়িহুদীদের বিরুদ্ধে যা তৈরী করছিলেন এ দেশেও তাই তৈরী করা হচ্ছে)।

কিন্তু এর মধ্যে যে আশার চিহ্ন আছে তা স্মরণীয়। দেখতে-না-দেখতে পাটেল-পণ্ডিতেরা কংগ্রেস-চিন্তা থেকে গান্ধীবাদের মধ্যযুগীয় অর্থনীতিক আদর্শ প্রায় বিদায় করে দিয়েছেন, গান্ধীজীর রাজনীতিক অহিংসার আদর্শেরও প্রায় মুলোৎপাটিত করে ফেলছেন এবং বিক্ষোভ সৃষ্টির মধ্য দিয়েও জনগণের সামাজ্যবাদবিরোধী চেতনাকে আবার প্রবল করে তুলছেন। এইটিই সর্বাপেক্ষা বড় আশার চিহ্ন। যদিও সাময়িকভাবে নির্বাচনের গৃহ-সংগ্রামে শক্তি ব্যয়িত হচ্ছে, তবু জন-চেতনা যদি একবার সুস্থ স্বাভাবিক খাদে ফিরে আসে তবে তা নিঃসন্দেহ প্রবল স্রোতে উজান বইবে।

অবশ্য সুচিন্তিত বৈপ্লবিক খাদে উপনিবেশের জন-চেতনাকে ফিরিয়ে আনা সহজ কাজ নয়—তা স্বীকার্য।

গোপাল হালদার

৬।১১।৪৫ ইং

অভিযান

(আট)

জোসেফ দাঁড়িয়েছিল বাজারের চৌমাথার ধারে। নরসিংয়ের মোটর থামতেই সে একটু হেসে নমস্কার ক'রে বললে—আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন ?

জোসেফের নমস্কারটা নরসিংয়ের ভাল লাগল না। গিরবরজার হাড়ির ছেলে! সিংহরায়দের অদৃষ্ট, লক্ষ্মী ছাড়ার পরিণাম! জোসেফের দোষ কি? তবুও সে প্রতিনমস্কার না ক'রে পারল না। হোক সে গিরবরজার হাড়ির ছেলে, তার হাড়িত্বের এক বিন্দু ছাপ আর কোথাও নাই যে, তাকে সেই বলে অবহেলা করা যায়। আচারে-আচরণে, কথায়-বার্ত্তায়, ধারায়-ধরনে সে সর্ব্বাংশে এমন যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে যে, তাকে নমস্কার না-করলে জোসেফের অপমান হবে না, জোসেফ ছোট হবে না, নরসিং নিজেই ছোট হয়ে যাবে, নিজেরই বারবার মনে হবে এটা অভদ্রতা হ'ল, নমস্কার না করাটা ঠিক হ'ল না। সে একটা ম্লান হাসি হেসে প্রতি নমস্কার করলে।

নিতাই অল্প দূরে দাঁড়িয়ে রামার সঙ্গে কথা বলছিল। ওই জোসেফকে নিয়ে কথা। কাল রাত্রি থেকেই সে জোসেফের উপর বিরূপ হয়ে রয়েছে। সে রামাকে মৃদুস্বরে বললে—বেটা হাড়ি খেরেস্তান হয়ে যেন রাজা হয়েছে। সাপের পাঁচপা দেখেছে। একবারে যেন লাট সাহেব বনে গিয়েছে।

জোসেফ এগিয়ে এল গাড়ীর কাছে। নরসিংয়ের পাশের দরজাটার উপর কনুই রেখে হেঁট হয়ে গাড়ীতে উপবিষ্ট নরসিংয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে একটি সিগারেটের প্যাকেট বার ক'রে ধরলে—খান।

ভাল সিগারেট, গোল্ডফ্লেক। নরসিং গোল্ডফ্লেক না-খাওয়া নয়। মেজবাবুর দৌলতে অনেক ভাল সিগারেট খেয়েছে। গোল্ডফ্লেক, ফাইভ ফিফ্‌টি ফাইভ, থ্রি কাস্‌ল্‌। মেজবাবুর চাকরটা দিত। দিলদরিয়া মেজবাবু গাড়ীতে হামেশাই টিন সিগারেট ফেলে যেতেন। অধিকাংশ সময়েই আর খোঁজ করতেন না। খোঁজ করলে কিন্তু একটি সিগারেট কম হলেই তিনি ক্ষেপে যেতেন। এই খোঁজের একটা সময় ছিল। সেই সময়টা পার হলেই নরসিং সিগারেটের টিনটা পকেটে ক'রে একবার মেজবাবুর কাছে অকারণে ঘুরে আসত, দেখত মেজবাবু নতুন টিন খুলে সিগারেট টানছেন। সেও ফিরে, খানিকটা এসে সিগারেট ধরিয়ে আরাম ক'রে হাপরের মত ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে গ্যারেজের দিকে চলে যেত। ভারী মিঠা সিগারেট এটা। নরসিং নিজেও কখনও কখনও দু'চার প্যাকেট কিনে খেয়েছে শখ ক'রে। চার আনা প্যাকেট। একটা সিগারেট দেড় পয়সার উপর দাম। এ সিগারেট কি তার মত ট্যাক্সি ড্রাইভারের খাওয়া পোষায় ?

গোল্ডফ্লেকের লোভ সে সামলাতে পারলে না। সিগারেট টেনে নিয়ে মুখে পুরে দেশলাই জ্বাললে; আগে সে জ্বলন্ত কাঠিটা ধরলে জোসেফের সিগারেটের সামনে, তারপর নিজের সিগারেটটা ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে জ্বলন্ত সিগারেটটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে

দেখতে লাগল। ব্যাপারটা হ'ল—ওর এই সিগারেট দেখার আগ্রহের মধ্যে দিয়েই সে যেন বলতে চাচ্ছিল—মনটা ঠিক তোমার দিকে দিতে আমি অনিচ্ছুক।

জোসেফ বললে—সিগারেটটা ভাল।

নরসিং হেসে বললে—না-খাওয়া নই। ফাইভ ফিফটি ফাইভ।

বাধা দিয়ে জোসেফ বললে—স্টেট এক্সপ্রেসটা বড় নরম।

হ্যাঁ। কিন্তু গন্ধ ভাল। তারপর থ্রি কাস্‌ল্‌। হাসলে নরসিং।

জোসেফ বললে—আমার সাহেব এইটাই খেতে ভালবাসেন। খানসামাটার সঙ্গে আমার হাফ প্রাইসে বন্দোবস্ত। স্টক বেশি থাকলে প্রায়ই দেয়। কম পড়লে তখন খোলা প্যাকেট থেকে একটা দুটো ক'রে সরিয়ে চার পাঁচদিনে এক প্যাকেট পাই।

নরসিং একটু হাসলে। তারপর বললে—আমাদের বিড়িই ভাল, বুঝলেন না। যেমন কলি তেমনি চলি, সময় বুঝে চলতে হয়, যেমন মানুষ তেমনি চাল হওয়াই ভাল। এক পয়সায় আটটা।

জোসেফও হাসলে। বললে—এটা আমাদের উপরি। মাসে মাইনে তিরিশ টাকা; কামাই করলে একটাকা তো কাটবেই—মধ্যে মধ্যে হাকিমের মেজাজ চড়লে দেড় টাকাও কাটে। তার উপর ফাইন আছে।

নিতাই এগিয়ে এসে দরজার হ্যাণ্ডেল খুলে বললে—এই আসুন বাবু এই আসুন।

জোসেফ গম্ভীরমুখে মৃদুস্বরে বললে—আজ আর ট্রিপ দেবেন না।

ট্রিপ দোব না? কেন?

কোচোয়ানেরা জোট পাকিয়ে আমার সাহেবের কাছে গিয়েছে। লাইসেন্স না নিয়ে আর ট্রিপ দেবেন না।

নরসিং বললে—হুঁ। সে এটা অনুমান করেছিল। অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে তার এই কাজে। এ কাজের হাল-হদিস, আইন-কানুন সে সবই জানে; মোটর সার্ভিসের জন্যে সরকারের হুকুম চাই, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের হুকুম চাই; পুলিশ সাহেব গাড়ী দেখে পাশ করবে—তবে হবে। নরসিংয়ের মগজটা গরম হয়ে উঠল। মাথার শিরাগুলোয় যেন গুণ দেওয়া ধনুকের ছিলার মত টান ধরে গেল। প্রতি পায়ে আইন—প্রতি পায়ে আইন! জিঞ্জির দিয়ে তামাম মুলুকের মানুষগুলোর পা বেঁধে রেখেছে। নরসিংয়ের দু'পাশের রগে দুটো শিরা মোটা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। গিরবরজার ছত্রিদের এটা বংশগত বৈশিষ্ট্য। রাগ হলেই মাথার দিকে রক্ত ছোটে। সে অবশ্য সকল মানুষেরই ছোটে কিন্তু গিরবরজার ছত্রিদের রক্ত ছোটে যেন বেশি পরিমাণে। সেই জন্য রাগ হলে তারা সামলাতে পারে না, দাঙ্গা বাধিয়ে বসে, খুনখারাপী হয়ে যায়, পরকে মারে নিজেরা মরে; পরের হাতেও মরে আবার অবরুদ্ধ ক্রোধে মাথার শিরা ফেটে গিয়েও মরে, অজ্ঞান হয়ে যায়, নাক দিয়ে ঝুঁঝিয়ে রক্ত গড়িয়ে মাটি বিছানা ভিজে যায়।

নিতাই নরসিংয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—তা হলে সিংজী?

নরসিং বললে—এক লোটা জল নিয়ে আয় তো!

নিতাই ডাকলে—রাম! এ রে রামা!

রামা একদল গেঁয়ো যাত্রীর দিকে তাকিয়ে আছে। ওদের হালচাল লক্ষ্য করছে।

মোটরে যেতে প্রলুব্ধ করবার কথা ভাবছে। রাজী ওরা চট ক'রে হয় না। পায়ে হেঁটে বিশ মাইল চল্লিশ মাইল চলে যায়; মাথায় বোঝা, কাঁধে বাঁক নিয়ে পুরুষানুক্রমে হেঁটেই চলে ওরা।

নরসিং বিরক্ত হয়ে বললে—তুই নিয়ে আয়।

জোসেফ বললে—একটা কথা বলব?

নরসিং মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকালে।

চলুন না আমার বাড়ি। একটু চা খাবেন। ওখানে বসেই বরং একখানা দরখাস্ত লিখে সাহেবের কুঠিতে নিয়ে যাব। আমার দ্বারা যতটুকু হয় করব। হাজার হলেও আমার মনিব তো! এখানে সাহেব একটা রেকমেণ্ড ক'রে দিলে চলে যাবেন সদর শহরে। পুলিশের কাছে পাশ করিয়ে—ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পারমিশন নিয়ে কালই আবার ফিরে আসবেন।

নিতাই জল নিয়ে এল নরসিং কোন উত্তর দেবার পূর্ব্বেই। জলের ঘটিটা নিয়ে খানিকটা জল ঢকঢক ক'রে খেয়ে বাকীটায় মুখ কান ঘাড়টা ধুয়ে ফেললে, খানিকটা জল মাথার উপর দিয়ে ভিজিয়ে নিলে। তারপর বললে—চলুন, তাই চলুন।

যেমন অদৃশ্য রাসায়নিক কালীর লেখা ফুটে ওঠে আগুনের উত্তাপ পেলে তেমনি ভাবে পুরানো ছত্রিরা নতুন কালের ছেলেদের মধ্যে জেগে ওঠে ওই রক্তগরমের মধ্যে দিয়ে, ঠাণ্ডা জলে নরসিংয়ের মাথার গরম রক্ত ঠাণ্ডা হতেই সে এ কালের মানুষ হয়ে উঠল। মামীর কঠোর তিরস্কারে ত্রস্ত হয়ে যে নরসিং বড় হয়েছে, ইমামবাজারের বাবুদের বাড়ির দয়ার অন্নে সংস্কারের বাঁধনের মধ্যে থেকে যে নরসিং পথ খুঁজে নিয়েছে, মেজবাবুকে সেলাম বাজিয়ে বকশিশ নিয়ে যে নরসিং খুশি হয়েছে, ড্রাইভার রহমতকে তোয়াজ ক'রে যে নরসিং ড্রাইভিং শিখেছে—সেই নরসিং। যে নরসিং এই গত কাল তামাকওয়ালাকে প্রথমটা ধমক দিয়ে শাসন করার পর তারই কাছে পঞ্চাশটাকা ভাড়া পেয়ে তাকেই সসম্মানে ভেতরে বসিয়ে শ্যামনগর পর্য্যন্ত নিয়ে এসেছে ড্রাইভ ক'রে সেই নরসিং।

*　　　*　　　*

গিরবরজার হাড়ির ছেলের বাড়ি। কিন্তু 'শূয়ার খুপরী' নয়। গিরবরজার ছত্রিরা হাড়ি ডোম বাউড়ীদের ঘরগুলোকে শূয়োর খুপরীই বলে থাকে। কথাটার মধ্যে ঘৃণা এবং অবজ্ঞা আছে তাই কথাটা কটু এবং অন্যায় শুনায়, অন্যথায় কথাটা সত্য। ছোট একখানা খড়ো ঘর। জানালা নাই, অন্ধকূপের মত অন্ধকার, ভিতরে ভ্যাপসা গন্ধ। এক-কোণে থাকে হেঁসেল, এক কোণে থাকে ছাগল, এক কোণে থাকে হাঁস মুরগী, এক কোণে থাকে দু'চারটে মাটির হাঁড়িতে কিছু চাল কিছু ডাল, কিছু পেঁয়াজ; চালের কাঠ থেকে ঝুলানো শিকেতে ঝোলে ক্ষেতের বা বাড়ির উৎপন্ন দুটো একটা কুমড়ো; মাচায় তোলা থাকে কাঠকুটো ঘুটে। রাত্রিতে তারই মধ্যে তারা শোয়। ঘরের বাইরে বাঁশের খুঁটি দেওয়া একটা চালা। চালার একপাশে হয় রান্না, এক পাশে বসে তাদের দিনের আসর।

জোসেফ গিরবরজার হাড়ির ছেলে, দু'পুরুষ আগে তার প্রপিতামহ এসে এখানে খ্রেস্তান হয়েছে। তাকে মদের দোকানে দেখে যেমন চিনতে পারেনি নরসিং গিরবরজার হাড়ির ছেলে বলে, তেমনিই ঠিক চিনতে পারলে না তাদের বাড়িতে এসে, তাদের বাড়িটাকে

হাড়ির ছেলের বাড়ি বলে। পাকা দালান কোঠা নয়, মেটে বাড়িই, কিন্তু মেঝে পাকা, দাওয়া পাকা, লম্বা বাঙলো ধরনের সারি সারি তিনখানি ঘর, তক-তক ঝক-ঝক করছে। চুনের কলি দেওয়া ধবধবে দেওয়াল, প্রতি ঘরেই বেশ মাঝারি আকারের জানালা দিয়ে আলো এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে। দরজায় দরজায় খেরেস্তানী কায়দায় সাহেব লোকের বাবুলোকের মত পর্দ্দা ঝুলছে। বাইরের বাঁধানো বারান্দায় খান দুই চেয়ার, গোটা চারেক মোড়া সাজানো রয়েছে। উঠোনটা মাটির কিন্তু চারিপাশে বাঁধানো নর্দ্দমা। উঠোনের এক পাশে তারের জালের একটা বড় বাক্সে কতকগুলি মুরগীর বাচ্চা কিলবিল করছে, পাখা ঝাড়ছে, বড় বড় মুরগীগুলো উঠোনে নর্দ্দমায় খুঁটে খুঁটে খেয়ে বেড়াচ্ছে। কয়েকটা হাঁসও রয়েছে। নর্দ্দমায় রাত্রের বাসি খাবার খাচ্ছে। একদিকে খানিকটা জায়গায় মাত্র গোটা চারেক বেলফুলের গাছ। শীতের সময় তারই মধ্যে গাঁদা এবং মোরগ ফুল লাগানো হয়েছিল, সেগুলি এই বৈশাখ মাসে শুকিয়ে গিয়েছে, এখনও সেগুলো তুলে ফেলেনি। বেল ফুলের ঝাড় কয়েকটা ফুলে ভরে আছে। ঘরের চালের উপর একটা লাউয়ের লতা উঠেছে, কচি লতা, লাউডগা সাপের মাথার মত লতার ডগাগুলা বেঁকে যেন মুখ তুলে রয়েছে। অন্য পাশ থেকে উঠেছে একটা কুমড়ো লতা। দেখে চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। বাঃ! দিল- খুশি হয়ে উঠল।

জোসেফ বারান্দায় উঠে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললে—আসুন বসুন সিংজী।

নরসিং উঠে এল, আবার একবার সব মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে বললে—বাঃ! ভারী চমৎকার আপনার বাড়ি।

জোসেফ হেসে বললে—কি করব, গরীব মানুষ নিজেরাই খেটে খুটে সব ক'রে নিয়েছি। বসুন। তারপর ডাকলে কই, মা কই?

বেরিয়ে এল জোসেফের মা। মোটাসোটা প্রৌঢ়া, পরিচ্ছন্ন কাপড় পরে সাদাসিধে বাঙালী গেরস্ত ঘরের মেয়ের মতই; কোনখানে খেরেস্তানীর ছাপ নাই। নরসিংকে নমস্কার ক'রে বললে—আপনি আমাদের গিরবরজার সিংরায় বাড়ির ছেলে! আমার কত ভাগ্যি যে আপনি আমাদের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন।

নরসিং একটু হাসলে।

জোসেফ ডাকলে রাম এবং নিতাইকে—আপনারা আসুন, বসুন।

রামটা অকারণ লজ্জায় ছোট ছেলের মত মুচকে মুচকে হাসছিল। নিতাই অবাক হয়ে দেখছিল সব। সে হঠাৎ রামকে মৃদুস্বরে বললে—এ শালাদের ভেতরে গুড় আছে বুঝলি রামা।

নরসিং ডাকলে, আয়রে বোস।

রামা উঠে গিয়ে ভাবছিল কোথায় বসবে, চেয়ারে অথবা মোড়ায়। নিতাই নিজে একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসল, একটা মোড়া রামার দিকে ঠেলে দিয়ে বললে—ব'স না রে!

জোসেফ মাকে বললে—একটু চা তৈরী করতে হবে যে।

জোসেফের মা একটু অপ্রস্তুতের মত বললে—চা খাবেন? প্রশ্ন করলে সে।

খাবেন বৈ কি। আমি নিয়ে এলাম।

জোসেফের মায়ের প্রশ্নটা নরসিংয়ের মনের ঠিক জায়গায় গিয়ে ঘা দিয়েছিল; মনটা

মুহূর্ত্তের জন্য বিদ্রোহ ক'রে উঠল। খেরেস্তানের, মুসলমানের দোকানে চা সে খেয়েছে, কিন্তু এরা যে এককালে গিরবরজার হাড়ি ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল দরখাস্তও লেখাতে হবে। এস. ডি. ও-র কাছে নিয়ে যেতে হবে এই জোসেফের সঙ্গেই। শ্যামনগর পাঁচমতী সার্ভিস খুলতে হলে জোসেফের অনেক সাহায্য চাই। সঙ্গে সঙ্গে সে হেসে বললে—খাব বই কি। তারপর জোসেফের দিকে চেয়ে বললে—আপনি কিন্তু দরখাস্তটা লিখে দিন। আর আজই ওটা যাতে সাহেব রেকমেণ্ড ক'রে দেন তার ব্যবস্থা করতে হবে।

হ্যাঁ। আমার বোন আসুক, তার হাতের লেখাটা ভাল। তাকে দিয়েই লেখাব।

আপনার বোন?

হ্যাঁ। এখানকার মেয়েদের মাইনর ইস্কুলে চাকুরী করে। এখন মর্নিং ইস্কুল, এই এল বলে। জোসেফের কণ্ঠস্বর একটু উদাস হয়ে উঠল, বললে—বড় ভাল মেয়ে, ম্যাট্রিক পাশ করলে আর পড়াতে পারলাম না! কি করবে? মিশনারী ইস্কুল—আমরা ক্রশ্চান, চাকরীর সুবিধে হ'ল ঢুকে পড়ল চাকরীতে।

নরসিং একথার কি জবাব দেবে? সে স্তব্ধ হয়ে রইল। কিন্তু এখানে বসতে সে যে অস্বস্তি অনুভব করছিল মুহূর্ত্তপূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেটুকু এক মুহূর্ত্তে দূর হয়ে গেল। নিতাই রামের হাতে একটা চিমটি কাটলে। রামা একবার উঃ ক'রে উঠল কিন্তু তার পরমুহূর্ত্তেই খুক্ খুক ক'রে হাসতে আরম্ভ করলে।

জোসেফ পকেট থেকে সিগারেট বার ক'রে ধরলে। খান ততক্ষণ। সিগারেট ধরিয়ে অকস্মাৎ প্রশ্ন করলে—কাল বললেন শুখনরামের গদিতে রয়েছেন। ওখানে উঠলেন কেমন ক'রে?

নরসিং তার মুখের দিকে তাকালে, মনে পড়ে গেল গত রাত্রের মদের দোকানের কথা। শুখনরামের গদিতে উঠেছে শুনে জোসেফ কিছুক্ষণ চুপ করেছিল, তারপর বলেছিল কাল হবে কথা। নরসিংয়ের ভ্রূ দু'টো কুঁচকে উঠল, সে বললে—কেন বলুন তো? ওকেই কাল ভাড়া এনেছি।

নিতাই বললে—বেটা ভুঁড়ের মেলাই টাকা, না মশাই? তারপর সে আকর্ণবিস্তার দাঁত মেলে বললে—আমরাও ছাড়ি নাই, পঞ্চাশ টাকা ভাড়া আদায় করেছি।

রামের মনে পড়ে গেল শুখনরামের থলথলে ভুঁড়িটা কেমন ভাবে মোটরের ঝাঁকিতে ঝাঁকিতে দোল খাচ্ছিল। সে হি-হি ক'রে হাসতে আরম্ভ করলে।

জোসেফ গম্ভীর ভাবে বললে—লোকটা ভাল নয়। পাঁচ সাতবার লোকটার বাড়ি সার্চ্চ হয়েছে।

বাড়ি সার্চ্চ হয়েছে? কেন?

লোকটা গাঁজা চরস আমদানী করে লুকিয়ে লুকিয়ে।

নরসিং কোন জবাব দিলে না; তার বড় বড় চোখ দুটো আরও বড় হয়ে উঠল; বোধ করি অপরিসীম বিস্ময়ই তার হেতু।

জোসেফ বললে—বাইরে থেকে চরস আফিং গাঁজা আনে পেশোয়ারী পাঠান পাঞ্জাবীরা, শুখনরাম এখানে তামাকের ব্যবসার সঙ্গে এ ব্যবসা চালায়। হঠাৎ হেসে বললে—তা' না হলে অত বড় ব্যবসাদার নিজে দেহাত যায়! বুঝলেন না ব্যাপারটা? এখানে ওখানে

গাঁয়ে দেহাতে যে সব এজেন্ট আছে তাদের কাছে এ ব্যবসায় মধ্যে মধ্যে নিজে না গেলে চলবে কেন? এ সব কি কর্ম্মচারী দিয়ে চলে?

নরসিংয়ের মনে পড়ে গেল ছোট্ট একটা তামাকের পেটী। গাড়ী দরুনে তামাক পড়ে থাকল ভাঙা-গাড়ীর সঙ্গে মাঠে। ওই ছোট্ট পেটীটা সে নিয়ে এল কেন? মনে পড়ল গদীর সামনে গাড়ী থেকে নেমেই শুখনরাম হুকুম দিলে, ছোটা পেটিয়াটো উতারো আগাড়ি। তারপর ছেলেকে বলেছিল—একদম উপ্পরমে লে যাও, মেরা কামরামে ঠিকসে রাখনা!

কি ছিল সেটাতে?

জোসেফ বললে—তা ছাড়া লোকটা মধ্যে মধ্যে মেয়ে কিনে আনে দেহাত থেকে। গরীব ঘরের মেয়ে—বিয়ে হয় না বদনামী হয়েছে, কি বিধবা, মা-বাপে পুষতে পারছেনা এমন মেয়ে—লোকটা বুঝে-শুঝে কায়দামাফিক কথাটা পেড়ে মা-বাপকে টাকা ধরে দেয়; নিয়ে আসে। তারপর ওই সব পাঞ্জাবী পেশোয়ারীদের বেচে দেয়। ওদের এই সব ব্যবসা আছে। পড়েননি কাগজে? কয়েকটা খবর বেরিয়েছে তো।

নরসিং এবার চমকে উঠল। খবরের কাগজ সে বড় পড়ে না, কিন্তু কথাটা মিথ্যা মনে হ'ল না। জোসেফের খবর পাকা খবর। সেই মেয়েটিকে মনে পড়ে গেল। সুন্দরী মেয়েটি। সব চেয়ে সুন্দর তার গায়ের রঙ আর চুল। মনে পড়ে গেল শুখনরামের সেই বীভৎস ভঙ্গিতে কুৎসিৎ কদর্য্য গালাগাল: "আরে হারামজাদী কুত্তি বেসরমী কাঁহাকা! কেনে হাসছিস? কাহে? কাহে?···আরে মশা ওই মেইয়া লোকটার বাত শুনবেন?··· আড়াই শও রূপাইয়া দেকে উসকে হামি কিনিয়ে আনলম মশা। উসকে পোখোরকে ঘাটসে পাকড়কে লিয়ে গিয়োসিলো চারো জোয়ান, দোঠো মুসলমান, এক আদমী বাগদী এক হাড়ি।"

চঞ্চল হয়ে উঠল নরসিং।

নিতাই বলে উঠল—ওরে শালা!

রাম ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল প্রায়। তার গলা যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। কাল যখন মোটরখানা গদির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল তখন গদির ঐশ্বর্য্যের পটভূমিতে ওই শুখনরামকে দেখে তার গম্ভীর আদেশদৃপ্ত কণ্ঠস্বর শুনে সে একবার ভয় পেয়েছিল। সে দেখাটা যেন অন্ধকারে কোন দুষমনের চেহারার আবছা চেহারা। আর এই মুহূর্ত্তে সে দুষমনের চেহারাটা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

জোসেফের মা এসে দাঁড়াল।—রজনী!

জোসেফ বললে—হয়েছে?

হ্যাঁ। কোথায় দোব?

এই যে আমি ঠিক করে দি! হেসে নরসিংয়ের দিকে চেয়ে জোসেফ রজনী দাস বললে—একটা টেবিল পাতি? চা দেবার জন্যে?

হ্যাঁ। হ্যাঁ।

হঠাৎ নরসিং ক্ষেপে উঠেছে মনে মনে। দুনিয়ার সব কিছুকে ভেঙে চুরে দেবার ইচ্ছা হচ্ছে তার। হারামজাদে শুখনরাম, সুদখোর মুনাফাখোর বানিয়া—!

লম্বা একখানি ভাঁজা টেবিল এনে সাট করে পেতে ফেললে জোসেফ। তার উপর পেতে দিলে একখানি রঙীন চাদর। জোসেফের মা চায়ের কাপ এনে নামিয়ে দিলে। বললে—বলতে ভরসা হয় না—কিছু খাবার দেব? মিষ্টি? মিষ্টিতে তো দোষ নাই।

জোসেফ হেসে বললে—মায়ের সেকালের ধাঁচ এখনও গেল না। আরও বেশি একটু হেসে বললে—আমরা সব ভাইবেরাদার মা, এক কাজ করি; এক সঙ্গে উঠি বসি। তা ছাড়া—। সকৌতুকে নরসিংয়ের দিকে চেয়ে বললে—কোন দিন তো মদের দোকানে আমাদের দেখনি তুমি!

নরসিং চুপ ক'রে রইল।

জোসেফই প্লেটে ক'রে মিষ্টি এনে নামিয়ে দিলে। তারপর একটা খাতা পেন্সিল এনে বসল, বললে—আপনার নাম, বাবার নাম, গ্রাম তো জানি—বলুন দেখি, দরখাস্তটা লিখে ফেলি। মেরীর আসবার সময় হয়েছে।

নরসিংয়ের হঠাৎ মনে পড়ে গেল ও' জেলার সদর শহরে এস. ডি. ও-র সঙ্গে যে কাণ্ডটা তার হয়ে গিয়েছে—সেই কাণ্ডটার কথা। আগে সে ইমামবাজারে ট্যাক্সি সার্ভিস চালাত এ কথা জানলেই একটা এনকোয়ারী হবে ও' জেলায়। এনকোয়ারী হবেই। তার ড্রাইভিং লাইসেন্স ও' জেলার। কিন্তু তার উপায়ই বা কি?

জোসেফ আবার তাগিদ দিলে—বলুন?

নরসিং বললে—থাক এ বেলাটা। বলব, খানিকটা কথা বলতে হবে আপনার সঙ্গে। আজ বেলা হ'ল।

ঠিক এই মুহূর্তে এসে ঢুকল একটি মেয়ে। আবলুসের মত কাল রঙ, নিতাইয়ের চেয়েও কাল। ধবধবে সাদা কাপড় জামায় হয় তো তাকে বেশি কালো দেখাচ্ছে। কিন্তু ভারী ভাল লাগল নরসিংয়ের। ভারী ভাল লাগল।

জোসেফ বললে—এই যে মেরী। ইনিই আমাদের গিরবরজার সিংহরায় বাড়ির ছেলে।

মেরী দৃহু হেসে বললে—নমস্কার।

প্রতিনমস্কার করলে নরসিং।

নিতাই অবাক হয়ে গেল। একেবারে অবিকল ইস্কুলের দিদিমণি! জোসেফের সঙ্গে সে দিব্যি কথা বলতে পারে, ইয়ার্কি করতে পারে, মদ খেয়ে গালিগালাজ এমনকি মারামারি করতে পারে। সহজে পাঞ্জা ধরেও বলতে পারে—চলে আও লড়ো পাঞ্জা! কিন্তু জোসেফের বোনের সঙ্গে কথা বলতে গেলে সে কিছুতেই আপনি না বলে পারবে না।

রামা কিছুতেই হাসতে পারছে না, মেয়েটার এত কালো রঙ তবু সে হাসতে পারছে না।

মেরী নীলিমা দাস। জোসেফ রজনী পরিচয় করিয়ে দিলে। মেয়েটি কথা বলে কম। অল্প কয়েকটি কথা বললে সে। বেশ হাসিমুখে কথা বললে—কথাগুলিও বেশ মিষ্টি লাগল নরসিংয়ের। শুধু মিষ্টি নয়—কথাগুলি যেন একটু ভারী ভারী মনে হ'ল। এ ধরনের ভারী কথা বেশ একটু মানী লোকেরাই বলে থাকে। ওই কালো মেয়েটি বয়সে জোসেফের

চেয়ে ছোট, জাতে এক সময় হাড়ি ছিল ওর পূর্ব্বপুরুষ, তবুও আশ্চর্য্যের কথা—এ ধরনের কথা মেয়েটির মুখে বেমানান বলে মনে হ'ল না। সে হাসিমুখে বেশ সহজভাবে বললে—ছেলেবেলায় আমার ঠাকুরদাদা বলতেন গিরবরজার গল্প। সিংহরায়দের সিংহদের কথা। ভারী ভাল লাগত আমাদের। রাজা রাজড়ার গল্পের চেয়েও ভাল লাগত। সে আরও একটু মিষ্টি হাসি হেসে চুপ করলে।

নরসিং গম্ভীরভাবে বসেছিল, মেয়েটি আসার পর থেকেই সে একটু বেশি গম্ভীর হয়ে উঠেছে। সে একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই।

নীলিমাও এক কাপ চা নিয়ে বসেছিল, সে চায়ের মধ্যে চামচ ডুবিয়ে নাড়তে নাড়তে বললে—আবার আপনারা সব করবেন! এই তো আপনি নতুন পথ ধরেছেন।

নরসিং বললে—এতে কি আর সে দিন ফিরে আসে? এবার সে একটু ম্লান হাসি হাসলে।

সে আর এখন মোটর ড্রাইভার নরসিং নয়, গিরবরজার ছত্রি সিংহরায় বাড়ির ছাওয়াল সে, কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ছে গিরবরজার একটি গল্প। খুব বেশিকালের কথা নয়, কোম্পানীর আমলের কথা। তখন সবে গিরবরজার ছত্রিদের জালানো আগুনের আঁচে অস্থির হয়ে মা-লক্ষ্মী গিরবরজা ছেড়েছেন, লাগামছেঁড়া পাগলা লালঘোড়া নিয়ে ঘোড়-দৌড়ের খেলা খেলছে ছত্রিরা, মনের ভিতরের ঘর আলো করা মতি তখন তারা হারিয়েছে কিন্তু মাথার পাগড়ীর শিরপুছ বাতাসে পিছনের দিকে হেলে না পড়লে তাদের চমক ভাঙ্গে, মনে হয়—একি! মাথাটা নুয়ে পড়ল নাকি? সেই সময়ের কথা। পাশের গ্রামে এক সদ্‌গোপ অবস্থাপন্ন হয়ে উঠেছিল। ছত্রিরা সদ্‌গোপদের বলত চাষা। বড় বড় সিংহরায়রা বলত—চাষো। হালে-বলদে, ধানে মড়াইয়ে, ক্ষেতে খামারে, জলকর ফলকরে বাগ-বাগিচায় লোকটা দেখতে দেখতে ফেঁপে উঠল।

লোকে বলত লক্ষ্মীর সংসার। হঠাৎ লোকটার মাথায় ভর করলে বেওকুফির সয়তানী। সে নীলামে কিনলে সিংহরায়দের কতকটা আবাদী জমি। দখল নিয়ে দাঙ্গা হ'ল। জখম হয়ে পড়ে গেল দু'তিন লাঠিয়াল ক্ষেতের চষা মাটির উপর, দুষমনের রক্ত শুষে নিলে ছত্রিদের ক্ষেত। হটে যেতে হ'ল সদ্‌গোপকে। তার পর হ'ল মামলা। মামলা গিরবরজার ছত্রিরা করলে না, করলে সদগোপ। ছত্রিরা হ'ল আসামী। শিরপেঁচ বেঁধে গোঁফে চাড়া দিয়ে আসামীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াল। পিছনে হেলে রইল পাগড়ীর শিরপুছ। সদগোপের বরাত, আর ছত্রিদের মাথার দেবতা বাবা ভিখারী মহাদেওজীর কৃপা—হঠাৎ সদগোপটা মরে গেল মামলার মধ্যেই। এর পর একদিন এক সওয়ারী অর্থাৎ পাল্কী এসে নামল সিংহরায়দের অন্দরের দরজায়। নামল এক বিধবা ছোট এক ছেলের হাত ধরে। ওই সদগোপের বিধবা সে। মামলাটা মিটিয়ে নিতে এসেছে। তবে হাঁ, মেয়েটি মেয়ের মত মেয়ে বটে। রূপ তো ছিলই তার উপর লছমীর প্রসাদ পেয়েছে সে তখন। কপালের উপর চুলের সীমানা বরাবর মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে সিংহ রায়ের সঙ্গে কথা বললে। কথার তার ধার কি! প্যাঁচ কি! জেদ না, জোর না, আইন না, তুললে সে ন্যায় অন্যায়ের সওয়াল। বললে—ফৌজদারী মামলা আমি তুলে নিচ্ছি কালই। আপনারা ছত্রি, ব্রাহ্মণের নীচেই আপনারা, চিরকাল আপনাদের আমরা প্রণাম ক'রে এসেছি, রাজা বলে এসেছি; আমার

স্বামী ফৌজদারী করেছিল তার জন্যে আমি কসুর মানছি। কিন্তু বিচার আপনাকেই করতে হবে। এই আমার নাবালক বাচ্ছা। এর বাপ টাকা দিয়ে নীলামে জমি কিনেছে। সে নীলামে তার যোগসাজস থাকে, কোন কারচুপী থাকে বাজেয়াপ্ত করুন তার দাবী। কিন্তু যদি সে কসুর না থাকে তার টাকা যদি হকের হয় তবে তার দাবী কায়েম করবার ভার আপনাকে নিতে হবে। আবার প্রণাম ক'রে সে চলে গেল ছেলের হাত ধরে পাল্কীতে সওয়ার হয়ে। ষোল কাহার হুম-হুম ক'রে যে সোর তুলতে পারলে না গিরবরজা গাঁয়ে ওই মেয়েটির মিষ্টি অথচ জোরালো কথা ক'টি সেই সোর তুলে দিয়ে গেল। গিরবরজার সিংহ রায় বাড়ির ঘরের কোণে কোণে যেন সেই কথার ধ্বনি বাজতে লাগল। জমে রইল সে কথা।

সিংহ রায় গেল তারপর সদ্‌গোপের বাড়ি। ছেড়ে দিয়ে এল জমি। ছেলের হাতে দিল একটি মিঠাইয়ের ঠোঙ্গা আর বললে, যাও বেটা, তুমার জমির দখল তুমি লে লেও। হামার দাবী ছুট গিয়া।

মেয়েটি বেরিয়ে আবার তাকে প্রণাম করলে, আসন দিয়ে বসালে, তরিবৎ ক'রে ফল কেটে সাজিয়ে নামিয়ে দিলে সামনে। পান দিলে আর দিলে এক মোহর প্রণামী। বললে—শুধু তো এতেই আপনাকে আমি রেহাই দিতে পারব না; আমার আরও আরজী আছে। আমার বাচ্ছা বড় না হওয়া পর্য্যন্ত আপনাকে দেখতে হবে। নজর রাখতে হবে।

গিরবরজার ছত্রি সিংহ রায় পান চিবিয়ে মুখ লাল ক'রে ফিরে এল। লোকে বাহবা দিলে মেয়েটাকে। হাঁ একটা রানীর মত মেয়ে। আচ্ছা বুদ্ধি, সিংহ রায়কে বুদ্ধির খেল দেখিয়ে দিলে!

হা হা ক'রে হাসল সিংহ রায়।—ঠিক কথা। মেয়ে লোকের সম্বল হল বুদ্ধি—পাতলা ছুরীর মত তার ধার, মিহি কাটে কাটাই ওর ধরম। পুরুষ হল মর্দ্দানা, তার ধরম হল পৌরুষ। সে হ'ল তলোয়ারের মত। পাতলা ছুরী তলোয়ারের গায়ের ময়লা সাফ করে চিরদিন। মাটি লাগলে চেঁচে ফেলে, রক্ত মাংস লেগে থাকলে সাফা ক'রে নেয়। আমার গায়ে বে-ধরমীর ময়লা লেগেছিল পাতলা ছুরী সাফা ক'রে দিলে। এতে আর সরমটা কোথায়!

নরসিং নিজে তলোয়ার ব্যবহার করে নাই, তার আমলে তার বাপদাদাদের মধ্যেও তলোয়ার ব্যবহারের রেওয়াজ উঠে গিয়েছিল। কিন্তু সে বলিদান দেখেছে। ছেত্তাদারের কোমরে থাকে ধারালো ছুরী, প্রতিবার বলিদানের পরই সে ওই ছুরী দিয়ে খাঁড়ার রক্ত মাংস মেশানো মাটি সত্যিই চেঁচে ফেলে দেয়। যাক সে কথা।

সিংহ রায়ের কথাটা প্রমাণ হয়ে গেল কিছুদিনের মধ্যেই। লছমীর প্রসাদ পাওয়া, পাতলা ছুরীর মত ধারালো-বুদ্ধি যে মেয়ে, যে সওয়ালে হারিয়ে দিয়েছিল সিংহ রায়কে, যে ষোল বেহারার পাল্কী হাঁকিয়ে এসেছিল একদিন গিরবরজা—সেই মেয়ে একদিন চার বেহারার ডুলী চেপে এসে উঠল সিংহ রায়ের বাপের কাটানো পুকুরের পাড়ে থাম বাগিচার মধ্যে যে এক বাড়ি তৈরী করিয়েছিল আরামখানা নামে, সেই আরামখানায়। তলোয়ারের চেয়ে পাতলাধার ছুরী তলোয়ারের তাঁবেদারিণ হয়ে রইল এরপর চিরদিন।

কথাটা স্মরণ ক'রে নরসিং আজও আরও গম্ভীর হয়ে উঠল। বললে, আচ্ছা আজ তা' হলে উঠি।

জোসেফ বললে—ও বেলা কখন আসছেন ?

ও বেলা ?

হ্যাঁ। দরখাস্তটা লিখতে হবে, কি সব কথা বলবেন বললেন।

হাঁ হাঁ। দুই হাতের তালু দিয়ে গোঁফের দুই প্রান্ত উপরের দিকে তুলে দিয়ে নরসিং বললে আসব। ভেবে হিসেব ক'রে দেখি দাঁড়ান।

আবার খটকা লাগল ? হাসল জোসেফ।

খটকা ? নরসিংও হাসল।

সমস্ত দুপুরটা ভাবলে নরসিং। অনেক ভাবনা। রান্না রান্না করলে। খাওয়া দাওয়া সেরে সে মন ঠিক করলে। বিকেল বেলা শুখনরাম গদীতে এসে বসতেই সে গেল সেখানে; একটা চাকর একটা গেলাসে সিদ্ধির ঠাণ্ডাই এনে ধরলে শুখনরামের সামনে। শুখন মদ খায় না, সিদ্ধি, তারপর এক কল্কে চরস, তারপর গাঁজা। শুখন নরসিংকে দেখে ভ্রূ কুঁচকে বললে—কেয়া সিংজী ? অ্যাঁ ? আজ পাঁচমতী তো চার-পাঁচ খেপ দিলেন! সার্ভিস খুলবেন।

নরসিং বললে—খুলি—যদি আপনি থোড়াথুড়ি সাহায্য করেন।

হামি ? হা-হা ক'রে হাসলে শুখন। আরে সীয়ারাম! সিংজী উ কেরেয়া খাটাকে কাম হামি পারবে না। হামারা বহুৎ কাম—ওহি কাম হামি দেখতে পারছি না ভাই।

নরসিং মুখটা একটু এগিয়ে এনে বললে—আপনার সুবিধে হবে মোটর সার্ভিস থাকলে, পাঁচমতী থেকে শ্যামনগর আপনার মাল আসবে মোটরের মধ্যে।

শুখনরাম চকিত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকালে কিন্তু কোনো কথা বললে না।

নরসিং বললে—ছোট পেটীর মাল আপনার।

শুখনরাম হঠাৎ নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হাঁকেডাকে কর্ম্মচারীরা ব্যস্ত হয়ে উঠল। খাতার পর খাতা আসতে লাগল তার সামনে। সেই ব্যস্ততার মধ্যেই শুখন বললে—হামার এখুন অনেক কাম মশায়, আপনার কথা শুনব থোড়া বাদ।

সন্ধ্যার পর সে তাকে ডাকলে বাড়ির ভিতরে।

বলেন মশা—আপনার বাত।

নরসিং বললে—আমি তো বলেছি। এখন বলবেন আপনি।

কে আপনাকে কি বলিয়েছে ওহি বাত হামি পুচছি।

হাসলে নরসিং। বলবে কে শেঠজী! আমি গিরবরজার সিংহ রায় বাড়ির ছেলে। শ্যামনগরে কে কি করে, কি দিয়ে ভাত খায় আমি জানি না!

অনেকক্ষণ পর শুখনরাম বললে—বাস্, হামাকে কি করতে হোবে বোলেন ?

কি করতে হবে ? প্রথম সার্ভিস লাইন খুলতে সাহায্য করতে হবে। দুশো-চারশো টাকা ধার দিতে হতে পারে। আমি গাড়ী বন্ধক রাখব অবিশ্যি। আর বিপদে-আপদে দেখবেন এই আর কি।

বস্। ঠিক হ্যায়। হামার বাত হামি দেই দিলাম। বস্।

দেখুন, ঠিক তো ?

ঠিক—ঠিক—ঠিক।

আচ্ছা রামরাম। এখন তা হ'লে আমি সব ঠিকঠাক করি! গাড়ীটাকে পাশ করবার আগে খানিকটা মেরামত করা দরকার। মেরামত সে নিজেই করবে। ডাক্তারী পড়তে গেলে ছাত্ররা যেমন মড়া কেটে চিরে চিরে মানুষের শরীরে সব দেখে শেখে, রহমতের কাছে সে তেমনিভাবেই গাড়ীর সব চিনেছে। কতকগুলো পার্ট্‌স দরকার শুধু। শুখন-রামের কাছে টাকা ধার নিয়ে কলকাতা থেকে সে'সব কিনে আনবে সে। কলকাতা তাজ্জবকে শহর! দিদিয়া বলত বাগদাদের গল্প। বাগদাদের মত আজব শহর। মনে পড়ে রাত্রে রঙ ধরা চোখে কসবীদের পাড়ার ঝলমলে আলোয় আলো করা রাস্তার কথা! একদিন স্ফূর্তি ক'রে আসবে সেখানে। হঠাৎ নরসিং চমকে উঠল। সিঁড়ির বাঁকের মুখে কোণে কে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘোমটা দিয়ে সাদা থান পরণে, বেরিয়ে আছে শুধু দু'টি নিরাভরণ হাত। নরসিংয়ের বুকের রক্ত তোলপাড় ক'রে উঠল। পিছনের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে সে খপ ক'রে তার মাথার ঘোমটাটি খুলে দিলে।

সেই মেয়ে! গাড়ীর চাকায় লেগে দেশান্তরে এসে পড়া মাটির টুকরোর মত শেঠের বাড়ির সিঁড়ির কোণে পড়ে আছে। বিহ্বল দৃষ্টিতে মেয়েটি তার দিকে চাইলে। নরসিং মৃদুস্বরে বললে—তোমাকে বেচে দেবে—পাঞ্জারীর কাছে কি পেশোয়ায়ীর কাছে।

মেয়েটির মুখ সাদা হয়ে গেল ভয়ে।

নরসিং বললে—পার তো আজ রাত্রে বাইরে আমরা যেখানে থাকি সেখানে এস।

(ক্রমশঃ)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পুস্তক-পরিচয়

মানব-সমাজ—(প্রথম খণ্ড) মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন। অনুবাদক, সুবোধ চৌধুরী। প্রকাশক, পুঁথিঘর। ২২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

বাইবেলে আছে ঈশ্বর ছয়দিনে পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এক জোড়া করিয়া জলচর ভূচর খেচর সৃষ্টি করা হইল, তাহারাই বংশবৃদ্ধি করিয়া জন্মমৃত্যু আবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট নিয়মে চলিতেছে। মানুষের বেলায়ও ঐ কথা—একজোড়া আদিম দম্পতির সন্তান-সন্ততিই সমগ্র মানব জাতি। ভারতীয় বেদ বা পুরাণে একেশ্বর-বাদ নাই। বহু দেবতা মিলিয়া বিশ্বজগত সৃষ্টি ও পরিচালনা করিয়াছেন। এক ব্রহ্ম বহু হইলেন এ ধারণা বহু পরে। ভারতীয় আর্য্যরা মানবজাতিকে একটি দম্পতির সন্তান মনে করিতেন না। প্রজাপতি ব্রহ্মা জগত সৃষ্টি করিলেন—তাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, জঙ্ঘা হইতে বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্রের উদ্ভব হইল। এই চারি শ্রেণীর মানুষ

স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করিবে, অন্যথা ধর্ম্মহানি। কিন্তু মানুষ ক্রমে ধর্ম্মদ্রোহী দুষ্ট হইয়া ভ্রষ্ট হইল। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি পুরাণের গল্পে মানুষের ক্রমে অধঃপতন। সত্যযুগে দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি, অকালমৃত্যু, দুঃখ-কষ্ট ছিল না—ডাকিবামাত্র দেবতারা আসিয়া সব অভাব পূরণ করিয়া দিতেন; স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যে কোন ব্যবধান ছিল না। গ্রহনক্ষত্রগুলি এবং রহস্যময় হিমগিরি ছিল দেবতাদের বাসভূমি। ঋষি ও রাজারা এখানে স্বচ্ছন্দে রথে চড়িয়া যাতায়াত করিতেন। এমন কি দ্বাপর যুগেও অর্জ্জুন ইন্দ্রের দেবসভায় বসিয়া উর্ব্বশীর নৃত্য উপভোগ করিয়াছেন। তিন চার হাজার বৎসর এই কবিকল্পনা আমাদের সৃষ্টির রহস্য জানিবার কৌতূহল চরিতার্থ করিয়াছে। দম দেওয়া ঘড়ির মত ঈশ্বরের অমোঘ নির্দ্দেশে জগত চলিতেছে, সবই ঈশ্বরের লীলা—অতএব তর্ক করিও না,—কেন না তর্কে বহুদূর, বিশ্বাসেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটিবে।

কিন্তু তবু মানুষ তর্ক করিয়াছে। এই তার্কিকের দল অপৌরুষেয় বেদবাণীতে সন্দেহ করিয়া সৃষ্টির রহস্যকে অধিকতর রহস্যময় করিবার জন্য আনিল উপনিষদ, বেদান্ত, ব্রহ্মজ্ঞান; দার্শনিকগণ দীর্ঘকাল চিন্তাজগতে প্রভুত্ব করিবার পর তাঁহাদেরই বংশের ধারায় দেখা দিল বিজ্ঞানী। ডারউইন বলিলেন এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে মানুষ হইতে কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত বিবর্ত্তনের ফল। বানরশ্রেণীর এক জাতীয় মস্তিষ্ক ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বহু লক্ষ বৎসরে বহু রূপান্তরের মধ্য দিয়া মানুষকে সম্ভব করিয়াছে। যে মানুষ পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছে, হাত পা'র পৃথক ব্যবহার বুঝিয়াছে, পাথর ছুঁড়িয়া অথবা তীক্ষ্ণাগ্র কাষ্ঠফলক দিয়া পশু পক্ষী মৎস বধ করিয়া উদর পূর্ত্তি করিয়াছে—তাহার বয়স ত্রিশ হাজার বৎসরের অধিক নহে। গৃহবাসী, রাজা জমিদার, ব্যবসায়ী, কৃষক শ্রমিক, পুরোহিত প্রভৃতিতে বিভক্ত মানব সমাজের বয়স সাত আট হাজার বৎসরের অধিক নহে। বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে অণ্ডজ ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে মানুষই বয়োকনিষ্ঠ।

বিজ্ঞানীরা মানুষের ইতিহাসকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন; বন্য, বর্ব্বর, ও সভ্য। ইহার মধ্যেও অবশ্য আরও কতগুলি স্তর আছে। ভূগর্ভের নরকঙ্কাল মানুষের পাথুরে ও ধাতব অস্ত্রশস্ত্র, ব্যবহৃত মৃৎপাত্র, গিরিগুহার ও সমাধির নিম্নে প্রোথিত আসবাব ইত্যাদির খণ্ড খণ্ড প্রমাণগুলিকে একত্র জুড়িয়া, সভ্য মানুষের প্রাচীন গ্রন্থের জনশ্রুতি কিম্বদন্তী সংগ্রহ করিয়া, জীববিজ্ঞানীরা দুই শত বৎসরের গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে মানব সমাজের সৃষ্টি ও বিস্তারের যে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, যুক্তিপন্থী মানুষ তাহা অস্বীকার করিবে কি করিয়া।

রাহুলজীর গ্রন্থখানিতে (১) মানব সমাজের বিকাশ (২) বন্য মানব সমাজ (৩) বর্ব্বর মানব সমাজ (৪) ও (৫) সভ্য মানব সমাজ—এই কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত। তাঁহার আলোচনার প্রধান মৌলিকতা এই যে, বর্ব্বর যুগ হইতে ভারতীয় আর্য্য সমাজের ক্রম-বিকাশের ধারার সহিত অন্যান্য প্রাচীন জাতির সমাজবিকাশের ধারার সহিত তুলনামূলক বিচার। পিতৃসত্তা-যুগ অতিক্রান্ত হইবার পর আর্য্যরা যখন পাঞ্জাবে প্রবেশ করেন, তখন এক প্রকার প্রজাতন্ত্র তাঁহারা স্থাপন করিয়াছিলেন। লেখকের মতে ১৫০০ খৃষ্টপূর্ব্ব অব্দের সমসাময়িককালে বেদ রচিত হয়। বুদ্ধের জন্মের সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে আর্য্য সভ্যতা ও সমাজে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা নিখুঁত হইয়া উঠিয়াছিল। পুরাণ, সংহিতা, স্মৃতি, বৌদ্ধশাস্ত্র প্রভৃতি হইতে ভারতীয় সমাজের ক্রমবিবর্ত্তনের ধারা এমনভাবে ইতিপূর্ব্বে আর কেহ

উদ্ঘাটিত করেন নাই। কি ভাবে অনার্য্যরা যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিল এবং ক্রমে আর্য্যদেহে মিশিয়া গেল, তাহার সমাজবিজ্ঞানসম্মত আলোচনা বিশেষভাবে মিশর, গ্রীস, ব্যাবিলন, আসিরীয়, ঈরানীয় সভ্যতার সহিত তুলনামূলক আলোচনা তথ্য ও যুক্তির দিক হইতে অতুলনীয়।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের যে সকল বদ্ধমূল মূঢ় ধারণা আছে, তাহার উপর গ্রন্থকার সত্যের কশাহস্তে অতি নির্ম্মম আঘাত করিয়াছেন। পুরোহিত ও রাজন্য-বৃন্দের মিলিত লোভ ও চাতুর্য্যে সমাজে ধর্ম্মের অনুশাসন দ্বারা প্রগতি বন্ধের কৌশল সেকালেও অজানা ছিল না। আদিম সাম্যবাদী সমাজের অর্থাৎ 'সত্য যুগের' স্মৃতি মানুষের মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য সকল দেশের মতই ভারতে সম্রাট রাজাদের অনুগ্রহজীবী স্মৃতিকারেরা সমাজবৈষম্যকে বিধির বিধান বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। এবং ইহার ফলে সদাচার ও কদাচারের আদর্শ দম্ভ ও অনুকম্পা সমাজের এক এক স্তরে এক এক রূপ হইল। ভারতের সামন্ততান্ত্রিক যুগের সমাজব্যবস্থার শক্তি, দৌর্ব্বল্য, সমৃদ্ধি ও দারিদ্র্য, ধর্ম্ম ও নীতির বৈচিত্র্যময় বিবর্ত্তনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া সুপণ্ডিত গ্রন্থকার ভারতীয় সমাজতত্ত্ব আলোচনায় যে নূতন পথে অগ্রসর হইয়াছেন, এক ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ব্যতীত সে পথের আর কোন পথিক আমরা দেখি নাই। হিন্দী হইতে অনূদিত এই গ্রন্থখানি বাঙ্গলা সাহিত্যের সম্পদ। এ স্থলে অনুবাদকের কৃতিত্বের কথাও বলা উচিত। তিনি মূল গ্রন্থের শব্দাবলী ও প্রকাশভঙ্গী অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বহু পারিভাষিক শব্দ সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন যাহাতে অপণ্ডিতদেরও পড়িয়া বুঝিতে কষ্ট হয় না।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

LITTLE GOLDEN AMERICA—Ilya Ilf and Eugene Petrov. Eagle Publishers, Calcutta. Rs 6/-

যে বিধাতা আছেন কি নেই তাই নিয়ে বিশাল এক দর্শনশাস্ত্র রচনা হয়ে গেছে ; তিনি যে পরিস্থিতি-পরিকল্পনা-পটু, এ বিষয়ে মনে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না, তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে যা'ই মতভেদ থাকুক না কেন। কল্পনা ক'রে দেখুন দু'জন, সম্ভবত আধা-বয়সী সুরসিক সোভিয়েট-তন্ত্রবাদী সাহিত্যিক মার্কিন-ভ্রমণে বেরিয়েছেন ; মাঝারি-মূল্যের একখানি ধূসর বর্ণের মার্কিনী মোটর চড়ে, সারথী একজন অনতিনবীনা, অনতিসুন্দরী রসগ্রহণ-সুনিপুণা মার্কিন রমণী ; পথপ্রদর্শক তাঁর বিগতযৌবন, চিরতরুণ পতি, যিনি একাধারে জ্ঞান ও কৈবল্যের কল্পতরু।

অদ্ভুত এই যাত্রা, নিউ-ইয়র্কের প্রাসাদশ্রেণীবেষ্টিত আধুনিকতম কংক্রিটের রাজপথে যার সূচনা, এবং আদ্যোপান্ত ঐ আধুনিকতম কংক্রিটের রাজপথ ধ'রেই যার পরিশেষ। সেই বিবিধ-বিজ্ঞাপন-মণ্ডিত রাজপথের কোনও বৈচিত্র্য অথবা বৈষম্য নেই। সে ওয়াশিংটন নগরে যেমন নিখুঁত, কলোরাডো উপত্যকাতেও তেমনই ; সুঘন বনভূমিতেও যেমন প্রশস্ত ও যাত্রীশালাবিশিষ্ট, তরুহীন মরুভূমিতেও তেমনই। এই রাজপথ মার্কিনী কর্ম্মকুশলতার চরম নিদর্শন।

বইটির নাম "খুদে সোনালী মার্কিনদেশ"। খুদে, কারণ ধনিকসর্বস্ব মার্কিনী কর্ম-কৌশলের দূরদৃষ্টি নেই। এবং সোনালী, কারণ ডলারের নেশা লেগেছে সর্বত্র।

কাহিনীটি খুলেই বলি। দু'জন রুশ রস-রচয়িতা জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে অ্যাটলান্টিক তীর থেকে প্যাসিফিক্-তট, এবং পুনরায় ভিন্ন পথে প্যাসিফিক্-তট থেকে অ্যাট্‌লান্টিক তীর পরিভ্রমণ ক'রে এসে হৃষ্টচিত্তে স্বদেশে ফিরলেন। এই ভ্রমণের তুলনা হয় না। কী না দেখলেন এঁরা। সিংসিং কারাগারের বৈজ্ঞানিক সব ব্যবস্থা, নায়গারা জলপ্রপাতের বৈদ্যুতিক কারখানা, মেক্সিকোর রেডইণ্ডিয়ান ফোর্ডের কারখানা। হলিউডের বিলাস, অ্যাণ্ডিজ পর্বতের গগনভেদী বনরাজি সমস্তই নিখুঁত ও দর্শনযোগ্য। যদি কোথাও কিছু অযোগ্য ও মলিন থাকে, সে যাত্রীদৃষ্টির অন্তরালে। যেমন শিকাগোর পাপ, আবর্জনার আধার গলিগুলি, যেমন রেডইণ্ডিয়ান ও নিগ্রো সমস্যা।

অপূর্ব অভিজ্ঞতার যাত্রা। একদিকে মার্কিন ধনদৌলতের অভাবনীয় কীর্তিমালা; যা' বিশ্বের সকল সুখ সকল শক্তিকে আহরণ ক'রে জনসাধারণের সেবায় নিযুক্ত করেছে। এত সামান্য ব্যয়ে এত বিলাস কল্পনার অতীত ছিল। মরুভূমির মধ্যে আছে কেবল পেট্রল স্টেশন নয়, তুষারশীতল জল পরিবেশনকারিণী সুদর্শনা আধুনিকা। যা কিছু ভালো যা কিছুর বিন্দুমাত্র যোগ্যতা আছে—মার্কিনদেশে তা'কে পয়সা দিলেই কিনতে পাওয়া যায়।

তার উপর অপরূপ মার্কিনী আতিথেয়তা, যার ক্লান্তি নেই, সীমা নেই। অদ্ভুত মাকিনী ব্যবসায়ীর সততা, যার জন্য কথাচ্ছলে যা একবার মার্কিনকণ্ঠ উচ্চারণ করেছে প্রাণ দিয়ে তা রক্ষিত হবে। অভাবনীয় মার্কিনী "সার্ভিস" যার বাংলা তর্জমা হয় না, কিন্তু যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতম শক্তিগুলিকে অক্লেশে কি নগরবাসী কি মরুভূমিবাসী জনসাধারণের সেবায় নিয়োগ করে।

অপর দিকে রুশবুদ্ধি স্তম্ভিত হ'চ্ছে দেখে অভাবনীয় ধনদৌলতের পাশে অবর্ণনীয় দারিদ্র্যদুঃখ, কর্মহীনতা, ব্যবসা চাতুরী, গুণ্ডামী, মানসিক অলসতা, এবং সর্বোপরি মার্কিনী রাষ্ট্রের দৃষ্টিহীনতা যা প্রতি বৎসরান্তে জমাখরচ মিলিয়ে লাভের অঙ্কটি শিখে রাখে, কিন্তু চিরকালের জন্য স্থায়ী কিছু সৃষ্টি করে না। ডলারের স্থান সর্বোচ্চ, তার দীপ্তিতে জ্ঞান ও প্রতিভা হারিয়ে যাচ্ছে।

বারংবার রুশবুদ্ধি পরাহত হ'চ্ছে এই নিষ্ফল বৈচিত্র্যহীন প্রয়াস দেখে, যার পণ্ডশ্রম সমুদ্রের ঢেউয়ের ওঠা-পড়ার মতনই বিভ্রান্তিকর। মার্কিনদেশ যক্ষরাজের যোগ্য ধনরাশি উৎপাদন ক'রেই ক্ষান্ত হ'চ্ছে না, কিন্তু অভাবনীয় ভোগের সামগ্রী পরিবেশন ক'রেই নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে। কারণ তার বেশিকিছু অর্থবাদী মার্কিন কল্পনার বহির্ভূত।

বিশাল মার্কিনদেশের প্রত্যেকটি ছোট শহরের পারিপাট্য দর্শনীয়, তবু নিরন্তর আমেরিকার পর্বত প্রান্তরে হতাশ যুবকের দল স্যুটকেশ হাতে চাকুরী খুঁজে বেড়ায়।

মার্কিনী ঐশ্বর্য রুশ-বিচারের পরীক্ষা পাশ ক'রে না। উপরন্তু খাদ্যপ্রাণ শ্বেতসার দুগ্ধ মাখনবিশিষ্ট মার্কিন আহার স্বাস্থ্যপ্রদ হ'তে পারে কিন্তু সে রুশ রুচি বিগর্হিত।

এই বিচিত্র বিস্ময়কর চিত্তাকর্ষক ভ্রমণ কাহিনীটি ভারতীয় পাঠকের সহজলভ্য ক'রে প্রকাশকগণ রসিক সমাজের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

লীলা মজুমদার

পত্রিকা-প্রসঙ্গ

নতুন জীবন। সম্পাদক—সুনীলকুমার ধর।

'নতুন জীবন' যৌনতত্ত্ব ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত মাসিক পত্র। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এত এত সাহিত্য পত্রিকা থাকতে যৌনতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যবিষয়ক পত্রিকার প্রসঙ্গ কি জন্য?

একটি কারণ এই যে নতুন জীবনের পৃষ্ঠাগুলি প্রধানতঃ যা দিয়েই ভরা থাক, এটিও সাহিত্য পত্রিকাই। আমার বিবেচনায়, কেবল গল্প কবিতা উপন্যাসবোঝাই অনেক তথাকথিত সাহিত্য পত্রিকার চেয়ে উচ্চাঙ্গেরও, বটে। গল্প উপন্যাসও নতুন জীবনে কিছু কিছু স্থান পেয়ে আসছে, যদিও সেগুলি একটু বিশেষ ধরনের, উদ্দেশ্যমূলক।

আর একটি কারণ, নতুন জীবনই একমাত্র পত্রিকা যা বাংলা ভাষায় এই ধরনের সাময়িক-পত্রের অভাব মেটাবার আদর্শ সামনে রেখে সক্রিয় প্রচেষ্টা করে আসছে বলা যেতে পারে। যৌন ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রথম শ্রেণীর একটি জনপ্রিয় সাময়িক পত্রের অভাব নতুন জীবন মেটাতে পেরেছে বলতে পারি না, কিন্তু ভাল জিনিস পরিবেশন করে সত্যসত্যই পাঠকের উপকার করার আন্তরিক প্রেরণা এই পর্য্যায়ের মাসিকগুলির মধ্যে নতুন জীবনেই খুঁজে পেয়েছি। অন্য যে পত্রিকা আমি দেখেছি তাতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির এবং যৌন ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় জ্ঞান পরিবেশনের ভানটাই শুধু আছে—বিকারগ্রস্ত মানুষের মনে নিষিদ্ধ অশ্লীল বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করার যে চুলকানি আছে সেটা উস্কে পত্রিকা চালানই অনেকের আসল উদ্দেশ্য। এমন কি বিজ্ঞানপন্থী পত্রিকা বলে ঘোষিত হলেও যৌনব্যাধি ও স্বাস্থ্যহানির হাতুড়ে ওষুধ আর মাদুলি তাবিজের লোক-ঠকানো স্পষ্ট জুয়াচুরির বিজ্ঞাপনও এই সমস্ত পত্রিকায় অনায়াসে স্থান পায়।

এ বিষয়ে নতুন জীবনের সম্পাদকের নিষ্ঠা প্রশংসনীয়। ফাঁকিবাজী বিজ্ঞাপন—পয়সা যাতে বেশী মেলে—তাঁর কাগজে ছাপা হয় না। অতি সহজে আইন বাঁচিয়ে বিজ্ঞাপনের এই ঘৃণিত ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে সুনীলবাবু নতুন জীবনে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। সমস্যাটা সত্যই তুচ্ছ নয়। শুধু লক্ষ লক্ষ রুগ্ন হতাশ মানুষের জীবনটাই এই প্রবঞ্চকের দল ব্যর্থ করে দিচ্ছে না, সমাজের নৈতিকজীবনের ভিত্তিমূলেও এরা আঘাত হানছে। এ দুর্ভাগা দেশের অন্য বড় বড় সমস্যাগুলির মত এ সমস্যারও আসল মীমাংসা অবশ্য রাষ্ট্র ও সমাজের সেই পরম সংস্কারে। কিন্তু কাগজে কাগজে এদের বিরুদ্ধে লড়বার, মানুষকে এদের সম্বন্ধে সচেতন করে তুলবার চেষ্টার প্রয়োজনও কম নয়। কুৎসিৎ বিজ্ঞাপনের আলোচনাও কুৎসিৎ হবে—এই আশঙ্কাতেই কি বড় বড় পত্রিকায় অন্য সব বিষয়ে আলোচনা থাকলেও এ বিষয়ে কখনো আলোচনা হয় না? অথবা অন্য কারণ আছে?

যৌনবিষয়ে কতগুলি প্রাথমিক জ্ঞানের অভাব মানুষের পক্ষে যেমন ক্ষতিকর অজ্ঞ-সংস্কারবদ্ধ ভাবপ্রবণ মানুষকে সেই যৌনজ্ঞান দেবার প্রক্রিয়া ভুল হলে তাও কম বিপজ্জনক হয় না। এ বিষয়ে সম্পাদক ও পরিচালকদের দায়িত্ব গুরুতর। অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী হবার

সম্ভাবনাই থাকে বেশি এবং নতুন জীবনের মত সাধারণের উপযোগী পত্রিকার পক্ষে পাঠক-পাঠিকাকে অল্প বিদ্যার বেশি কিছু দেওয়া চেষ্টা করেও সম্ভব নয়। তাই কঠোর নিষ্ঠা ও অখণ্ড সতর্কতার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি যাতে লব্ধ জ্ঞানটুকু পাঠক-পাঠিকার সত্যই কাজে লাগে, তাদের বিভ্রান্ত না করে দেয়।

নতুন জীবনের অনেকগুলি লেখায় একটি মূলনীতি অনুসরণ করা হয়েছে বোঝা যায়, যা থেকে এই অপরিহার্য্য সতর্কতা সম্পর্কে সম্পাদককে সচেতন মনে হয়। লেখকদের দায়িত্ব-জ্ঞানেরও পরিচয় মেলে। আমাদেরই প্রাত্যহিক ব্যবহারিক জীবনে কার্য্যকরী জানবার কথায় আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টা লেখাগুলিতে করা হয়েছে। শিশুর যৌনবোধ নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্য স্পষ্টতঃ এই যে, শিশুর যৌনবোধের অস্তিত্ব ও স্বরূপকে ছেলেমেয়ে মানুষ করার জন্য বড়দের যতখানি মানা ও জানা দরকার ততখানিই মানিয়ে ও জানিয়ে দেওয়া। এ লেখায় অনায়াসে জটিলতা এনে সংশয় ও ভ্রান্তির সৃষ্টি করা চলত। 'স্বাভাবিক যৌনশক্তি লাভের কয়েকটি সহজ ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ উপায়' শিরোনামা দেখে আতঙ্ক হয়েছিল। সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটি পড়ে খুসী হলাম, লেখককে মনে মনে ধন্যবাদও জানালাম। এত সহজ ও স্পষ্টভাবে কাজের কথা লেখা কঠিন, বিষয়টি নিয়ে ফেনিল আলোচনার প্রলোভন সত্যই প্রবল।

সব লেখায় এ নীতি বজায় থাকেনি। সহজ জানবার কথার সঙ্গে মিশ্রণ ঘটেছে কঠিন তথ্যের। ফলে লেখাগুলি সামঞ্জস্য হারিয়েছে। কেবল সহজবোধ্য কথা নিয়েই আলোচনা থাকবে, উচুস্তরের জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা থাকবে না, তা বলছি না। কিন্তু একই লেখার খানিকটা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করতে চেয়ে বাকীটা দুর্ব্বোধ্য রেখে পাঠকের মনে বিপর্য্যয় সৃষ্টি করা অসঙ্গত মনে হয়। কঠিন বিষয়ে লেখায় একটি নিয়ম অবশ্য পালনীয়ঃ যে শ্রেণীর পাঠকের জন্য লেখা রচনাটি যেন সেই এক শ্রেণীর পাঠকেরই উপযোগী হয়। একটি লেখাকে অজ্ঞ ও জ্ঞানী সকলেরই পাঠযোগ্য করতে চাওয়ার মানে হয় না। একই বিষয়ে দুটি লেখা প্রকাশ করাও বরং তার চেয়ে শ্রেয়। তা যদি সম্ভব না হয়, লেখার আগাগোড়া অধিকাংশ পাঠকের জ্ঞানবুদ্ধি অভিজ্ঞতার পক্ষে গ্রহণযোগ্য করা না যায়, তবে প্রবন্ধটি মুষ্টিমেয় সেই ক'জনের জন্যেই লেখা হোক—গ্রহণ করার ক্ষমতা যাদের আছে। সাময়িকপত্রে এরকম দু'একটি লেখা থাকা দোষের কিছু নয়। সাধারণ পাঠকের গ্রহণ-যোগ্য আরও রচনা তো আছে। দু'টি একটি দুর্ব্বোধ্য লেখা সাধারণ পাঠকের উপকার ছাড়া অপকার করে না। লেখাটি বুঝবার জন্য কারো কারো মনে ওবিষয়ে পড়াশোনা ক'রে নিজেকে তৈরী করে নেবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে। কিন্তু কিছু বোঝা, আর কিছু না বোঝা তার পক্ষে প্রায়ই ক্ষতিকর। কিছু বোঝাটাই অর্থহীন। কোন জ্ঞাতব্য বিষয়েরই খানিকটা টুকরা ভেঙ্গে নিয়ে মানুষ আত্মসাৎ করতে পারে না। কিছু বোঝা'র মানে তার ভুল ধারণার সৃষ্টি হওয়া যে সে-সব বুঝেছে। নিজের ধারণা ও কল্পনা দিয়ে সে তারপর সমগ্র ভ্রান্তি গড়ে তুলবে। 'সঙ্কর রক্ত কি সত্যই প্রতিভার সৃষ্টি করে?' লেখাটিতে সামঞ্জস্যের এই অভাব।

বরং 'সঙ্গীতে যৌনতা'র বিষয়বস্তু আরও বেশি সূক্ষ্ম ও গভীর হলেও লেখাটিতে অনেকটা সামঞ্জস্য আছে—যতখানি বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠককে সামনে ধরে লেখক লিখতে সুরু করেছেন শেষ পর্য্যন্ত মোটামুটি তাকেই সামনে খাড়া রেখেছেন। 'আধুনিক প্রেমের কবিতা'র

সম্বন্ধে এ কথা বলতে পারলাম না। 'পুরুষ কি এক নারীতে তৃপ্ত ?' প্রবন্ধটিতে বহু বিতর্কের উপাদান থাকলেও পাঠকের মনে নতুন ভ্রান্তি সৃষ্টির সহায়তা করে না।

নতুন জীবনের পথ নতুন। সাহিত্য ও সমাজপ্রীতির আদর্শ যত জোরালো হবে পথ ততই প্রশস্ত ও দীর্ঘ হবে। *

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কৃতি-সংবাদ

৺জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী

প্রকৃতির কঠোর বিধানে বাংলার বিখ্যাত ও জনপ্রিয় গায়ক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর প্রাণময় সংগীত অকস্মাৎ চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। তিনি একাদিক্রমে পনের বৎসর ধ'রে বাংলা দেশের সংগীতরসপিপাসু জনসাধারণের জন্য রস পরিবেশন ক'রে এসেছিলেন, এবং শুধু তাই নয়, নিজের গানের প্রভাবে শ্রোতাদের মনকে ব্যাপকভাবে রাগ-সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট ক'রে দেশের সংগীতের আদর্শকে সত্যিই অনেকখানি উঁচুতে টেনে তুলেছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের মৃত্যুতে বাংলার সংগীতজগতের যে ক্ষতি হ'ল তা পূরণ হবার নয়।

বাংলাদেশের সংগীতের ইতিহাসে একটা যুগই এসেছিল যাকে "জ্ঞান গোঁসাইয়ের যুগ" ব'লে অভিহিত করা যেতে পারে। হিন্দুস্থানী সংগীতের উৎকর্ষের কথা তুললে দেখা যায় যে, নানা কারণে বাংলা প্রদেশ এ বিষয়ে পিছনে প'ড়ে আছে। কিন্তু নানা বাধা ও অন্তরায় লঙ্ঘন ক'রে বাঙ্গালীর সন্তান হিন্দুস্থানী সংগীতে যে পারদর্শিতা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়ে চলেছে তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। বাংলাদেশে সংগীতের এই অভ্যুদয়ের যুগে প্রতিভাশালী নবীন শিল্পীদের যে মিছিল চলেছে কয়েক বৎসর ধ'রে তাতে জ্ঞান গোঁসাইয়ের স্থান ছিল সকলের পুরোভাগে। একদিকে তিনি যেমন হিন্দুস্থানী সংগীতকে এদেশে জনপ্রিয় ক'রে তুলেছিলেন, অন্য দিকে তেমনি বাংলা ভাষায় রচিত গানে হিন্দুস্থানী রাগ ও চালের প্রবর্তন ক'রে বাংলা দেশে পূর্ব-প্রচলিত অথচ অধুনা-লুপ্তপ্রায় এক সংগীতের ধারাকে পুনরুজ্জীবিত ও নূতন গতিতে ও নূতন আবেগে প্রবাহিত ক'রেছিলেন। ধ্রুপদ, খেয়াল ও ভজন গেয়ে জ্ঞানবাবু শ্রোতাদের মুগ্ধ ক'রতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁর বাংলা গানে শ্রোতারা অতীন্দ্রিয়ের আভাস পেত। শুধু মুগ্ধ হ'ত না, অভিভূত হ'য়ে পড়ত।

সহজ, সরল, সতেজ ও সাবলীল ভঙ্গিতে গাওয়াই ছিল জ্ঞানবাবুর বৈশিষ্ট্য; ঔদার্য, মাধুর্য ও গভীরতা ছিল তাঁর কণ্ঠের সম্পদ; আর সবার উপর ছিল তাঁর স্বরে একটি দরদ ও গানে একটি স্ফূর্তি যা শ্রোতাদের মনকে কখনও রসাভিষিক্ত ক'রত কখনও বা দোলা দিয়ে যেত।

* যে-সব লেখার নাম উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি ১৩৫২-এর শারদীয়া সংখ্যা 'নতুন জীবন'-এ আছে।

জ্ঞানবাবুর প্রাথমিক শিক্ষা হয় তাঁর জ্যেষ্ঠতাত, ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ ধ্রুপদ গায়ক, স্বর্গীয় রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয়ের কাছে। পরবর্তীকালে তিনি সংগীতাচার্য শ্রীযুক্ত গিরিজা-শঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছে কিছুদিন সংগীত শিক্ষা করেন। সুপ্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রীয় সংগীত-গুরু পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বরের কাছেও জ্ঞানবাবু কিছু বিদ্যা আহরণ করেন এরূপ শোনা যায়। পরিণত বয়সে এবং লব্ধ-প্রতিষ্ঠ অবস্থায় তিনি ভারতবিখ্যাত ওস্তাদ ফিয়াজ খাঁ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বাংলাদেশে বেতারের প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকেই জ্ঞানবাবু নিয়মিতভাবে বেতারের শ্রোতাদের আনন্দ দান ক'রে এসেছেন এবং বাংলার বাইরে ভিন্ন প্রদেশের বেতারের আসরেও একাধিকবার নিমন্ত্রিত হয়েছেন। বহু গ্রামোফোন রেকর্ড আজও তাঁর অমর সংগীত-প্রতিভার সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিন্তু যে সরল প্রকৃতি, সদানন্দ ও যথার্থ সংগীতপ্রেমিক গায়কটিকে ছাড়া কোনও বৃহৎ সংগীতানুষ্ঠানের কথা এদেশে কল্পনা করা যেত না, তাঁকে সকল সংগীতের আসর থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিতে হয়েছে।

শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

কেরলের 'ওনাম'

ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে জনপদে এখনো লোক-সংস্কৃতির উৎসব আয়োজন একেবারে লোপ পায়নি। পূজার সময় পশ্চিম ভারতে ও উত্তর ভারতে এমনি নানা উৎসব চলে; 'নবরাত্র' উপলক্ষে গুজরাটিদের চলে 'গরবা নাচ'—আমরা অনেকেই তার কথা জানি। তারপরে আসে দেওয়ালী। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের উৎসবগুলির কথা আমরা বেশি জানি না। অবশ্য গত দশ পনের বছরে আমরা কেরলের 'কথা-কলি' ও অনুরূপ নৃত্যশিল্পের সঙ্গে এক-আধটুকু পরিচিত হয়েছি। তবু দক্ষিণ ভারত বল্‌তেই আমরা বলি 'মাদ্রাজী', ইংরেজ শাসনের প্রাদেশিক ভাগ-বিভাগের ফলে এই অজ্ঞতা ও বর্বরতা প্রশ্রয় পেয়েছে। অন্ধ্র (বা তেলেগু), তামিল, কানাড়ি ও মালয়ালাম্ (বা কেরলী) প্রধানত এই চার ভাষাকে আশ্রয় করে দক্ষিণ ভারতের চার জাতি ও চার সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করেছে। অন্ধ্র ও তামিলেরাই সংখ্যায় প্রধান। তারা শুধু ভাষায় ও সংস্কৃতিতে বিশিষ্ট নয়, প্রায় স্বতন্ত্র। কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে মালাবার বা কেরল হচ্ছে সব চেয়ে বিশিষ্ট সংস্কৃতির কেন্দ্র। ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন এ দুটি দেশী রাজ্য ও ব্রিটিশ মালাবার হল এই কেরল জাতি ও তার সংস্কৃতির অধিষ্ঠানভূমি। তাদের সামাজিক গঠনে বৈচিত্র্য রয়েছে—মাতৃপ্রধান নীতিতে এখনো তাদের বিধিব্যবস্থা হয়, মেয়েরাও অনেক বেশি স্বাধীন এবং সচেতন। তেমনি তাদের সভ্যতায়ও রয়েছে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ ও সরল মহিমা। লোক-জীবন এখনো সেখানে একেবারে ভেঙে পড়েনি, তাই উৎসব আনন্দও সহজ রয়েছে। গত বৎসর যাঁরা কলকাতায় গণনাট্য সঙ্ঘের কেরলী 'নবান্ন' নৃত্য দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই তা বিস্মৃত হন নি। কেরলের এই নবান্ন উৎসবকে বলে 'ওনাম'। অন্যান্য প্রাচীন উৎসবের মত এরও সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনী জড়িত হয়ে পড়েছে। 'ওনামের' প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ থেকে কেরল সংস্কৃতির একটি সাধারণ রূপ দেখতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন কেরলায় রাজাদের বিধাতা ছিল জনগণ। কতগুলি সামাজিক রীতি মেনে জন-সাধারণ নিজেদের নেতা নিজেরাই ঠিক করতেন। 'নাডুবানি' অর্থাৎ এইসব গণনেতারাই

মনোনীত করতেন দেশের রাজাকে। বারো বছরে 'নাড়ুবানি'রা একবার সবাই এসে মিলতেন 'মামংকম্' নামক রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে। বারো বছরের জবাবদিহি করতে হ'ত রাজাদের। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সমালোচনা না টিকলে অস্ত্রধারণের প্রয়োজনও স্বীকৃত ছিল। তার ওপর 'মরুমাক্কাথায়ম্' অর্থাৎ নারীপ্রধান সমাজের বিচারে অন্য একটা বড়ো রকমের অসাম্য—নারীর অর্থ নৈতিক অধিকারে বঞ্চনা কেরলায় কখনো ছিল না। এখনো নেই।

অতীতের চেহারা দু'হাজার বছর আগে এমনি গৌরবময় ছিল। আজ সে দু'হাজার বছরের ব্যবধান পেরিয়েও সে কথা স্মরণ করার সুযোগ মেলে পুরাণের কাহিনীতে। ওনামের সঙ্গে যে পৌরাণিক কাহিনীটি জড়িত তা হচ্ছে এই : কেরলা দেশের লোক সুখে ছিল, খাওয়াপরায় কষ্ট ছিল না, শত্রুর ভয় ছিল না। ঈশ্বরকেও ভুলতে চাইল মানুষ। তাই বামনাবতারে ঈশ্বর এলেন, দেশের রাজা মহাবলীর কাছে দান চাইলেন ত্রিপদ ভূমি। এক পায়ে স্বর্গ, এক পায়ে মর্ত, আর এক পা দেবার জায়গা নেই। মহাবলী নিজের মাথা পেতে দিলেন। বিষ্ণুর পা মাথায় নিয়ে নেমে গেলেন পাতালে। শাপ-মোচন হবে বছরে একবার, দেশে ফিরবেন তখন। ইতিমধ্যে বিগত গৌরবের প্রতীক হয়েছে রাজা মহাবলী, আপন হ'য়ে গেছে ঘরোয়া দেবতার পোশাকে।

তাই উৎসব করে মালোয়ালীরা। পুরাকালের কথা মনে পড়ে; গান গায়, মহাবলীর রাজ্যে সবাই ছিল সমান—

উৎসবের দিনটা আসলে ফসল কাটার দিন। মালোয়ালী সনের চিঙ্গোম মাসে (আমাদের ভাদ্র) প্রধান শস্য আউস উঠল। কেরলের ঋতুতে শরতের হাওয়া এখন ভালো লাগবে। নারিকেল বীথি সারি দিয়েছে সমুদ্রতটে। সব্জীর ক্ষেত সবুজ। ধান গাছে সোনা-হলুদ ঢেউ। ধান্য সভ্যতার রুচিস্মিত আয়োজন এবার। "পুধারী" অথবা নবান্ন গ্রহণ। তারপর গোলায় ধান তোলা। ক্ষেতের কাদামাটি দিয়ে গড়া মহাবলীর মূর্তি স্থাপন করা হবে গোয়ালে, খড়ের গাদায়, ধান-গোলায়। ভোজ চলবে। তারপর উৎসবের নাচ।

এই পল্লীনৃত্যের নাম 'কাইকোট্টাক্কালি'। মেয়েরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে নাচের দল বাঁধে। বাদ যাবে না কেউ; বুড়ি মেয়েরা পর্যন্ত না। নাচের ভঙ্গিটি সহজ, তবু ব্যঞ্জনায় ঐশ্বর্যময়। তাল মেলানো সাড়ম্বর বাজনার প্রয়োজন নেই—সহজ পদপাতে এবং দেহচ্ছন্দে নিখুঁত শিল্পময়তা। কেরলার এই পল্লীনৃত্যের মূল সৌন্দর্য ও শুদ্ধির অনেকখানি আহরিত হয়েছে প্রসিদ্ধ কথাকলি নৃত্যে। একদা আনন্দিত সজীব প্রাণের আত্মপ্রকাশ এই উৎসবে।

আগে গ্রাম্য সুন্দরীদের ভেতর কাড়াকাড়ি পড়ত ভালো নাচের পাল্লায়। ক্রমশ এখন আর পড়ে না। ১৩৫০-এ চল্লিশ হাজার লোক মরেছে কেরলায়। গত ভাদ্রেও তারা এ উৎসব করেছে বটে কিন্তু অদৃশ্যমান পল্লী সংস্কৃতির ওপর সুস্পষ্টভাবে এ আঘাতটা হয়েছে মর্মান্তিক। কেরলের জাতীয় উৎসব কতটা একালের বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে আপনার সহজ ও সানন্দ রূপ বজায় রেখে টিকে থাকতে পারবে—তারই পরীক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে। এ পরীক্ষায় কেরলের জন-সমাজ সগৌরবে উত্তীর্ণ হতে পারলে তাদের লোককলাও নূতন ঐশ্বর্যে বিকশিত হবে, তা বলাই বাহুল্য।

শ্রীবল্লথলনারায়ণ কুট্টি

নিখিল ভারত লেখক সম্মেলন

গত অক্টোবর মাসে জয়পুরে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর সভানেত্রীত্বে নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনের একটি অধিবেশন হ'য়ে গিয়েছে। এই অনুষ্ঠানে দেশী বিদেশী বহু লেখক ও চিন্তাশীল শিক্ষাব্রতী যোগ দিয়েছিলেন। সারা ভারতের লেখক ও তাঁদের লেখার দিক দিয়ে এই জাতীয় সম্মেলনের প্রয়োজন আজ খুবই বেশি—একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু এই সম্মেলনে সব চেয়ে যে বড় এবং প্রাথমিক অভাবটি চোখে পড়েছে—সেটি হচ্ছে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের প্রতি দৃষ্টি না পড়া। হিন্দী, উর্দু ও বাঙলার মত তেলেগু, তামিল, মারাঠি, গুজরাটি, পাঞ্জাবী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে প্রগতিশীল যে এক একটি সাহিত্য আছে এবং প্রত্যেকটির পেছনে আছে এক একটি প্রাচীন সাহিত্যের রত্নাগার, তাকে চেনা বা জানার কোনো সুযোগ ও প্রেরণা এখানে পাওয়া গেল না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লেখকরা কোন পথে ভাবছেন, ভারতের জীবন সংগ্রামের পথে কে কতখানি অগ্রসর—এ সম্বন্ধে পরস্পরের ভাবের আদানপ্রদানের সুযোগ এই জাতীয় সম্মেলনে বেশি ক'রেই থাকা উচিত। কিন্তু জয়পুরে সে সম্বন্ধে প্রেরণার অভাব স্বাভাবিকভাবেই অনেককে হতাশ করেছে। প্রত্যেক প্রদেশের সাহিত্যিকরা আপন প্রাদেশিক গণ্ডীর মধ্যে অনেকাংশে আবদ্ধ, একটা অন্ধ প্রদেশিকতা সময়ে সময়ে মাথা তুলবার সুযোগ পায়। জয়পুরের সম্মেলন তা দূর করবার জন্য কোনো স্থায়ী ক্ষেত্র রচনা করেনি। দার্শনিক রাধাকৃষ্ণন এই সম্মেলনের বক্তৃতায় বলেছেনঃ 'সাহিত্য মানুষের নির্জনতার সৃষ্টি।' এই ভয়ঙ্কর কথাটি যে কতখানি মর্মান্তিক তা স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আজ প্রদেশে প্রদেশে অপরিচয়ে, অবিশ্বাসে, রেষারেষিতে, অন্ধতায়। এবং আরও ছোট ভাবে, সাহিত্যিক বিশেষের পক্ষে ওই সাংঘাতিক অতি পুরাতন কথাটি শেষ পর্যন্ত তাকে বিরোধী ক'রে তুলছে সেই সাহিত্যের—যে সাহিত্য পীড়িত মানুষের সংগ্রাম ক্ষেত্রে বেরিয়ে এসে শক্তি আহরণ করছে বিপ্লবী জনসাধারণের জীবন থেকে, অভিজ্ঞতা থেকে। সর্ব মানবের কল্যাণচেতনা আসে সমাজের সমস্ত শ্রেণীর জীবনের ভূয়োদর্শন থেকে—তাদের নৈতিক, মানসিক এবং রাষ্ট্রিক চেতনা থেকে। এই সংঘাত ও সংঘর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে নির্জনতার সাহিত্যিক আপন ব্যক্তিত্ব ও একাকিত্ব নিয়ে স্বাভাবিক ভাবে গিয়ে পড়ছে আজ প্রতিক্রিয়াশীলদের আওতায়।

লেখক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের প্রাথমিক ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি আশা করি আগামী বৎসরে সংশোধিত হবে। এবং ইতিমধ্যে আন্তঃপ্রাদেশিক একটি পরিকল্পনা গ্রহণ ক'রে প্রত্যেক প্রদেশে শাখা স্থাপিত হবে—এবং যে কোনো প্রদেশে কেন্দ্রীয় একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হবে। যাতে ক'রে সারাভারতের লেখকগোষ্ঠী শুধু সৌখীন সামাজিক ভাবেই নয়, নৈতিক ও রাষ্ট্রিক প্রয়োজনের প্রেরণাতেও সৃষ্টিক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পাবে।

সুশীল জানা

লোককবি জাম্বুল

সোভিয়েট রাশিয়ার লোক-কলার মূর্ত প্রতীক কাজাকৃস্তানের জনপ্রিয় লোককবি বিশ্ববিশ্রুত জাম্বুল জাবায়েভ্ গত ২২শে জুন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

প্রায় একশ বছর আগে রৌদ্রোজ্জল বিস্তীর্ণ এক তৃণাঞ্চলের দেশে জাম্বুলের জন্ম। দেশ-বাসীদের প্রায় সবাই যাযাবর,—স্থায়ী বাসিন্দা খুবই কম; সকলের অবস্থা জার-শোষণে ও শাসনে শোচনীয়। সাম্রাজ্যবাদী শাসনে শিক্ষাবঞ্চিত, উন্নত সমাজব্যবস্থার সংস্পর্শ-রহিত, বিজ্ঞানোন্নত জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও কাজাকবাসীদের নিজস্ব বলিষ্ঠ লোক-সংস্কৃতি আশ্চর্য প্রাণস্পন্দনের পরিচয় দিত। এর মধ্যে চারণগীতি, কবিগান অন্যতম। স্তেপ-অঞ্চলে তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুরে আবালবৃদ্ধবণিতা পরিবেষ্টিত হয়ে নিজেদের সুখদুঃখের কথা গানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করা লোককবিদের প্রধান কাজ। বালক জাম্বুল অল্প বয়সেই এই দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং চারণ কবি হবার সাধনায় মগ্ন হন। মাত্র তের বছর বয়সে তিনি প্রথম গান রচনা করেন। এর পর দিনের পর দিন প্রিয় ডম্রা (দোতারা) বাজিয়ে গানের পর গান রচনা ক'রে স্তেপ অঞ্চলের তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুরে জনপ্রিয় হ'য়ে উঠতে থাকেন। আটত্রিশ বছরে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ লোককবিকে কবির লড়া'য়ে পরাজিত ক'রে শ্রোতৃমণ্ডলীর অশেষ শ্রদ্ধা ও প্রশংসা লাভ করেন।

অন্যান্য কবিদের থেকে তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্যও ছিল আকর্ষণের অন্যতম কারণ। নিজেদের সুখদুঃখের গাথার সঙ্গে সঙ্গে থাকৃত তাদের জাতীয় জীবনের শোষণের কাহিনী, জার-শাসনের নির্মম অত্যাচারের মর্মস্পর্শী রূপ। শ্রোতারা যখন মন্ত্রমুগ্ধের মত নিজেদের দুর্দশার কথা শুনে মুহ্যমান হয়ে পড়ত—তখন তাঁর দোতারায় বেজে উঠ্‌ত প্রাণের স্পন্দন—কণ্ঠে নিঃসৃত হত আশার বাণী। অত্যাচারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ সুখের দিন কিভাবে বরণ ক'রে আনবে তার প্রস্তুতির ইঙ্গিত। এর জন্য জার-শাসকদের কাছ থেকে তাঁকে বহু লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করতে হয়েছে। জীবনের এক সুদীর্ঘ অংশ তিনি এমনি ক'রে কাটিয়ে দিয়েছেন—দেশবাসীকে আশার গান শুনিয়ে। এর পর এল তাঁর কল্পনার সুখের দিন—সোভিয়েট শাসন। সোভিয়েট রাশিয়ার বিজ্ঞানোন্নত অনেক অংশে রুশ বিপ্লব প্রচণ্ড বাধা পেয়েছে—কিন্তু এই যাযাবর জাত কাজাকবাসীরা যখন দেখ্‌ল—তাদের প্রিয়তম কবি সাগ্রহে বিপ্লব বরণ ক'রে নিয়ে সোভিয়েটের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন তখন তারা দলে দলে বিপ্লবকে সাগ্রহে সমর্থন করল এবং অচিরে দেশে সোভিয়েট শাসন প্রবর্তিত হল। প্রথমত সন্দেহ থাকলেও যখন সোভিয়েট-ব্যবস্থা দেশের সত্যিকারের জনসাধারণের মঙ্গলময় হয়ে উঠ্‌ল—তখন দেশবাসীর শ্রদ্ধা কবির প্রতি অভূতপূর্বভাবে বেড়ে গেল।

এবার শুরু হ'লো কবির আনন্দোজ্জল এক বলিষ্ঠ জীবনের গান। দুঃখের গানের পরিবর্তে নভেম্বর বিপ্লব আর সোভিয়েট ব্যবস্থার বিষয় নিয়ে কবি রচনা শুরু করলেন। সমবায় সমিতিতে নিজে নেমে এলেন কাজে। যৌথ খামারের কাজে প্রৌঢ় কবি কায়িক পরিশ্রম-তো করতেনই অধিকন্তু কর্মীদের মধ্যে আনন্দবিতরণ করতেন নতুন নতুন গান রচনা ক'রে—কখনো খামারে কাজ করতে করতে, কখনো বিশ্রামের সময়ে—বিভিন্ন উৎসবে ও আয়োজনে। শুধু নিজের যৌথ খামারে নয়—কিংবা কাজাকস্তানের যৌথ খামারেও নয়—এই গান আবশ্যক মত বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে সারা সোভিয়েট রাশিয়ার শহরে, গ্রামে, খামারে বিভিন্ন জাতের নরনারীর মুখে ধ্বনিত হত।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের গঠনধারার সঙ্গে কবি জাম্বুলের সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর অপূর্ব মহিমায় উদ্ভাসিত। ১৯৪১ সালের ২২শে জুন সোভিয়েট রাশিয়ার উপর এল চরম পরীক্ষা—

বিজয়োন্মত বর্বর নাৎসী আক্রমণ। বৃদ্ধ কবি পার্বত্য অঞ্চলে বেরিয়েছেন—শুনতে পেলেন স্টালিনের যুদ্ধ সম্পর্কে প্রথম বক্তৃতা বেতার থেকে প্রচারিত হবে। পঁচানব্বই বছরের বৃদ্ধ জাম্বুল বিপদসংকুল পার্বত্যপথ ঘোড়ায় চড়ে অতিক্রম ক'রে গ্রামে ফিরে প্রিয় বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে একত্রে স্টালিনের উদ্দীপনাময় ঘোষণা শুনলেন এবং সেই রাত্রেই যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রথম গান রচনা করলেন। এই গান তারপর বেতারযোগে সারা সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রচারিত হ'ল। এর পরে তাঁর রচনা একের পর এক সোভিয়েট নরনারীর যুদ্ধজীবনে অপরিহার্য এক রূপ গ্রহণ করল। 'যুদ্ধ-গীতি' (Songs of War) নামে তাঁর এক সংকলন প্রকাশিত হয়ে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হ'ল। সংকলনের প্রথম কবিতা—"এল যবে স্টালিনের আহ্বান।" তারপর অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদবাসীকে লক্ষ্য ক'রে বলিষ্ঠ এক আহ্বান—"অমর অজেয় লেনিনগ্রাদ, নগর দুয়ারে শত্রুরা বরবাদ"। জয়ে নিশ্চিত-বিশ্বাসী জার্মান-সৈন্য যখন মস্কোর দ্বারপ্রান্তে তখন তাঁর সংগীতে দিলেন প্রতিরোধের বীর্য, বীরত্বের উন্মাদনা।

যুদ্ধরত পুত্র এবং তার কমরেডদের লক্ষ্য ক'রে যেসব রচনা তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতেন তার মধ্যে প্রতিটি সৈনিক যেন তার আপন আপন পিতার কাছ থেকে শুনতে পেত সাহসের আর আনন্দের বাণী।

ডনবাস যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর প্রিয়-পুত্র অল্ডাগাই মৃত্যুবরণ করে। সেই মৃত্যুবার্তা বহন ক'রে যারা কবির কাছে এল—কবি তাদের শুনালেন দোতারা বাজিয়ে বীরত্বের গাথা —আর সানন্দে বের করলেন পুত্রের কীর্তিমণ্ডিত সংবাদপত্রের সংগৃহীত অংশসমূহ। বার্তাবাহীরা ইতঃস্তত করে অনন্যোপায় হয়ে শোক সংবাদ জ্ঞাপন করলেন,—নীরব নিস্তব্ধ কবির গণ্ড বেয়ে চোখের জল নেমে এল। ধীরে ধীরে কবি আবার দোতারা কোলে তুলে নিলেন, মর্মস্পর্শী সহজ সুন্দর গান বেরিয়ে এল তাঁর কণ্ঠ থেকে, যুদ্ধ-সংকলনগীতির এইটেই হ'ল শেষ গান—নাম—'পুত্রের মৃত্যুতে'।

জাম্বুল কাজাক্ সোভিয়েটের সর্বোচ্চ পরিষদের সদস্য ছিলেন। সোভিয়েট সরকার তাঁকে 'অর্ডার অফ লেনিন,' 'অর্ডার অব রেড ব্যানার অব লেবার,' 'অর্ডার অব ব্যাজ অব অনার' দ্বারা সম্মানিত করলেন। তিনি লাভ করলেন সোভিয়েট রাশিয়ার সাহিত্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পুরষ্কার 'স্টালিন প্রাইজ'।

যুদ্ধ শেষ হ'ল—বিজয়ী সোভিয়েট রাশিয়া আনন্দ ও শান্তির মাঝখানে সোভিয়েট ইউনিয়নে বিশেষত কাজাকস্তানে কয়েক মাস পরে তাদের প্রিয়তম কবির শতবর্ষ জয়ন্তী পালন করবে এই ছিল পরিকল্পনা। কিন্তু যুদ্ধজয়ের আনন্দের মধ্যেও নিরানন্দ এল; কবি পীড়িত হলেন। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে শুয়ে গত ৯ই মে কবি তাঁর শেষ গান রচনা করলেন "বিজয়-গীতি।"

কাজাকস্তানের রাজধানী আলমা-আটার রাস্তায় ২৪শে জুন কাতারে কাতারে নরনারী বালক বালিকা এ্যাকাডেমী অপেরা এণ্ড ব্যালে থিয়েটারে জড়ো হ'ল তাদের শ্রেষ্ঠ 'আকিন'কে (চারণ কবি) শেষবারের মত দেখে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। রাজধানীর ইতিহাসে এত বড় জনতা কেউ কোনো দিন দেখেনি। হাজার হাজার পুষ্পমাল্য আচ্ছাদিত কবির মৃতদেহ নিয়ে গাড়ী রাজধানীর রাস্তা অতিক্রম করল। নগরবাসী সাশ্রুনয়নে তাদের এক শতাব্দীর প্রিয়তম পিতামহকে বিদায় দিল। গাড়ী চল্ল কবির নিজের গ্রামে তাঁর নিজের কর্মস্থানে, যৌথ খামারে।

পরদিন ২৫ শে জুন সারাদিন সারারাত ধরে দূরবর্তী এলাকা থেকে আবালবৃদ্ধবনিতা কবিকে শেষ দর্শন ক'রতে এল। ২৬ শে জুন ভোর বেলা তাঁর সমাধির আয়োজন হ'ল। বয়স্ক এবং তরুণ ভক্তবৃন্দ সমস্বরে কবরের উপর সমাধি গীতি উচ্চারণ ক'রে শেষ কৃত্য সমাপন করলেন। শত শত লেখক শিল্পী সমবেত হয়ে কবির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন।

লোক-চেতনার ও সুস্থ জীবনপ্রেরণার অভাবনীয় রূপান্তরের সাক্ষী হিসাবে জনগণের সত্যদ্রষ্টা জাম্বুল সকল দেশের সকল মানুষের নিকটে চিরদিন ভালবাসা ও সমাদর লাভ করবেন।

মনোরঞ্জন বড়াল

বিক্ষোভের হিসাবনিকাশ

পাঠক মাত্রই জানেন গত ২১শে নভেম্বর, বুধবার থেকে গত ২৩শে নভেম্বর, শুক্রবার পর্যন্ত কলকাতার জনসাধারণের মন কতটা অশান্ত ও তাদের জীবনযাত্রা কতটা বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিল। 'পরিচয়ের' এ সংখ্যা প্রকাশেরও বিলম্ব শেষ দিকে এই কারণে ঘটেছে। কিন্তু ঘটনার ও অবস্থার গুরুত্ব মনে রাখলে 'পরিচয়ের' এই বিলম্ব উল্লেখযোগ্য বলে মনে হবে না। মোটামুটি পাঠক সাধারণ কলকাতার তখনকার অবস্থা জেনেছেন। অবশ্য মফঃস্বলের পাঠকদের পক্ষে সম্ভবত ঘটনাবলী যথাযথ বোঝা সহজে সম্ভবপর হয়নি। তার প্রধান কারণ বাঙলা দেশের সংবাদপত্র আজ সংবাদ সরবরাহ করে না, সংবাদকে ঢেলে সাজিয়ে ব্যক্তি বা দল বিশেষের প্রচারের উপযুক্ত ক'রে তা পরিবেশন করে। কথাটি সংস্কৃতি-অনুরাগীদের পক্ষে গুরুতর। স্থানাভাবে ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা 'পরিচয়'-এ করা সম্ভব নয়, আর তা না করলে তর্ক-বিতর্কের অবকাশ থাকে। তথাপি জীবন্ত সংস্কৃতির ছাত্র হিসাবে কলকাতার এই কয়দিনের ঘটনার অর্থ আমাদের সংক্ষেপে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন।

প্রথম ও প্রধান কথা অবশ্য এই যে, কলকাতার ছাত্ররা এবার যে সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন আমাদের এতদিনকার আন্দোলনের ইতিহাসেও তা অসাধারণ। নিরস্ত্র জনতার পক্ষে লাঠির বা গুলির সম্মুখে না দাঁড়াতে পারা আমরা মোটেই অস্বাভাবিক মনে করি না। তবু ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে এর ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছে। লাঠির সামনে মাথা পেতে দিয়ে, গুলির সামনে দাঁড়িয়ে থেকে এ দেশের লোক মাঝে মাঝে দেখিয়েছেন তাঁদের স্বাধীনতার প্রেরণা কত তীব্র ও সাহস কত প্রবল। পৃথিবীর অন্য দেশেও তেমন দৃষ্টান্ত সুলভ নয়। এরূপ তেজস্বিতার ফলে রাজনৈতিক সাফল্য অর্জ্জন হয়নি বটে, কিন্তু নিশ্চয়ই রাজনৈতিক শক্তি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আরও বর্দ্ধিত হয়েছে। ছাত্ররা বুধবার ও বৃহস্পতিবার আমাদের সেই ইতিহাসেরই আর একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। এজন্য তাঁদের আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এই ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে আমাদের যে সব ত্রুটি দেখা গিয়েছে, তা এই সঙ্গে পরিষ্কার করে না বুঝলে অন্যায় হবে। নিজেদের ত্রুটির কথাই আমরা বলব, পুলিসের বা সাম্রাজ্যবাদীদের মূর্খতা ও কাপুরুষতার কথা বলব না। কারণ তারা অন্যরূপ আচরণ করলেই তা হত ব্যতিক্রম। আর তাদের এই নির্বুদ্ধিতা ও অমানুষিকতা পরোক্ষে আমাদের শক্তিকেই সুদৃঢ় করে তোলে। সেই শক্তি প্রমাণিত হবে এখন এই অত্যাচারীদের শাস্তি বিধানের স্থির

ব্যবস্থায়, আর অত্যাচারের মূলোৎপাটনের বৈপ্লবিক আয়োজনে। দুইই হচ্ছে প্রধানত আমাদের দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনের জন্য নিজেদের ত্রুটিগুলিও সংশোধন করা প্রয়োজন।

প্রধান ত্রুটি যা এবার দেখা গেল তা হচ্ছে দেশের নেতাদের। গত দু তিন মাসে তাঁরা দেশের উপর দিয়ে বিক্ষোভ ও উত্তেজনার প্লাবন বইয়ে দিয়েছেন। তাঁরা কেউ অর্বাচীন নন, কাজেই এ প্লাবন পুলিসের লাঠি ও বন্দুক দেখে উদ্বেল হয়ে উঠলে তাঁদের চমকিত হওয়া সাজে না। ছাত্রদের সেদিনকার বিক্ষোভ-শোভাযাত্রা যে এত বলিষ্ঠ হতে পারল তার জন্য নেতারাও গৌরব করতে পারতেন; আর তা যে সর্বাংশে স্থনিয়ন্ত্রিত রইল না, সে দায়িত্বও নেতারা সঙ্গে সঙ্গে আংশিক ভাবে গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু তার পরিবর্তে নেতার পর নেতা বুধবার ও বৃহস্পতিবারের সমস্ত বিক্ষোভ-প্রকাশকেই 'শুধু প্ররোচকের কাণ্ড' বলে নিজেদের দায়িত্ব অস্বীকার করছেন, এবং ছাত্র সাধারণের মাথায় চাপিয়ে দিচ্ছেন এক মূর্খতার ও গ্লানির বোঝা। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু তাঁর বুধবারের বাণীতে গুলি বর্ষণের বিরুদ্ধে একটি কথাও বললেন না, পরোক্ষে সাম্রাজ্যবাদীদের অপপ্রচারও তাতে পুষ্ট হল। তিনি বরং বললেন, প্ররোচকের খেলার পুতুল হয়েছে বুধবারের ছাত্রদল। কিন্তু পরিষ্কার কথা এই, মোটামুটি ছাত্রদের আচরণে গৌরবের জিনিসই ছিল, অগৌরবের কিছু ছিল না। এমন কি, বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ পর্যন্ত কলকাতার বিক্ষুব্ধ জনতা কাণ্ডজ্ঞান হারায়নি, তখনো শহর একেবারে নানা বাজে লোকের হাতে গিয়ে পড়েনি। কিন্তু বুধবার থেকেই নেতাদের কণ্ঠে যে সুর ফুটল তা হচ্ছে মূল ছাত্র-বিক্ষোভকেও বিকৃত করে দেখাবার সুর, কারো ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টা। স্বভাবতই এই সুরেরই জের দূর থেকে পরে স্বয়ং মৌলানা আজাদও টানলেন, এবং স্বয়ং পণ্ডিত জওহরলালও টানছেন—যেন কংগ্রেসের নির্বাচন ও "ভাবী সংগ্রামকে" ব্যর্থ করে দেবার ইচ্ছাতেই বুধবার কলকাতার ছাত্ররা মিছিল বের করেছিলেন, লাঠির সামনে মাথা নোয়াননি, গুলির সামনেও পালাননি।

সত্য বটে, বৃহস্পতিবারের অপরাহ্ণ থেকে ছাত্রদের বিক্ষোভ শেষ হয়ে কোথাও কোথাও চ্যাংড়া ও বখাটেদের বাঁদরামো শুরু হয়। শুক্রবারে শহরের গুণ্ডা আর বখাটেরা এই জন-বিক্ষোভের সুযোগ গ্রহণ করে, জন-উদ্দীপনার একটা বিশ্রী পরিসমাপ্তি ঘটতে থাকে। তার কারণ, গোড়া থেকেই এই বিক্ষোভের ও নেতাদের পূর্ববর্তী দীপ্ত ভাষণের মধ্যেই ছিল ত্রুটি। সে ত্রুটি মৌলিক—নেতাদের সুচিন্তিত কোনো প্ল্যান নেই। ছাত্র-মিছিলেরও মাথায় কোনো প্ল্যান ছিল না—বাধা পাওয়াতে হঠাৎ একটা জিদ্ তাঁদের চেপে গেল—"লাল দিঘী।" তাঁরা তবু একটা সাময়িক উদ্দেশ্যে বদ্ধপরিকর হলেন, কিন্তু নেতারা ছাত্রদের আচরণকেও স্বীকার করতে রাজী নন। এ ত্রুটিই আমাদের নেতাদের মৌলিক—বিক্ষোভকে তাঁরা সংকল্পে স্বতঃস্ফূর্তি বা সুনিয়ন্ত্রিত ও কর্মধারায় সফল করতে অভ্যস্ত নন। Spontaneity'র উপর তাঁরা জন বিক্ষোভকে ছেড়ে দেন; স্বয়ং-চালিত জন-বিক্ষোভ ব্যর্থ আক্রোশে ফেটে পড়ে নিঃশেষ হয়। তখন তার শোচনীয় রূপ ও পরিণতি দেখে নেতারা অপরের ত্রুটি খুঁজতে থাকেন, ভেবে দেখেন না মৌলিক ত্রুটি কোথায়—তাঁদের নিজেদের এই স্বতোৎসারণের Spontaneity'র উপর বিশ্বাসে, নিজেদের চিন্তাশূন্যতায়, সংগঠন শক্তির অভাবে।

বলা বাহুল্য নেতাদের এই অভ্যাস কম বেশি ছাত্রদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। এবারের এ ঘটনাবলীতে ছাত্ররা নিজেরাও বোধ হয় বুঝতে পারছেন—বিক্ষোভ যত তীব্র ও প্রবল

হোক, তা'ই বিপ্লবের পক্ষে একমাত্র উপকরণ নয়—তার জন্য চাই সংযত আয়োজন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, সংঘবদ্ধ পরিচালনা।

শুধু মাত্র নেতাদের ত্রুটি নিয়ে বিচারে বস্‌লেও ছাত্ররা লাভবান হবেন না বরং তাতে হয়ত নব নব উপনেতার সৃষ্টি হতে পারে। এদিকেও নেতাদের মধ্যে যে শোচনীয় অবস্থা দেখা গিয়েছে তা দেখে ছাত্ররা সাবধান হতে পারেন। প্রত্যেক নেতাই সে কয়দিনের ঘটনা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিবৃতি দিচ্ছেন। তাঁরা অনেকে একই প্রতিষ্ঠানের (কংগ্রেসের) লোক, একই মর্মের কথাও বলছেন (সব প্রোরোচকের কাজ); কিন্তু তথাপি একত্র হয়ে তাঁরা একটি বিবৃতিও এক সঙ্গে প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক। অথচ ছাত্রদের মধ্যে অন্তত এ ব্যাপারে হিন্দু মুসলমান ও বিভিন্ন রাজনীতিক মতের যুবকদের ঐক্য দেখা গিয়েছে, এমন কি, কলকাতার যানবাহনের সাহসী মজুরেরা পর্যন্ত সরল ভাবেই জানিয়েছেন এ ব্যাপারে তাঁদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ, ছাত্রদের সঙ্গে তাঁদের সহমর্মিতা। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রেরণা অনিবার্যরূপে তাঁদের একত্র করেছে। ছাত্র ও মজুরদের এবার সেই সংযোগ ও একতা নিশ্চয়ই দৃঢ় করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে নেতাদেরও বিবাদ-বিভেদ দূর করিয়ে একত্র করতে হবে। নইলে নেতারাই উপর থেকে বসে বিবাদ ও বিভেদ ঘটাবেন এই ঐক্যবদ্ধ ছাত্র ও মজুরদের মধ্যেও। বিভিন্ন তাঁবেদার সংবাদ পত্র এজন্যেই বিকৃত সংবাদ জোগাচ্ছে, তা আমরা জানি। কারণ সংবাদ পত্রগুলো এক নেতার বা এক একটা নেতৃ-গোষ্ঠীর প্রচার পত্র মাত্র। কেউ শ্যামাপ্রসাদবাবুর কৃতিত্ব প্রচার করে সার্থক, কেউ শরৎচন্দ্রের বীরত্ব ঘোষণায় কৃতার্থ, অনেকেই পরস্পরের দোষ কাটাচ্ছেন স্বতন্ত্র কোনো দলের ঘাড়ে মিথ্যা দোষ চাপিয়ে দিয়ে।

কিন্তু, ছাত্রেরা জানেন—প্ররোচক ছিল কি ছিল না; আর নেতাদের এই প্ররোচক আবিষ্কারের ফ'লে কি প্ররোচনা প্রশ্রয় পাচ্ছে। কিন্তু এই সূত্রে আমরা আমাদের যে ত্রুটি সংবন্ধে সচেতন হতে পারি তা এই—প্রথমত, স্বতোৎসারিত নীতিতে spontaneity-তে আন্দোলন আমাদের নেতাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে—ছাত্রদেরও উপর তার প্রভাব পড়েছে। দ্বিতীয়ত, বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও সংগঠন-ক্ষমতার অভাবে নেতারা জনজাগরণ দেখলে সহজেই দ্বিধাগ্রস্ত ও বিড়ম্বিত হয়ে পড়েন। তৃতীয়ত, একই সঙ্গে বলবার মত ঐক্যও নেতারা এখনো সঞ্চয় করেননি। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখাও দরকার—নেতাদের উপরে দোষারোপ করলেই নেতৃত্ব পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে না। বরং উপনেতৃত্বের সৃষ্টি বাড়তে পারে। চতুর্থত, বাঙলা দেশের সংবাদ পত্র আজ মুনাফাদারীর দৌলতে মালিকদের মুখপত্রই শুধু হয়নি, বিশেষ বিশেষ নেতা ও উপনেতাদের স্বার্থে তা সংবাদ সাজায়, ভাঙে গড়ে, গোপন করে। তাই সংস্কৃতিঅনুরাগীর পক্ষে জনমনের ও জন-আন্দোলনের সংবাদ লাভ আজ দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছে। অথচ,—যা সব চেয়ে বড় সত্য তা এই,—যুদ্ধের বৈপ্লবিক সম্ভাবনা আমাদের দেশেও প্রকটিত হচ্ছে। তাকে বলিষ্ঠ ও সার্থক রূপ দানেই আমাদের নতুন জীবনের ও নতুন সংস্কৃতির দুয়ার খুলবে। সে জন্যই চাই ঘটনার সঙ্গে যথার্থ পরিচয়, অবস্থায় বাস্তব বিশ্লেষণ; তাতেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও সংগঠন সম্ভব।

গোপাল হালদার

পরিচয়

পঞ্চদশ বর্ষ—১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা
পৌষ, ১৩৫২

বাঙালী কোথায় চলেছে

[পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটি ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার সম্মিলিত উদ্যোগে গত ৩০শে অক্টোবর হইতে ১লা নভেম্বর পর্য্যন্ত "বাংলার পুনর্গঠন" সম্পর্কে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে এই অভিভাষণ পঠিত হয়। মূল সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা।]

১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের ফলে বাঙলার গ্রাম্য জীবন সব দিক থেকে ধ্বসে পড়েছে। সেই ভাঙা ঘরকে নূতন ক'রে কি ভাবে গড়ে তোলা যায় এ-কথা আলোচনা করবার জন্য আপনারা আজ বাঙলার বিভিন্ন অংশ থেকে এখানে সমবেত হয়েছেন। আপনারা সকলেই দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রকোপের সময় জনসেবায় নিযুক্ত ছিলেন এবং তার ঠিক পরবর্ত্তীকালে, বাঙলার গ্রাম্য জীবনকে কি ভাবে পুনরায় গড়া যেতে পারে, সেজন্য বিভিন্ন দুর্ভিক্ষত্রাণ সমিতিগুলি যে-সকল প্রচেষ্টা করেছিলেন, সেগুলি কাজে পরিণত করার ভার আপনারাই নিয়েছিলেন। আজ আপনারা আপনাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান আদান-প্রদান ক'রে সমবেত চিন্তার দ্বারা নূতন কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশ লাভের জন্য এখানে এসেছেন। আর, আজ আপনাদের যিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেছেন, তাঁর কাছে বিশেষভাবে বাঙলার ভবিষ্যদ্‌জীবন গঠনের সম্বন্ধে আপনারা উপদেশ লাভ করবেন। তিনি দীর্ঘ দিন বাঙালী জাতির ও বাংলা প্রদেশের আর্থিকজীবন সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করেছেন। জাতীয় মহাসভার নিয়োজিত ন্যাশনাল প্লানিং কমিটির একজন প্রধান সভ্য হিসাবেও তিনি এ-বিষয়ে যথেষ্ট মৌলিক মন্ত্রণা দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমরা এ পুনর্গঠন কাজের জন্য পথ নির্দ্দেশে যথেষ্ট সাহায্যলাভ করবার আশা রাখি।

এবার আমি আপনাদের সমক্ষে আমাদের সমস্যাটা কি, তাই সংক্ষেপে বলব।

বাঙালী কৃষিজীবী : বাংলার শতকরা ৭৪ জন লোক কৃষিকাজে তাদের জীবিকা অর্জ্জন ক'রে থাকে। কিন্তু "জীবিকা অর্জ্জন করে" এই কথা বলে থামলেই ভুল হবে। বাংলার কৃষক জমি থেকে তার অন্নবস্ত্রের সংস্থানের চেষ্টা করে, এইটুকুই শুধু বলা চলে। কিন্তু এই দুই নিত্য আবশ্যকীয় জিনিস কি পরিমাণে জোটে—সেটা বুঝতে গেলে হিসাব ক'রে দেখতে হয় প্রত্যেক কৃষক পরিবারের ভরণপোষণের জন্য কতখানি জমি দরকার, এবং তাদেরই বা তা কতটা আছে। সরকারী কৃষিবিভাগ ও সরকারী কৃষিকমিশন (ফ্লাউড কমিশন) এ-কথা পরিস্কার স্বীকার করেছেন যে, এক রপ্তে ১৫ বিঘা ভাল জমি হলে একটি পরিবারের কৃষি কাজ

বিনা অপচয়ে করা চলে; এবং অন্ততঃ ৯ বিঘা জমি না হলে একটি সাধারণ কৃষক পরিবারের নিত্য শাক-অন্ন জোটাও সমস্যার বিষয় হয়ে ওঠে। এই সঙ্গে সঙ্গে ১৯৩৬ সালের তদন্তের ফলে ফ্লাউড কমিশন স্বীকার করেন যে, বাঙলার কৃষকদের গড়পড়তায় পরিবার পিছু মাত্র ৪'৮ বিঘা জমি আছে। অর্থাৎ গড়ে, একটি পূরা চালু জোত কারও ভাগে পড়ে না। এ তো হল গড়পড়তার কথা। তার মধ্যে বড় জোতদারও আছেন, আর দশ কাঠা জমির মালিক ক্ষেত মজুরও আছেন। (বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯৩৬ সালে এই কৃষকদের শতকরা ৫৭ জনের জমি ৯ বিঘার মধ্যে ছিল, এবং শতকরা ৪৬ জনের ৬ বিঘা ও তার চেয়ে কম জমি ছিল। স্থতরাং কৃষিজীবীদের অর্দ্ধেক লোক যে জমি হতে সারাবছরের খোরাক তুলতে পারত না তা বলা বাহুল্য। অবশ্য যাদের জমি কম ছিল তারা ক্ষেতমজুরী ক'রে বা ভাগচাষী হয়ে এই অভাব মেটাতে চেষ্টা করত। এই সকল দুঃস্থ চাষীদের মধ্যে যারা প্রধানতঃ মজুরীর উপর নির্ভর ক'রে সংসার চালাবার চেষ্টা ক'রে থাকে তাদের "ক্ষেতমজুর" শ্রেণীতে ধরা হয়। আর যারা জমির ফসল ও মজুরী এই দুইয়েরই নির্ভর করে তাদের—"মজুর চাষী" বলে অভিহিত করা যেতে পারে। অন্য যারা, তারা প্রায় শুধু জমির-ফসলের উপরই গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নির্ভর করে। এদের শুধু "কৃষক" বলা উচিত। এদের মধ্যে অনেকের নিজের জমি যথেষ্ট নেই; তারা অন্যের জমি বর্গা নিয়ে সে অভাব পূরণ করে।)

(১৯৩৬ সালের দু'তিন বৎসর পরেই যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধের আগেও ধীরে ধীরে দেশের অবস্থা মন্দ হতে আরো মন্দের দিকে চলেছিল। কারণ, এই যে বিরাট ক্ষেত মজুর ও মজুর চাষী শ্রেণী তাদের খোরাকের ব্যবস্থার জন্য ভেবেচিন্তে দেশব্যাপী কোনো চেষ্টা হয়নি। তার উপর যুদ্ধের ফলে জিনিসপত্রের দাম চড়ে। জাপানী আক্রমণ হতে রক্ষার জন্য নৌকা, ধান, চাল প্রভৃতি সরানোর ফলে অভাব আরও বাড়ে। বহুসংখ্যক সৈন্যসামন্ত আমাদের প্রদেশে আসায় খাদ্যের চাহিদা অনেক উপরে উঠে; এই সময়ে আবার ফসলও কম হয়। এবং সরকারী অব্যবস্থা ও দুর্নীতি এবং ব্যবসায়ীদের দুর্ব্বার লোভের ফলে দুর্ভিক্ষের স্থষ্টি হয়। কিন্তু দুর্ভিক্ষের আগেই, ১৯৪২ সালের শেষভাগে দেশের অবস্থা যথেষ্ট খারাপ হয়েছিল।)

(পূর্ব্বেই বলেছি যে, আমাদের কৃষিজীবীদের অর্দ্ধেক লোক জমি থেকে শাকান্নও সংগ্রহ করতে পারে না। এ অবস্থা ১৯৩৬ সালে হঠাৎ উদ্ভূত হয়নি; আগে থেকেই এই অবস্থার দিকে চাষীরা এগিয়ে আসছিল। এই অধোগতির ধারা ১৯৪২ সালের মধ্যে কতটা বেড়েছিল তার নির্দ্দেশ পাওয়া যায় বাংলাদেশের ঐ সময়ের নিঃস্ব পরিবারের সংখ্যা থেকে। নিঃস্ব বলতে এ প্রবন্ধে শুধু সেই সকল লোককেই বোঝাবে যারা প্রধানতঃ সম্পূর্ণরূপে ভিক্ষা বা অপরের দানের উপরে নির্ভর ক'রে খাওয়া-পরা চালায়। ১৯৩১ সালের আদমসুমারীতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে এদের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ১'০৭ শতাংশ। দেশের অবস্থা যদি ১৯৩১-এর পর সামান্য উন্নতিলাভ করত বা অপরিবর্তিত থাকত, তাহলে নিঃস্বের সংখ্যা বাঙলার লোকসংখ্যার অনুপাতে বাড়ত। এই হিসাবে আমরা দেখি যে, ১৯৪২ সালের শেষে বাঙলাদেশে নিঃস্ব লোক ৫'৯ লক্ষ থাকবার কথা। কিন্তু হিসাবে মেলে ৭'৫ লক্ষ। এ-হিসাব বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে আমি ভারতীয় রাশিবিজ্ঞান

সমিতির অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাশয়ের সহযোগিতায় যে তদন্ত করেছিলাম, তারই সংগৃহীত তথ্য থেকে পাওয়া যায়। এ প্রবন্ধে অন্য যে সকল রাশির উল্লেখ করব তারও বেশির ভাগই এই তথ্য সংগ্রহ হতে নেওয়া। কিন্তু মৌলিক রাশির ভিত্তিতে যে আলোচনা বা হিসাব করা হয়েছে সেগুলির জন্য দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার।

উল্লিখিত নিঃস্ব লোকের সংখ্যা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, বাঙলার আর্থিক অবস্থা ১৯৩১ থেকে ১৯৪২ পর্য্যন্ত মোটামুটি নিচের দিকে চলেছিল।

কৃষিজীবীদের দুরবস্থা সম্বন্ধে বিশদভাবে কিছু কথা পূর্ব্বেই বলেছি। এই দীন অবস্থা কিন্তু তাদের একচেটিয়া নয়। অন্য দু'টি বিশেষ পেশার উল্লেখ ক'রে তার নমুনা দেব।

বাঙালীর খাদ্যের প্রধান অংশ ভাত ও ডাল জোগায় চাষী; অন্য প্রধান উপকরণ মাছ জোগায় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়। এই জেলেদের অবস্থা সম্বন্ধে এটুকু বললেই চলে যে, এরা চাষীদের চেয়েও খারাপ হালে থাকে। মৎস্যজীবীদের সাধারণতঃ জমি থাকে না; তারা নির্ভর করে পুকুর, নদী ও বিল জমার উপর। কিন্তু এদেরও বেশির ভাগ লোকই জমিদারী জলকর মহালে জমা নেবার কোনো সুযোগ পায় না। এই সব বিল, নদী প্রভৃতিতে মাছ ধরার অধিকার জমিদারের কাছারী থেকে ডাকে নিলাম করা হয়। সাধারণতঃ পয়সাওয়ালা মহাজনরা এই সব ডেকে নেয়। তারপর, তারা হয় জেলেদের মজুরি দিয়ে মাছ ধরায়, না হলে যতটা সম্ভব চড়া হারে ঐ সব জলাতে মাছ ধরার আংশিক স্বত্ব জেলেদের বিলি করে। কৃষকদের মধ্যে ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুরদের চেয়ে এদের অবস্থা কোনো অংশে ভাল নয়।

চাষী ও জেলে যেমন খাবার জোগায়, বাঙলার তাঁতী তেমনই চিরকাল বাঙালীকে কাপড় জুগিয়ে এসেছে। ইংরেজশাসনের প্রথম যুগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অত্যাচারে ও পরবর্ত্তী সময়ে কাপড়ের কলের প্রতিযোগিতায় এদের বহু লোক জাতিব্যবসায় ছেড়ে কৃষি ও অন্য পেশায় চলে যায়। তা হলেও এই তন্তুবায় সম্প্রদায় এখনও বাঙলার কাপড়ের চাহিদার এক চতুর্থাংশ মেটাতে পারে। আর মোট উৎপন্ন কাপড়ের হিসাব করলে দেখা যায় যে, ১৯৪০ সালেও এরা বাংলার কাপড় কলের প্রায় সমান সমান বস্ত্র বয়ন করেছিল। কিন্তু এ-যুগের এই তাঁতীরা আর স্বাধীন শিল্পী নয়। ১৯৪১ সালের সরকারী তদন্তে দেখা যায় যে, তন্তুবায় সম্প্রদায়ের শতকরা ৭৫ জনই মহাজনের কবলে। বস্ত্রশিল্পের বিখ্যাত কেন্দ্র শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা, রাজবলহাট প্রভৃতি জায়গায় তদন্ত ক'রে দেখা যায় যে, বেশির ভাগ তাঁতীরই নিজের তাঁত নাই। তারা মহাজনের মজুরী খাটে, শুধু "বানি" পায়। আর, যাদের তাঁত আছে, তারাও সুতা ও খোরাকীর জন্য মহাজনের ঘরে বাঁধা থাকে। তার ফলে বেশীর ভাগ তাঁতী খুব কম বানি পায়; আর সুতা কিনতে হলে তাদের বাজারের চেয়ে বেশি দাম দিতে হয়। এই সব শিল্পীদের অবস্থা ক্ষেতমজুর ও আধিয়ারের সামিল। এদেরও বেশির ভাগ লোকের অনেক সময়ে দু'বেলা পেট ভরে শাক-অন্ন জুটত না।

কৃষক, গ্রাম্য-শিল্পী ও মৎস্যজীবীদের অবস্থার মত গ্রামের অন্য পেশার লোকদের অবস্থাও দিন দিন খারাপের দিকে চলেছিল। কারণ গ্রামের অন্য শিল্প ও ছোট ব্যবসায়, সমস্তই কৃষকের সম্পদের উপর নির্ভর করে। এই অধোগতির বেগ ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে

প্রবল স্রোতে পরিণত হয়ে বাঙলার সমাজকে ভাসিয়ে দিয়ে গেছে। বানের জল চলে গেলে যেমন সর্ব্বত্র মহামারী দেখা দেয়, এখানেও তেমনই বিস্তৃতভাবে বিভিন্ন রোগের প্রকোপ দেখা দিয়েছিল। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে শুধু যে, কম পক্ষে ৩৪ লক্ষ লোক মারা গেল তাই নয়, বাঙলার নিঃস্ব লোকের সংখ্যা প্রায় ১১ লক্ষে দাঁড়াল, এবং শতকরা ৭৫ জনেরও বেশি কৃষিজীবী তাদের জমি হতে খোরাক সংস্থানের ক্ষমতা হারাল—অর্থাৎ আরও এক ধাপ নিচে নেমে পড়ল। সরকারী দপ্তর থেকে জানা যায় যে, দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বে এক বৎসরে সাধারণতঃ জমি বিক্রয়ের যত দলিল তৈয়ারী হত ১৯৪৩ সালে তার তিনগুণ পরিমাণ বিক্রয় কোবালা রেজেস্ট্রী হয়। এই সব জমি প্রধানতঃ গরীব চাষীরা বেচেছিল। ক্ষেত-মজুরদের মধ্যে যাদের কিছু জমি ছিল তারা অনেকেই সে সব বিক্রয় করতে বা বন্ধক দিতে বাধ্য হয়েছিল। এদের শতকরা ২৫ জন সমস্ত জমি বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। "মজুর চাষী" যারা, তাদের অবস্থা এর চেয়ে কিছু ভাল ছিল। তাই তাদের জমি লোকসান এদের তুলনায় অর্দ্ধেকেরও কম হয়েছিল। সবচেয়ে কম ধাক্কা খেয়েছিল "কৃষক" শ্রেণী। এদের শতকরা দু'জনেরও কম লোক সমস্ত জমি বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এদের উপর দুর্ভিক্ষের আঘাত তীব্রতায় কম হলেও যথেষ্ট বিস্তৃত হয়েছিল। বিভিন্ন পেশায়, তাদের লোকসংখ্যার অনুপাতে কি পরিমাণ লোক নিঃস্ব হয়ে গেছে, সেই সংখ্যা থেকে অনেকটা আন্দাজ পাওয়া যাবে যে, কোন পেশায় দুর্ভিক্ষের দরুন দুর্গতি কতখানি হয়েছে।

সমস্ত কৃষিজীবীদের শতকরা ১'৩ অংশ লোক নিঃস্ব হয়ে গেছে। কিন্তু এদের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ করলে দেখা যায় যে, এদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি নিঃস্ব হয়েছে ক্ষেতমজুররা। শুধু "কৃষক"দের ধরলে নিঃস্ব পরিবারের সংখ্যা মোট "কৃষক" পরিবারের মাত্র ০'৭৫ শতাংশ হয়। কিন্তু ক্ষেতমজুরদের নিঃস্ব পরিবার দাঁড়ায় ৩'০২ শতাংশ। গ্রামের শিল্পীরাও প্রায় এই রকমই আঘাত পেয়েছে; তাদের ২'৭০ শতাংশ পরিবার নিঃস্ব হয়ে গেছে। ছোট দোকানদার ও গ্রাম্য ব্যবসায়ীরাও বাদ যায়নি; তাদের ১'৩০ অংশ এই দুর্গতিতে পৌঁছেচে। কিন্তু সব চেয়ে বেশি ভেঙে পড়েছে মৎস্যজীবীরা। তাদের শতকরা ৭'৭৫টি পরিবার সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে পরের অনুগ্রহে বেঁচে আছে বা মরে যাচ্ছে।

এসব নিঃস্বলোক ছাড়া আরও বহুলোক দুঃস্থ হয়ে পড়েছে—এ-কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। কয়েক বৎসর আগেও কৃষিজীবীদের অর্দ্ধেক লোক দুঃস্থ ছিল; এখন তাদের মধ্যে দুঃস্থের সংখ্যা প্রায় তিন চতুর্থাংশে দাঁড়িয়েছে। এদের বেশির ভাগই হয় জমিহীন মজুর না হয় আধিয়ার। নিজেদের নামমাত্র জমি আছে; তাতে বছরে দু'চার মাসের হয় তো খোরাক জোটে। বাকী সময় পরের জমিতে মজুরী বা ভাগ চাষ থেকে খাওয়া-পরার চেষ্টা করতে হয়। বাঙলার কৃষক ও গ্রাম্য শিল্পী প্রভৃতির ঋণের হিসাব করলেও এই দুর্দ্দশার পরিচয় পাওয়া যায়। ঋণের পরিমাণ ও বিস্তৃতি ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের পরে বহু পেশায় দু'গুণ বেড়ে গেছে।

বেশিদিন খেতে না পেলে মানুষ মারা যায় এ অতি সহজ কথা; খাবারের অভাব ঘটলে মানুষ শাক-পাতা-মূল যা পায় তাই খেয়ে বাঁচবার চেষ্টা করে। তাতে রোগের সৃষ্টি হয়; এসব না খেলেও, খাদ্যের অভাবে সহজেই দেহ রোগে জীর্ণ হয়। এমনি

ক'রেই বাঙলার বহুসংখ্যক লোক রুগ্ন হয়ে পড়ে আছে। আমাদের তদন্তে দেখা গেছে যে, সারা বছরের হিসাব নিলে ১৩৫০ সালে দেশের প্রায় অর্দ্ধেক লোক কোনো না কোনো সময়ে মাসখানেক ও তার বেশি সময় রোগে ভুগেছিল। ফলে বাংলার বহু সংখ্যক রোজকারী লোক রোগে অক্ষম হয়ে পড়ে থাকে। উপযুক্ত চিকিৎসা, পথ্য ও খাদ্যের অভাবে তারা আর কাজে ফিরে আসতে পারেনি। বাঙলার যে ১১ লক্ষ নিঃস্ব লোকের কথা আগে বলেছি, এদের অনেকে এই কারণে নিরুপায় হয়েছে। যারা দুঃস্থ; তাদেরও মধ্যে বহু পরিবার একই কারণে এই অবস্থায় আছে। এ ছাড়া, পূর্ব্বেই বলেছি যে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে বাঙলার ৩৪ লক্ষ লোক মারা গেছে। যে সব পরিবারে রোজকারী লোক এভাবে চলে গেছে, তারা সংখ্যায় নেহাৎ কম নয়। ১৫ থেকে ৫০ বৎসর বয়সের পুরুষদের শতকরা ৫ জন মারা গেছে। মোটের উপর বাঙলার প্রত্যেক পরিবারে গড়ে একজন থেকে দু'জন রোজকারী লোক থাকে। কাজেই সহজেই বোঝা যায় যে, বাঙলার কিঞ্চিদধিক এক কোটি পরিবারের মধ্যে তিন চার লক্ষ পরিবারের রোজকারী লোক মারা গেছে। এই সব পরিবারে যারা পূর্ব্বে দুঃস্থ ছিল, তারা ফলে নিঃস্ব ও এখন নিরাশ্রয় হয়ে গেছে। যারা কোনোরকমে চালিয়ে যাচ্ছিল তারা এখন দুঃস্থ হয়ে পড়েছে, এবং তাদের দয়ার উপর যারা নির্ভর ক'রে পেট চালাত, সেই সব লোককে নিরাশ্রয় হয়ে এখন চলে আসতে হয়েছে।

অন্নাভাবে মানুষ যেমন মারা গেছে, অনাহার ও রোগের ফলে লোকে যেমন অক্ষম হয়েছে, গ্রামের আর্থিক কাঠামো ভেঙে গিয়ে সমগ্র গ্রাম্যসমাজ যেমন ধ্বংসের পথে চলেছে, তেমনই বাঙলার ভবিষ্যদ্‌সমাজ যারা গড়ে তুলবে, বাঙলার সেই ছোট ছেলে মেয়েদের শিক্ষার বনিয়াদও দুর্ভিক্ষের আঘাতে বহু সহস্র গ্রামে লোপ পেয়ে গেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আওতায় আজ প্রায় দুইশত বৎসর ধরে শিক্ষার ক্ষীণ তরুটি অতি সামান্য শাখাপল্লব বিস্তার ক'রে দেশের শতকরা মাত্র ১৮ জন লোককে অক্ষরজ্ঞান দিতে পেরেছে; এবং শিক্ষায়তনে ১৯৪০-৪১ সালে ৭ থেকে ১৭ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের কিঞ্চিদধিক এক চতুর্থাংশকে আশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু এ সামান্য অবলম্বনও ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের ফলে রক্ষা পায়নি। ঐ বৎসরের অনাহার ও ১৯৪৪-এর মহামারী এই দু'য়ের ফলে গ্রাম্য শিক্ষায়তনগুলিতে ছাত্রসংখ্যা ১৯৩১ সালের পর্য্যায়ে নেমে গেছে।

আমাদের আজ ভেবে দেখতে হবে যে, এই সব সমস্যার কি সমাধান হতে পারে। আমি বিশেষ করে বাংলার ১১ লক্ষ নিঃস্ব লোকের সমস্যার কথা এ-প্রসঙ্গে আলোচনা করব। দুঃস্থতা ও অন্যান্য সমস্যা এই সূত্রেই সংক্ষেপে বিচার করা হবে।

বাংলার এই ১১ লক্ষ (১০'৭৬ লক্ষ) নিঃস্ব লোককে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়—

১। যাদের রোজকারী লোক মৃত (বা নাই)···মোট ৫'২৬ লক্ষ

২। যাদের রোজকারী লোক অক্ষম (রুগ্ন)···মোট ৩'০৮ লক্ষ

৩। যাদের রোজকারী লোক কাজের অভাবে বেকার···মোট ২'৪২ লক্ষ

এদের মধ্যে শিশু, বালকবালিকা, নারী, জোয়ান পুরুষ ও বৃদ্ধ লোক ভাগ করলে দাঁড়ায় এরূপ—

	শিশু	বালকবালিকা	জোয়ান		বৃদ্ধ	মোট
			স্ত্রী	পুরুষ		
	(০-৫ বৎসর)	(৫+—১৫)	(১৫+—৫০)		(৫০+…)	
রোজকারী						
১। মৃত	০'৪৫	২'১৯	১'৬৭	০'৪০	০'৫৫	৫'২৬
২। অক্ষম	০'২৮	০'৯১	০'৭১	০'৫৩	০'৬৫	৩'০৮
৩। বেকার	০'৩৭	০'৭৭	০'৫৪	০'৫০	০'২৪	২'৪২

প্রথমে শিশুদের কথা আলোচনা করা যাক। যে সব শিশু ও ছোট ছেলেমেয়েদের মা বাপ দুইই মারা গেছে, তাদের অনাথাশ্রমে রাখা ছাড়া উপায় নাই। কারণ নিঃস্ব পরিবারে এদের জন্য খোরাকী দিয়ে ব্যবস্থা করবার চেষ্টা ব্যর্থ হবার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু যেখানে মা বেঁচে আছে, অথবা খুবই নিকটআত্মীয় যেমন, পিতামহ কি মাতামহের প্রকৃত আশ্রয়ের সম্ভাবনা আছে, সেখানে খোরাকী দিয়ে এই সব শিশু ও ছেলেমেয়েদের পরিবারের মধ্যে মানুষ হতে দেবার সুবিধা দেওয়া উচিত। মায়ের জায়গা অনাথ আশ্রম নিতে পারে না; এবং অকারণ পরিবারের বাঁধন ভেঙে তার বাইরে ছেলেমেয়েদের রাখা বাঞ্ছনীয় নয়।

সরকারী কর্ম্মচারীরা প্রথমে তদন্ত ক'রে বলেছিলেন যে, সমস্ত বাংলায় ৩০ হাজার শিশু ও ছেলেমেয়েদের জন্য অনাথাশ্রম দরকার। কিন্তু পরে তাঁরা এই সংখ্যাকে একেবারে ১০ হাজারে কমিয়ে দেন। আমাদের হিসাব থেকে মনে হয় ১৩-১৪ হাজার শিশু ও ছেলে-মেয়েদের অনাথাশ্রমে আশ্রয় দেওয়া দরকার হবে। এ-ছাড়া, যাদের মা জীবিত আছে ও কর্ম্মক্ষম, সে রকম ছেলেমেয়েদেরও কিছুদিন তাদের মায়ের সঙ্গে শিল্পকেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট আশ্রম গড়ে আশ্রয় দিতে হবে, এবং যতদিন না তাদের মা কাজ শিখে রোজকার ক'রে তাদের খাওয়াতে পারে, ততদিন তাদের খোরাকী দিতে হবে। আমার মনে হয়, এই ধরনের আশ্রমে আরও ১৩-১৪ হাজার ছোট ছেলেমেয়েকে আশ্রয় দিতে হবে। তাদের মা ও অন্যান্য কর্ম্মক্ষম নারীদেরও আন্দাজ ১৫ হাজারের জন্য এই রকম ব্যবস্থা করতে হবে। মোটামুটি এক একটি মহকুমায় তিনটি ক'রে আশ্রম স্থাপন করলে এ বিষয়ে সুব্যবস্থা সম্ভব হবে। বলা বাহুল্য দুঃস্থ পরিবারের শিশুদের জন্য অনাথাশ্রম আবশ্যক হবে না তাদের দরকার হবে সাহায্য। কিন্তু দুঃস্থ পরিবারের বহু সংখ্যক নারীকে কাজ দিয়ে রোজকারের ব্যবস্থা করা আবশ্যক হবে।

এবার যে সব পরিবারের রোজকারী লোকেরা রুগ্ন ও অক্ষম, তাদের কথা আলোচনা করা দরকার। একথা অতি সহজবোধ্য যে, এই সব পরিবারের অন্য লোকদের জন্য খোরাকী ও কাপড় দিতে হবে এবং চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা ক'রে রুগ্ন লোকদের কর্ম্মঠ করতে হবে। এদের মধ্যে কিছু লোক দু'তিন মাস হাসপাতালে থাকলে তবে সেরে উঠতে পারবে। বাকী লোককে সাধারণ চিকিৎসাকেন্দ্রে রোগনির্ণয় ও ঔষধ এবং পথ্যের জন্য সাহায্যদান করলেই চলবে। শুধু নিঃস্বদের মধ্যেই প্রায় ১ লক্ষ রোজকারী লোক রুগ্ন; তা ছাড়া প্রতি বৎসরেই এই ধরনের অন্নহীন লোকের মধ্যে অর্দ্ধেক কি তার বেশির ভাগ অন্ততঃ দু'এক মাস রোগে ভোগে। যদি আমরা ধরি যে, প্রাপ্তবয়স্ক রুগ্ন নিঃস্বদের শতকরা দশ-জনকে মাস তিন হাসপাতালে রাখার ব্যবস্থা করা দরকার, তা হলে শুধু এই বয়সের নিঃস্বদের

জন্য প্রত্যেক মহকুমায় ৩০ টি রোগীর উপযুক্ত এক একটি হাসপাতাল দরকার হয়। প্রকৃতপক্ষে এরূপ চিকিৎসার উপযোগী রোগীর সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশি।

নিঃস্বদের বাদ দিয়ে শুধু যদি দুঃস্থদের ধরা যায়, তা হলে ৫০ হাজার রোগীর উপযুক্ত হাসপাতালের দরকার হয়।

দুঃস্থদের শতকরা মাত্র একজন লোক তিনমাস হাসপাতালে থেকে রোগ সারাবে এই হারে হিসাব করা হয়েছে। এ আন্দাজ মোটেই বেশি নয়।

রুগ্ন লোকদের কর্ম্মঠ ক'রে তাদের কাজ দিতে হবে—একথা বলা বাহুল্য। আর যারা কর্ম্মক্ষম বেকার, তাদেরও রোজগারের ব্যবস্থা করতে হবে। এদের সংখ্যা পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, মৃত ও রুগ্ন রোজকারী লোকদের বাড়ির জোয়ান মেয়েদেরও কাজের ব্যবস্থা আবশ্যক। এই ব্যবস্থা এক ধরনের হতে পারে না। বিভিন্ন পেশায় বিভিন্ন ব্যবস্থা, সরঞ্জাম ও নিয়মের প্রয়োজন হবে।

প্রথমে আমি মৎস্যজীবীদের কথা বলব। কারণ নিজেদের সংখ্যা অনুপাতে এরা সব চেয়ে বেশি দুর্দ্দশায় পৌঁছেচে। এদের অভাব নৌকার, জালের ও পোলো দোয়াড় প্রভৃতি বাঁশের তৈয়ারী মাছ ধরার সরঞ্জামের। নৌকা না হলে এদের মাছ ধরা শুধু বেশি জলের সময় সম্ভব হয়। তা হলে বৎসরে ৬ মাস জাতিব্যবসায় বন্ধ থাকে। গোটা দুই জাল এবং গোটা তিন চার পোলো ও ঘুনি দোয়াড় বা বঁইচনা প্রত্যেক পরিবারের আবশ্যক। এই সব সরঞ্জামের দাম নিঃস্বরা দিতে পারবে না। তাদের এগুলি সাহায্য হিসেবে দিতে হবে, এ-ছাড়া এদের আর একটি প্রধান সাহায্য—জমিদার ও মহাজনের অন্যায় বা অত্যধিক জলকর আদায় থেকে রক্ষা। এ বিষয়ে জমিদারকে বোঝাতে গিয়ে আমার নিজের ব্যর্থতার তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। মাছ ধরা ও নৌকাঘাটের পারাপারি কাজ এই একই শ্রেণীর লোকে ক'রে থাকে। জমিদারের জলকরের মত, সরকার বাহাদুরও পারঘাটার জমা নিলামে উচ্চতম ডাকে ছেড়ে দেন। এবং ধনী মহাজন সাধারণতঃ সেটি কিনে নিয়ে মাঝিদের ভাগচাষীর মত হীন অবস্থায় ফেলে রাখে। এ অন্যায় বন্ধ করার জন্য এরূপ আইন হওয়া উচিত যে জলকর একটা নির্দ্দিষ্ট হারের বেশি আদায় চলবে না। এবং প্রকৃত মৎস্যজীবী ও মাঝি বর্ত্তমান থাকলে অন্য লোক সে সব জমা পাবে না। একজন মাঝি বা একজন মৎস্যজীবী অবশ্য বড় জলা বা একটি পারঘাটা জমা নিতে পারে না, বা নিলেও সে নিজে মহাজনে পরিণত হবে, তাই আবশ্যক মৎস্যজীবীদের সমবায়, যারা সকলের মঙ্গলের জন্য সমবেতভাবে এই জমা নিতে পারবে। এভাবে সমবায় গড়া নিঃস্বদের সাহায্য দেবার সময় সহজেই হতে পারে। তবে সেটা সরকারী কর্ম্মচারীরা হাতে নিলে হবে না। মৎস্যজীবীদের মধ্যে যারা পূর্ব্বেই জনসেবার কাজ করেছে, তাদের দিয়ে এই ধরনের সমিতি গড়তে চেষ্টা করলেই তা সফল হবে। এই সকল সমবায় মারফৎ মৎস্যজীবীদের দরকারী সূতা, আলকাতরা, গাব প্রভৃতি সরবরাহ করা যেতে পারে। মাছ বিক্রয়েও এরা ফড়িয়াদের হাত থেকে মৎস্যজীবীদের রক্ষা করতে পারবে। এইভাবে সমবায় গড়লে জেলেদের দিয়ে জাল পোলো প্রভৃতি তৈয়ারী করান চলে। তাতে এদের মেয়েরা যথেষ্ট কাজ পাবে। মাছ বিক্রয়েও মেয়েরা সাহায্য করতে পারবে। সমবায় সুগঠিত হলে এই পেশায় যে মেয়েদের বাড়ির রোজকারী

লোক মৃত বা রুগ্ন তাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আবশ্যক হবে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, মাছধরার সরঞ্জাম দিলেই জেলেরা খেতে পাবে না। মাছধরার বিভিন্ন সময় আছে, ও মাঝে মাঝে ফাঁকও আছে। যতদিন না ঠিক মাছ ধরার সময় আসে ও রোজকার শুরু হয় সে সময় পর্য্যন্ত এদের নিঃস্ব লোকদের খোরাকী জোগাতে হবে। না হলে এরা আবার জাল নৌকা প্রভৃতি বিক্রয় বা বন্ধক দিতে বাধ্য হবে। এ-বিষয়ে সরকারী সাহায্যের সময় দৃষ্টি না দেওয়ার ফলে চট্টগ্রাম অঞ্চলে কোনো কোনো স্থলে জেলেরা সরঞ্জামের খরচ খোরাকী হিসাবে ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছে।

এবার আমি কৃষিজীবীদের বিষয় আলোচনা করব। পূর্ব্বেই বলেছি যে, গরীব চাষীরা অনেকে তাদের সমস্ত জমি হারিয়েছে, আর নিম্ন ও মধ্যম সবশ্রেণীর কৃষকেরই কিছু না কিছু জমি বিক্রয় ও বন্ধকে নষ্ট হয়েছে। এই শ্রেণীকে সাহায্য করবার জন্য সরকারী তরফ থেকে হস্তান্তরিত জমি ফিরিয়ে দেবার-ব্যবস্থা ক'রে একটি আইন পাশ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, বিক্রয়ের দামটা দশ বৎসর সমান কিস্তিতে শোধ দেওয়া চলবে। কিন্তু সরকারী লোকের খেয়াল হয়নি যে, প্রথম কিস্তি দেবে কে? যে সব লোকেরা সরকারী লঙ্গরখানায় বা বেসরকারী সাহায্যকেন্দ্রের দৌলতে কোনো রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে রেখে আবার স্বাভাবিক সাংসারিক জীবনে ফিরে আসতে চেষ্টা করছে তারা? আর এই আইনে কতটা জমি ফেরৎ পাওয়া যাবে? বিক্রয়মূল্যের উর্দ্ধমাত্রা দেওয়া হয়েছে ২৫০৲। তার মানে যে ব্যক্তি দেড় বিঘার বেশি জমি অভাবে পড়ে বিক্রয় করেছে, সে বাড়তি জমিটা ফেরৎ পাবে না। আর এই সব আইন-আদালতের খরচাই বা জুটবে কোথা থেকে? কোনো কোনো সরকারী কর্ম্মচারী মন্তব্য করেছেন যে, আমরা যত জমি হস্তান্তরিত হয়েছে বলি সে হিসাবে কই ফেরৎ পাবার দরখাস্ত আসে না তো! কেন আসছে না তার কারণ অতি সহজ, তা আপনারা জানেন।

জেলেদের বেলা যেমন নৌকা ও জাল সাহায্য হিসাবে দেবার কথা বলা হয়েছে, এখানেও তেমনই গরীব চাষীদের—যারা মাত্র ৫-৬ বিঘা জমি বা তারও কম জমির মালিক—তাদের এ জমি সরকারী তরফ থেকে কিনে ঐ সব লোককে কৃষিকার্য্যে বসিয়ে দিতে হবে। আর এই সুযোগে, এদের দিয়ে কৃষি সমবায়ের ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। তবেই কৃষি যন্ত্রশিল্পের সমকক্ষ হবার পথে অগ্রসর হতে পারবে। যে সব চাষীর অবস্থা এদের চেয়ে ভাল, তাদের দিতে হবে কৃষিঋণ নামমাত্র বা বিনাসুদে, এবং সে ঋণ পরিশোধ শীঘ্র দাবী করলে চলবে না। গ্রাম পুনর্গঠিত হলে আট-দশ বৎসরের কিস্তিতে সেটা ফিরে নিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এদের উপর খাজনার যে দাবী আছে, তা কমাতে হবে। জমিদারী খাজনা বাঙলার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন। জমির উর্ব্বরতার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তা ছাড়া মধ্যস্বত্ব যাদের যাদের আছে—জোতদার বললে যাদের বোঝায় তারা, আসল যে চাষী, যে লাঙল ধরে মাটিতে ফসল ফলায় তার কাছ থেকে এর অনেক বেশি হারে খাজনা আদায় করে। বাংলায় বর্ত্তমানে জমিদারীপ্রথা লুপ্ত করবার আলোচনা চলছে। জমিদারী উঠে গেলে সরকারী খাজনা কতটা হবে তার বিচার আবশ্যক। পাঞ্জাবে আন্দোলনের ফলে এই খাজানার সীমা চাষের খরচা বাদ দিয়ে ফসলের যে দাম হয় তার এক চতুর্থাংশে উর্দ্ধসীমা নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। বাঙলাতে কৃষিকর নিয়ন্ত্রণের প্রথম ধাপ হিসাবে এই নিয়ম প্রবর্ত্তন করা উচিত। অবশ্য খাজনার

মাত্রা শস্যের বর্ত্তমান চড়া দাম ধরে বাঁধলে চলবে না। কিন্তু এ-ব্যবস্থায় শুধু জোতদার রক্ষা পাবে, জোতদারীর খাজনা সীমাবদ্ধ না করলে রায়ত ও ভাগচাষী রক্ষা পাবে না। তার জন্য শেষ পর্য্যন্ত জোতস্বত্বও লোপ পাওয়াতে হবে। তার প্রথম ধাপ হিসাবে এখনই ভাগ-চাষীর স্বত্ব চাষীর স্বত্বে পরিণত করা আবশ্যক। আর একটি বিষয়ে আইন ক'রে চাষীকে রক্ষা করা দরকার। নূতন জমি উত্থিত হলে জমিদার সাধারণতঃ যে লোক চড়া হারে সেলামী ও খাজনা দেয় তাকেই বিলি করেন। কিন্তু এ-জমি বিলি হওয়া উচিত আশপাশের প্রকৃত কৃষিজীবীদের মধ্যে—যাদের সাহায্যেই জমি উঠেছে। এই ছিল প্রাচীন নিয়ম। তার পুনঃ-প্রবর্ত্তন করা উচিত।

কৃষি সমবায় গড়ে উঠলে আরও দুটি বিষয়ে সুবিধা হবে, এক হচ্ছে জমিতে ফসলের উন্নতির জন্য যে সার ও সরঞ্জাম কেনা দরকার সেটা একসঙ্গে পাইকারদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে। বৈজ্ঞানিকদের পরামর্শও এর মারফৎ ভবিষ্যতে পৌঁছতে পারবে। এবং যে ফসল উৎপন্ন হবে তার বিক্রয়মূল্য এক জোটে থাকার দরুণ ঠিকমত পাওয়া যাবে, চাষের জন্য যে পরিমাণ বলদ ও মহিষের দরকার তা দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বে গড়ে আবশ্যকীয় সংখ্যার কিছু কম ছিল। সাধারণতঃ আমাদের দেশের একজোড়া বলদ ১২।১৪ বিঘা জমির বেশি চাষ করতে পারে না। ১৯৪১ সালের সরকারী তদন্তে দেখা যায় যে, তখন ৮৭ লক্ষ চাষের বলদ ও মহিষ ছিল। ১৯৪৩ সালের আরম্ভে বাঙলার অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ হয়েছিল। সুতরাং গো-মহিষের সংখ্যাও কমে গিয়েছিল ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ১৯৪১ সালেই যত বলদ ও মহিষ ছিল, তাতেই দাঁড়ায় ১ জোড়া বলদ পিছু ১৭ বিঘা জমি। দুর্ভিক্ষের ফলে বহু লক্ষ গরু ও মহিষ খাদ্যাভাবে মরে গেছে; তার প্রায় দু'গুণ সংখ্যা বিক্রয় হয়ে কসাইখানায় সেনাবিভাগের খাদ্যে পরিণত হয়েছে। ফলে এখন ১৯ বিঘা জমি চাষের জন্য আছে ১ জোড়া বলদ বা মহিষ। আর তা ও বেশির ভাগ বর্দ্ধিষ্ণু চাষী মহাজনের ঘরে। আগেও খানিকটা এই অবস্থা ছিল; সেটা এখন আরও সঙ্কীর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ-অবস্থায় গরীব চাষীদের শুধু জমি ফিরিয়ে দিলেই যে কাজ শেষ হল একথা বলা যায় না। তাদের হাল-বলদও কিনে দিতে হবে। কিন্তু এদের অনেকের জমি এত কম যে, একজোড়া বলদ পুরাকাজে লাগতে পারে না। পূর্ব্বে যে সমবায় সমিতি গড়ার কথা হয়েছে, তার মারফৎ এই হাল-বলদ দিলে এবং জমি একসঙ্গে চাষ করা হলে এ-সমস্যার সহজ সমাধান হবে।

যে সব গরীব চাষীর ঘরে রোজকারী লোক মারা গেছে বা রুগ্ন ও অক্ষম, বা যাদের জমির পরিমাণ কম, তাদের জমি ফিরিয়ে দিলেও পুরা খাওয়া-পরা চলবে না। এদের বছরের মধ্যে কতক সময়ের কাজ দিতে হবে। এই শ্রেণীর মেয়েরা অনেকে ধান ভেনে খোরাকীর জোগাড়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু এ পেশায় আয় অত্যন্ত কম এবং ধানকলের প্রতিযোগিতা খুবই বেশি। এজন্য আপাততঃ ধানকল আর না বাড়তে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়; বিশেষতঃ যখন খাদ্যমূল্য হিসাবে ঢেঁকিছাঁটা চাল অনেক ভাল বলে গণ্য করা হয়। এখানেও সমবায় গঠনের যথেষ্ট সার্থকতা আছে। এই সব কৃষিজীবীদের বৃদ্ধ লোকেরা মৌমাছি পালন ক'রে মধু সংগ্রহ করতে পারেন। যেসব জাতির শূকর বা মুরগী পালন নিষিদ্ধ নয় তারা এই সব গৃহপালিত জীব পালন ক'রে আয় করতে পারে। এ-ছাড়া আর একটি গৃহপালিত পশুও

আছে—ছাগল সকলেই পুষতে পারে। অবশ্য ছাগল চরাবার জন্য কৃষিসমবায় ও গ্রাম হতে ব্যবস্থা করা চাই। এছাড়া যতদিন পর্য্যাপ্ত সুতা এদেশের কলে না প্রস্তুত হয়, ততদিন সুতাকাটার কাজ শিল্পের মত সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে করলে, এই সব পরিবারের স্ত্রীলোক ও অবসর সময়ে বালক বালিকারাও কিছু আয় করতে পারে। নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘ ও খাদিপ্রতিষ্ঠান যে-হিসাবে কাটুনীদের সুতার দাম দিয়ে থাকেন, সেই হারে মজুরী পেলে একজন স্ত্রীলোক প্রত্যহ আটঘণ্টা ও তার সঙ্গে একজন দশ-বারো বছরের ছেলে বা মেয়ে ঘণ্টা তিনেক সুতা কাটলে মাসে গড়ে তাদের কুড়ি টাকা আন্দাজ আয় হতে পারে। যেখানে কর্ম্মী বেশি সেখানে শিল্পকেন্দ্র গড়ে কাজের সরঞ্জাম এবং মালমশলা দিয়ে, আর লোক যেখানে ছড়ানোভাবে আছে সেখানে এগুলি ঘরে ঘরে পৌছে দিয়ে সমবায় গড়ে দিলে, ভালভাবে এসব কাজ সম্পন্ন হতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে, এর কতকগুলি শিল্প, যেমন চরকায় সুতাকাটা, গ্রাম্যজীবন পুনর্গঠনে শুধু অস্থায়ী ভাবেই সাহায্য করতে পারে।

মৎস্যজীবী ও কৃষকদের কথার পর আমি এই সুতা সম্পর্কিত শিল্পের বিষয় আলোচনা করব। এদের কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। বাঙলার তাঁতীদের পুনর্গঠিত করতে হলে শুধু বাজারে নিয়ন্ত্রিতভাবে সুতা ছাড়লেই চলবে না। বেশির ভাগ তাঁতীর আজ নিজের তাঁত নাই। যার তাঁত আছে, তারও সুতা কেনার ও খোরাকীর সংস্থান নাই। সুতা দিলেও সেই সুতায় কাপড় বুনে মজুরী থেকে খোরাকী জোগাড় করতে অনেক সময় লাগে। সরকারী ব্যবস্থায় এই সহজ কথাটা উপলব্ধির কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। এখন যেভাবে সুতা সরবরাহ হচ্ছে তাতে শুধু মহাজন লাভবান হচ্ছে। আর কাপড় আগুনের দামে বিক্রয় ক'রে ফুলছে কাপড়ের ব্যবসায়ী। এখানেও সহজ সমাধান হতে পারে সমবায় সমিতি গঠন ক'রে, তবে সে সমবায় থেকে যে ব্যক্তি তাঁতী নয়, নিজে তাঁত বোনে না, তাকে বাদ দিতে হবে। তা না হলে এ সকল সমবায় সমিতি তাঁতীকে সাহায্য না ক'রে তার বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে থাকবে। এইভাবে আসল কারিগরদের নিয়ে সমবায় গড়ে, তাঁতীদের খোরাকী বাবদ সাহায্য করতে হবে, এবং সমবায় মারফৎ কাপড় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। তবেই তন্তুবায় সম্প্রদায়ের সমস্যার সমাধান হবে। এসব সংগঠন অস্থায়ীভাবে করলে চলবে না। এই তাঁতশিল্প দেশে কাপড়ের কল বাড়লেও যথেষ্ট পরিমাণে থাকবে এবং যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কিছু পরিবর্ত্তিত ক'রে, কুটির-শিল্প হিসাবে একে বাঁচিয়ে রাখা কর্ত্তব্য।

চাষী, জেলে ও তাঁতী তিনটি শ্রেণীর জন্য যে সকল আর্থিক ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, সেগুলি কাজে পরিণত করলেও শুধু নিঃস্বদের মধ্যে প্রায় ৮০ হাজার পুরুষ, এবং তাদের যেসব পরিবারে রোজকারী লোক মারা গেছে তাদের প্রায় দেড় লক্ষ মেয়ে ও রুগ্ন, অক্ষম পুরুষের ঘরের ১৫ হাজার স্ত্রীলোককে কাজ দিতে হবে।

কৃষি সংক্রান্ত ও অন্যান্য যে-সব যন্ত্রশিল্প সহজে এদেশে গড়ে তোলা যায় তাতে এ-সমস্ত লোককে সহজেই কাজ দেওয়া যায়। কিন্তু সে কথা, কিছুদিন পরের কথা। কারণ যন্ত্র-শিল্প গড়ে তুলতে কিছু সময় লাগে। আমাদের দরকার এখনই এদের কাজ দেওয়া। সেদিকে কোনো অভাব নেই। দেশের লোকের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই শুধু এত কাজ

করবার আছে যে, তাতেই এ-সমস্ত পুরুষ ও মেয়েকে কাজে লাগিয়েও আরও কাজ থাকে। বরং লোকের অভাব ঘটবে, কাজের নয়।

মনে করুন, থাকবার আশ্রয়ের কথা। এই ১১ লক্ষ নিঃস্বদের নিজস্ব কোনো মাথা গোঁজবার জায়গা নেই। এদের এক একটি পরিবারে তিন থেকে চার জন মাত্র লোক; এরা মোট ৩ লক্ষ পরিবার। এদের জন্য একটি ক'রে ভাল খড়ের চালের মাটির ঘর ও রাঁধবার দাওয়া ক'রে দিতে ২৫ হাজার লোককে এক বৎসর টানা পরিশ্রম করতে হবে। তার পর মনে করুন, যেসব খাল, বিল, নিকাশী মহানালা, সাহের, পুকুর সব মজে গিয়েছে বলে প্রতিবৎসর বৃষ্টির শেষে বহু চাষের জমি ডুবে যায় ও ম্যালেরিয়া জর তীব্র আকারে প্রকাশ পায় সে গুলি উদ্ধার করতে সহজেই ৬০-৬৫ হাজার লোক কাজে লেগে যেতে পারে। এইসব ছোট স্থানীয় পয়ঃপ্রণালী ও জলাধারগুলি খনন করলে দেশের খাদ্য ও স্বাস্থ্যসম্পদ বাড়বে, ও সঙ্গে সঙ্গে বহু সহস্র লোকে খেটে খাবার কাজ পাবে। অবশ্য সত্য যে, এই খনন ও পঙ্কোদ্ধার বছরে আট মাস চলতে পারে। বর্ষা নামলে, ও তারপর মাস দুই কাজ বন্ধ থাকবে। সে-সময়ে এই সমস্ত লোককে সহজে গ্রামের জঙ্গল কাটা, ও জলা ও পচা ডোবাগুলিতে মশাশুককীট নষ্ট করার কাজ দেওয়া যেতে পারে। তাতে যে খরচ হবে, দেশের লোকের স্বাস্থ্য ভাল হয়ে কর্ম্মক্ষমতা বেড়ে তা বহুগুণে উশুল হয়ে যাবে।

বাঙলার বহু অংশেই কোনো রাস্তা নাই। ফলে শিক্ষার ব্যবস্থা, রোগ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা, এবং উৎপন্ন দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা কিছুই সম্ভব হয় না। বাংলা দেশে এ অভাব দূর করবার জন্য নিয়ন্ত্রিতভাবে রাস্তা নির্ম্মাণ করলে বহু লোকের এখন বহু বৎসর জীবিকা নির্ব্বাহ হতে পারে। যুদ্ধের সময় ষাট কোটি টাকা খরচ ক'রে আসাম থেকে চীনে ফৌজী রাস্তা করা যদি শুধু ১৯৪৫-এর ফেব্রুয়ারী থেকে জুলাই পর্য্যন্ত পাঁচ মাসের কাজে লাগাবার জন্য সম্ভব হয়, তা হলে বাঙলার ৬ কোটি মানুষকে মানুষের মত বেঁচে থাকতে দেবার জন্য আমাদের প্রদেশে সর্ব্বত্র রাস্তার খরচ মেলা উচিত। এই কাজে পুরুষ ও মেয়ে উভয়েই জীবিকা অর্জ্জন করতে পারে।

এবার মেয়েদের একটি বিশেষ পেশার কথা বলব। বাঙলার ৯০ হাজার গ্রামে খুব অল্প জায়গাতে উপযুক্ত ধাত্রী পাওয়া যায়। খাদ্যের অভাব ছাড়াও উপযুক্ত যত্ন ও সাবধানতার অভাবে প্রতি হাজার জন্মের মধ্যে বহুসংখ্যক শিশু ও প্রসূতি রোগে মারা যায়। বাঙলার নিঃস্ব মেয়েদের মধ্য থেকে আমরা সহজেই ৩০-৪০ হাজার স্ত্রীলোককে একবৎসর শিক্ষা দিয়ে এই সকল গ্রামে ধাত্রীর অভাব মোচন করতে পারি। এদের এই সঙ্গে বসন্ত কলেরা প্রভৃতির টিকা দেওয়া শিক্ষা দিলে, গ্রামের সংক্রামক রোগগুলিও বহু পরিমাণে বন্ধ করা যায়।

এ-ছাড়া, সুতাকাটা প্রভৃতি অন্যান্য শিল্পের কথা পূর্ব্বেই বলেছি। এক একটি শিল্প কেন্দ্রে যদি সুতাকাটার জন্য ১০০ জন স্ত্রীলোক ও ১০০ জন বালক বা বালিকা কাজ করে, তা হলে এইরূপ ৩টি কেন্দ্রের সুতায় ১০০ জন তাঁতী সমানসংখ্যক সাহায্যকারী স্ত্রীলোকের সহায়তায় সারামাস কাপড় বুনে চালাতে পারে।

নিঃস্বদের জন্য ঘর তুলে দেওয়ার কথাও পূর্ব্বে বলেছি; এর জন্য আবশ্যকীয় দরমা,

পাটি প্রভৃতি মেয়েরা ক'রে দিতে পারে। তা ছাড়া দক্ষিণ বাঙলায় সর্ব্বত্র, এমন কি সমুদ্র-তীরে মেদিনীপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যান্ত নারিকেলের দড়ি বোনার শিল্প চালু আছে। দড়ি পাকানোর কল সহজেই সস্তায় ভাল তৈরী করা যায় ও তার সাহায্যে এই কুটিরশিল্পে বহু লোককে কাজ দেওয়া যায়।

আমি যন্ত্রশিল্পের কথা ইচ্ছা করে এ-প্রবন্ধে কিছু বলিনি। কিন্তু বাঙলা তথা ভারতের স্থায়ী পুনর্গঠন করতে হলে কৃষি থেকে দেশের লোকসংখ্যার শতকরা অন্ততঃ ৩০ জন লোককে যন্ত্র-শিল্পে না টেনে নিতে পারলে কোনো রকম পরিকল্পনাই সার্থকতায় পৌছাতে পারবে না; শুধু জমি চাষ ক'রে ও কুটিরশিল্পের উৎপন্ন সম্পদে আমাদের দেশের ৪০ কোটি লোককে খাইয়ে পরিয়ে সুস্থ রেখে শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। এ-পথে চললে রোগ ও অভাব আমাদের চিরসঙ্গী থাকবে এবং আমাদের সংস্কৃতিও দু'তিন পুরুষে লোপ পেয়ে যাবে।

আমি সর্ব্বশেষে শিক্ষার কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। বাঙলার গ্রামে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা কি ভাবে ভেঙে গেছে তা পূর্ব্বেই বলেছি। শিক্ষার ব্যবস্থা পুনরায় গড়ে তুলতে গেলে মনে রাখতে হবে যে, গ্রামের ছেলেমেয়েরা আর্থিক হিসাবে তিন শ্রেণীতে পড়ে:

১। যাদের মা বাপ দুঃস্থ ছিল এবং এখন নিঃস্ব হয়েছে; অথবা যারা আগেও নিঃস্ব ছিল। এদের খোরাকী ও প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য কাজ দেবার কথা আগেই বলেছি। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য শুধু অবৈতনিক পাঠশালা খুলে দিলে হবে না। এদের পাঠ্য বই খাতা পেনসিল ও পরণের কাপড় সবই প্রথমে জোগাতে হবে।

২। যারা আগে সচ্ছল ছিল কিন্তু এখন দুঃস্থ হয়ে পড়েছে। এদের জন্যও বিনা বেতনে পড়ানোর ব্যবস্থা এবং সরকারী সাহায্যে পাঠ্য বই সরবরাহ দরকার হবে।

৩। যারা এখনও সচ্ছল আছে তবে অবস্থাপন্ন নয়। এদের ছেলেমেয়ের জন্য নিয়ন্ত্রিত দামে বই, কাগজ, পেনসিল প্রভৃতি সরবরাহ করা আবশ্যক।

এই সব নূতন শিক্ষায়তন পুনর্গঠন করতে বহুসংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যক হবে। নিঃস্ব ও দুঃস্থদের মধ্যে শিক্ষিত পূর্ব্বকালের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা সহজেই এই সব কাজে নিজেদের জীবিকা অর্জ্জন করতে পারেন। এই সব পাঠশালায় পূর্ব্বে যে ভাবে দক্ষিণা মিলত, তাতে কোনো শিক্ষক বা তার পরিবারবর্গের লোক বর্ত্তমান উচ্চমূল্যের যুগে জীবনধারণ করতে পারে না। এজন্য সরকারী সাহায্য আবশ্যক।

এই সব বিভিন্ন ব্যবস্থায় কত খরচ পড়তে পারে আমি তার একটা মোটামুটি হিসাব ক'রে দেখেছি। তাতে ১১ লক্ষ নিঃস্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এক বৎসরে ১০ কোটি টাকা খরচের আবশ্যকতা দেখা যায়। বলা বাহুল্য, দুঃস্থদের ব্যবস্থার জন্য আরও অনেক বেশি টাকা লাগবে। আমাদের এই গরীব দেশেও যদি যুদ্ধের সময় বহু কোটি অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয় এবং শুধু চাউলের মুনাফাখোররা ১৯৪৩ সালে ১০০ কোটি টাকা লাভ ক'রে থাকে তা হলে দেশের মানুষকে রক্ষা করার জন্য এ-টাকা খরচের দাবী কিছুমাত্র বেশি বলা চলে না। যুদ্ধের সময় যারা সরকারী অব্যবস্থার সুবিধা নিয়ে বা অন্যায় উপায়ে অজস্র টাকা

করেছে, তাদের কাছে এখন উচ্চহারে কর নিয়ে এই টাকার সংস্থান করা উচিত। পূর্ব্বেই বলেছি আপনাদের সভাপতি অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা যন্ত্রশিল্প গঠন ক'রে জাতির আর্থিক-জীবন দৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করার পথ সম্বন্ধে নির্দ্দেশ তাঁর অভিভাষণে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করবেন। সেজন্য আমি আমার আলোচনায় এ-প্রসঙ্গের শুধু উল্লেখমাত্র করেছি। এবিষয়ে একটি কথা বলে এ-প্রবন্ধ শেষ করব। ভবিষ্যতের যন্ত্রশিল্প সহজেই বহুবিস্তৃত ও সমবায় পদ্ধতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাতে মানুষের ব্যক্তিত্বও নষ্ট হবে না, মানুষ যন্ত্রের দাসেও পরিণত হবে না।

শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ইউ-কে-আর

দুই ধারে ধু ধু করে মাঠ। মাঠের বুক চিরিয়া বি, এণ্ড, এ. রেলের একক লাইন প্লাটফরমের পাশ দিয়া পুব-ও পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে। ছোট্ট স্টেশন, নাম ধরিত্রী।

মেল ও এক্সপ্রেস এখানে ধরে না। থ্রু মালগাড়ীগুলি প্লাটফরম কাঁপাইয়া চলিয়া যায়। থামে মাত্র দুইটা যাত্রী গাড়ী। লোক ওঠে নামে খুবই কম। কাছাকাছি কোনো লোকালয় নাই, হাটবাজার নাই। তাই এখানে আসিলেই রেলবাবুরা ঘন ঘন সিক্ রিপোর্ট করে, বদলি হইতে চায়। তারা মনে করে ধরিত্রীর চাকরি নির্ব্বাসনেরই নামান্তর।

একটি তেজী পাকুড় গাছ ও দুইটি মানবশিশু কাজল ও উজল ধরিত্রীর রূপ একেবারে বদলাইয়া দিল। স্টেশনের পশ্চিমে ঝিলের ধারের এই গাছটি বয়সে উজল কাজলের চেয়েও ছোট কিন্তু কী বাড়ন্ত তার গড়ন! কী ঘন সবুজ রূপ! পাতার মধ্যে শোঁ শোঁ শব্দ সারাক্ষণ লাগিয়াই থাকে। মনে হয় গাছটা শিশু দু'টির সঙ্গে দৌড়ঝাঁপ করিতে চায়। স্থাবর চায় মৃত্তিকার দৃঢ় বন্ধন হইতে মুক্তি পাইতে।

কাজল ও উজল যেমন সুশ্রী তেমনই বুদ্ধিমান। রহস্যে ভরা কালো কালো তাদের চোখে কি যেন মায়া আছে। ঠোঁটে মিষ্টি মিষ্টি অথচ দুষ্টু হাসি। হাসিয়া খেলিয়া নাচিয়া দুষ্টামি করিয়া ধরিত্রীকে তারা মাতাইয়া রাখে। তাদের খেলার সাথী হয় ঐ গাছটি। তার চার ধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া লুকোচুরি খেলে। গাছটি হয় বুড়ী।

তারা পড়েও এক সঙ্গে। একত্রে নামতা মুখস্থ করে। সুর করিয়া বলে, পাখী সব করে রব, রাতি পোহাইল।

ভারী সুন্দর শোনায়।

চুয়া রেলের পোর্টার। লাইনে কাজ করে আজ পঁচিশ বৎসর। ধরিত্রীতেই আছে দশ বৎসরের উপর। সে বলে, তার কর্ম্মজীবনে উজল কাজলের মতন একজোড়া ছেলে আর দেখে নাই। দু'টিতে যেন কিষেণজী ঔর বলদেও। অর্থাৎ কৃষ্ণ বলরাম।

আর তাদের মায়েরা ভাবে কোথায় একজন ছিল পাকশীতে আর একজন বেজের-

ডাঙ্গায়। তাদের মিলন বিধাতার অভিপ্রেত তাই উভয়ের বাবা ধরিত্রীতে বদলি হইয়া আসিলেন।

ধরিত্রীর রুক্ষনিরালা জীবনে শিশু দু'টি নূতন প্রাণের সঞ্চার করিল। বাবুরা সিক্ রিপোর্ট করে না, বদলি হইতে চায় না। গেটম্যান দধীচির বৌ পাখী আর আগের মতন মন-মরা হইয়া থাকে না। উজল কাজলকে কেন্দ্র করিয়া সেও যেন জীবনে রসের আস্বাদ পাইয়াছে।

চুয়া হাটের দিন পাঁচ মাইল দূরে রেণুগ্রামে বাবুদের হাট করিতে যায়। নিজের পয়সা দিয়া ছেলেদের জন্য পানতুয়া আনে। আনে ক্ষীরের তক্তি। ছেলেদের মায়েরা—কুন্তলা ও শেফালী আপত্তি করিলে ক্ষুন্ন হয়। বলে, হামার ভি ছেইলে থাকলে জরুর খাবার লইয়ে আসতুম।

চুয়া ছেলেদের হিন্দী শেখায়। পেঁপেঁ দেখাইয়া বলে পাপিতা। বেগুনকে বলে বাইগণ।

শিশু দু'টি খিল খিল করিয়া হাসে, ছড়া আওড়ায়—

আইগন বাইগন তাড়াতুড়ি
যদু ম্যাস্টার শ্বশুরবাড়ী
রেল কম ঝমাঝম
পা পিছলে আলুর দম।

চুয়া চোখ ঘুরাইয়া গম্ভীরভাবে বলে, পা পিছলাও মৎ। বহুৎ বেথা হোবে। লেকিন শ্বশুর বাড়ি যাও। উ বঢ়িয়া চিজ।

কাজল বলে, তোমার শ্বশুর বাড়ি কোথায় চুয়াদা ?

নেই হ্যায়। লেকিন সাদি ভি নেই হুয়া।

উজল জিজ্ঞাসা করে, লেকিন-সাদি কাকে বলে ?

বিয়া, বিভা, যিসিকো বিয়ে বোলতা।

ছেলেরা মজা পায়। ছড়ার মতন সুর করিয়া বলে,

লেকিন চুয়া
সাদি নেই হুয়া।

মেল, এক্সপ্রেস ও থ্রু মালগাড়ী প্লাটফরম কাঁপাইয়া চলিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে স্টেশন-ঘরের জিনিসগুলি, চায়ের কাপ ডিস, কাঁচের গ্লাস কাতর গুঞ্জন করিয়া ওঠে। শিশুরা হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে। তাদের মনে নানা প্রশ্ন জাগে, কেন এ শব্দ! কোথায় যাইয়া গাড়ী থামিবে, কোন দেশে ? এই যাত্রীদের ঘরবাড়ি কোথায় ?

গাড়ী আসার ও ছাড়ার আগে পরে কখনও উজলের বাবা কালীপদ, কখনও কাজলের বাবা শৈলেন একটা যন্ত্র কানের কাছে তুলিয়া ধরিয়া কাকে যেন ডাকে, হ্যালো।

তারপর কথা বলে, কত কথা। ফাইভ আপ, থার্টিন ডাউন, লাইন ক্লিয়ার।

একদিন উজল শৈলেনকে জিজ্ঞাসা করিল, কার সঙ্গে কথা বলছ, কাকাবাবু ?

আগের স্টেশনের সঙ্গে।

উজল প্রশ্ন করিল, কথা যায় কি ক'রে ?

শৈলেশ উত্তর করিল, তারের ভিতর দিয়ে।

ভারী মজা ত'। একে কি বলে ?

টেলিফোন করা।

উজল যাইয়া কাজলকে বলিল, ভারী মজার কথা। জান, তারের ভিতর দিয়ে কথা যায়, কাকাবাবু বললে।

কাজল মাসকয়েকের বড়। সে বিজ্ঞের মত বলিল, যাবেই ত'। ও যে তার।

দু'জনে তারপর গম্ভীরভাবে যুক্তি পরামর্শ করিল। অনেক গবেষণা।

পরদিন তামাকের কলিকায় সূতা বাঁধিয়া, কলিকা কানে লাগাইয়া তারা ফোন আরম্ভ করিল। কাজল বড়। সেই প্রথমে ডাকিল, হ্যালো উজল।

একজন ঝিলের পারে পাকুড় গাছের তলায়, আর একজন অপর পারে ঘাটের উপর। কাজল গাছের আড়াল হইতে ডাকে, উজলও ঘাটের বেদীর পাশ হইতে অলক্ষ্যে থাকিয়া জবাব দেয়, হ্যালো আপনি কে ?

আমি কাজলবাবু। ধরিত্রী। হ্যাঁ ধরিত্রী, ফাইভ আপ, লাইন ক্লিয়ার। তার পরই হয় নিমন্ত্রণ। কাজলের বাড়িতে আজ লাউ-চিংড়ী আর মাংস। উজলের আসা চাইই।

তারা এই খেলার নাম দিল টেলিটেলি।

উভয়েই এত চেঁচাইয়াছিল যে, সূতা মধ্যবর্ত্তী না থাকিলেও কথা শোনা যাইত। কিন্তু সূতার এই দৌত্য তাঁদের কাছে বড়ই বিস্ময়কর মনে হয়। ইচ্ছা করে মায়েদের কাছে ছুটিয়া গিয়া ব্যাপারটা জানায়। কিন্তু দুই দুইটা কলিকা হারাইয়া যাওয়ার ফলে তামাক খাওয়া বন্ধ হওয়ায় শৈলেশ যেরূপ হাঁক ডাক জুড়িয়া দিয়াছিল তাতে বলিতে আর ভরসা হয় না।

কিন্তু তাদের এতবড় আবিস্কারের কথা গোপন রাখা চুয়ার পক্ষে অন্ততঃ অসম্ভব। সে পরম উৎসাহে স্টেশনের প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে খবরটা পৃথক ভাবে জানাইল এবং প্রতিবারেই মন্তব্য করিল, দোনোই এটিস্ হোগা।

এই বয়সে এত যাদের বুদ্ধি তারা ভবিষ্যতে এটিস্ (এ. টি. এস) অর্থাৎ এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ট্র্যাফিক সুপারিনটেণ্ডেণ্ট না হইয়া যায় না।

চুয়া তার কর্ম্মজীবনে এ. টি. এস-এর চেয়ে বড় চাকুরিয়া আর দেখে নাই। দেখিলে ভবিষ্যৎ-বাণীটা আরও জমকালো হইত।

কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের আরও খেলার সাথী জুটিল, উজলের মা শেফালী। সেও সূতা বাঁধা কলিকা লইয়া তাদের সঙ্গে ছুটাছুটি করে। টেলিটেলি খেলে। ডাকে, হ্যালো উজল, হ্যালো কাজল।

উজল বলে, কে তুমি ? তোমায় ত' চিনতে পারছি না।

তুমি চিনবে না। আমি কাজলের জ্যাঠাইমা। ভাবছিলুম তাকে আজ পিঠে খাওয়াব।

উজল এবার বলিয়া উঠিল, খুব চিনি তোমায়। তুমি আমাকে চিনতে পারছ না। আমি যে উজল।

বাঃ রে দুষ্টু ছেলে—বলিয়া শেফালী চুমা ছুঁড়িয়া দেয়। বলে, পিঠে হবে বিকেলবেলায়।

দু'একদিন কুন্তলাও আসিয়া এই খেলায় যোগ দেয়।

কালীপদ হাসিয়া স্ত্রীকে বলে, আবার যে ছোটটি হয়ে গেলে দেখছি।

ছেলেদের আর একটা নূতন আবিষ্কার। টেলিগ্রাফের থামে কান লাগাইয়া কাজল ডাকে, শুনবি আয়।

উজল আসিয়া থামে কান লাগায়। কাজল বলে, কি শুনছ ?

শোঁ শোঁ।

এইটে কলকাতার শব্দ।

উজল পুব দিকে হাত বাড়াইয়া বলে, আব ঐ দিকের ?

শাঁ শাঁ।

উজল জিজ্ঞাসা করে, আর উত্তরপাড়ার ?

অত জানলে ত' আমি জ্যাঠাবাবুর মতন বড় হতুম।

উজল বলিল, বাবার মতন ?

কাজল একদিন তার বাবা শৈলেনের মতন হইতে পারে তা বরং সম্ভব। ঐরকম লোক হামেশা দেখা যায়। উজল আরও অনেক দেখিয়াছে। কিন্তু তার বাবার মতন হওয়া যে অসম্ভব। অমন লম্বা চওড়া বিরাট পুরুষ, বুক পর্য্যন্ত লম্বা দাড়ি, হাঁটু পর্য্যন্ত ঝোলা লংকোট। যেন গাম্ভীর্য্যেব প্রতিমূর্ত্তি।

উজল তার মাকে যাইয়া বলে, কাজল নাকি বাবার মতন হবে। হিঃ হিঃ—

শেফালী বলে, তা হতেও পারে।

তারের মধ্য দিয়া কথার চলাচল, থামের মধ্যে শোঁ শোঁ শব্দ। গাড়ী যাওয়ার সময় লাইনের কাঁপুনি; আর কাজলের ভবিষ্যতে কালীপদর মতন হওয়া—উজল ভাবে জগৎটা যেন বিস্ময়ে ভরা।

এ ছাড়াও বিস্ময় আছে রেণুগ্রামের পথ। রেলের লাইন ও টেলিগ্রাফের তার ভিন্ন জগতের সঙ্গে ধরিত্রীর ঐ একটি মাত্র যোগসূত্র। যাত্রীরা যে দু'চারজন এখানে ওঠা নামা করে তারা ঐ পথ দিয়া আসে, ঐ রাস্তায়ই আবার চলিয়া যায়। চুয়া হাটে যায় ঐ পথ দিয়া। পায়ে হাঁটা আঁকা বাঁকা মেঠো পথ—পথের চেয়ে পথের দ্যোতনাই বেশি। খানিকটা যাইয়া মাঠের উপরে সরু রেখাটা কতকগুলি তাল গাছের মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছে।

উজল কাজল কতই না কল্পনা করে। ঐ গাছগুলির নিচে পথের ধারে রাজপুরী আছে—ঘুমন্ত পুরী।

রাজা রানী উজীর কোটাল সবাই পালকের নরম বিছানায় ঘুমায়। একটি পরী তাদের ঘুম পাড়ায়, আবার ঘুম ভাঙ্গায়। মায়ের কাছে তারা শুনিয়াছে,

ঘুমের পরী আসিছে উড়ি নয়ন ভুলানি
গায়েব পরে কোমল করে পরশ বুলানি।

গবেষণা চলে নানারকম। পরী দেখিতে কার মতন ? উজল না কাজল—কার মায়ের মতন ? তাদের ইচ্ছা ঐ রাজপুরীতে যায়, পরীর সঙ্গে আলাপ করে। তার নিকট হইতে লাল নীল কাপড় আনিয়া রঙীন নিশান বানায়। দধীচি কিংবা তার বউয়ের মতন নিশান দেখাইয়া গাড়ী পাশ করে। তাদের বড় ইচ্ছা ঐখানে যাইয়া টেলিটেলি খেলে। একজন ওখানে যায় আর একজন এখানে থাকে। দু'জনে দু'জনকে ডাকে, হ্যালো হ্যালো বলিয়া।

দূর হইতে তারা দেখে তাল গাছের ডগায় ডগায় রৌদ্র-ছায়ার খেলা। পথপ্রান্তের ঐ গাছগুলি একবার ঝলমল করে, আবার ম্লান হয়।

আকাশে এক জোড়া চিল ওড়ে। একটার উপরে আর একটা উড়িতে উড়িতে মেঘের কাছ দিয়া তারা ঐ তাল গাছগুলির দিকে চলিয়া যায়। উজল বলে, দুটোতে মিলে একটা ফুটকি হয়ে গেল।

কাজল বলে, ফুটকি একটা নয় দুটো। ভাল করে ছাখ। তারা সিদ্ধান্ত করে তাদের মতন চিল দুটারও খুব ভাব। তাই ওরা একত্রে ওড়ে।

কিন্তু ঐখানে যাইয়া টেলিটেলি খেলা আর হইয়া ওঠে না।

মাস কয়েক পরের কথা। যুদ্ধ তখন ভারতের সীমান্তে। শত্রুকে প্রতিরোধের জন্য, পাল্টা আক্রমণের জন্য স্থানে স্থানে বিমানঘাঁটি তৈরী হইতেছে। দধিনন্দেও একটা হইবে। ধরিত্রী হইতে ছয় মাইল দূরে।

প্রকাণ্ড ঘাটি, তোড়জোড় তারই অনুরূপ। মালে মশলায়, লোকে লস্করে ধরিত্রী ছাইয়া গেল। কয়েক জন নূতন রেলবাবু আসিল। তাছাড়া নানা জাতির লোক, সাহেব, চীনা, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী। গাড়ী বোঝাই মানুষ আর ওয়াগন বোঝাই মাল। মালই বা কত রকম, কলকব্জা, লোহালক্কড়, ক্রেন ইঞ্জিন। ওয়াগনেও মানুষ আসিল, হাজারীবাগের কুলী কামিনের দল, তারা মাটি কাটিবে রাস্তা তৈরী করিবে।

উজল ও কাজলের বেশ লাগে, বেশ লাগে এত মানুষ আর এত কলরব। অজানা ভাষা শুনিয়া তারা অনুকরণ করিবার চেষ্টা করে। অপরিচিত চেহারা দেখিয়া হাসে।

কুলিরা একদিন পাকুড় গাছটার গোড়ায় কুড়ালের ঘা মারিল। ওখানে নাকি লাইন বসিবে।

উজল ছুটিয়া আসিয়া মাকে বলিল, বাবাকে বল না। ওদের নিষেধ করুক।

তা হয় না বাবা।

কেন হয় না?

সে তুমি বুঝবে না।

উজল মুখ গম্ভীর করিয়া রহিল।

তার পরদিন ডালপালা সমেত গাছটা পড়িয়া গেল। খানিকটা পড়িল জলের মধ্যে ও বাকীটা মাটির উপর। জলের মধ্যে ছপছপ শব্দ হইল। কাজল ও উজল ছিল একটু দূরে দাঁড়াইয়া।

কয়েক দিন পরে কুলীদের নির্দয় কুঠার দূরের ঐ তাল গাছগুলিকেও ধরাশায়ী করিল।

কাজল ও উজল বেদনা প্রকাশের ভাষাও খুঁজিয়া পাইল না। কাজল উজলের দিকে চাহিয়া বলিল, এ কী হল ভাই?

উজল বলিল, তাই ত'!

আগে গয়লা ও সব্‌জিওয়ালারা আসিয়া বাবুদের সঙ্গে গুজুর গুজুর করিত। এখন করে ভাল ভাল পোশাক পরা বাবুরা। কারও মাথায় হলদে পাগড়ি, কারও বা জরির টুপি। কেহ আসে সাহেব সাজিয়া। কথা হয় কালীপদর সঙ্গেই বেশি। তাবা তাকে বড়বাবু বলিয়া খাতির করে। সে কখনও গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে, কখনও বা একটু হাসে। মুখখানা যেন খুশিতে ভরিয়া ওঠে।

উজলদের বাড়ির শ্রী ফিরিয়া যায়। চেয়ার টেবিল আসে। জানালায় জানালায় পর্দ্দা চড়ে। রেণুগ্রাম হইতে আসে ভাল ভাল খাবার আর কলিকাতা হইতে কৌটা ভর্ত্তি রসগোল্লা, সুন্দর পোশাক আরও কত কি।

কালীপদর মতন না হইলেও ধরিত্রীর সকলের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। শুধু বাবুদের নয়, কুলী পোর্টারদের মুখেও হাসি ফুটিল। অমন যে দধীচির বৌ পাখী, নেতা ছাড়া যে পরিত না, সেও একখানা ডুরে কিনিল।

চুয়া কিনিল ওয়েস্ট কোট। কখনও ফতুয়ার উপর কখনও বা খালি গায়েই কোট চড়াইয়া সে নবাগত কুলী পোর্টারদের উপব ছড়ি ঘুরায়।

তার বিশ্বাস মানুষের মতন মাটিরও বরাত বলিয়া একটা জিনিস আছে। সে বলে, পহলে এই দো বাচ্চা বলদেও ঔর কিষেণ জি ইট্টিশানের নসীব ঘুরাইলো। উস্কো বাদ ঘুরাইলো লড়াই।

কাজলরা স্থির করে তারাও একটা রেলের লাইন বসাইবে। কোথায় লাইন বসিবে, যাইবে কতদূর—প্রায়ই এই সব আলোচনা হয়। কখনও মৌখিক, কখনও বা ফোনে।

পাকুড় গাছটা কাটিয়া ফেলার পর হইতে তারা লাইনের ওপারে নতুন একটা শেডের ধারে টেলিটেলি খেলে। উজল বলে, হ্যালো, আমাদের লাইন যাবে দইনন্দন ছাড়িয়ে (দধিনন্দকে তারা বলে দইনন্দন)।

কাজল বলে, স্টেশন হবে চুয়াদা আর পাখীর ঘরে।

তাদের বাড়ির পিছনের আসস্তেওড়া ও ঘেঁটুবন পরিষ্কার হয়। তারা উঁচুনিচু মাটি চাঁচিয়া সমান করে, বাবলার ছোট ছোট ডাল দিয়া স্লিপার বানায়। বাঁশের কঞ্চি ও কাঠের টুকরো হয় রেলের লাইন। সেগুলি বাঁধিবার জন্য ডাক পড়ে শেফালীর, চুয়াদার। এক একবার কুন্তলাও আসে।

সিগন্যাল হয় ছাতার বাঁটের। শেফালী বলে, তোমাদের লাইনের নাম ইউ. কে. আর —উজল কাজল রেলওয়ে।

লাইনের আর সব ঠিক। লাল নীল দু'খানা নিশানও তৈরী হইয়াছে। পাখী নিশান ধরিয়া গাড়ী পাশ করিবে।

অভাব শুধু গাড়ীর আর ইঞ্জিনের। উজল ও কাজল শেফালীকে বলে, গাড়ী আনিয়ে দাও কলকাতা থেকে।

শেফালী ভরসা দেয়, হ্যাঁ দেব।

প্রথমে আসে বাঁশী আর ঘণ্টা।

কাজল মার কাছে পোশাক চায়।

কুন্তলা বলে তোর ত' অনেক পোশাক আছে।

ওতে হবে না। আমি বড়বাবু হব। ভাটিয়া বাবু হব।

উজলের সব রকম পোশাকই হইল। সাহেবি টুপি, হলদে পাগড়ি, লাল টুকটুকে সোয়েটের জুতা। কালো বুট।

কাজলেরও ঐ সব চাই।

কুন্তলা বলে, অত সব পাব কোথায় ?

কেন ওরা পায়

তোমার জ্যাঠামশাই যে বড়বাবু।

বাবাও ত' মেজ বাবু।

উনি বড়বাবু হোন, তখন পাবে।

কাজল বলে, তখন কিন্তু জ্যাঠাইমার মতন তোমারও অনে—ক গয়না কিনতে হবে।

কয়েক মাস পরের কথা। একদিন ট্রেন হইতে কতকগুলি পুলিশ নামে। সঙ্গে কয়েকজন বাঙ্গালী অফিসার ও একটি সাহেব।

আজকাল মাঝে মাঝে এরূপ পুলিশ আসে। তারা নামিয়াই ট্রলি করিয়া বা পায়ে হাঁটিয়া দধিনন্দের বিমান ঘাঁটির দিকে চলিয়া যায়। আজ নামিয়া তারা প্রথমে গেল স্টেশন ঘরে, তারপর ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া বাবুদের কোয়ার্টার ঘিরিয়া ফেলিল।

অন্য জায়গায় বেশি দেরী হইল না। কিন্তু কাজলদের বাড়িতে লাগিল চার ঘণ্টা। খানাতল্লাসীর পর পুলিশ কালীপদর হাতে হাতকড়া পরাইয়া পরের ট্রেণেই তাকে লইয়া চলিয়া গেল।

ধরিত্রী নীরব, নিস্তব্ধ। উজলদের বাড়ির দরজা জানালা সব বন্ধ। উনান ধরে নাই। শুধু ঐ বাড়ি নয় সারা ধরিত্রীতেই বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। মানুষগুলার মুখে একটা শঙ্কার ভাব। বিমান আক্রমণের সাইরেণ বাজিলে যেমন হয় ঠিক তেমনি।

আকস্মিকতার প্রথম আঘাত কাটিয়া গেলে ছেলেদের মনে একটা বিস্ময় জাগিল। কিন্তু দু'জনের দেখা হয় না। আলোচনা হয় না। দুপুরে উজল আসিয়া কাজলদের বাড়িতে খাইয়া যায়। তখন অন্য লোক থাকে। কথা বলিতে ভরসা হয় না। অথচ কত কথাই না জমিয়া ওঠে।

তৃতীয় দিনে কাজলকে একা পাইয়া উজল আসিয়া তার কাছে দাঁড়াইল। পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। কাজল উজলের কাঁধের উপর হাত রাখিয়া একবার শুধু বলিল, ভাই !

আর কোনো কথা জোগাইল না।

উত্তরপাড়া হইতে উজলের কাকা আসিয়া তাদের লইয়া গেলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে কাজল একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। তার চোখের উপর অত বড় গাড়ীখানা ধীরে ধীরে একটা কালো বিন্দুতে পরিণত হইল।

কাজল এবার সেডের কাছে যাইয়া একটা থামে সুতা বাঁধিল। তার ইচ্ছা একবার ডাকে, হ্যালো উজল।

তারপর সারাটা দিন সে দল ছাড়া হরিণশিশুর মতন ঘুরিয়া বেড়াইল। কারও সঙ্গে একটা কথাও বলিল না।

বৈকালে কুন্তলা দেখিল, কাজল ইউ. কে. রেলের লাইনগুলি সব একটা একটা করিয়া তুলিয়া ফেলিতেছে।

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন

স্কেচ

১

[**নীরদ মজুমদারের জন্য**]

হিরনার টিলা লালে লাল হল মেঘডম্বরু নীলে,
সবুজে ও লালে লাল।
বাবুডির আঁকা বাঁকা লাল পথ মেঘে ও পলাশে শালে
একাকার প্রায়, পিসারোই নাজেহাল।

চিৎকাটে আজ উত্রিল্লো-ঘন গ্রাম্য গলির মায়া
শরৎমেঘের হঠাৎ বাংলা-ঘেষা অশ্রুর নীল,
থরোথরো কাঁপে ফিরোজা সমুখে বিল,
সহৃদয় নীল সঘনঘটায় দিগ্‌রিয়া দূর, দূর
ত্রিকুটে জড়ায় দোঁহায় পুবের হাওয়ায় হারায় কায়া।

উৎরাই আর খাড়াইতে চোখে জুটেছিল আস্বাদ
মুক্তির নীল শ্যাম মরকত কাঁকরের শুচি লাল।
ধানের সবুজে নেমে যায় স্নিত মাঠের পান্না টান—
সপ্তদশীর স্বচ্ছের জের তিরিশে শ্যামল খাদ,
পাহাড়ের নীলে সিরিয়ার কালো বাধে না বিসম্বাদ—

মানুষেরই বাধা, চুরাশি মৌজা, এক গাঁটি জোটে ধুতি।
তবুও অসীম ধৈর্য হৃদয়ে, বায়েঙ্গা প্রাণ বাঁচে
অমর বাহুতে, আউষের খেদ আমনের আশা যাচে,

বাজরা ভুট্টা যা হোক্, থাকুক হিম্মৎওয়ালা প্রাণ,
চাষীর ঘরে যে অবিনশ্বর অক্ষয় সে বিভূতি।

ছড়ায় নীলিমা, ছুটে আসে জল, গেয়ে ধায় সাঁওতাল
চানোয়ার পারে শালবুনুয়েরা সান্ধ্য ঘরের দিকে
ত্বরিত গায়ক গাড়োয়ান ভাঙা হাট ছেড়ে চলে,শাল
বনের কিনারে, তুরন্ত টানে ছুটে চলে অনিমিখে
বেগের বন্যা রাখালের মেয়ে, আমরুয়া দেয় ডাক।

জীবনের কোন্ ইন্দ্রনীলের গভীরে যে ঝাঁকে ঝাঁক
বলাকারা জাগে, নীলিমার আগে ভাসে মানসের স্রোতে।
মনে হয় জয় কাপড় চাহিদা ফসলের দাবী দাওয়া।
কালো বাজারের মূঢ় স্বার্থের দাগ ধুয়ে ভিজা হাওয়া
লাল পথে মাতে দেরঁ্যার সবুজে ত্রিকুটের নীল হতে।

স্বচ্ছ হরিতে জেগে ওঠে ঋজু শাল
আকাশপৃথিবী ব্যেপে দানছত্তরে
ভেরোয়াটানের অন্ত্যজ গ্রামে গেয়ে যায় মেলা স্বরে
রক্তিমপটে পিকাশোর পেশীস্বচ্ছল সাঁওতাল॥

২

[গোপাল ঘোষের জন্য]

তুরন্ত ঢেউ খাদে খাদে তুমি অক্ষয় যৌবনা
লাল মাটি তুমি একি তিরিশের খেলা!
বর্ষণান্তে কার্তিকে আনো পরিণত স্বেচ্ছায়
উৎরাই আর খাড়াই অশেষ তরঙ্গঘনবেগ—
ক্ষণে ক্ষণে সংসারে কল্যাণী ক্ষণেকে বা উন্মনা
উর্ব্বশী বুঝি, তিরিশ বছর তোমাতে খুলেছে মেলা।
চপল লাস্যে হাস্যে মুখর কখনো বা স্বেচ্ছায়
সংহত সতী পাহাড়ের নীল, তরঙ্গঘনবেগ
চানোনের স্রোত কখনো ত্রিকূট কখনো বা দিগ্ রিয়া।
বিন্ধ্যযুগের নগ্ন মাটিতে—তোমাতে বিলাই হিয়া॥

বিষ্ণু দে

মায়াবিনী

ভুমি যে ভুলাও, ভুলাও কেবলি হে মায়াবিনী
অর্থ-চক্রে চক্রী প্রাণেরে। যে কিঙ্কিনী
শুনেছি যে কালে চরণের চারু হার্পসিকর্ডে
সে কাল ত গেছে। এ কাল ধূলায় ধূসরিত প্রায়
চৈত্র গাজনে মাদলমত্ত ডমরু বাজায়॥

মনে হয় যেন কবে বা কোথায় দেখেছি যেন
মৃগ-নয়নীকে—নারী মজলিশে? লেকের ভিড়ে?
হবেও বা তা—মনে নেই ঠিক। অথবা বোধহয়
গুরু ভোজনের স্বপ্ন-শিখরে অলীক এ মুখ।

এতদিনে দেখি তোমার সে মুখ হয়েছে পাথর।
আকাশে বাতাসে পথে প্রান্তরে মোহমুদ্গর
ভেঙ্গে দিয়ে গেছে জীবনের মধু-প্রতিমাগুলি।
দীর্ঘশ্বাসে ভীরু হৃদয়ের শুক্‌নো পাতা
উড়ে গেছে কোন প্রচণ্ড ঝড়ে ধূম্রলোকে।
পথ ভরে গেল মরণে, ক্ষুধায়, হানাহানিতে।
সশস্ত্র যত পাথুরে মানুষ মিতালী পাতায়।
বাহুতে তাদের কর্ম্মীত্যাগের প্রবল শিরায়,
ভাঙ্গা ও গড়ার দ্বৈত ছন্দ নাকাড়া বাজায়।
তারপর, ক্রমে বন্ধু হাতের নিগূঢ় চাপে
চলে আসি ছায়া ছেড়ে রৌদ্রের প্রখর পথে।
হৃদয়ের মৃদু গান হয়ে উঠে বজ্রসম।
দেশের প্রতিমা, দেশের মানুষ—ভীষণ মধুর!
হঠাৎ এলো কি প্রলয়ঙ্কর হৃদয়-হরণ!
ধুয়ে মুছে দিল আত্মরতির সোনালী বরণ॥

আজ দেখি শুধু এদলে ওদলে কি হানাহানি,
অবিশ্বাসের নিশ্বাস ফেলে লোকেরা বাঁচে।
মিলনবিধুর এ আকাশ নেভে মেঘলা রাতে
যুদ্ধান্তেও যায় না যুদ্ধ। দেশের মানুষ
হাহাকার করে, অভিশাপ হানে নিজেরি মাথে।

এখনও তোমার নয়নধনুর কটাক্ষতীর
জন্মান্তরে এ হৃদয় পানে পাঠাবে না কি।
জনতার স্রোতে মিশে গেছি হায়, হে মায়াবিনী,
প্রেতলোক থেকে তবু বাজাবে কি সে কিঙ্কিনী॥

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

না-না-না

দস্যি ছেলের দত্যিপনা, আব্দারেদের কান্না
আর না!
চুপটি করে' একটু যদি ভাবছি লিখি কাব্য,
হুল্লোড়ে আর চীৎকারে কী সাধ্যি লেখায় নাব্‌বো?
মগজ যেন ভীমরুলী চাক, চক্ষে দেখি শর্ষে,
গুণ্ডাগুলোর শয়তানিতে মুণ্ডু ঘোরে জোরসে।
শান্ত মনের দীঘির জলে ঢিল ছুঁড়ে দেয় হরদম,
মনের খাতায় লেখার পাতায় ছিটোয় কালো কর্দম।

বিদ্যেবোঝাই ডিগ্রীবীরের নামের লেজুড় গয়না—
সয়না!
বাক্যবীরের তীক্ষ্ণফলা মর্মভেদী তর্কে
প্রাণ কেঁপে যায়, [illegible] কাব্য পালায় ভড়্‌কে।
লম্বা কথায় জট্ বাঁধে আর চওড়া কথায় সিন্ধু,
খুশির আকাশ ধোঁয়ায় ঢাকে, রয়না আলোর বিন্দু।
গ্রন্থকীটে ডিম পেড়ে যায় লক্ষ পুনরুক্তির,
মনের ফোটাফুলবাগানে লাঙল চালায় যুক্তির।

বুকনি-চটুল চাকরি-সুখীর হাজার টাকা মাইনে—
চাইনে!
দশটা-পাঁচের বদ্ধ ডোবায় চোখ-রাঙানির পঙ্কে
বছর বছর শ্যাওলা বাড়ে লক্ষকোটির অঙ্কে,
পানায় ঢাকে জোচ্ছনা-রোদ, মন খাবি খায় বন্দী,
পয়সা গুনে' কাট্‌লে সময় ছন্দে কখন মন দি?
মনের পাখীর হাল্কা ডানা চালবাজি আর দম্ভে
যতোই ভারি হয় ক্রমশ ততোই ওড়া কম্‌বে॥

অজিত দত্ত

অভিযান

(নয়)

নিতাইয়ের নেশাটা আজ ভাল জমে নাই। নেশা না জমলে নিতাইয়ের ঘুম আসে না। নরসিং বলে নেশাটি পুরো হলেই হারামজাদে নদীর দহের মাছ। অথৈ জলে আরামসে থির হয়ে যেন অঙ্গ এলিয়ে দিলে। আর নেশা না হলেই শূয়ার কি বাচ্চে ডাঙ্গার মাছ। ঝটপট-ছটফট ; উল্লুক কাঁহাকা !

নিতাই দাঁত বার ক'রে হাসে, খুশি মনে হাসি মুখে স্বীকার ক'রে নেয় সিংজীর কথা। বলে গা-গতরের 'বেথা' না মরলে ঘুম আসে কখনও ? আপুনিই বলুন কেনে ? তা-ছাড়া নিতাই আরও খানিকটা দন্তবিকাশ ক'রে বলে—অল্প খেলে মাথা চন চন করে, তাগদ যেন বেড়ে যায়, মারামারি করতে ইচ্ছে হয় ; হ্যা-রে-রে ক'রে ছুটে বেড়াতে আমোদ লাগে। ঘুম পালায় যেন নদী পেরিয়ে ভূতের মত। এরপর গলা নামিয়ে বেশ মিষ্টি মোলায়েম স্বরে বলে আর পুরো নেশা হ'ল, তামাম দুনিয়া দুলতে লাগল, মাটিতে পড়লাম যেন মায়ের কোলে শুয়ে দোল খেতে লাগলাম, কানের কাছে চেঁচান না ক্যানে, চোখ আরও কিটি-মিটি ক'রে বুজে আসবে, মনে হবে শালা বর্গী এল বুঝি ! বাস, তারপর একবার নাক যদি ডাকল তো রাত ফরসা।

নেশা না জমায় নিতাইয়ের ঘুম আসে নাই ; বিছানায় খানিকটা এপাশ ওপাশ ক'রে সে উঠে বাইরে এসে ঘুরছিল।

নরসিংও জেগে আছে। সে ভাবছে। অনেক কথা। নিতাই গল্প করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু নরসিং উত্তর দেয় নাই। শেষে সে বিরক্ত হয়ে বলেছে, মাথায় জল দিয়ে বাইরে খানিকটা হাওয়া লাগিয়ে আয়।

দিব্যি ফুটফুটে জ্যোৎস্না। শুখনরামের বাড়িটা নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জ্যোৎস্নার মধ্যে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে নিতাইয়ের মনে হ'ল কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ ! বাড়িটার বাহার যেন জ্যোৎস্নার মধ্যে বেড়ে গিয়েছে।

বেটা ভুড্ডিরাম আচ্ছা বাড়ি হাঁকিয়েছে , পেল্লায় কাণ্ড ! আষ্টে পৃষ্টে শিক দিয়ে কাঠ দিয়ে যেন একটা সিন্দুক বানিয়েছে। মাছি গলবার ফাঁক নাই। দরজাগুলোয় ডবল পাল্লা, সামনে লোহার শিক ঘেরা পাল্লা—পিছনে ইয়া পুরু শাল কাঠের দরজা। দাওয়ার খিলেন-গুলো শিকের ফ্রেম এঁটে বন্ধ। উপরের বারান্দার রেলিং আর মাথার ঝিলমিলির মাঝ-খানটা পর্য্যন্ত ফাঁক রাখে নাই ; সমস্ত কাঠ দিয়ে বন্ধ। হঠাৎ তার মনে হ'ল—দিনের বেলা যেন ওগুলো খোলা ছিল। হ্যাঁ খোলাই তো ছিল। স্থূল বুদ্ধিতে অনেক গবেষণা করেও সে ব্যাপারটার কিনারা করতে পারলে না। যাঃ বাবা, নেশা লাগল না কি ?

সে চমকে উঠল—এ কি ? আরে বাপরে বাপ ! তার সর্ব্বাঙ্গে, পায়ের নখ থেকে মাথা পর্য্যন্ত একটা চমকের শিরশিরে প্রবাহ ছুটে গেল। সে পা টিপে টিপে ঘরে এসে ঢুকল, চাপা গলায় ডাকলে—সিংজী।

নরসিং অত্যন্ত বিরক্ত হ'ল। মেজাজ তার ভাল নাই। মাথা যেন গরম হয়ে রয়েছে। 'শ্যামনগর 'পাঁচমতী' সার্ভিসের ভাবনা, লাইসেন্স চাই। শুখনরাম সাহায্য করবে বলেছে। কিন্তু না আঁচালে বিশ্বাস নাই; শুখনরাম সব পারে। তবে নরসিং বড় কায়দা ক'রে ধরেছে শুখনকে। এখন ভয় হচ্ছে জোসেফকে। জোসেফকে পাশ কাটিয়ে শুখনরামের সঙ্গে দোস্তি করার জন্যে একটু ক্ষণ্ণ হয়েছে সে। সে আবার এস. ডি. ও-র ড্রাইভার। সাহেবের কান না ভারী ক'রে দেয়। 'গরজু' মিটমিটে ডাইন কাঁহাকা! গরজ কত। বলে, আরম্ভ করুন আপনি, আমারও ইচ্ছে আছে একখানা গাড়ী কিনে ওই লাইনে সার্ভিস চালাব। হাড়ির ছেলে কেরেস্তান হয়ে হুঁসিয়ার হয়েছে। তবে লোকটা মোটের উপর ভাল। জোসেফ না থাকলে আজ মদের দোকানে একহাত বেধে যেত। এইটা একটা খারাবি হয়ে গেল।

সন্ধ্যাবেলা এখানকার ড্রাইভারদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে গিয়ে তাসে বসেছিল নরসিং। রামেশ্বর, জাফর, রসিদ আর সে। মদের বোতল নিয়ে মদের দোকানের পাশেই ডিম, আলুর দম, মাংসের দোকানে। মস্ত একখানা খড়ের চালা, সামনেটায় নড়বড়ে টেবিলের উপর চায়ের ব্যবস্থা। সকাল থেকে বিকেল পর্য্যন্ত বড় একটা অ্যালুমিনিয়মের হাঁড়িতে জল ফুটছে। টেবিলের উপর ময়লা কাপ আর মাটির ভাঁড় সাজানো থাকে। চালার ভিতরে কয়েকখানা ভাঙ্গা চেয়ার, কয়েকখানা বেঞ্চি; চেয়ার এবং বেঞ্চিগুলোর মাঝখানে টেবিলের সমান উঁচু লম্বা বেঞ্চি বা টেবিল। সকাল থেকে চায়ের খরিদ্দারেরা জমিয়ে রাখে দোকানটি। সন্ধ্যে থেকে চায়ের আসরে মন্দা পড়ে; উননে কড়াই চড়ে। মাংসের কালিয়া, ডিমের কোর্ম্মা, আলুর দমের লোভনীয় গন্ধ উঠতে থাকে। পরোটা ভাজা হয়। দোকানে আসর দু'টো। একটা সামনে একটা পিছনে। চালাটার পিছনে পাঁচিলের ওপাশে একটা আড্ডা বারোমেসে বাঁধা খরিদ্দারদের আসর। দু'চার জন কোর্টের টাউট আছে, রামেশ্বরদের একদল আছে, আরও আছে পাঁচমিশেলী একটা দল—কাপড়ের দোকানের কর্ম্মচারী, ধানচালের দালাল, রঙমিস্ত্রী, হারমোনিয়ম মেরামতওয়ালা, এমনি ধরনের পাঁচ কারবারের পাঁচটি লোক, তারা একপাশে আলাদা আলাদা মদ মাংস ডিম খায়; গোলমাল বড় করে না, চুপচাপ খেয়ে উঠে চলে যায়। বড় জোর স্ফূর্ত্তি বেশি জমলে হঠাৎ দু'চার কলি গান গেয়ে ওঠে।

রামেশ্বরদের আড্ডা আলাদা। ওদের প্রথম আড্ডা বসে মদের দোকানে, তারপর বোতল নিয়ে রেষ্টুরেন্টের এই ভিতরের দিকে এসে বসে। পাকা বন্দোবস্ত, আপন আপন বসবার আসন পর্য্যন্ত ওরা কিনে রেখেছে। রামেশ্বর, জাফর, রসিদ এদের তিনখানা ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ার কেনা আছে। ক্লিনার ন্যাপলা, ফটকে, হাফিজ এদের আছে তিনটে টুল, সাজার অর্থাৎ চাঁদা ক'রে কেনা আছে আরও একটা ইজিচেয়ার, একটা ছোট টেবিল, আসলে সেটা চওড়া টুল আর একখানা বেঞ্চি। চওড়া টুল অর্থাৎ টেবিলখানাকে মাঝখানে রেখে রামেশ্বররা ইজিচেয়ারে আরাম ক'রে হেলান দিয়ে বসে। টেবিলের উপর পড়ে তাস। তে-তাসের খেলা চলে। নিঃশব্দে নির্দ্দিষ্ট তাসখানা সকলকে দু'তিনবার দেখিয়ে টেবিলের উপর ফেলে দেয় তাস তিনখানা। নির্দ্দিষ্ট তাসখানাকে চিনে তার উপর দাম ধরতে হবে।

জোসেফ আজ মদের দোকানে আসে নাই। দোকানে গিয়েই নরসিং খবর পেলে সন্ধ্যাবেলাতেই জোসেফ দু'টো বোতল কিনে নিয়ে বাড়ি গিয়েছে। নরসিং বুঝলে জোসেফ তাদের প্রতীক্ষা করছে বাড়িতে বসে। হুঁসিয়ার সয়তান লোকটা, নরসিংয়ের বাড়া ভাতে ভাগ বসাতে চায়। হেসে নরসিং বসে গেল দোকানে। ওদিক আর মাড়াচ্ছে না সে। রামাকে পাঠালে ডিম আর মাংস কিনে আনতে। রামেশ্বর এগিয়ে এসে হেসে বললে, রাম রাম সিং ভাই।

নরসিং হেসে বললে—রাম রাম।

রামেশ্বরের পিছনে এসে দাঁড়াল রসিদ। সেলাম ভাই।

সেলাম।

রামেশ্বর হঠাৎ তার হাত ধরে বললে—সব শুনেছি। পাঁচমতী সার্বিস খুলে দিলেন!

নরসিং গম্ভীরভাবে বললে—দেখি; চেষ্টা তো করছি।

হাত ধরে টেনে রামেশ্বর বললে—আসুন।

কোথায়?

রসিদ বললে—আমাদের একটি আড্ডা আছে।

চলুন নিরিবিলি কথা হবে সেখানে। দোস্তি হবে।

রামেশ্বর বললে—শালা জোসেফটা আজ আসে নাই। ভাল হয়েছে। চলুন।

নরসিং একটু ভাবলে। যদি হাঙ্গামা বাধে! সে একবার নিতাইয়ের দিকে তাকালে। বেটা ডোমের চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে, গায়ের জামা খুলে কাঁধে ফেলেছে, মনে হচ্ছে একটা দুর্দান্ত মহিষ দাঁড়িয়ে আছে। এই মুহূর্ত্তে রাম এসে দোকানে ঢুকল। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, ছোঁড়ার লাঠির হাতও ভাল। নরসিং উঠে দাঁড়াল, চলুন।

জাফর দাঁড়িয়েছিল জানালার ধারে। রসিদ গিয়ে তাকে ধাক্কা দিলে—চল্ বে।

জাফর নিঃশব্দে তার দিকে ফিরে তাকালে একবার, তারপর বললে—আসছি।

রামেশ্বর হেসে উঠল, বললে—নজরমে কুছ আ গেয়া। যানে দে উসকো।

নরসিং নিতাইকে একপাশে ডেকে নিয়ে বললে—মাল খাবি না বেশি।

খাব না?

না। খাব বাড়িতে গিয়ে। খবরদার। অচেনা লোক, বিদেশ বিভুঁই।

•

মন্দ লাগল না আসরটা। হাঁ আরাম আছে, তোয়াজ করবার মত ব্যবস্থা আছে। মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠলো নরসিংয়ের। সে একখানা ইজিচেয়ারে বসে বললে—বেশ জায়গা।

নিতাই দাঁত বার ক'রে বলে উঠল—কেয়াবাৎ হায়! গুরুজী আমাদেরও চেয়ার কিনে ফেলুন।

রাম হারমোনিয়মওয়ালাটার চুলের বাহার দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। বাহবা, বাহবা! থাকে থাকে ঢেউখেলানো চুল, টোপরের মত মনে হচ্ছে! সে নিজে চুলের উপর আঙুল দিয়ে ঢেউখেলানো থাক তুলতে চেষ্টা করতে লাগল।

রামেশ্বর বললে জোসেফ শালার সঙ্গে দহরম-মহরম করবেন না। শালা এস. ডি. ও-র ড্রাইভার, শালা গোয়েন্দা হ্যায়।

হাঁ, উ হামারা মালুম হো গেয়া।

রসিদ মদের গেলাস ভরে টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়ে বলল—আজ তো কটা ট্রিপ দিলেন; কি রকম মালুম হ'ল ?

খুব ভাল। নিতাই বলে উঠল।

হারামজাদা ডোম, বে-আক্কেল—বেকুফ কাঁহাকা! শূয়ার কি বাচ্চার ঘটে যদি এক তিল বুদ্ধি থাকে! মনে মনে চটে উঠল নরসিং কিন্তু এখানে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করা চলে না। সে হেসে বললে—প্যাসেঞ্জার ভাল হয় কিন্তু রাস্তার যা হাল তাতে তিন মাসেই গাড়ী খতম। আর—। একটু থেমে বললে—প্যাসেঞ্জার ভাল হলেও ঘোড়ার গাড়ীওয়ালারা ছাড়বে না। ভাড়া নামাবে। তিন চার আনায় নামাবে। তাহলে তো আধেলা মুনাফাও থাকবে না। আবার একটু থেমে বললো—সুবিধে বুঝছি না। ভাবছি।

তারপর নিঃশব্দে মদ্যপান চলে।

নরসিং হঠাৎ তুললে শুখনরামের কথা।

রামেশ্বর বললে—বাপরে বাপ! উতো একঠো খড়িয়াল হ্যায়।

রসিদ বললে—শালা জেনানীর কারবার করে। দেহাত সে জেনানী কিনে আনে—চালান ভেজে কলকাত্তা। উঃ পরসাদ ভাই, দু'মাহিনা হ'ল একঠো যা ভেজলো! উঃ। শালা জাফর তো গাড়ী ছেড়ে দিয়ে বলে হামভি যায়গা কলকাত্তা, শিয়ালদহসে উসকো ছিনা লেকে ভাগেগা। শালা!

রামেশ্বর তাস বার করলে।

রসিদ বললে—জোসেফের বহিনটাকে দেখিয়েছিস ভাই পরসাদ! জাফর তো বলে, কেরেস্তান হয়ে ওকে আমি বিয়ে করব। তা মেয়েটা কালোতে খুবসুরাত আছে।

নরসিং বললে—থাক ও সব কথা।

আপনি দেখেননি ?

দেখেছি।

আ—। হেসে উঠল রসিদ।—নজর গির গেয়া!

কি সব যা তা বলছেন? ভদ্রলোকের মেয়ে, আমাদের ভাইবেরাদারের বহিন, লেখা-পড়া শিখেছে—

ইয়া—। হা-হা-হা। দরদ আ-গেয়া! রসিদ বীভৎস উল্লাসে হাসতে লাগল। নিতাইও হাসতে লাগল, রামাও হাসছে। নরসিং হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, নিতাইয়ের মাথার চুলের মুঠো ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললে—হাসছিস ক্যানে উল্লুক। তোর বহিনকে নিয়ে যদি এমনি তামাসা করে।

রামেশ্বর উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আরে ভাইয়া, ই কেয়া হোতা হ্যায়! ছোড়দো উ বাত। বৈঠ যাইয়ে। এ রসিদ—ঢালো ঢালো।

রসিদ আবার গেলাস ভরতে লাগল। রামেশ্বর তাস বাঁটতে লাগল আপন মনে।

গ্রাস শেষ হতেই সে বললে—আসুন দু' হাত খেলা যাক। নসীব আপনার দেখি। পাঁচমতী সার্বিস ভাল চললে আপনার জিত।

তাস খেলতে লাগল সে। ঠোঁটের একটা দিক ঘন ঘন নাড়তে আরম্ভ করেছে। ঐ পাশের নাকের পেটিটা সঙ্গেসঙ্গে নড়ছে। নেশা জমে আসছে রামেশ্বরের।

নরসিং স্থির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল রামেশ্বরের হাতের দিকে। লোকটা পাকা জুয়াড়ী। তাস তিনখান পাশাপাশি ফেলে দিয়ে রামেশ্বর বললে—ধরুন দান।

নিতাই ঝপ ক'রে একটা সিকি ধরলে একখানা তাসের উপর। উল্লুক বুড়বক মরেছে। সে বিষয়ে নরসিং নিঃসন্দেহ।

রসিদ ঝপ ক'রে ফেললে অন্য একখান তাসেব উপর পুরা আধুলির একটা দান। রামেশ্বর বললে—আপনি?

নরসিং ভাবলে একটু। সে রসিদের দানের পাশেই ধরলে তার দান পুরা টাকা।

রামেশ্বর তাস উল্টালে। সব ফাঁক। যে খানায় কেউ বাজী ধরে নাই সেইখানাই বাজীর তাস। সে দান টেনে নিলে। ফের ফেললে তাস। রসিদ এবার ঝপ ক'রে ফেললে একটাকা। নরসিং তার দিকে তাকালে একবার। রসিদ এবার ঠিক তাসখানার উপর বাজী ধরেছে। প্রত্যাশা করছে গতবার ঠকার পর এবার নরসিং তার তাসে বাজী ধরবে না।

নিতাই এক সিকিতেই দমে গিয়েছে!

নরসিং পকেট থেকে একখানা পাঁচ টাকার নোট বার ক'রে ধরলে রসিদ যে তাসে বাজী ধরেছিল সেই তাসেই।

রামেশ্বর তাকালে রসিদের মুখের দিকে। কি ইসারা হয়ে গেল।

নরসিং বললে—উঠান তাস।

রসিদ ঝুঁকে পড়ল টেবিলের উপর—ফিন হামারা তাসমে বাজী লাগায়া?

নরসিং হেসে বললে—হাঁ, আপনার সঙ্গেই নসীব জড়ালাম। কই, উঠান তাস।

সবুর। রসিদ আরও একটু ঝুঁকে এসে বললে—এক বাত।

নরসিং বললে—তাস ঢাকা পড়েছে। খাড়া হয়ে কি বলছেন?

উত্তরে আরও একটু ঝুঁকে বুকের আড়ালে গোটা টেবিলটাকে ঢেকে দিয়ে রসিদ বললে—আমার নসীবের ভাগা দেনে হোগা। জোসেফের বহিন—। দাঁত মেলে সে হাসতে লাগল। নরসিংয়ের দরদের পরিচয় সে পূর্ব্বেই পেয়েছিল তাই ওই জায়গায় খোঁচা দিতে চাইল।

নরসিং দু'হাতে এবার রসিদের দুই কাঁধে ঠেলা দিয়ে সজোরে বসিয়ে দিলে কিন্তু ততক্ষণে টেবিলের উপরের তাস টাকা ছটকে পড়েছে, বাজীটা ভঙ্গ হয়ে গিয়েছে। রামেশ্বর চীৎকার ক'রে উঠল—উল্লুক কাঁহাকা! বাজী বরবাদ ক'রে দিলে।

নরসিং পাঁচ টাকার নোটখানি তুলে নিয়ে বললে—বাজীর টাকা দিতে হবে, বাজী আমি মেরেছিলাম।

রামেশ্বর চাকু ছুরিটা বার ক'রে বললে—বসুন। বরবাদ গিয়েছে, ফের ফেলছি তাস। এমন যায়।

উঁহু। বাজীর টাকা না দেন, গত বাজীর আমার টাকাটা নিতাইয়ের সিকিটা ফিরৎ দেন। আমি উঠব।

রসিদ উঠে দাঁড়াল। ইয়ে আপকা আবদার হ্যায় না কেয়া।

আবদার নয় দাবী। নিক্‌লান টাকা।

চাকু ছুরিটা হাতে নিয়ে রামেশ্বরও উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে নরসিং তার হাত চেপে ধরলে। ছ'ফিটের কাছাকাছি লম্বা নরসিং। তার হাতখানাও সেই অনুপাতে লম্বা। বললে—দেখছেন কতখানি লম্বা আমি? আপনার চাকুর ফলা ছোট, আমার কলিজার সন্ধানও পাবে না।

নিতাইও উঠে দাঁড়িয়েছে নরসিংয়ের পাশে। কালো মহিষের মত চেহারা, তার উপর ছাতিখানা তার উঁচু হয়ে উঠেছে—হাতাহাতি মারামারির সম্ভাবনা। হারমোনিয়মওয়ালার চুলের মোহ কেটে গিয়েছে রামার, সেও সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রসিদ আস্তিন গুটিয়েছে, ন্যাপলা ফটকেও উঠে দাঁড়িয়েছে। হাফিজ বসে ছিল। সেই সর্ব্বাগ্রে গম্ভীরভাবে বলে উঠল—পর্‌সাদ সাহেব অন্যায় আপনাদের। বাজী সিংজী মেরেছিল, রস্‌সিদ ভাই অন্যায় ক'রে ভেস্তে দিলে।

হাফিজের কথায়, মুহূর্ত্তে ফেটে পড়বার মত ব্যাপারটা শিথিল হয়ে ধীরে ধীরে এলিয়ে পড়ল—পাংচার হওয়া মোটরের চাকার মত। সকলেই তাকালে হাফিজের মুখের দিকে। রামেশ্বর বললে—ছাড়ুন হাত ছাড়ুন, বসুন। নরসিং হাত ছেড়ে দিলে কিন্তু বসল না, আসর থেকে বেরিয়ে এসে ডাকলে—নিতাই রামা আয়। বেরিয়ে আসবার দরজার মুখে ফিরে দাঁড়িয়ে হাফিজকে বললে—সেলাম ভাই দোস্ত। চললাম।

চলে এল ওখান থেকে। কিন্তু মদের বোতলটা উঠিয়ে আনতে ভুল হয়ে গেল। ওদিকে তখন মদের দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নতুন অচেনা জায়গা, মদের দোকানের খিড়কীর দরজাটা জানা নাই; নিতাই কপাল চাপড়াতে লাগল। নরসিং খারাপ মেজাজ নিয়ে বসে আছে। মদের জন্যই যে তার মেজাজ খারাপ হয়েছে তা ঠিক নয়, জোসেফের বোন মেরী বেচারীকে খামকা অপমান করলে; সে-অপমানের নিমিত্ত হ'ল সে-ই। জোসেফ কালই ওদের সম্বন্ধে সাবধান ক'রে দিয়েছিল। খামকা লোকগুলোর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল! হয়তো ওরা এরপর শত্রুতা করতে আরম্ভ করবে। তার ভরসা শুখনরাম। সয়তান বদমাস শুখনরাম! সবাই এক কথা বলছে। ও আবার শেষ পর্য্যন্ত কি করবে কে জানে! নরসিংয়ের একমাত্র অস্ত্র—সে শুখনরামের গোপন আবগারীর মাল আমদানীর সন্ধান পেয়েছে। তার গাড়ীতে সে মাল এনে পৌঁছে দেবে। কিন্তু সয়তান যদি শেষ পর্য্যন্ত ওকেই ধরিয়ে দেয়! কিছু বিচিত্র নয়, শুখনরাম সব পারে। ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠছে নরসিংয়ের। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

ঠিক এই সময়টিতেই নিতাই সন্তর্পণে এসে ঘরে ঢুকল,চাপা গলায় ডাকলে—গুরুজী!

নরসিং চমকে উঠল চিন্তায় বাধা পেয়ে, রূঢ়দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল সে নিতাইয়ের দিকে।

উঠে আসুন। তাজ্জব ব্যাপার।

কি?

আসুন না উঠে। চুপি চুপি। মজা দেখবেন আসুন।

নিতাই তাকে নিয়ে রাস্তার ধারে একটা গাছতলায় দাঁড়াল।—ওই দেখুন।

নরসিংয়ের বড় বড় চোখ তুটো বিস্ময়ে উত্তেজনায় বিস্ফারিত হয়ে আগুনে পোড়ানো ভাঁটার মত হয়ে উঠল। বন্দুক চালান দেওয়া লম্বা কাঠের বাক্সের মত শুখনরামের কাঠদিয়ে মোড়া বারান্দাটার এদিকের কোণে পূর্ব্ব মাথায় খানিকটা কাঠের ঢাকা জানালার মত খুলে গিয়েছে। রেলিঙের মাথায় বেঁধে একখানা কাপড় ঝুলিয়ে দিয়ে তাই ধরে একট সাদা কাপড়-পরা মূর্ত্তি আসছে।

নিতাই বললে—ওই দেখুন।

সাদা কাপড় পরা, মাথা পর্য্যন্ত ঢাকা! স্ত্রীলোক, হ্যাঁ স্ত্রীলোক! স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে গাছ কোমর বেঁধে কাপড় পড়েছে। বিত্যুচ্চমকের মত একটা কথা নরসিংয়ের মনে পড়ে গেল। আজই সন্ধ্যার আগে শুখনরামের সিঁড়ির কোণে দেখা হয়েছিল, সে আসতে বলেছিল। বুকের ভিতর যেন মোটরের ইঞ্জিন স্টার্ট হয়ে গেল তার। ছুটে সে এগিয়ে গেল। কাপড় ধরে ঝুলে খানিকটা নেমে এসেই মেয়েটা ছেড়ে দিলে কাপড়টা—লাফিয়ে পড়বে মাটিতে। অদ্ভুত সাহস, আশ্চর্য্য মেয়ে! নরসিং তাকে মাটিতে পড়তে দিলে না, তার দীর্ঘ মজবুত হাত তু'খানা মেলে লুফে নিলে।

মেয়েটা চমকে উঠল, তারপরই কিন্তু চাঁদের আলোয় নরসিংয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে তু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে খিল খিল ক'রে হেসে উঠল।

নিতাই ব্যাপারটা বুঝে হঠাৎ সেই পথের ধুলোর উপরেই একটা ডিগবাজী খেয়ে নিলে। —শালা—! ই মেয়ে গাছ চালিয়ে দেবে রে বাবা!

* * *

ফট্‌কির গ্রামের লোকেও ঠিক এই কথা বলে। ফট্‌কি মেয়েটার ডাকনাম। ভালনাম একটা আছে কিন্তু সে গ্রামের লোকে কেউ জানে না। ফুট্‌ফুটে মেয়ে, স্ফটিকের মত উজ্জ্বল লাবণ্যময় দেহবর্ণ দেখে ছেলেবেলায় ফটিক থেকে স্ত্রী বাচ্যে ফট্‌কি বলে ডাকত। সে নাম পরিবর্ত্তন করার কোনো হেতু ঘটে নাই। বাল্যের লাবণ্য গ্রামের ধুলায় মাটিতে দারিদ্র্যের স্পর্শে মলিন হয় নাই, সূর্য্যের উত্তাপেও তার রঙ তামাটে হয় নাই। বরং বিপরীতই হয়েছে। রঙ তার দিন দিন উজ্জ্বল হয়েই উঠেছে।

ছেলেবেলায় তার মা তাকে নাচিয়ে আদর করত 'রাঙা মাটির ছবি দেখলে তোরা পাগল হবি'। তিন চার বৎসর বয়স হতেই রঙীন ফেরানী পড়ে পাড়ায় বেড়াতে বার হলেই লোকে তাকে কোলে তুলে আদর করত। বাঃ, ভারী ফুটফুটে মেয়ে। কি নাম তোমার?

ফট্‌কি

বা-বা-বা। ফুট্‌ফুট্‌ ফুট্‌ ফটিকমণি!

পাড়া-ঘরের ছেলের মায়েরা বলত, বউ করতে হয় তো এমনি! হ্যাঁ গো ফটিক আমার বেটার বউ হবে?

ফটিক হেসে ঘাড় নেড়ে বলত, হব।

আরও একটু বয়স বাড়ল, পাড়ার ছেলেমেয়েরা মিলে খেলার বয়স হ'ল—তখন ছেলের দলের ঝগড়া-বাধতে আরম্ভ করল ফট্‌কির স্বামিত্ব নিয়ে। ফট্‌কির পক্ষপাত ছিল না, সে দাঁড়িয়ে

নির্ব্বিকারচিত্তে দেখত তাদের ঝগড়া, তারপর পুরাকালের বীর্য্যশুল্কার মত যেদিন যে বিজয়ী হ'ত, তার খেলাঘরেই বউ সেজে বসত।

আরও একটু বয়স হ'ল, ফটকি তখন ফেরানী ছেড়ে কাপড় পরতে আরম্ভ করেছে, তখন ছেলেরা তার নাম দিলে 'ফটিক জল'। ফটকী মুখ টিপে টিপে হাসত, স্বাদ বুঝবার বয়স তখনও নয় কিন্তু গন্ধটা মিষ্টি লাগত।

এই সময়েই হ'ল তার বিয়ে। দশ বছরের মেয়ে আঠারো বছরের বর।

"অতি বড় ঘরন্তী না পায় ঘর, অতি বড় সুন্দরী না পায় বর"—প্রবাদবাক্যটা ফলে গেল ফটকির কপালে, বছর পার না হতেই ফটকি বিধবা হ'ল; সব মনে পড়ে ফটকির। বর মরে যাওয়ার সংবাদে ফটকির দুঃখ হয় নাই, সে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। আঠারো বছরের জোয়ান চাষীর ছেলে, তাকে দেখে তার ভয় হত। এক বৎসরের মধ্যে বার তিনেক সে এসেছিল ফটকির বাপের বাড়ি, প্রতিবার ফটকি কেঁদেছিল। এখন তার মধ্যে মধ্যে তাকে মনে পড়ে দুঃখ হয়। তার সেই লম্বাচওড়া দেহ, চওড়া ছাতি মনে পড়লে কিছুক্ষণের জন্য ফটকি নিঝুম হয়ে বসে থাকে।

আরও বছর দুয়েক গেল। দুনিয়ায় হঠাৎ রঙ লেগেছে মনে হ'ল ফটকির। মা বাপ সাবধান করত তাকে, বাইরে যেতে বারণ হ'ল; যেতে হলে মায়ের সঙ্গে যেতে হবে। একা বাইরে বার হলেই দু'পাশের বেটাছেলের চোখ তার উপরে এসে পড়ে; ফটকি সঙ্কুচিত হয়, অস্বস্তি অনুভব করে—বুকের ভিতরটা গুরগুর করতে থাকে। একলা দেখলে অল্পবয়সীরা হেসে তাকে হাসাতে চেষ্টা করে; মুখ নামিয়ে চলে যায় ফটকি। তারা গান গায়, ছড়া কাটে। একটা ছেলে মুখে মুখে ছড়া বাঁধতে পারত। সে ছড়া বাঁধলে একটা নয় দু-চারটে।

> ফটিক জল, ফটিক জল ও হায় তেষ্টাতে ফাটছে যে ছাতি।
> দিনেতে খাই না ভাত, চোখেতে নাইকো ঘুম সারা রাতি।

আরও একটা মনে আছে—

> ফটিক জল, একবার মুখটি তোলো
> মুচকি হেসে একটি কথা বলো।

মরণ! ফটকির হাসি পেত। হাসতে তার ইচ্ছা হ'ত। কিন্তু ভয়, একটা আতঙ্ক তার বুকের ভিতরের সেই অদ্ভুত শিহরণকে স্তব্ধ ক'রে দিত। দুটোর ধাক্কায় সে কেমন হয়ে যেত। দুনিয়া হয়ে উঠত তেতো, কিছু ভাল লাগত না। মায়ের সঙ্গে ঝগড়া হ'ত, ছুতো-নাতায় ঝগড়া—সে উপোস ক'রে কাঠের মত পড়ে থাকত। তখন সে সব বুঝেছে। বুকের ভিতরের অস্বস্তিটা আগে ছিল ধোঁয়ার মত, এখন সে যেন আগুনের মত জ্বলে উঠল। সত্যিই ফটকির মনে হ'ত শরীর তার জ্বলছে। পুকুরের জলে নেমে সে আর উঠতে চাইত না, শুধু মাটির উপর শুয়ে থাকতে ভাল লাগত। রাত্রে মা-বাবার ঘরের ঠিক পাশের ঘরেই সে শুয়ে থাকত, ঘরে এসে খিল দিয়েই সে বিছানা তুলে ফেলে দিত। ঘুম হত না। জানালায় মধ্যে মধ্যে ঠুকঠাক্ শব্দ উঠত, ঢেলা লাগত জানালায়। কখনও শিসের শব্দ উঠত। কখনও চাপা মিহিগলায় গান শোনা যেত।

হঠাৎ একদিন মনে হ'ল কোঠা ঘরের জানালায় কে যেন উঠে বসেছে। উত্তর দক্ষিণে লম্বা

কোঠা ঘর। পাশাপাশি দু'খানা কুঠরী, দক্ষিণের কুঠরীতে শোয় মা আর বাবা, উত্তর দিকের কুঠরীতে ফট্‌কি। উত্তর দিকের জানালাটা খোলা বারণ। ও জানালাটায় বাবার নজর চলে না। শব্দ শুনে ফট্‌কি উঠে বসল, বুকের ভেতরটা যেন ঢেঁকি দিয়ে কুটছে। চীৎকার ক'রে ডাকতে ইচ্ছা হয়েছিল তার প্রথমে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হ'ল, না। সে স্থির চোখে চেয়ে রইল জানালাটার দিকে। শব্দ হ'ল—একটা কিছু যেন ভেঙ্গে গেল। কি ভাঙল? কাঠের গরাদে? সঙ্গে সঙ্গে চাষীর ঘরের অসমান জানালার জোড়ের ফাঁকের ভেতর একটা শিক চালিয়ে ঠেলে জানালার খিলটা খুলে ফেললে বাইরে থেকে। একটা মুখ ঢুকল গরাদে-ভাঙ্গা জানালা দিয়ে। গাঁয়ের বড় মোড়লের ছেলে। এতক্ষণে তার যেন চেতনা হ'ল, সে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করলে, খিল খুলে সে দরজা টানল কিন্তু দরজা বাইরে থেকে শেকলবন্ধ। মা বাবা তার দরজায় বাইরে থেকে শেকল দিয়ে বন্ধ ক'রে রাখে। পিছন থেকে এসে জোরে জড়িয়ে ধরে ফেললে বড় মোড়লের ছেলে। সে প্রাণপণে বাধা দিতে চেষ্টা করলে, ডাকলে—বাবা বাবাগো!

মোড়লের ছেলে বাঘের মত চেঁচিয়ে উঠল—খুন করে ফেলাব।

ওঘরে বাবার শব্দ পাওয়া গেল সে ভূত দেখে ভয় পাওয়া লোকের মত বু বু করছে, মা চেঁচিয়ে উঠল স্পষ্ট ভাষায়—মেলে গো, খুন করলে গো!

ফট্‌কি তখন স্তব্ধ। মোড়লের ছেলে আবার চীৎকার ক'রে উঠল—দুয়োর ভেঙে গিয়ে কেটে ফেলাব। হাঁ।

মা বাবা চুপ হয়ে গেল।

মোড়লের ছেলে আবার ওই ভাঙ্গা জানালা দিয়েই বেরিয়ে গেল, জানালা দিয়ে গলে লাফিয়ে পড়ল মাটির উপর। ফট্‌কি তখন অজ্ঞানের মত পড়ে।

সে দিন ফট্‌কির চিরকাল মনে থাকবে।

—

পরদিন বাবা মা তাকে গালাগালি করলে। বললে—তুই জলে ডুবে মর, বিষ খেয়ে মর, গলায় দড়ি দে।

সে কি করবে? সে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল মা বাপের মুখের দিকে।

কে? লোকটা কে বল।

সে বললে—বড়মোড়লের ছেলে।

বাপ বললে—নালিশ করব আমি।

মা বললে—চেঁচিয়ে পাড়া গোল ক'র না। কেলেঙ্কারীর সীমা থাকবে না। জাতে পতিত করবে। চাষার ঘেঁটে কোথাকাব।

বাপ গেল বড় মোড়লের কাছে। কি হ'ল কে জানে! তবে বাবা ফিরে এল বড় মোড়লের কাছে জমি-বন্ধক দেওয়া বন্ধকী দলিলখানা হাতে ক'রে। বললে—যা হয়েছে তা হয়েছে, মোড়ল বলেছে আর হবে না।

ফট্‌কি সমস্ত দিন যেন মাটির পুতুলের মত বসে রইল। রাত্রে মা বাবা সে সকলে এক ঘরে শোয়ার ব্যবস্থা হ'ল। মা বাবা ঘুমিয়ে গেল, তার কিন্তু ঘুম এল না, একটা আতঙ্ক

যেন তাকে অস্থির ক'রে তুলছে। রাত্রি বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কও বাড়ছে। পেঁচা ডেকে গেল, সে চমকে উঠল। মনে হ'ল কে শিস দিয়ে গেল। ডাক পাখী ডাকছে, ফট্‌কির মনে হচ্ছে কেউ কুক্‌ দিচ্ছে। চাষীর ঘর, ইন্দুর বেড়াচ্ছে, শব্দ উঠছে, ফট্‌কির মনে হচ্ছে ওপাশের ঘরের জানালায় কেউ উঠে জানালা খুলছে। ঘুম এল তার শেষ রাত্রে। তাও কিছুক্ষণের মধ্যেই দুঃস্বপ্ন দেখে আতঙ্কে সে গোঙাতে লাগল; মনে হ'ল কে এসে তাকে আক্রমণ করেছে। মা তাকে জাগিয়ে তুললে। কিন্তু লজ্জায় বলতে পারলে না কি দুঃস্বপ্ন সে দেখেছিল।

দিন কয়েক পরই আবার একদিন সন্ধ্যার সময় গোয়ালে সে গরু বাঁধছিল। হঠাৎ বড়মোড়লের ছেলে গোয়ালে ঢুকে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলে। চেঁচিয়ো না। চেঁচালে আমার কচু, তোমারই কলঙ্ক।

ফট্‌কি চেঁচালে না।

পরের দিন আবারও সে গোয়ালঘরে ঠিক সময়ে এসে ঢুকল।

একদিন বাইরে থেকে আর কয়েকজন ছোকরা এসে শেকল দিলে ঘরে। মোড়লের ছেলে ফট্‌কিকে নিয়ে মাচায় উঠল, কাস্তে দিয়ে চালের বাখারী কেটে ফট্‌কিকে নিয়ে চাল ফুঁড়ে উঠে ওপাশে লাফিয়ে পড়ল।

মোড়লের ছেলেকে চিরদিন মনে থাকবে তার। তার বুকে সে বাঘিনীর সাহস জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছে। আশ্চর্য্য, দিনে ফট্‌কি সে সাহস খুঁজে পায় না। রাত্রির অন্ধকার যত ঘনাতে থাকে ফট্‌কির বুকে সাহসও তত জাগতে থাকে, কয়লার আঁচের মত। সন্ধ্যা থেকে সে ধোঁয়ায়, প্রথম প্রহরে সে থমথম করে, চৌকিদার হাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেলেই সে যেন ধ্বক ধ্বক ক'রে জ্বলে। সমস্ত বাধা বিঘ্ন পুড়িয়ে ছাই ক'রে সে তখন বেরিয়ে আসে।

হঠাৎ মরে গেল মোড়লের ছেলে। যেমন মানুষ তেমনি মরণ। প্রকাণ্ড উঁচু গাছে উঠেছিল কচি পাতা কাটবার জন্য। শখের লড়াইয়ে মেড়া ছিল তার, সেই মেড়াকে খাওয়াবার জন্য লকলকে কচি ডালি এবং পাতা কাটতে উঠল গাছে। সেই গাছের ডগা থেকে পড়ল নিচে ঘাড় গুঁজে। বীভৎস সে মূর্ত্তি।

তারপর সেই ছড়া-বাঁধা ছেলেটা।

ফট্‌কির মা বাপ তখন নিশ্চিন্ত হয়েছে। মোড়লের ছেলে মরেছে। ফট্‌কি ম্রিয়মাণ হয়েছে খানিকটা। ফট্‌কিকে তার আলাদা ঘরেই শুতে দিয়ে তারা তাদের ঘরে শুচ্ছে। মেয়েটা যদি শুয়ে একটুআধটু কাঁদে কাঁদুক, তা ছাড়া মা মেয়ে বাপ এক ঘরে শোয়াও ভাল দেখায় না।

ছেলেটা একদিন একলা পেয়ে বললে—ফটিকজল!

ফট্‌কির বুকে পাক খেয়ে উঠল আগুন, সে চারিদিক চেয়ে দেখে নিয়ে বললে, রাত্রে জানালার ধারে এস। শিস দিয়ো। চৌকিদার চলে যাওয়ার পর।

রাত্রে চৌকিদার হাঁক দিয়ে গেল। উঠে বসল ফট্‌কি। আস্তে আস্তে এসে সেই মোড়লের ছেলের ভাঙ্গা জানালাটার ধারে বসল। সেটা আবার মেরামত হয়েছিল, কিন্তু আজই আবার ফট্‌কি সেটাকে ভেঙে আলগা ক'রে ঠেকিয়ে রেখেছে। একটুক্ষণ বসে থেকে

সে জানালার খিলটা খুললে। আরো একটুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে জানালাটা একটু ফাঁক ক'রে দেখল। তারপর সম্পূর্ণ জানালাটা খুলে ফেল্লে। অধীর অস্থির হয়ে উঠেছিল সে।

তার নারীজীবনের দেহগত স্বাভাবিক ক্ষুধা বৈধব্যের বাঁধে বাঁধা পড়েছিল সমাজ ও শাস্ত্রের নির্দ্দেশে। সে বাঁধের গায়ে রাত্রির অন্ধকারে সরীসৃপের মত বিষ নিশ্বাস দিয়ে নির্গমন-পথ সৃষ্টি ক'রে গিয়েছে বড় মোড়লের ছেলে। অভ্যাস এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় রাত্রির অন্ধকারে সে ক্ষুধার্ত্ত ধারা উতলা এবং মত্ত হয়ে উঠেছে। ভালমন্দ পাপপুণ্য সব তার কাছে এখন তুচ্ছ।

অধীরতার মধ্যে সে আর চুপ ক'রে বসে থাকতে পারলে না। ভাঙা জানালাটা দিয়ে নিচের দূরত্বটা একবার দেখে নিলে। মনে পড়ল মোড়লের ছেলের সঙ্গে গোয়ালের চাল থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ার কথা। পড়বে লাফিয়ে? কিন্তু জানালাটা অপরিসর বলে লাফিয়ে পড়ার তেমন সুবিধা নাই। উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় তার মস্তিষ্ক, মন, সমস্ত কিছু তখন প্রচণ্ড কামনায় একাগ্র তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। হঠাৎ সে উঠল, উঠে আলনা থেকে কাপড় নিয়ে জানালার মাঝের মোটা বাজুতে বেঁধে বাইরের দিকে ঝুলিয়ে দিলে। তারপর তাই ধরে সে ভাঙা জানালা দিয়ে গলে বাইরে এসে ঝুলে পড়ল, দেওয়ালের গায়ে পা রেখে রেখে ধীরে ধীরে সে নেমে এল নিচে। তারপর সেই ছেলেটা এল।

ফট্‌কির সর্ব্বাঙ্গ তখন যেন জ্বরগ্রস্তের মত তপ্ত হয়ে উঠেছে। বুকের ভিতরটা জ্বলন্ত হাপরের মত মনে হ'ল, হাঁপাচ্ছে—নিশ্বাস পড়ছে আগুনের মত গরম। সে বললে—চল গাঁয়ের বাইরে। বড় মোড়লের আমবাগানে। সমস্ত রাত্রি সেখানে প্রেতিনীর মত নৃত্য করলে সে। সত্যই সে নাচলে, গান গাইলে। শেষ রাত্রে ফিরে সে আশ্চর্য্য নিপুণতার সঙ্গে আবার ওই কাপড় বেয়ে উপরে উঠে গেল।

ছড়া-গাইয়ে ছেলেটা আর আসে নাই। তার কথা মনে হলে দিনের বেলা ফট্‌কি মুখ মচকে ব্যঙ্গের হাসি হাসে। রাত্রের বেলায় মনে হলে মাটির উপর থুথু ফেলে।

মানুষের অভাব কোথায়?

পরের দিন রাত্রেই নতুন লোক এল আশ্চর্য্যভাবে। ফট্‌কি কাপড় বেয়ে নিচে নেমে দাঁড়িয়েছিল। সে এল না। ফট্‌কি ভাবছিল। হঠাৎ এল একজন। গ্রামে হাঁক মেরে চৌকিদার ফিরছিল। সে এসে খপ ক'রে হাত ধরলে।

ফট্‌কি বললে—হাত ছাড়।

না।

খালি হাতটা দিয়ে সটান এক চড় বসিয়ে দিলে ফট্‌কি তার গালে। বাগ্দী ছোঁড়াটা সঙ্গে সঙ্গে আর এক গাল পেতে দিয়ে বললে—ই গালেও মার!

ফট্‌কি আর না হেসে থাকতে পারলে না। বললে—মরণ!

তারপর এল গ্রামের জমিদার। ঘাটের পথে যেতে পথের মাঝখানে পড়ে কাছারী। হঠাৎ একদিন সে দেখলে কাছারীতে জমিদার এসেছে। ভাল লাগল জমিদারকে। দিনে ফট্‌কি আর এক ফট্‌কি। মুখ নামিয়ে ঘোমটা টেনে সে পার হয়ে গেল কাছারীর সামনেটা। কিন্তু রাত্রে নিজেই গিয়ে হাজির হ'ল কাছারীর পাশে। জমিদার কোন

ঘরে থাকে সে তার অজানা নয়। নগদী গমস্তা গাঁয়ের লোক বলে পুকুরের ধারের ছোট কুঠরীটা হ'ল বাবুকামরা। বাবুকামরার জানালায় সে গিয়ে টোকা দিলে। দু'বার, তিন বার, চার বার! জানালা খুলে বাবু ডাকলে—কে? সামনেই ছিল সে, একটু পাশে সরে গিয়ে দাঁড়াল দেওয়াল ঘেঁষে। চাপা গলায় বললে—খুলুন।

জমিদারকেও তার ভাল লেগেছিল। কিন্তু কথাটা প্রকাশ ক'রে দিলে চৌকিদারটা। সেই ছিল আবার জমিদারের নগদী। সে কথা মনে হলে হাসে ফটকি। হারামজাদার চাকরী গেল। জমিদারের কাছে একটি নূতন আস্বাদ পেলে সে।

কথাটা প্রচার হলেও গ্রামে কেউ উচ্চবাচ্য করলে না। বাপ মা পর্য্যন্ত না। বাপ নূতন জমি বন্দোবস্ত পেলে বিনা সেলামীতে। দু'একজন তাকে ধরলে সুদ-খাজনা মাফের সুপারিশের জন্য।

জমিদার চলে গেল। ওই চৌকিদার বাগ্দী ছোঁড়া এবার আক্রোশ মেটাতে একদিন তাকে ঘাট থেকে দিনে-দুপুরে তুলে নিয়ে গেল আরও তিনজন সঙ্গী জুটিয়ে। দু'জন মুসলমান, একজন হাড়ি। কিছুক্ষণ দেরী হলে হয়তো তার সন্ধান করা কষ্টকর হয়ে উঠত কিন্তু ফটকির জন্যে ব্যাকুল তরুণের গ্রামে অভাব ছিল না। তারা সঙ্গে সঙ্গে ছুটল। উদ্ধার ক'রে চৌকিদারটাকে আর তার সঙ্গীদের বেঁধে নিয়ে এল। ফলে ব্যাপারটা চাপা পড়ল না। মামলা হ'ল।

মামলায় অনেক কথা নিয়েই জেরা হ'ল, ঘাঁটাঘাঁটি হ'ল, কিন্তু দিনের বেলায় ফটকির মুখ দেখে বিচারক সব কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না। জেল হয়ে গেল তাদের। কিন্তু এবার সমাজকে ঠেকানো গেল না। সমাজে তার বাপ পতিত হ'ল।

এই সময় এল শুখনরাম। সে আড়াইশো টাকা দিলে তার বাপকে। জরিমানা দিয়ে বাপ সমাজে উঠল। কথা দিলে—ফটকিকে সে ঘরে রাখবে না, নবদ্বীপ কি কোথাও পাঠিয়ে দেবে। নবদ্বীপের বদলে বাবা একদিন রাত্রে শুখনরামের তামাকের গাড়ীতে তাকে তুলে দিলে। শুখনরাম তাকে নিয়ে এল। ফটকি আপত্তি করে নাই। শুখনরামকে দেখে তার সর্ব্বাঙ্গ সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে কিন্তু তার অনেক টাকা, অনেক সম্পদ, অনেক সম্মান। তাই আস্বাদ করবার জন্য সে এসেছে। একই রাত্রে শুখনরাম এবং শুখনরামের ছেলে দু'জনের কাছেই আত্মসমর্পন করতে হয়েছে। প্রথম ছেলে। বাপ তখনও অন্দরে আসে নাই। তারপর বাপ।

আজ সিঁড়ির কোণে নরসিংয়ের সঙ্গে দেখা। নরসিংয়ের ডাক তার মনে নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল। পাঞ্জাবীদের কাছে তাকে শুখনরাম বিক্রী করবে শুনে সে প্রথমটা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল। কিছুক্ষণ পরেই তার মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল। ভয়! কিসের ভয়! চল দেশ থেকে দেশান্তরে! স্ফটিকের মালার মত আজ এর গলায় কাল তার গলায়। চল! সে হেসেছে আপন মনে!

সন্ধ্যাবেলা সেই তখন থেকেই সে জ্বর হয়েছে বলে শুয়েছিল। জ্বর শুনে তার আজ ডাক পড়ে নাই। গভীর রাত্রে সে উঠে বারান্দার রেলিং এবং খড়খড়ির মধ্যের কাঠের ঢাকার একটা জানালা খুলে সেখান থেকে ঝুলিয়ে দিলে একখান কাপড়। রেলিংয়ে উঠে সেখান থেকে কাপড়খানাকে ধবে ঝুলে পড়ল।

যাবার সময় কিন্তু সে নরসিংয়ের বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদলে।

আমাকে নিয়ে পালিয়ে চল এখান থেকে।

নরসিং তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলে। বড় মায়া হচ্ছে মেয়েটির উপর। শুধু মায়া—সুন্দর পাখী, ছোট্ট একটি হরিণ দেখে যেমন মায়া হয় তেমনি ধরনের মায়া। তার বেশি কিছু নয়। সমস্ত রাত্রি মেয়েটা আদরিণীর মত তার উপর ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু নরসিং শুধু তার গায়ে হাত বুলিয়েছে মাত্র। কঠোর সংযমে সে নিজেকে বেঁধেছিল। আর আফশোসও করেছে কেন তাকে সে হুট ক'রে একটা ঝোঁকের মাথায় আসতে বলেছিল সিঁড়ির কোণে। ছত্রির ছেলে সে, কসম খেয়ে, প্রতিজ্ঞা ক'রে, প্রতিজ্ঞা ভাঙবে কি ক'রে? কসম যে বরবাদ করে সে কখনও ছত্রির ছেলে নয়। নরসিং কসম খেয়েছিল জানকীর কাছে। জানকী বলত, "বিয়ে তুমি পাঁচটা কর আমি কিছু বলব না কিন্তু আমার গা ছুঁয়ে কসম খাও, ঠাকুরের নামে দিব্যি গাল, অন্য মেয়েলোক নিয়ে পাপ তুমি করবে না"।

জানকীর গা ছুঁয়ে কসম সে খেয়েছিল।

ফট্‌কিকে লুফে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকে মোমবাতি জ্বাললে সে। রামা ঘুমুচ্ছিল। ফট্‌কি হেসে বললে—ও কে?

আমার শালা।

তোমার পরিবারের ভাই? আপন ভাই?

হ্যাঁ।

হেসে ফট্‌কি লুটিয়ে পড়ে বললে—বলে দেবে না নিজের বোনকে আমার কথা?

চমকে উঠল নরসিং। মনে পড়ে গেল জানকীর কাছে প্রতিজ্ঞার কথা। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে নরসিং বললে—বউ আমার বেঁচে নাই। তুমি বস।

ফুঁ দিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ফট্‌কি দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে ফুলের মালার মত বুকের উপর নিজেকে এলিয়ে দিলে। ফুলের মালা কিন্তু আগুনের ফুল। নরসিংয়ের সর্ব্বাঙ্গে উন্মত্ত জ্বালা ধরিয়ে দিলে কিন্তু সে ছত্রির ছেলে—প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য পাথরের মত শক্ত হয়ে বসে রইল। ফট্‌কির কথা শুনলে। গভীর রাত্রের অন্ধকারে ফট্‌কির লজ্জা নাই, ভয় নাই; পিশাচী বল সে পিশাচী, প্রেতিনী বল সে প্রেতিনী—অকুণ্ঠ মুখরতার সঙ্গে সে সব বলে গেল। ভোরের শুকতারা দেখা দিল আকাশে। নিতাই বাইরে থেকে ডাকলে—গুরুজী ভুল্‌কো তারা উঠেছে আকাশে।

নরসিং সস্নেহে বললে—চল তোমাকে তুলে দি বারান্দায়। রাত শেষ হয়ে এল।

তাকে বুকের উপর রেখে উপভোগ না ক'রে কেউ বিদায় দেয় এ অভিজ্ঞতা ফট্‌কির কাছে নূতন। সে এক মুহূর্ত্তে কেমন হয়ে গেল। নরসিংয়ের গলা জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রেখে সে হঠাৎ কেঁদে ফেললে।

নরসিং সস্নেহে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলে; মুখে তার বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল।

ফট্‌কি বললে—আমাকে নিয়ে তুমি পালিয়ে চল এখান থেকে।

নরসিং আবার তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে—আজ তুমি যাও, আমি ভেবে দেখি! কাল; কাল তোমাকে জানাব।

ফটকী বললে—না-না। তোমাকে ছেড়ে—না-না।

নরসিং বললে—না নয়। কাল, কাল। আজ যাও তুমি। আর বেরিয়ে আসতে হলে চোরের মত নয়; কাল ভেবে দেখে যা হয় ব্যবস্থা করব আমি।

(ক্রমশঃ)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় সমাজ পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

ভারতীয় সমাজপদ্ধতির ধারা বুঝিবার জন্য চরক সংহিতার (১) মধ্যে কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করা চলে। ইহাতে বলা হইয়াছে, "ব্রহ্মা প্রথমতঃ আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করেন, প্রজাপতি তাঁহার নিকট সেই আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র সমগ্র অধ্যয়ন করেন; তৎপর অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রজাপতির নিকট সেই আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন" (প্রথম অধ্যায় সূত্রস্থানম্; পৃঃ ৩৪.)। খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "ময়ূর মাংস বিশেষ হিতজনক, কুক্কুট মাংস স্নিগ্ধ, শুকরের মাংস স্নিগ্ধকর ··· গুরুপাক, গোমাংস বায়ুরোগ, পীনস্ রোগ, শুষ্ক কাশ রোগ, পরিশ্রমজনিত ক্লান্তিতে শরীরের মাংসক্ষয়ে বিশেষ হিতজনক। মহিষের মাংস স্নিগ্ধ, উষ্ণ, মধুর, উৎসাহজনক এবং নিদ্রাকারক" (ঐ—পৃঃ ১৯৪)। পুনঃ দুগ্ধবর্গের গুণ বিষয়ে বলা হইয়াছে কিলাট (ছানা) প্রভৃতি দীপ্তাগ্নি এবং বায়ুনাশক (পৃঃ ২০৬)। খাদ্যের বিষয়ে বলা হইয়াছে, "মাংস, শাক, বসা, তৈল, ঘৃত, মজ্জা এবং নানাবিধ ফলের সহিত অন্ন পাক করিয়া আহার করিলে সেই অন্ন বলকারক" (পৃঃ ২০৮)। হিঙ্গু বাত শ্লেষ্মা এবং মলবদ্ধতানাশক (পৃঃ ২১১)।

হিন্দুর চিকিৎসাশাস্ত্রের এই দুই বিশিষ্ট গ্রন্থকারের অনেক ব্যবস্থার সহিত স্মার্ত্ত বিধানের অনেক ব্যাপারের কোন মিল নাই। স্মৃতি ও পুরাণাদিতে হিঙ্গু, লশুন, পলাণ্ডু, ছানা ভক্ষণ নিষিদ্ধ কিন্তু ভিষক্ শাস্ত্রসমূহে তাহা ভক্ষণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। এমন কি কুক্কুট, গোমাংস, মহিষ মাংস ভক্ষণেরও বিধান আছে।

অতঃপর অতি অর্ব্বাচীন একটি বৈদ্যশাস্ত্রীয় পুস্তক হইতে তথ্য সংগ্রহ করা যাউক। বাঙ্গলা-মগধের সম্রাট নয়পাল দেবের মন্ত্রী ও পাকশালার অধ্যক্ষ চক্রপানি দত্ত (২) কি বলিতেছেন উহার অনুধাবন করা যাউক। ইনি কাশ রোগের বিধান দিতেছেন, "গ্রাম্য কুক্কুটাদি, অনূপ (শূকর প্রভৃতি) এবং ঔদক (কচ্ছপ প্রভৃতি) জন্তুর মাংস রসের সহিত অথবা মাষকলাই ডাল···ধানের অন্ন ভোজন করাই প্রশস্ত" (১।পৃঃ, ২১৯)। ইনি আবার ক্ষয়রোগে "মাংসাহারী ব্যাঘ্রাদির মাংস অথবা মাংসভোজী পক্ষীর মাংস যথারীতি পাক করিয়া আহার করিতে দিবে" এই ব্যবস্থা দিয়াছেন (১—পৃঃ ১৯৪)। ইহার সময়ে ভারতে

১। চরক সংহিতা—প্রথম ভাগ, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন কবিরাজের অনূদিত।

২। চক্রদত্ত—কবিরাজ শ্রীপ্যারিমোহন সেনগুপ্তের সংশোধিত ও প্রকাশিত, ১২৯৫ সাল।

গোমাংস ভক্ষণ প্রথা সম্পূর্ণরূপে অন্তহিত হইয়াছে। আর বাঙ্গলায় ব্যাঘ্রের অভাব কখনও হয় নাই, সেই কারণেই বোধ হয় "বিষস্য বিষমৌষধম্" ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন।

এই প্রকারে দেখা যায় যে, ভিষগ্‌শাস্ত্রে খাদ্যাদির ব্যবস্থা-সম্পর্কে যে-তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সহিত স্মৃতি ও পুরাণসমূহের বিধানের বেশ গরমিল রহিয়াছে।

এইরূপ তুলনামূলক পাঠ হইতে জানিতে পারা যায়, স্মৃতিসমূহ প্রাচীন হিন্দু আচার-ব্যবহারের যথার্থ তথ্য প্রদান করে না। স্মৃতিসমূহ পুরোহিততন্ত্রের শ্রেণীস্বার্থের বড়াই-এর পরিচায়ক, ইহা হিন্দু কৃষ্টির দ্যোতক নহে। অবশ্য ব্রাহ্মণ্যবাদের ছায়া ভিষগ্‌শাস্ত্রসমূহে পড়িয়াছে; সুশ্রুত সংহিতায় বৈদ্য অপেক্ষা পুরোহিতের প্রাধান্য দেখা যাইতেছে; ইহাতে উক্ত হইয়াছে বৈদ্যের পুরোহিত মতে কার্য্য করা কর্তব্য (৩৪।৭)।

ইতিহাসে সংবাদ পাওয়া যায়, বুদ্ধের সময়ের জীবক হইতে আধুনিক চক্রপাণি পর্য্যন্ত ভিষগ্‌গণ হয় বৌদ্ধ, না হয় বৌদ্ধ-ঘেঁসা লোক ছিলেন। বর্ত্তমানের বিজ্ঞানের যাচাইয়ে এই শাস্ত্রের মূল্য যাহাই নির্দ্ধারিত হউক না কেন, প্রাচীনকালে হিন্দুর ভিষগ্‌শাস্ত্র তুলনামূলক বস্তুতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা দ্বারা অনেকাংশে নিরূপিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। প্রাচীনকালে ইহার স্থান অতি উচ্চে ছিল। এইজন্য আরবেরা হিন্দুর চিকিৎসা-শাস্ত্রের অনুবাদ করিয়া স্বীয় সংস্কৃতি মধ্যে উহার স্থান দিয়াছিলেন। কবিরাজেরা সুশ্রুত-সংহিতাকে হিন্দুর Surgery-বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করেন। Hoerule মহোদয় হিন্দুর Anatomy-বিজ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের উক্ত পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অপেক্ষা হিন্দুর অস্থিবিজ্ঞানে (Anatomy) কয়েকখানা বেশী অস্থির গণনা করা হইয়াছে। এতদ্বারা বোধগম্য হয় যে, তাঁহারা অস্থিসমূহের আরও সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার সংখ্যা গণনা করিয়াছেন। দেখা যায় বৌদ্ধেরা আলকেমীর চর্চ্চার সঙ্গে শরীরবিজ্ঞানেরও বিশেষভাবে চর্চ্চা করিয়াছিলেন। জাতিভেদ স্পর্শদোষ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্যবাদের অনুষ্ঠান তাঁহাদের কর্ম্মকে ব্যাহত করিতে পারে নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তখনো চিকিৎসাশাস্ত্রসমূহ তুকতাক্ (augery and divination) ও ভূত প্রেত প্রভৃতিতে বিশ্বাসবিমুক্ত হইতে পারে নাই! সুশ্রুত সংহিতায় উল্লিখিত আছে, শুভসূচক দূত, অনুকূলনিমিত্ত (স্বরভিবাতাদি), শুভ শকুন (পক্ষিবিশেষের প্রশস্তধ্বনি), মঙ্গল (স্বস্তিকপূর্ণ পূর্ণ কুম্ভাদি)—এই সকল শুভসূচক দূতাদির সংঘটন হইলে রোগীর গৃহে গমন করিবে (১০।৩)। চরক সংহিতায় কথিত হইয়াছে, সূতিকাগারে "অথর্ব্ববেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ প্রত্যহ উভয়কালেই কুমার ও প্রসূতির স্বস্ত্যয়নার্থ শান্তিহোম করিবে" (নিদানস্থানম্—পৃঃ ৪৬১-৪৬২)। ভিষগ্‌শাস্ত্রের ঔৎকর্ষ বৌদ্ধদেরই দ্বারা সাধিত হইয়াছিল বলিয়া বিবেচিত হয়, তাঁহারাই অনেক ঔষধ আবিষ্কার করেন। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, নাগার্জ্জুন চক্ষুরোগের ঔষধ প্রস্তুত করার বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন; এই ঔষধের কথা অর্ব্বাচীন চক্রপাণির চিকিৎসাপুস্তকে উল্লিখিত আছে, তখনও এই ঔষধ চলিত। এই ঔষধটির উপাদানসমূহের মধ্যে একটি হইতেছে "তাম্র"; ইহা বর্ত্তিকাকারে প্রস্তুত করা হইত। চক্রপাণি বলিতেছেন, "উক্ত বর্ত্তি নাগার্জ্জুন মুনি কর্তৃক 'পাটলীপুত্র' নামক তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে" (নেত্ররোগ চিকিৎসা, ৮৪ পৃঃ ৬১৯)। এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায়ও নাকি নেত্ররোগে তাম্র ব্যবহৃত হয়। তাহা হইলে তৎকালীন হিন্দু বৈজ্ঞানিকদের কৃতিত্ব

বিশেষ প্রশংসনীয়। কিন্তু এই বিজ্ঞানচর্চ্চার পাশাপাশিই উপরোক্ত কুসংস্কারসমূহ স্থানলাভ করিয়াছে। তাহাতে স্বতঃই মনে সন্দেহ জাগে—কাহারা এই চর্চ্চায় কৃতী ছিল। আজও নালন্দার ধ্বংসস্তূপসমূহের প্রাঙ্গণে লম্বা চুল্লীসমূহ বিরাজ করিতেছে। প্রদর্শকেরা (guides) বলেন, ঐগুলিতে রসায়ন সংক্রান্ত দ্রব্যাদি পাক হইত। বর্ত্তমান সময়ের কবিরাজেরা বলেন, শোষণনীতি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া বৌদ্ধেরা চিকিৎসাশাস্ত্রে এই সকল অযৌক্তিক গল্পের সন্নিবেশ করিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদের ছাপ ইহাতে পরিদৃশ্য হওয়ায় ইহাই অনুমিত হয়, যে আকারে আজ এই সব পুস্তক আমাদের কাছে আসিয়াছে, তাহাতে ইহাদের উপর ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্রের কলমের আঁচড়ই রহিয়াছে। এইজন্যই দেবতা ও মুনিগণের গল্প এই শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধ নাগার্জ্জুন ও চরক নিশ্চয়ই বিজ্ঞান অপেক্ষা ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও অথর্ব্ববেদের প্রাধান্য দেন নাই।

ফলিত বিজ্ঞানে হিন্দুর বিশিষ্ট দান হইতেছে শূন্য ('০') দ্বারা গণনা প্রণালী (Decimal system)। প্রাচীনকালে ভারতে অন্যান্য ক্ল্যাসিক্যাল দেশের ন্যায় বর্ণমালা সাহায্যে সংখ্যা গণনা করিবার পদ্ধতি প্রচলন ছিল (৩) বলিয়া কেহ কেহ বলেন। 'সিদ্ধান্ত-শেখর' নামক জ্যোতিষসিদ্ধান্তের টিকাকার মক্কিভট্ট এই পদ্ধতিকে 'অক্ষর সংখ্যা' নাম প্রদান করিয়াছেন। ইনি খৃঃ ১৩৭৭ সালে জীবিত ছিলেন। (৪) কিন্তু ইহার বহুপূর্ব্বে শূন্য দিয়া গণনা প্রণালী উদ্ভূত হইয়াছে। বিখ্যাত ফলিত জ্যোতিষী (Astronomer) আর্য্যভট্ট খৃষ্টীয় ৪৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন, তাহারও কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বেই এই 'দশমিক প্রথা' (Decimal system) উদ্ভূত হইয়াছে। (৫) কোন্ ভারতীয় প্রতিভাবান ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই মঙ্গলজনক বৈজ্ঞানিক প্রথা উদ্ভূত হইয়াছে তাঁহার নাম আজও কেহ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। আজ যাহা Arabic Numerals নামে অভিহিত, আসলে তাহা হিন্দুর মস্তিষ্ক-প্রসূত। Benfay প্রভৃতি কতিপয় জার্ম্মান ভারততত্ত্ববিৎ (Indologist) বহু অনুসন্ধান ও গবেষণার পর এই তথ্যই আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু আজকালকার ইংরেজ ও আমেরিকান ঐতিহাসিকেরা বলেন, "আমরা জানি না আরবেরা কোথা হইতে এই পদ্ধতি প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু আমরা আরবদের নিকট হইতে ইহা গ্রহণ করিয়াছি"(৬)। নিরপেক্ষ অনুসন্ধানকারী স্বীকার করিবেন যে, কৃষ্টির অনেক জিনিষের সহিত আরবগণ হিন্দুদের নিকট হইতে এই পদ্ধতিও গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে হিন্দুর গানের স্বরলিপি ভারত হইতে পারসীকেরা গ্রহণ করে, পরে আরবেরা উহা গ্রহণ করে; শেষে Guiddo D'arizzo নামক এক

৩। C. M. Whist. on the Alphabetical Notation of the Hindus in Trans. of the Literary Society of Madras P. 1802. f. P. 35. ff.

৪। শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত—'অক্ষর সংখ্যা প্রণালী'—সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—৩৬শ ভাগ, ১ম সংখ্যা ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।

৫। Bibhuti Bhusan Dutt, "A Note on the Hindu-Arabic Numerals in American Math. Monthly, Vol. 33,1926, P. 220-221.

৬। Thacher and Sewell—History of the Middle Ages দ্রষ্টব্য।

ইতালীয় সঙ্গীতজ্ঞ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় স্বরলিপিতে উহার প্রচলন করেন। অবশ্য পারসীকেরা যখন উহা গ্রহণ করে, তখন তাহারা স্বরলিপির 'সা, রে, গা, মা' প্রভৃতির নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'Do, Ri, Mi, Fa ইত্যাদি নূতন নামকরণ করে। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ইরাণের সম্রাট খস্রু নৌসিরবানের অভিষেকের সময় ভারত হইতে অনেক সঙ্গীতজ্ঞ ও বাদক পারস্যে লইয়া যাওয়া হয়। বোধ হয় এই সময়েই স্বরলিপি গৃহীত হয়। এই ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞদের বংশধরেরা আজও 'লুল্লিয়া' নামে ইরাণে বসবাস করে। ফার্সীতে 'গান গাওয়া' (to sing) ক্রিয়াপদের প্রতিশব্দ হইতেছে 'স্রুদ দান' বা 'স্রাই দান'। এই শব্দই ভারতীয় উৎপত্তির পরিচায়ক বলিয়া অনুমিত হয়। পুরাতন Encylopaedia Britanica-তে এই প্রকারে হিন্দু স্বরলিপির প্রসারের সত্য স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু হালের উক্ত বিশ্বকোষখানার যে সব সঙ্কলন সংস্করণ হইয়াছে তাহা এই বিষয়ে নীরব। এক্ষণে কথা এই, ভারতীয় Notation পিথাগোরীয় পদ্ধতির পূর্ব্বের কিনা? প্রাচীন ইউরোপে পিথাগোরীয় পদ্ধতির প্রচলন ছিল। শুনা যায় গ্রীক্ অর্থডক্স চার্চ্চে এই পদ্ধতি অনুযায়ী গান গীত হয়। কিন্তু এই পদ্ধতির সহিত ভারতীয় পদ্ধতির সম্পর্ক কেহ আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই। হিন্দুরা তাঁহাদের সঙ্গীতের মূল বৈদিক ছন্দের গীত হইতে ধার্য্য করেন।

ফলিতবিজ্ঞানে আচার্য্য বৃদ্ধ (প্রথম) আর্য্য ভট্টের দান অতুলনীয়। তাঁহার 'আর্য্যভট্টিয়' বা 'বৃদ্ধ আর্য্য সিদ্ধান্ত' গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়ে লিখিত হয়। ইনি পাটলীপুত্রে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া বর্ত্তমানের পণ্ডিতদের বিশ্বাস। ইনি 'ভূ ভ্রমণবাদ' স্বীকার করেন; ইহা পঞ্চদশ শতাব্দীর কপার্নিকাসের পূর্ব্বের কথা। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতেই আর্য্যভট্ট বলিলেন, That the earth rotated on its axis (৭) (পৃথিবী তাহার মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে)। ইনি বলিলেন, "চন্দ্র সূর্য্যকে এবং মহতী ভূচ্ছায়া চন্দ্রকে আচ্ছাদিত করে।" এতদ্বারা তিনি এই বিষয়ে পৌরাণিক গল্পসৃষ্ট মতের খণ্ডন করেন। পুরোহিততন্ত্রের বিশ্বাসের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত মহাশয় বলেন, "কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী বরাহ, ব্রহ্মগুপ্তপ্রমুখ জ্যোতিষী-বর্গের ততটা সৎসাহস ছিল না। তাই তাঁহারা নানাপ্রকার কল্পনার আশ্রয়ে স্মৃতি-পুরাণাদিতে বর্ণিত উপাখ্যানের সহিত বিজ্ঞানের ঐক্য স্থাপন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। '......গ্রহগতি সম্পর্কে আর্য্যভট্ট-ব্যাখ্যাত নীচোচ্চবৃত্তিবাদ সম্পূর্ণ মৌলিক' (৮)।

এই স্থলে দৃষ্ট হয় যে, আর্য্যভট্ট নির্ভীক যুক্তিবাদী ছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী ফলিত জ্যোতিষকারদের পুরোহিততন্ত্রের মতের সহিত আপোষ করিয়া বিজ্ঞানের সেবা করিতে হইয়াছিল। ইহারা রাজদরবারী ছিলেন, কাজেই বর্ণাশ্রমীয় গোঁড়া রাজাদের দ্বারা সৃষ্ট আবহাওয়ার সহিত মানাইয়া লইয়া তাঁহাদের বিজ্ঞানের সেবা করিতে হইয়াছিল। এই বিষয়ে তাঁহারা মধ্যযুগের গোঁড়া আরব খলিফাদের সময়ের ও ইউরোপীয় দেশের বৈজ্ঞানিকদের সমদশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৭। Robert Bryan—The Imperial Guptas in Great Men of India. P.32.

৮। শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত—আচার্য্য আর্য্যভট্ট ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গ—সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, চত্বারিংশ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ১৫১-২।

আর্য্যভট্টের শিষ্যেরা তাঁহাদের অনুগামী হইয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মী পুস্তকের মতের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন, "ইহা কথিত হয় যে, চন্দ্র সূর্য্যের উর্দ্ধে গমন করে। তাহা বেদান্ত, ইতিহাস প্রভৃতিতেই শোনা যায়। আর্য্যভট্টের উক্তি ঐ প্রকারের নহে। আর্য্যভট্ট প্রণীত দর্শন ছাড়িয়া আমরা তথায় প্রবেশ করিব না; শ্রুতি প্রভৃতির সহিত ঐ দর্শনের ঐক্য থাক বা না থাক ("আর্য্যভট্ট প্রণীতং বিহায় ন বয়ং তত্র প্রবিশামঃ। পৌরাণিক শ্রুত্যাদিষু সম্বন্ধোঽস্য দর্শনস্যস্ত বা ন বা ॥) অন্যথা, উপপত্তিহীন হইলেও সেই দর্শন সিদ্ধ হইয়া যাইবে।" (লঘুভাস্করীয় বিবরণে শঙ্করনারায়ণ)। (৯)

এইস্থলে জ্ঞাতব্য যে, যুক্তিবাদকে আশ্রয় করিয়া আর্য্যভট্ট ও তাঁহার শিষ্যেরা যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন তাহার প্রচার করিয়া গিয়াছেন, পুরাণ ও শ্রুতির ভয় করেন নাই। অন্যপক্ষে, অন্যান্য জোতির্ষীরা সেই সৎসাহস প্রদর্শন করিতে পারেন নাই যদিচ ইহার মধ্যে ব্রহ্মগুপ্ত পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই বিষয়ে Bryan মহোদয় বলেন, A little later Brahmagupta was stating that "All things fall to the earth by a law of nature, a fact that was new to Newton a thousand years later." (১০)। বোধ হয় মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে পৌরাণিক কোন আজগুবি গল্প নাই বলিয়াই তিনি এই মত প্রচার করিতে সাহস পাইয়াছিলেন! এই সংবাদ হইতে এই তথ্যই প্রাপ্ত হওয়া যায়, যেরূপ অন্যান্য দেশেও পুরোহিত শক্তি (Priest Craft) দেশের অগ্রগামী গতিকে বাধা দিয়েছে এবং এখনও দিতেছে, ভারতেও প্রাচীনকালে পুরহিততন্ত্র লোকের স্বাধীন চিন্তাকে ব্যাহত করিত। কিন্তু ভারতীয় বৈজ্ঞানিককে বা স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তিকে মধ্যযুগীয় মুসলমান দেশসমূহে এবং ইউরোপের ন্যায়, রাজশক্তির দ্বারা এই জন্য নির্য্যাতিত হইবার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। অবশ্য শঙ্করবিজয় গ্রন্থে কথিত আছে দুষ্ট মতের লোকদের মস্তক ছেদন করিয়া ঢেঁকিতে কুটিবে ইত্যাদি (দুষ্ট মতাবলম্বিনঃ বৌদ্ধান জৈনান ··শিরাণি পণ্ডভিশ্ছিত্বা বহুষু উদুখলেষু নিক্ষিপ্য কঠ ভ্রমণৈ চূর্ণীকৃত্য চৈবং দুষ্টমত ধ্বংসামচরণ, নির্ভয়ো বর্ত্ততে)"। আবার শঙ্করাচার্য্য Knight-templerদের ন্যায় একদল ষণ্ডা লাঠিধারী লোক লইয়া দ্বিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন, কারণ তিনি মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। শ্বেত শ্বাতরউপনিষদে উল্লিখিত আছে—যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত তর্কে পরাস্ত হইয়া সাকল্য ঋষির মস্তক আপনিই শরীর চ্যুত হইয়াছিল! এই সঙ্গে রাষ্ট্রের দ্বারা ভিন্ন মতের নির্য্যাতনের কথা ইতিহাসে মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। কুমারিল ভট্টের প্ররোচনায় রাজা সুধন্বা কর্তৃক বৌদ্ধদের হত্যা এবং অন্যান্য রাজাদের ছাড়া ভিন্ন মতের লোকদের বা তাহাদের মন্দির ধ্বংসের কথা ঐতিহ্য এবং ইতিহাসে পাওয়া যায়। ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, "ক্যানিংহামের 'এন্‌সেন্ট ইণ্ডিয়ায়' দেখি ৭ম শতাব্দীতে

৯। শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত—ঐ পৃঃ ১৫৭।

১০। Bryan—Great Men of India, P 32.

অনেক বৌদ্ধ রাজাই উৎপীড়ক" (১১)। অন্যপক্ষে, চোল রাজগণ জৈনদের প্রতিষ্ঠিত মন্দির পোড়াইয়াছে, এবং বৈষ্ণবেরাও তাহাদের বিপক্ষে নির্য্যাতনের অভিযোগ করে (১২) (রামানুজের জীবনী দ্রষ্টব্য)। ১১-১২শ শতাব্দীর চালুক্যেরা জৈনদের মন্দির ভাঙ্গিয়া তাহাতে পৌরাণিক দেবী স্থাপিত করিয়াছে। (১৩)

সিংহলে 'মহাবংশ' ঐতিহাসিক পুস্তকে বৌদ্ধ রাজাদের দ্বারা ব্রাহ্মণ্যবাদীয়দের নির্য্যাতনের কথা উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। এক রাজা Adams Peak হইতে হিন্দু সাধুদের বিতাড়িত করে (মহাবংশ দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃঃ ২১১), রাজা মহাসেন দেবালয় ভাঙ্গিয়া মণিহিরো বিহার নির্ম্মাণ করেন, যে স্থলে একটি দেবালয় ইনি ভাঙ্গিয়াছেন তথায় তিনটি করিয়া বিহার তিনি স্থাপন করেন। খৃষ্টীয় ২৮৪ অব্দে এই মন্দিরভঙ্গের কার্য্যটি সংঘটিত হয়। এই মন্দিরগুলি শিব মন্দির ছিল (১৪)। তিনি শিবলিঙ্গ প্রভৃতির পূজা নিশ্চিহ্ন করিয়া বৌদ্ধ মত লঙ্কায় সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা করেন (১৫)। আবার জৈন রাজাদের অত্যাচারের প্রমাণেরও পশ্চিমের প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষী আছে এবং গুজরাটের ইতিহাসেও প্রমাণ আছে (১৬)। এই প্রকারের সাম্প্রদায়িক নির্য্যাতনের তালিকায় ব্রাহ্মণ্যবাদী, জৈন ও বৌদ্ধ কোন ধর্ম্মের রাজাই বাদ যান নাই। কিন্তু এই প্রকারের নির্য্যাতনের পশ্চাতে ইতিহাসের অর্থনীতিক কি ব্যাখ্যা আছে তাহা অজ্ঞাত আছে। সাধারণতঃ স্বীকার করিতে হইবে যে; আরব খেলাফতে সুফী মনসুর আল-হল্লাজ ও ইউরোপে জিয়র ডানো ব্রুনো এবং গ্যালিলিও প্রভৃতির যে দশা হইয়াছিল, কোনও হিন্দু দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের ব্যক্তিগতভাবে সেই দশা ভারতবর্ষে হয় নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

১১। বঙ্গদর্শন—১৮৮৪, শ্রাবণ, পৃঃ ৩০৫।

১২। N. C. Bandyopadhyaya—Development of Hindu Polity, Vol. I & II P. 178.

১৩। Ramaswamy Aiyangar—Andhra—Karnatic Jainism—Studies in South Indian Jainism. P 112.

১৪। The Mahavansa—Translated by Geiger. P 270

১৫। Mahavansa—Translated by G. Turnonr—Vol. I. P 237.

১৬। Vincent Smith—Vaidya—Early History of India, Bhav. Inscription. P 206.

পুস্তক-পরিচয়

স্বর্গাদপি গরীয়সী (প্রথম খণ্ড)—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (জেনারেল প্রিণ্টার্স, মূল্য ৪৲ পৃ ১৮৫)।

শতাব্দী—রমেশচন্দ্র সেন (পূরবী, মূল্য ৩৷৷৹ পৃ ৩২৬)।

দর্পণ—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (বুক এম্পোরিয়াম, দাম ৪৷৷৹)।

এই কয় বৎসর বাঙলা উপন্যাস-সাহিত্যের ধারা সচল ও বেগবান হয়েছে। কারণ বাঙালীর জীবনযাত্রা নানা ঘটনা-সংঘাতে ও ভাব-সংকটে উপন্যাস-সাহিত্যের উৎকৃষ্ট উপাদান হয়ে উঠেছে, আর আমাদের লেখকেরাও তা উপলব্ধি করতে পারছেন। বাঙলা উপন্যাসের এই ধারা যখন সচল হয়ে উঠেছে তখন নতুন দিকেও যেমন তা পথ করতে চেয়েছে, তেমনি পুরনো খাদেও সে বয়ে চলেছে নতুন গতিতে, স্বাচ্ছন্দ্যে, সৌন্দর্যে। আজ কালের বহু উপন্যাস থেকে আমরা তার আভাস পাই। এই তিন খানা উপন্যাসও তারই প্রমাণ। একালের বাঙলা উপন্যাসের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ এর মধ্য দিয়ে আমাদের চোখে পড়ে। লেখকদের নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য ও তাঁদের গ্রন্থের বিশেষ উদ্দিষ্ট অনুযায়ী যে লক্ষণ প্রস্ফুট হবার কথা তাই প্রস্ফুট হয়েছে, অন্য সব লক্ষণ প্রস্ফুট হয়নি, হওয়া সম্ভবও নয়, তা বলাই বাহুল্য।

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের স্থান বাঙলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সুবিদিত। তাঁর 'স্বর্গাদপি গরীয়সী'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে কয়েকমাস পূর্বে; দ্বিতীয় খণ্ড এখন প্রকাশিত হয়েছে, তৃতীয় খণ্ডও মাসিকপত্রে চলছে। আমরা অবশ্য প্রথম খণ্ড নিয়েই আলোচনা করছি। এক হিসাবে তাই এ আলোচনা অসম্পূর্ণ; কিন্তু তবু তা অন্যায় আলোচনা হবে না। লেখকের প্রথম খণ্ডের 'ভূমিকা' থেকেও এ বিশ্বাসই সুদৃঢ় হয়। বিভূতিবাবু বলেছেন, "স্বর্গাদপি গরীয়সী' জীবনী নয়। যদিও এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে ইহাতে জীবনের উপকরণ প্রচুর পরিমাণেই বর্তমান। নারী জীবনের পূর্ণ সার্থকতা মাতৃত্বে—এই মূল কথাটি বলা আমার উদ্দেশ্য।" লেখক জানিয়েছেন, "ওটা প্রকাশ পায় ভাব ও অভাব—দুয়ের মধ্যেই।...তাই গিরিবালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে কাত্যায়নী,—আর পরবর্তী জীবনে (দ্বিতীয় খণ্ডে ?) মৈথিল বধূ দুলারমন, কি খঞ্জনী।" গিরিবালার দ্বিতীয় পুত্র শৈলেন তার মাকে দেখছে, আর শুনছে তার মায়ের শিশু ও কিশোর বয়সের কাহিনী। খোলামকুচি নিয়ে যে গিরি মাটির পুতুলের মা হচ্ছে, সে-ই সন্তান-জননী গিরিবালা হয়ে সৌভাগ্য-আনন্দে-মাতৃত্বে বিকশিত হয়ে উঠল ক্রমে ক্রমে। এই প্রথম খণ্ডের কথাবস্তু হল এইটুকু মাত্র। শৈলেন তার মায়ের এই কাহিনী শুনছে কখনো মায়ের মুখ থেকে, কখনো বা মায়ের জ্যেঠাই মা, শৈলেনের বড়-দিদিমায়ের মুখ থেকে। শুনতে শুনতে তার মনে রঙ ধরে, "এ-দিকে গল্প চলিতে থাকে ও-দিকে শৈলেনের নিজের জগৎ ওঠে রেখায় রেখায় পূর্ণ হইয়া।" এবং "যাঁহারা দেবমূর্তিতে পূজা পান তাঁহারাই যেন মানবমূর্তিতে রূপান্তরিত হইয়া

গিয়াছেন।...মা কখন পার্বতী-উমা হইয়া যায়; পার্বতী-উমা কখন মায়ের মধ্যে কানায় কানায় ভরিয়া ওঠেন বোঝা যায় না।" কিন্তু উপন্যাসের কথাবস্তু এই শৈলেনের মনের ছবি নয়, তা গিরিবালার বাল্যজীবন, মাতৃত্বের পথে তীর্থ-যাত্রিণী বালিকার সহজ স্বচ্ছ জীবন-কথা। এরূপ কাহিনী রচনায় 'রাণুর' স্রষ্টা বিভূতিবাবু যে সিদ্ধহস্ত, তা সুবিদিত। উপন্যাসের পদ্ধতিও সহজ ও সুপরিচিত। তা কালানুক্রমে বিবৃত। সে বিবরণ মা বা বড়দিদিমা যাঁর মুখ থেকে শোনাই হোক্, তাঁদের কারো মনের কল্পনা অনুভূতি দিয়ে অনুরঞ্জিত নয়। শ্রোতা শৈলেনেরও কল্পনা-অনুভূতি দিয়েও তা নবায়িত নয়। অর্থাৎ, আধুনিক অনেক উপন্যাসে যেমন স্মৃতি ও বিস্মৃতির পথে জীবনানুসন্ধান চলে,—প্রুস্ত, জয়েস্, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ প্রভৃতির কৃতিত্বে যা আমাদের এতটা আকৃষ্ট করেছে,—লেখক সেই স্মৃতি-মন্থনপদ্ধতি বা কাল-বিলোপপদ্ধতি গ্রহণ করেন নি। এ-দিক থেকে বিভূতিবাবু উপন্যাসের সনাতন-ধারাতেই চলেছেন। সুস্থির, সুপরিচিত সেই ধারা, যার উপর নির্ভর করতে লেখক ও পাঠকের বাধে না। তবে এ-কাহিনী কথিত বলেই বর্ণনা পদ্ধতিতে আছে কথাবার্তার সহজ অন্তরঙ্গতার রীতি—প্রত্যেক কথকেরই শিক্ষাদীক্ষার অনুরূপ তার ভাষা ও ভাব।

গিরিবালার কাহিনী মাতৃত্বের কথা হলেও জীবনীমূলক। "কিন্তু শুধু সত্য লইয়া উপন্যাস চলে না"; সত্যনিষ্ঠ কল্পনা দিয়ে সেই জীবন-সত্যকেই উপন্যাসাকারে তুলে ধরতে হয়। লেখকও তা' করেছেন। লেখক জানিয়েছেন, "গোটা মানুষটিকে দাঁড় করাইতে হইলে যাহারা তাহাকে ঘিরিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাহার জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছিল তাহাদের আনিয়া ফেলিতে হয়।" তাই এসেছে একটি সুন্দর গৃহচিত্র—বোধ হয় ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্বেকার বাঙালী গ্রাম্য-সমাজের দরিদ্র-ভদ্রলোকের কথা—সভ্যতার কোনো আশা-আশঙ্কা-উদ্বেগ তাদের স্পর্শও করেনি। তবু তারা সত্যকারের মানুষ—কাত্যায়নী, বসন্তকুমারী, রসিকলাল, পণ্ডিতমশায়, হারাণ,—এ-সব মানুষকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এখানে বিভূতিবাবুর প্রধান কৃতিত্ব—তাঁর মানুষগুলো সুস্থ ও সহজ মানুষ। তাদের কথাবার্তা, আচরণ চমকপ্রদ নয়, অতিরিক্ত রকমের সহজ, এবং ঘরোয়া। বিভূতিবাবুর অদ্ভুত দখল তাদের সেই ঘরোয়া ভাষা ও কথাবার্তার উপর। পশ্চিম বাঙলার মেয়েলি ভাষার ও সাধারণ লোকের ভাষার উপর এমন দখল আর কোনো বাঙালী লেখকের আছে কি-না জানি না।

কিন্তু তবু উপন্যাসখানিকে শ্রীযুক্ত বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বল্‌তে বাধছে কয়েকটি কারণে। প্রথমত, বিভূতিবাবুর কাহিনীর অংশ ক্ষুদ্র। নানা চরিত্র ও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা অনুভূতির ও সকৌতুক দৃষ্টির মাধুর্য দিয়ে ভরানো। কিন্তু তবু মনে হয়, এ-কাহিনী দীর্ঘায়ত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, কথাবার্তায় সহজ স্বাভাবিকতা রক্ষা করতে গিয়েও তিনি প্রত্যেকের কথাকে বড় বেশি অবান্তর কথা ও কথার ভঙ্গিতে ভরতি করে রেখেছেন। তাঁর আশ্চর্য চরিত্র-সৃষ্টি ও তাঁর আশ্চর্য লিপি-কুশলতা সত্ত্বেও এ-ত্রুটিগুলো বাধা দেয়। মনে হয়, যে কথাটি তিনি বল্‌তে চেয়েছেন তা সুস্থ, সহজ, স্নিগ্ধ আবেগময় হলেও তা একটু ফাঁপানো ও ফেনানো।

বাঙলাদেশের আর একটি অঞ্চলের পল্লী ও গৃহচিত্র হিসাবে "শতাব্দী" গ্রন্থখানা

বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সে অঞ্চলটি নিম্ন পূর্ববাংলা,—যেখানে নদীতে-বিলে জলে-মানুষে মিলে এক অদ্ভুত জীবন রচনা করে, আর যেখানকার প্রকৃতির, সমাজের, মানুষের কথা বাঙলা সাহিত্যে প্রায় নেই। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন সাহিত্যিক সমাজে সুপরিচিত হলেও শুনেছি এই তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। তিনি যে অঞ্চলকে জানেন—ফরিদপুর-বাখরগঞ্জের মধ্যবর্তী প্রসিদ্ধ কোটালিপাড়া পরগণা, যে মানুষদের জানেন, তাঁদেরই তিনি বাঙালী পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। বাঙালী পাঠক সাঁওতাল পরগণা চেনে, হিমালয় পাহাড়ও চেনে, কলকাতা, পশ্চিম বাঙলা ও রাঢ়ও চেনে, কিন্তু চেনে না এই পূর্ববাঙলাকে। বাঙালী লেখকেরাও পূর্বে তাঁদের সমাজ-চিত্রকে এমন 'অঞ্চল'নিবদ্ধ চিত্র হিসাবে দেখতে উৎসাহী ছিলেন না। তাঁদের চিত্র একটা অনির্দেশ্য শূন্যলোকে ঝুলত। সেই অনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট হত সাধারণত কলকাতা বা তার নিকটবর্তী কোনো অনির্দিষ্ট পল্লী-অঞ্চল। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর থেকে বোধহয় এ-ধারায় একটা নতুন লক্ষণ স্পষ্ট হয়, হার্ডির "ওয়েসেক্সের" কথার মত তাঁদেরও কাহিনী প্রধানত অঞ্চল বিশেষের নর-নারীর জীবন-লীলার কথা। রমেশবাবু নদী-বিলের সেই পূর্ববাঙলাকে বাঙলা সাহিত্যে প্রকাশ করলেন, এই তাঁর প্রথম কৃতিত্ব। কিন্তু এই 'আঞ্চলিক' লক্ষ্যের মতই রমেশবাবুর আর একটি প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে 'কালিক'; তা বইএর নাম থেকেই সুস্পষ্ট। একটি শতাব্দীর মধ্যে পল্লী ও শহরে বাংলায় কেমন ক'রে সম্বন্ধ নিকটতর হয়ে উঠছে; জীবনে, চিন্তায়, প্রয়াসে, কল্পনায়—ধর্মনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতি অর্থনীতির চেষ্টায় ও আদর্শে—কি একে একে পরিবর্তন এসেছে, রমেশবাবুর মূল লক্ষ্য তারও চিত্র অঙ্কন করা। এক কথায় তাঁর লক্ষ্য প্রায় এক ইতিহাস-সত্যকে প্রকাশ করা। এইটি বাঙলার আধুনিক উপন্যাসের ধারার এক প্রধান দিক; রমেশবাবু সে দিকটিতে অগ্রসর হয়েছেন। রমেশবাবু সে জন্য গ্রহণ করেছেন অবশ্য বিশেষ ক'রে একটি সার্থককীর্তি মানুষকে—সে রাজেশ্বর। রাজেশ্বর ও পরে তার পুত্র-পরিবারের মধ্য দিয়ে দেশের পবিবর্তমান সমাজ ও রাজনীতিক সত্যকে,—ব্যবসাবাণিজ্য, স্বদেশী, অসহযোগ, বিপ্লববাদ ও শেষ পর্যন্ত সাম্যবাদী চেষ্টাকেও রূপদান করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এতবড় সুবিস্তৃত প্রেক্ষাপট সাধারণত উপন্যাসে কেহ গ্রহণ করেন না। অচ্ছেদ্য কাহিনীর আকারে এ সবকে একখণ্ড উপন্যাসে রূপায়ত করাও বোধ হয় অসম্ভব। সেদিক থেকে 'শতাব্দীর' দ্বিতীয় ও তৃতীয়াংশ তাই সম্পূর্ণ তৃপ্তি দেয় না। বিশেষত, একেবারে শেষ দিকটিতে সাম্যবাদীদের অংশ একটু বিচ্ছিন্ন ও 'রোমান্টিক' বলে মনে হয়। তবু স্বদেশী থেকে সাম্যবাদ পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসের একটা ত্বরিতচিত্র এই সবের মধ্য দিয়ে লাভ করা যায়,—এই একটি কথা বলতে হবে। দ্বিতীয় কথা এই যে, পূর্ব খণ্ডে যেমন টগর, চাঁপা, পরবর্তী খণ্ডে তেমনি অমলার মত, বীরেশ্বর, নরেশ্বরের মত চরিত্র আমাদের আগ্রহকে সঞ্জীবিত ক'রে রাখে। কিন্তু এই উপন্যাসের লেখকের প্রধান কৃতিত্ব আমাদের মনে হয় তাঁর 'বিলান দেশের' ছোট্ট গ্রাম মঞ্জরীর জীবন বর্ণনায়—বিশেষত রাজেশ্বর ও তার স্বজাতীয় নমঃশূদ্রদের সুখদুঃখ, ক্রিয়াকর্ম, ভাবনা-ইতিহাসের চিত্রে। বাংলার নমঃশূদ্র সমাজ অবজ্ঞাত হতে পারেন কিন্তু দুর্বল নন; একেবারে শিক্ষাহীনও নন। তথাপি এই নিম্নস্তরের জীবনচিত্রকে—রাজেশ্বরের মত নায়ককে—আজ পর্যন্ত এভাবে কোনো

লেখক রূপদান করতে সাহসী হননি। এ স্তরের দিকে অবশ্য বাঙালী লেখকের দৃষ্টি পড়েছে ;—বাঙলা উপন্যাসের দিক্‌সীমা এভাবেও বিস্তৃত হচ্ছে। "শতাব্দীর" একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যই এটি। অবশ্য পরবর্তী অংশে যখন রাজেশ্বর সমৃদ্ধ ব্যবসায়ী, তার পুত্রেরা সুশিক্ষিত ও পদস্থ লোক হয়ে উঠেছেন, তখন আর তাদের জীবনযাত্রায় সেই বৈশিষ্ট্য বজায় থাকেনি। উপন্যাসও মধ্যবিত্তের জীবনচিত্রের ভাবনা-কামনার চিত্র হয়ে উঠেছে ; মঞ্জরীর ও নিম্নস্তরের হিন্দুর যে জীবন-কাহিনী প্রথম অংশে লক্ষ্য করছিলাম তাও তখন হারিয়ে ফেলি। সঙ্গে সঙ্গে একটা জিনিসও লক্ষ্য করি : মঞ্জরীর মানুষ দোষগুণে ভরা সুস্থ ও সহজ মানুষ। সে তুলনায় এই পরবর্তী অংশে দেখি তাদের বংশধরেরা কতকটা অপ্রকৃতিস্থ, বিক্ষুব্ধ। হয়ত সভ্যতার বিক্ষোভ তাদের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে বলেই তারা এরূপ হয় ; টগর হয় অমলা, রাজেশ্বর হয় মহেশ্বর। তবু বলব—মঞ্জরীর পল্লীচিত্র ও রাজেশ্বরের গৃহচিত্র অঙ্কনেই রমেশবাবুর কৃতিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। তা ছাড়া' তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব রচনারীতিতে। ছোট ছোট প্রত্যেকটি বাক্য সুনিবদ্ধ। আর প্রকৃতিবর্ণনায় তা যেন প্রকৃতির প্রাণবস্তুকে উজ্জ্বল ক'রে তুলে ধরে। রমেশবাবুও বাক্যালাপ রচনায় মাঝে মাঝে আঞ্চলিক উপভাষার শরণ নিয়েছেন। এইটিও বাঙলা উপন্যাসের আর একটি নতুন লক্ষণ। ক্রমেই লেখকরা সচেতন হচ্ছেন—তাঁদের সৃষ্ট চরিত্র-সত্যকে ঠিকমত প্রকাশ করতে হলে চরিত্রের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ যেমন যথার্থ হওয়া চাই তেমনি তাদের উক্ত কথাবার্তাও হওয়া চাই তাদেরই স্ব-ভাষায়, স্থানীয় উপভাষায়। কিন্তু এরও হয়ত একটা সীমা আছে। পূর্ববাংলার ফরিদপুর-ঢাকার ভাষা আমরা চালাতে পারি, কিন্তু চট্টগ্রামের উপভাষাকে কতটা এরূপভাবে সাহিত্যে স্থান দিতে পারব, তা পরীক্ষাসাপেক্ষ। রমেশবাবুর চেষ্টা অবশ্য প্রশংসনীয়, আর তিনি সীমা-লঙ্ঘনও করেন নি। শেষ কথা, সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে একটি ব্যাপক দৃষ্টি, জাগ্রত চেতনা ও সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—এই জন্যই 'শতাব্দী' পাঠককে আনন্দদান করে। লেখকের থেকে সে আরও লেখা দাবি করবে।

পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার যে চিত্র ও মানুষ বিভূতিবাবু-রমেশবাবুর উপকরণ, আশ্চর্য রকমের সরল ও সহজ তাদের প্রাণমন জীবন। একটু জটিলতা এসেছে 'শতাব্দীতে' তা দেখেছি, শহরবাসী শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের জীবনে। কিন্তু মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দর্পণে' পৌঁছে চমকিত হতে হয়—বেলে-তেজপুর (স্বর্গাদপি গরীয়সী) বা মঞ্জরী (শতাব্দী) কি ঝুমুরিয়ার মত গ্রামে পরিণত হয়েছে ? গ্রাম-ছাড়া ভাগ্যবান্ রাজেশ্বররা হয়ে উঠেছে লোকনাথ ? আর তার পুত্র মহেশ্বর হীরেন ? আর সেই টগর-অমলার জাতি হয়ে উঠেছে মমতা-রম্ভা ?

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলার প্রধানতম কথাশিল্পীদের অন্যতম। 'দর্পণ' তাঁর নতুন উপন্যাস ; 'দর্পণের' প্রথম খণ্ড মাত্র শেষ হয়েছে। মাণিকবাবুর কৃতিত্ব ও শিল্পনৈপুণ্য এতে সর্বত্র পরিস্ফুট। আমরা সবাই জানি 'পদ্মা নদীর মাঝি' থেকে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলার একালের উপন্যাসের প্রায় একটা নতুন দিক খুলে দেন। তাঁর কথাবস্তু ও ভাববস্তু দু'ইই ছিল চমকপ্রদ রকমের নতুন—অন্তত বাঙলায়। কারণ 'পদ্মা নদীর মাঝির' সঙ্গে শোলোকভের 'এণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন্'-এর কোনো যোগসূত্র ছিল বলে জানি না। বাঙলা উপন্যাসের এই নতুন কথাবস্তুটি হল ওই গ্রাম্য (বা শহরের) অবজ্ঞাত মানুষ, হয়ত

সমাজের আবর্জনার মানুষও। মাণিকবাবুর প্রধান ভাববস্তু ছিল এই আবর্জনাগত মানুষের অ-স্বাভাবিক রূপ, মানসিক বিকৃতি। তিনি দেখেছিলেন, সমাজে ও মানুষের জীবনযাত্রায় বিকৃতিই প্রধান হয়ে উঠেছে; তাতেই মানসিক গঠনেও কারো আর বিকৃতি প্রধান না হয়ে পারে না। বিভূতিবাবু বা রমেশবাবু যেখান সুস্থ সহজ মানুষকেই প্রধান বলে জানেন, মাণিকবাবু সেখানে দেখছেন অসুস্থ মানুষ ও অসুস্থ চিন্তাকেই প্রধান বলে। তাঁর উপন্যাসের ঘটনার স্থান-কাল অনেকাংশে অনির্দেশ্য। অনুমান করা যেতে পারে তা কলকাতা ও তার নিকটবর্তী পশ্চিম বাঙলার একটি গ্রাম, আর কাল হয়ত বর্তমান। তাই 'শতাব্দী' ও 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' পড়বার পরে বিস্ময় এত বেশি হয়—এই সময়ের মধ্যে বাঙালীর জীবনযাত্রায় কি এত বিকৃতি নেমে এসেছে?

মাণিকবাবুর মূল কথাবস্তু ছোট নয়—একটি পল্লীবিদ্রোহ,—অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে ও কণ্ট্রাক্‌টারের বিরুদ্ধে। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা সম্ভবত এই—বিদ্রোহ দেশের চারদিকেই ধুঁইয়ে উঠছে। কিন্তু শ্রেণীগত স্বার্থে বা বিকৃত জীবনযাত্রার ফলে কেউ তা ঠিকমত গ্রহণ করতে পারছে, কেউ পারছে না। যারা সেই বিদ্রোহের দ্বারা সব চেয়ে কম প্রভাবিত যেমন, হেরম্ব, টেঁপি-নরেশ, রামপাল, দিগম্বরী প্রভৃতি, তারাও বিকৃত চিন্তার ও কাজের কবলিত হচ্ছে আর যারা বিদ্রোহের ঘূর্ণীতে বিতাড়িত যেমন হীরেন্দ্র, মমতা, আরিফ্, তারাও বৈপ্লবিক চরিত্রশক্তির অভাবে অনেকেই শুধু বিকৃতির প্রমাণ হয়ে থাক্‌ছে। সুস্থ হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে মাত্র দু'একটি চরিত্র রম্ভা আর কৃষ্ণেন্দুর মধ্যে। তারও মধ্যে কৃষ্ণেন্দু স্বদেশী দাদার ছাঁচে ঢালা, আরও হেঁয়ালি আরও খেয়ালী। আরিফ্ ছায়া চিত্র থেকে গেছে। হয়ত সে-ই পরে হবে বিপ্লবী মানুষ, কিন্তু মমতাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। হয়ত সে তার স্বামী হীরেনের মতই খণ্ড খণ্ড হয়ে গিয়েছে। তফাৎ এই, হীরেন্ বরাবরই খণ্ডিত মানুষ; মমতা বিভ্রান্ত হলেও খণ্ডিত নয়, হয়ত আরিফের সাহচর্যে সে পুনর্গঠিত (integrated) হয়ে উঠতে পারে, যদি আরিফ্ নিজে সংগঠিত (integrated) হয়। কিন্তু মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় তেমন সংগঠিত মানুষের রূপকার নন, অন্তত সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি এতদিন সৃষ্টিতে অগ্রসর হননি। 'দর্পণের' এই প্রথম খণ্ডে একটা আভাস পাই—রম্ভাকে ও ঝুমুরিয়ার কাণ্ড দেখে যাতে মনে হয় মানুষের চিত্তবিকৃতি ও জীবনের ভগ্নাংশ বর্ণনায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি মানুষের প্রাণবান্ চেতনা ও সৃষ্টিময় প্রাণযাত্রার সন্ধান দেবেন। কিন্তু এই প্রথম খণ্ড পর্যন্ত তিনি সংকট সংঘাত, বিকৃতি ও বিদ্রোহকেই প্রাধান্য দিয়েছের, বিপ্লবকে নয়। তাঁর রচনা পদ্ধতিতেও প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর পূর্বতন নিপুণতা, মনোবিচারের বিশ্লেষণ, ভাষার অকুণ্ঠ পরুষ, এবং চরিত্রগুলোর (বিকৃতিবশে) বিচিত্র প্রকাশ। এসব গুণ কোনো কোনো সময়ে এখন দোষ হয়ে উঠ্‌ছে। যথা, মনে হয় লেখক স্বাভাবিক দৃষ্টিতে মানুষকে দেখেন না বলেই তিনি স্বাভাবিক মনোবিশ্লেষণে আস্থাহীন; তিনি ভাষায় ও কথায় অনাবশ্যক পরুষের বা অসংযমের আশ্রয় নেন পাঠককে চমকিত করবার জন্য; এবং তাঁর চরিত্রাবলী যে বিকৃতিবশে অভাবনীয় আচরণের দিকে ঝোঁকে তা নয়, তিনিই পাঠককে চমকিত করবার জন্য চরিত্রদের অভাবনীয় আচরণে স্ফুরিত করেন। এক কথায়, সন্দেহ হয়—মাণিক বাবুর শিল্প-কুশলতা একটা শিল্প-কৌশলে পরিণত হচ্ছে—আর তা হচ্ছে তখন,

যখন মাণিকবাবুর দৃষ্টিভঙ্গি একটা বৃহত্তর জীবনায়তনের সন্ধান পাচ্ছে, যেখান থেকে দেখ্‌লে মানুষকে শুধু খণ্ডিত বা বিকারগ্রস্ত বলে দেখা আর যথেষ্ট বলে মনে হয় না।

(বাঙলা উপন্যাসের যে ধারাটি 'পদ্মানদীর মাঝি' থেকে শুরু হয়েছে 'দর্পণ'ও সে ধারারই উপন্যাস। সেই ধারা আমরা সবাই জানি। মাণিকবাবুও সামান্য স্রষ্টা নন। কিন্তু 'দর্পণে' আর একটি অসামান্য ধারারও সূচনা হচ্ছে, মাত্র তার আভাসটুকুই পাই মূল কথাবস্তু থেকে, রম্ভা আর ঝুমুরিয়া গাঁয়ের বিদ্রোহ থেকে। কিন্তু বিপ্লব প্রেরণা বা বিপ্লবী জন-চেতনা 'দর্পণের' ভাববস্তু বলে স্বীকৃতি আদায় করতে এখনো পারে নি।) আর, লেখকের পূর্বতন অভ্যস্ত (যদিও উৎকৃষ্ট) রচনা-পদ্ধতির বলে হয়ত তাঁর ভাববস্তু ও কথাবস্তু দুইই আরও গুলিয়ে যায়, নতুন সৃষ্টির ও শক্তিশালী প্রতিভার অধিকারী বলেই মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই কথা বলা প্রয়োজন। আমরা অপেক্ষা করব 'দর্পণের' অপরাপর খণ্ডের জন্য।

গোপাল হালদার

কাব্যদৃষ্টি ও সমর সেনের 'তিন পুরুষ'

তিন পুরুষ—সমর সেন। সংকেত ভবন। ৩নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রিট্‌।

আধুনিক বাংলা কবিতার অনুরাগী পাঠক হিশেবে একটা প্রশ্ন বহুকাল ধ'রে আমাকে ভাবিয়েছে। প্রশ্নটি—কাব্যবস্তু সম্বন্ধে। একটা জিনিস আমরা সকলেই স্পষ্ট অনুভব করছি যে, আমাদের আধুনিক কবিদের, বিশেষ ক'রে অত্যন্ত হালে যাঁরা কলম ধরেছেন—তাঁদের, জীবনদৃষ্টি যতোই প্রগতিশীল হ'চ্ছে সত্যিকার সার্থক কবিতাও সেই অনুপাতে দেশে ক্রমশ দুর্লভ হ'য়ে উঠছে। এই স্ববিরোধী অবস্থার একটা শস্তা সমীকরণ অবশ্য বাজারে চল্‌তি। এই দলের সমালোচকদের মতে, প্রগতিশীল জীবনদর্শনের আওতায় যখন মহৎ কবিতার জন্ম হ'চ্ছে না, তখন তার জন্যে দায়ী একমাত্র কাব্যসৃষ্টির অক্ষমতাই। ফলে, অত্যন্ত সহজেই এই পরিচিত সিদ্ধান্তে এসে এঁরা পৌঁছেছেন,—বাংলাদেশে ভালো গল্পলেখক, প্রাবন্ধিক ইত্যাদির অভাব নেই, অভাব শুধু মহৎ কবির!

অত্যন্ত দুরূহ কোনো সমস্যার এমন সুলভ সমাধানে মন ভুললেও, সমস্যা শেষপর্যন্ত থেকেই যায়। সহজ ব'লেই এই রকম সমাধান মূল সমস্যাকে সব সময়ে এড়িয়ে চলে।

আসলে আমার মনে হয়েছে, এইসব সমালোচকের মূল দৃষ্টিভঙ্গিটাই গোলমেলে। নিসর্গ-সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ প্রত্যেক মানুষের স্বভাবের গভীরে, কিন্তু সব সময়ে সে আবেদন সমান কার্যকরী না হওয়াও আবার তেমনি স্বাভাবিক—মনের বিশেষ অবস্থার সঙ্গে প্রতিবেশের স্বাভাবিক সংযোগের উপরই এর নির্ভর। এখন কোনো কালাপাহাড়ী রসজ্ঞ যদি উপভোগের এই আপেক্ষিক রীতিকে অস্বীকার ক'রে তার বিশুদ্ধতাকেই চিরন্তন ব'লে দাবী করেন এবং রসগ্রহণে অসমর্থ হতভাগ্যকে সেক্‌স্‌পীরীয় সংজ্ঞার চল্‌তি অপব্যখ্যা অনুযায়ী অপরাধ-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় ব'লে গণ্য করেন তা হ'লে অন্তত বাস্তবচেতনা যে মাঠে মারা পড়ে এ-বিষয়ে নিশ্চিত। এবং এ-মনোভাব যে বাস্তবতার বিরুদ্ধে উৎকট কালাপাহাড়ী দৃষ্টিভঙ্গির ফল তা শু এই কারণেই যে, এই ধারণা অনুযায়ী

ব্যক্তিবিশেষের মন নির্জীব দর্পণ মাত্র, সক্রিয় কাব্যচেষ্টা সংজ্ঞাধীন যে নিষ্ক্রিয় মনের কাছে অকল্পনীয়।

সত্যিই, আজকের সমাজজীবনে কাব্যরচনার উপাদান তো যথেষ্টই, অথচ তা সংহত সার্থক কাব্যবস্তুতে রূপান্তরিত হ'চ্ছে না কেন ?—অনেকসময় মনে হয়েছে, খাঁটি দার্শনিকতার সঙ্গে কবিতার মেজাজের একটা মৌল পার্থক্য থেকেই বোধহয় এই সংকটের উদ্ভব। পরে আবার মনে হয়েছে, কিন্তু কোনো কবির মনে বিশুদ্ধ তত্ত্বকথা (রাজনীতির ভাষায়—শ্লোগান) যদি দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার রসে জারিত হ'য়ে একেবারে জীবন্ত হ'য়ে ওঠে তবে খাঁটি কাব্যবস্তু হ'তেই বা তার বাধা কি ?

অন্যপক্ষে বুদ্ধদেব বসু-প্রমুখ সাহিত্যিকরা সমস্যাটিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। কাব্য ও দর্শনের মৌল বিরোধের সমীকরণ (অর্থাৎ সমষ্টি ও ব্যক্তি-চেতনার একাত্মতাসাধন) তাঁদের মতে অসম্ভব, তাই এই উনিশশো পঁয়তাল্লিশেও তাঁরা সাহিত্যিক ছুৎমার্গে আশ্চর্য-রকম আস্থা রাখেন এবং মনে করেন, যে-কোনো রকম কবিতা ('একটু সুর, একটু হৃৎস্পন্দনের' কবিতাও হ'তে পারে) লিখেই তাঁরা গুরুতর সামাজিক দায় পালন করছেন। কিংবা অনেক সময় এই সমস্যার একটা কৃত্রিম সমীকরণের চেষ্টাও তাঁরা করেন, যখন সক্রিয় 'কর্মলোক' (দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ক্ষেত্র)-কে সচেতনভাবে এড়িয়ে তাঁরা 'রাজনীতির যে প্রেরণা ভাবলোকের' সেই বিশুদ্ধ 'প্রেরণা'য় কবিতা লিখতে রাজি হন।

এক্ষেত্রে মুশকিল এই যে, রাজনীতির 'ভাবলোকের' বিশুদ্ধ 'প্রেরণা' কাব্যচেষ্টারও প্রেরণা মাত্র— কিন্তু তার বেশি আর কিছু নয়! এই বিশুদ্ধ প্রেরণার ভিত্তিতে যদি দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বাস্তব ক্ষেত্রটি না থাকে বা ক্রমশ না গড়ে ওঠে, তবে একদিন সেই ছিন্নমূল প্রেরণা তার আকাশবাসরের বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে গিয়েই অকালে প্রাণ হারাবে। এ-প্রসঙ্গে সমর সেনের ব্যক্তিগত সাহিত্যিক ইতিহাসও বিশেষভাবে স্মরণীয়। সমরবাবু একজন শক্তিমান আধুনিক কবি এবং তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ, ১৯৪০-এ প্রকাশিত 'গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা'র রচনাকাল থেকে 'রাজনীতির' (মার্ক্সীয় রাজনীতির) এই 'ভাবলোকের' (মূল দার্শনিক মতবাদের এবং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বহুমুখী ব্যাখ্যার) 'প্রেরণা'য় আস্থাও তাঁর অকৃত্রিম, অথচ ১৯৪৪-এ প্রকাশিত তাঁর আধুনিকতম কবিতার বই 'তিন পুরুষ' পড়তে গিয়ে এই কথাটাই বারবার মনে হ'লো যে, 'রাজনীতির' 'ভাবলোকের' বিশুদ্ধ 'প্রেরণা' গত চার-পাঁচ বছরে কবির ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে সমষ্টিচেতনার সমীকরণের কাজে তাঁকে একতিলও অগ্রসর হ'তে সাহায্য করেনি!

ফলে 'তিন পুরুষ' পড়তে পড়তে আমার সেই মূল প্রশ্নের জবাব আমি নিজের মনেই খুঁজে পেলুম। মনে হ'লো দার্শনিক তত্ত্ব ও বিশুদ্ধ কাব্যবস্তুর মধ্যে বিচ্ছেদ প্রকাণ্ড কিন্তু সেই বিচ্ছেদে সেতু বাঁধার দুরূহ কাজটিই আবার আজকের সার্থক কবির। এবং এই কাব্যচেষ্টা 'রাজনীতির' 'ভাবলোকের' 'প্রেরণা'র আস্থায় মাত্র নয়, এটি একটি রাজনৈতিক কর্মসূচীর অনুসরণেই সক্রিয়।

আর বাংলা কবিতার আসল গলদ এইখানেই। ইংরেজ লেখক জ্যাক লিণ্ডসে তাঁর সংক্ষিপ্ত কিন্তু মূল্যবান কাব্য-আলোচনাগ্রন্থ 'Perspective for poetry'তেও আধুনিক ইংরেজি কাব্যপ্রকৃতির বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে তার এই মৌল নিষ্ক্রিয়তা-বোধ বা 'Flaw of

passivity'র উপর খুব বেশি জোর দিয়েছেন, দেখলুম। আমার ধারণা, সমরবাবুর এবং আমাদের আধুনিক অন্যান্য কবির কাব্যচেতনার মূলে আসলে লিণ্ড্‌সে-বর্ণিত এই 'Flaw of passivity'ই গভীরভাবে কাজ করছে।

এই শেষোক্ত লেখক তাঁর বইটিতে বারবার এমন একটি সক্রিয় কাব্যচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন—শ্রেণীসমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রয়োগক্ষেত্রে সমসাময়িক প্রগতি-শীল শ্রেণীর সঙ্গে কবির ব্যক্তিস্বরূপের একাত্মতা উপলব্ধির পদ্ধতির যা অঙ্গাঙ্গী। কিন্তু এ কথাও এ-প্রসঙ্গে অবশ্য স্বীকার্য যে, কবির ব্যক্তিস্বরূপের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সেই ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে শ্রেণীসমাজের অনবরত বিরোধ একাত্মতা উপলব্ধির এই পদ্ধতিকে সর্বদাই সংকটসংকুল ক'রে রাখে। সংকটের এই আবর্তে তাই কবির পক্ষে শেষপর্যন্ত দুটি পথ খোলা: হয় তিনি এই সংঘাতের মধ্যেই নতুন সংহতির ভিত্‌ রচনা ক'রে সামাজিক অগ্রগতিকে রক্তমাংসে সঞ্জীবিত ক'রে তুল্‌বেন, আর তা না হ'লে, অন্ধ ঘূর্ণিপাকের জটিলতায় তিনি তলিয়ে যাবেন এবং হয়তো শেষকালে পালিয়ে বাঁচ্‌বেন কিংবা হার মেনে কবিতা লেখাই ছেড়ে দেবেন। এবং প্রায়ই দেখা যায় যে, ঠিক এই কারণেই—এই রাহুময় আত্মজিজ্ঞাসার হাত এড়াতেই—কবিরা 'হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ'-এর পলায়নী পদ্ধতি অনুযায়ী বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের নিরাপদ আশ্রয়ে নীড় বাঁধেন।

আধুনিক বাংলাদেশের কাব্যপ্রকৃতির নিষ্ক্রিয়তা-বোধের মূল উৎস এইখানে। এবং এই কারণেই সমর সেন ও অন্যান্য আধুনিক কবি থিয়োরীর ক্ষেত্রে বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে একমত না হ'লেও কার্যত এঁরা 'রাজনীতির' এই 'ভাবলোকের'ই ব্যাপারী। সমাজ-জীবনের উন্নততর পরিবর্তনে তাই বিশ্বাস রেখেও ব্যক্তিগত জীবনে সেই পরিবর্তনের সক্রিয় চেষ্টায় একাত্মতা-বোধের অভাবে এঁদের কাব্যচেষ্টার করুণ পরিণতি অবশেষে অত্যন্ত ব্যক্তিগত, স্বল্পপ্রাণ 'আশা' 'ভরসা'র প্রতিচ্ছবিতে:

> "একটি একেলা বট খাপছাড়া ছায়া দেয়,
> প্রায় পত্রহীন সে প্রৌঢ় বট, বহুদিন মাখেনি সবুজ কলপ
> কিন্তু তার শিকড়েরা ঊর্দ্ধমুখ, আকাশ সন্ধানে।"

(তিনপুরুষ: জোয়ার ভাঁটা)

'তিন পুরুষ'-এর কবি এইরকম ছিন্নমূল প্রাণের উৎকেন্দ্রে নিঃসঙ্গ, একক—গতপত্র, আকাশসন্ধানী 'বট'ই দারুণ দুর্দিনে তাঁর কাছে জীবনের একমাত্র প্রতীক। তাই শেষ-পর্যন্ত মিলিত অগ্রগতিতে আস্থা রেখেও কার্যকালে স্বাতন্ত্র্যের দৃঢ়দুর্গ থেকে এই কবি বলছেন:

> "আশা রাখি একদিন এ-কান্তার পার হয়ে পাবো
> লোকের বসতি, হরিৎ প্রান্তরে শ্যামবর্ণ মানুষের
> গ্রাম্যগানে গোধূলিতে মেঠো পথ ভরে......"

(২২শে জুন, ১৯৪৪)

অর্থাৎ সেই একাত্মতা-বোধের অভাব আর নিষ্ক্রিয়তা; নিষ্ক্রিয়তা আর উগ্রতর স্বাতন্ত্র্য! এবং আমাদের আলোচ্য বইটিতে কাব্যপ্রকৃতির এই মৌল নিষ্ক্রিয়তা-বোধ দু'দিকে দু'টি বিশেষ লক্ষণে পরিস্ফুট। একদিকে, যেখানে কবি ইতিহাসের ব্যাপক পটভূমিতে সমাজ-বিবর্তনের ধারাবাহিকতা দেখাবার চেষ্টা করেছেন, জোড়া-দেওয়া খণ্ডচিত্রে সেখানে তা

সিনারিয়ো-ধর্মী হ'য়ে উঠেছে—জীবন হ'য়ে উঠেছে সেখানে জীবনের abstraction! এর প্রমাণ এ-বইটির 'কালের যাত্রা' কবিতাটি। এখানে তিনটি বিচ্ছিন্ন কালের পট-ভূমিতে তিনটি টাইপ্ চরিত্র-চিত্র এঁকে এবং সেই তিনটি চরিত্রের মধ্যে মোটামুটি একটা রক্তসম্বন্ধের যোগসূত্র টেনে তাঁর স্ব-কৃত জীবনচিত্রের বিচ্ছিন্নতার মধ্যে ক্রমিক ধারা-বাহিকতা দেখাবার যে-চেষ্টা সমরবাবু করেছেন তার কৃত্রিমতা অত্যন্ত প্রকট। কারণ, পরপর তিনটি ঐতিহাসিক যুগের সম্বন্ধ পরস্পরবিচ্ছিন্নতায় নয়, পরস্পরনির্ভরে। বরং এই সম্বন্ধের সূত্র আরো গভীরে। সামন্তসমাজ শুধু ধনতন্ত্রেব জন্মের অনুকূল অবস্থাই সৃষ্টি করেনি, সেই সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়েই বুর্জোয়া বণিকশ্রেণী নতুন সমাজগঠনের শক্তি অর্জন করেছে, ঠিক যেমন ধনতন্ত্রের বর্দ্ধিষ্ণু উৎপাদন-শক্তি ও তার যন্ত্রশিল্পের প্রসার-সম্ভাবনা সমাজতন্ত্রের জন্মের উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে, আর তার অন্তর্বিরোধে—সংগঠিত শ্রমিক-কৃষকের চেতনায় সমাজতন্ত্রের জন্মরহস্য। তাই বিবর্তনশীল কালের পটভূমিতে কতকগুলি টাইপ্ চরিত্রকে বিশেষ বিশেষ কালের প্রতিভূ হিশেবে দেখাতে হ'লে শুধু তাদের মধ্যে সময়ের বিশেষ লক্ষণগুলি ফুটিয়ে তুললেই কবির কাজ শেষ হয় না—সেই লক্ষণগুলির বিরুদ্ধে তাদের সচেতন কিংবা অবচেতন প্রতিরোধস্পৃহাও স্পষ্টভাবে দেখানো দরকার, তা না হ'লে জীবন্ত চরিত্রগুলোকে আসলে সময়ের নির্জীব প্রতিফলন ব'লে মনে হয়। এবং সমরবাবু তাঁর আলোচ্য কবিতাটিতে স্বভাবতই এ-বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক না হওয়ায় উল্লিখিত তিনটি বিভিন্ন সময়ের মধ্যেকার জীবন্ত যোগসূত্রটিও অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ছিঁড়ে গেছে।

আবার অন্যদিকে, নিষ্ক্রিয়তাবোধ থেকে উদ্ভূত এই খণ্ডিত কাব্যদৃষ্টিই সমরবাবুর কবিমনের রসবিচারের সম্মুখীন: সেখানে আত্মসমালোচনায় তিনি দুর্বার, কঠিন। কোনো কোনো কবিতায় (গৃহস্থবিলাপ, সাফাই, ২২শে জুন ১৯৪৪ প্রভৃতি) তাঁর এই আত্মসমালোচনার প্রবৃত্তি স্পষ্ট রূপ নিয়েছে উগ্র বামপন্থী মনোবিকারে। এবং এই সমস্ত কবিতায় মৌল নিষ্ক্রিয়তা-বোধ থেকে উদ্ভূত খণ্ডিত কাব্যদৃষ্টির সমালোচনা-প্রসঙ্গে উগ্র বামপন্থী ভাববাদের কুয়াশা সৃষ্টি ক'রে তিনি আরো বেশি প্রমাণ করলেন—এই নিষ্ক্রিয়তা তাঁর কাব্যসত্তায় কতো দৃঢ়মূল!

প্রথমে 'গৃহস্থবিলাপ' কবিতাটি ধরা যাক। গত মন্বন্তরের উপর এটি সমরবাবুর অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবিতা। এখানে মন্বন্তরে ইতিহাসের যে-অভিব্যক্তি তিনি দেখেছেন তা অনেকটা গ্রীক ট্রাজেডির মতো অমোঘ, অবশ্যম্ভাবী। তাই যদিও…'দেশের দুর্যোগে কী উপায়ে কাঁচা টাকা ভাঁড়ু দত্ত করে' সে-সম্বন্ধে তিনি অবহিত তবু দুর্যোগের নৈর্ব্যক্তিক অবশ্যম্ভাব্যতা তাঁর রচনায় এত স্পষ্ট যে তাঁর ব্যঙ্গে বিদ্রূপে—

"যে যাদুতে কাগজ-হকার
গিয়েছে একদা লাটের মন্ত্রণাগার,
সে যাদুতে আমরা বঞ্চিত…"

—ইত্যাদি লাইনে একটা অস্পষ্ট আত্মকরুণার সুর কানকে ফাঁকি দিতে পারে না। তবু শেষপর্যন্ত যেহেতু 'বড়লোকে আস্থা নেই আর,' তাই মন্বন্তরের পরবর্তী সময়ে তাঁর সিদ্ধান্ত এইরকম:

"অকাল মরণ শেষে এ-কাল সময়ে!
তোমাকে জানাই বন্ধু :
পথে বাধা পর্বত আকার,
ঘুনধরা আমাদের হাড়,
শ্রেণীত্যাগে তবু কিছু
আশা আছে বাঁচবার।

আশ্চর্য এই যে, মন্বন্তর যাঁর কাব্যে কালের আমোঘ প্রকোপ—অনেকটা দৈবদুর্বিপাকের মতো, সামাজিক ভাঙন যাঁর কাছে এক অপ্রতিরোধ্য বিভীষিকার সামিল অবশেষে তিনিও একেবারে 'শ্রেণীত্যাগে' বাঁচবার উপায় সন্ধানে ব্যস্ত! কিন্তু 'শ্রেণীত্যাগ' তো জীর্ণ কাপড় পরিত্যাগের মতো কোনো একটি বিশেষ কাজ নয়, সেটি একটি আয়াসসাধ্য কর্মপদ্ধতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। যুগসঞ্চিত শ্রেণী-সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পিছনে দীর্ঘকালের যে সক্রিয় ইতিহাস আছে—সমসাময়িক অগ্রসর সামাজিক কালের সঙ্গে ব্যক্তিচেতনার একাত্মতা উপলব্ধির পদ্ধতির যা অনুষঙ্গী—সমরবাবুর বর্ণিত এই মন্বন্তর ও মারীগ্রস্ত ভগ্নমন মধ্যবিত্ত-জীবনে তার স্বীকৃতি কোথায়? অথচ আসলে গত কয়েক বছরের বাংলাদেশে সে ইতিহাস দুর্লভ ছিলো না। অব্যবস্থিত সাম্রাজ্যবাদের আওতায় অমোঘ আর্থিক বিপর্যয়কে মেনে নিয়েও উনিশশো বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশের বাংলাদেশের বিশেষ অবস্থায় যে-জনসাধারণ আম্‌লাতন্ত্রের অবাধ-বাণিজ্য নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েছে, তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশে আম্‌লাতান্ত্রিক দুর্নীতি ও মজুতদারের চোরাবাজারের বিরুদ্ধে সমস্বার্থে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গণসংহতির ভিত্‌ যারা রচনা করেছে—মন্বন্তর একমাত্র তাদের কাছেই দৈবদুর্বিপাক নয়, সামাজিক ভাঙনও তাদের কাছে অপ্রতিরোধ্য নয়, অবসিত সমাজের পুনর্গঠনের দায় তাই তাদেরই দৈনন্দিন কর্মতালিকার অঙ্গ। প্রবল ধ্বংসশক্তির বিরুদ্ধে এই সক্রিয় সচেতন প্রতিরোধবৃত্তি সংখ্যাশক্তিতে হয়তো অকিঞ্চিৎকর, তবু এই সক্রিয় সংঘর্ষই সমসাময়িক বাংলাদেশের একমাত্র ইতিহাস এবং এই ইতিহাসই আমাদের শ্রেণী-চেতনাকে তীব্রতর করতে সমর্থ। একে অস্বীকার ক'রে শ্রেণীচেতনার কথা চিন্তা করা খানিকটা কাব্যিক ইচ্ছাপূরণ মাত্র।

এবং সমরবাবুর এই উগ্র বিভ্রান্তির পরিণতি ঘটেছে অবশেষে আত্মগ্লানিতে—সাফাই, ২২শে জুন ১৯৪৪ প্রভৃতি কবিতায়—যেখানে আত্মসমালোচনাচ্ছলে তিনি সমসাময়িক অন্যান্য তথাকথিত 'মার্ক্সিস্ট' কবিদেরও বিদ্রূপ করেছেন। বলা বাহুল্য, আমার আপত্তি তাঁর বিদ্রূপে নয়; এ-উল্লেখ তাঁর লক্ষ্যভ্রষ্টতার আর একটি দৃষ্টান্ত মাত্র :

"কিন্তু জড়বাদী সুবুদ্ধির জোরে আজ আমি
দু-নৌকায় স্বচ্ছন্দে পা দিয়ে চলি,
বুর্জোয়া মাখন আর মজুরের ক্ষীর
ভাগ্যবান এ-কবিকে বিপুলা যশোদা
নিশ্চয় দেবেন ব'লে আমার বিশ্বাস"

(সাফাই)

এখানে তাঁর বক্তব্য অবশ্য খুব স্পষ্ট হয়নি। তবু আমার মনে হয়েছে, হয়তো

সমরবাবু 'মার্ক্সিস্ট' কবিদের সততার অভাবকেও বড়ো ক'রে দেখাতে প্রয়াস পেয়েছেন, শুধু মাত্র এইসব কবির মনে সক্রিয় শ্রেণী-চেতনার অভাবের কথাটাই এখানে তাঁর বিশেষ বক্তব্য নয়। কিন্তু আমার অনুমান সত্যি হ'লে বলতে হয় এক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত নির্ভুল হয়নি। কারণ, প্রথমত শ্রেণী-চেতনা তো কারো জন্মগত অধিকার নয়, এটি একটি ঘনিষ্ঠ বাস্তব চেতনা অর্জনের বিলম্বিত পদ্ধতির পরিণতি। এবং এই সঙ্গে এ-কথাও ভুললে চলবে না যে, এই শ্রেণী-সমাজে কবিরা, এমন কি তথাকথিত 'মার্ক্সিস্ট' কবিরাও সাধারণত মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আসেন। এবং এই নয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামাজিক অবস্থানটাও বেশ কিছুটা গোলমেলে: উৎপাদনরীতির বিশুদ্ধ আর্থিকক্ষেত্রে এর স্বার্থসঞ্জাত ঘনিষ্ঠতা ক্রমশই প্রোলেটারিয়েটের অভিমুখী অথচ শিক্ষাদীক্ষায় ও সামাজিক সংস্কারে এখনো এর আত্মিক যোগাযোগ বুর্জোয়ার সঙ্গেই। ফলে কোনো বিশিষ্ট শ্রেণীগত চারিত্র্য এর নেই; তাই এই শ্রেণী থেকে যে কবি আসেন—মার্ক্সীয় জীবনদর্শনে চরম আস্থা কিংবা মন্বন্তর-মড়কের প্রত্যক্ষ বিভীষিকাই তাঁর মধ্যে রাতারাতি শ্রেণী-চেতনার সঞ্চার করতে পারে না।

আসলে এই চেতনা অর্জনের জন্যে দীর্ঘদিনের সংগ্রামের অবকাশ আছে। ধ্বংসের মুখোমুখী জীবনসংগ্রামে কবির সক্রিয় সহযোগিতার সাফল্য এবং তার ফলে গণশক্তির ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু দৃঢ়মূল সংহতিই কালক্রমে এই চেতনাকে পুষ্ট করবে। তাই এ-প্রসঙ্গে কবির ব্যক্তিগত সততার কোনো প্রশ্নই ওঠেনা।

বলা বাহুল্য, বাস্তব পরিবেশের প্রশ্রয়ী আপেক্ষিক এই শ্রেণীচেতনা মূলত নিশ্চয়ই কবির ব্যক্তিগত সক্রিয় চেষ্টার ফল; তা না হ'লে যে-কোনো কাব্যবিচারই অসম্ভব হ'ত। এখানে আমি শুধু শ্রেণী-সমাজের বিশেষ অবস্থায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীসম্ভূত লেখকের বিশেষ অসুবিধের কথাটাই উল্লেখ করেছি মাত্র। কিন্তু যদি কেউ এর ফলে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হ'য়ে সমরবাবুর কবিতা-আলোচনাকেও নিষ্প্রয়োজন মনে করেন তো তাঁকে আমি সক্রিয় কাব্যচেষ্টার দোহাই দিয়েই বল্‌বো যে, সার্থক কাব্যরচনা সমরবাবুর সাধ্য ব'লেই তাঁর কাছে এখনো আমাদের অনেক প্রত্যাশা! এবং যদিও দু'টি বিপরীত শক্তির সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে জীবনের অখণ্ড রূপটি তাঁর কাব্যসত্তায় রক্তমাংসে সঞ্জীবিত হ'য়ে ওঠেনি তবু জীবনের অনুষঙ্গী এই অন্তর্দ্বন্দ্ব কোনোদিনই সমরবাবুর চোখ এড়ায়নি। বিশেষ ক'রে, এই শ্রেণীসমাজের অন্তর্দ্বন্দ্বের পাকচক্রে ব্যর্থ মধ্যবিত্ত ব্যক্তিমানসের হাস্যকর অসঙ্গতি আর তার ক্লান্তিকর আবহাওয়া যেখানে তাঁর পয়ারধর্মী গদ্যরচনার সহজাত স্বধর্মী, সেখানে তাঁর জীবনদৃষ্টি আশ্চর্যরকম অভ্রান্ত। কিন্তু যেহেতু শুধুমাত্র সংঘর্ষই নয়, সংগ্রাম-পরবর্তী জীবনের উজ্জীবনও সমসাময়িক বাস্তবের অঙ্গীভূত এবং যেহেতু সমরবাবু এই পরবর্তী জীবনের দিকে পিঠ না ফেরালেও মৌল নিষ্ক্রিয়তা-বোধের অবশ্যম্ভাব্যতায় অন্তত সে ক্ষেত্রে তিনি বিশুদ্ধ ভাববাদী শেষপর্যন্ত তাই আমরা 'গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা' থেকে 'তিন পুরুষ' পর্যন্ত সেই একই ত্রুটির পুনরাবর্তন লক্ষ্য করি, যে ত্রুটিতে কাব্যচেষ্টার আন্তরিকতা সত্ত্বেও শেষ-পর্যন্ত তাঁর জীবনদৃষ্টি শোচনীয়রকম খণ্ডিত।

'তিন পুরুষ'-এর রচনারীতিতেও কোথাও কোথাও এই খণ্ডিত জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন সুস্পষ্ট। অবশ্য এ বইটির অনেকগুলি কবিতায়, কোথাও পুরোপুরি কোথাও বা অংশত,

যেখানে তিনি পয়ারের পদের সঙ্গে একেবারে হাল্ আমলের অত্যন্ত দ্রুত শব্দ কিংবা বাক্যাংশকে মিশিয়েছেন :

বছর পঁচিশ হল পৃথিবীতে বাসা।
কেরাণী সন্তান আমি, চতুর মানুষ
কৈশোরে শুনেছি নানা মজাদার কথা,
কেরামৎ! এরি মধ্যে করতলগত
কত ছলা…। (অকাল)

এবং কোথাও বা মেশাতে গিয়ে ইচ্ছাকৃত নিয়মভঙ্গকে মাঝে মাঝে প্রশ্রয় দিয়েছেন, যেমন :

"ঘৃণ্য শূদ্র যত শত হস্ত দূরে রেখে
গৌরবে পড়েছি গীতা শ্রীমদ্ভাগবত,
দুর্দান্ত যবনকালে ধরেছি উপনিষদ।
ভাগ্যক্রমে ইংরাজ এলো, স্বাগতম!" (বাবু বৃত্তান্ত)

এমন কি যেখানে একটি কবিতায় (স্তোত্র) তিনি প্রবহমান পয়ারেরও পূর্ববর্তী যুগের আড়ষ্ট যৌগিক ছন্দকে পুরোপুরি গ্রহণ করেছেন :

"আদিদেব একা সাজে পুরুষ প্রকৃতি।
মহাজন চাষী তিনি সবাকার গতি॥
কৃষ্ণকালো বড়ো মেঘ জুড়েছে আকাশ।
শ্যামবর্ণ মূর্তি তার চাষীর আশ্বাস।
ধান দেখে মহাজন বলেছে সাবাস॥"

সেখানে আমার মনে হয়েছে, এই পদ্ধতিতে বর্তমান জীবনের গ্লানি ও অসঙ্গতিকে রূপ দেবার চেষ্টা ক'রে তিনি সফলও হয়েছেন এবং এই সাফল্য অর্জনে কয়েক জায়গায় রীতিমত শক্তিরও পরিচয় দিয়েছেন। এঁর কারণ অবশ্য এ-পর্যন্তও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবানুগ। আজকের সমাজে সৃষ্টিক্ষমতার দানবশক্তিকে উৎপাদনরীতির প্রাচীন কাঠামোয় বেঁধে রাখার হাস্যকর অথচ অত্যন্ত স্থূল বাস্তব চেষ্টার ফলে যে সামাজিক সংঘর্ষের উৎপত্তি ও প্রসার সমরবাবুর কবিতার এই সমস্ত অংশ সেই সংঘর্ষেরই অবিকৃত প্রতিচ্ছায়া। এই সব লাইন আমাদের হাসায় আবার চেতনাকেও উত্তেজিত করে।

এমন কি, এক এক সময় যখন তিনি প্রাচীন পয়ারের এই পঙ্‌ক্তিতে এমন সব বাক্যাংশ যোজনা করেন, যেগুলি হুবহু ইংরেজির তর্জমা ব'লে মনে হয়, যেমন :

"বিষণ্ণ বাড়ীতে, নিরানন্দ যে যুবক
দিন আনে দিন খায়, সহধর্মিনীকে,
কুড়িতে বুড়ী সে, তাই বাপান্ত করে," (কালের যাত্রা)

তখন তা-ও যেন সব সময়ে কানে লাগে না, আমাদের জীবনযাত্রার অসঙ্গতির সঙ্গে বলার ধরন যেন এখানে চমৎকার খাপ খেয়ে যায়।

কিন্তু বক্তব্য আর এই প্রকাশরীতির অসঙ্গতি সেখানেই স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে যেখানেই সমরবাবু অনাগত সামাজিক সম্ভাবনাকে তাঁর কাব্যবস্তুর মধ্যে পরিপাক করবার চেষ্টা করেছেন। ফলে, এখানে এসে তাঁর কাব্যদৃষ্টি জীবনদৃষ্টির বিশুষ্ক abstraction-এই পর্যবসিত

হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। ভারতচন্দ্রের পয়ারের যৌগিক-ছন্দের সঙ্গে চল্‌তি বাক্‌ভঙ্গির বিচিত্র ধ্বনিবিন্যাসের সমন্বয় ঘটিয়ে জীবনের জটিল অসঙ্গতিকে রূপ দেবার চেষ্টা সমরবাবুর আগেও চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়-প্রমুখ কবিরা করেছেন এবং তাঁরাও এ-বিষয়ে কমবেশি সফলও হয়েছেন এবং জীবন যেহেতু এখনো অসঙ্গতিতে পূর্ণ আমাদের কবিতায় ছন্দের এই অভিনব প্রয়োগপদ্ধতির সম্ভাবনাও তাই এখনো নিঃশেষ হয়নি; কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাছন্দের বিবর্তনের স্বাভাবিক ইতিহাসটিকেও মনে রাখতে হবে এবং ভুল্‌লে চলবে না যে, বলিষ্ঠ ভাব-প্রকাশের বাহন আজকের উপযোগী যে বলিষ্ঠ ভাষা—বাংলা পয়ারের সুবিদিত আতিথেয়তাকে সুদশুদ্ধ উশুল ক'রেও তার বাঁধাধরা চোদ্দমাত্রার এই সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ কাঠামোয় সে ভাষার নাটকীয় বিকাশ ও বিস্তারের সম্ভাবনাও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সমরবাবু নিজেই এর আগে বরাবর 'মানসী'র 'নিষ্ফল কামনা'র পরবর্তী যুগের ভাঙা-পঙ্‌ক্তির পয়ারের ছন্দকে (মুক্তক ছন্দকে) তাঁর রচনা-রীতির ভিত্তি হিশেবে মেনে নিয়েই তাঁর পয়াররচনাকে সার্থক গদ্যরূপ দিয়েছেন। অতএব আমার বক্তব্যের সত্যতা ইতিপূর্বেই প্রমাণিত।

'তিন পুরুষ'-এ এই উপরোক্ত ত্রুটি অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে 'কালের যাত্রা' কবিতাটির কয়েকটি লাইনে, যেখানে সমরবাবু আগামী কালের অগ্রদূতের কাহিনী বর্ণনা করছেন:

> "অন্যযুবা, ছন্নমতি কালের সম্বল!
> প্রায় পথের ভিখিরী, চালচুলোহীন,
> অতীত সঞ্চিত গ্লানি খর অসঙ্কোচে
> সে মুছবে…"

এখানে 'প্রায় পথের ভিখিরী, চালচুলোহীন' বাক্যাংশটি পয়ারের প্রায়-অসীম সহিষ্ণুতার সীমাও যেন লঙ্ঘন করেছে! বক্তব্যের Contrast-সৃষ্টিতে সাহায্য করতে গিয়ে এ-লাইনটি বরং সমস্ত স্তবকটির উপযোগী গাম্ভীর্যকেই নষ্ট ক'রে দিয়েছে। অথচ এটা বোঝা খুবই সহজ যে, আসলে এই একটি জোরালো বাক্যাংশ শুধুমাত্র নিয়মিত চোদ্দমাত্রার ছন্দের কবলিত হয়েই এখানে তার সমস্ত ব্যঞ্জনা হারিয়েছে।

অন্যত্র, যেখানে তিনি যথারীতি ভাঙা-পঙ্‌ক্তির যৌগিকছন্দের স্মরণ নিয়েছেন সেখানে তাঁর বক্তব্য ও প্রকাশরীতির সমন্বয় কিন্তু সুস্পষ্ট:

> "সরায় ময়লা, দুধ দেয় যে গয়লা,
> তাদের মিতালি খুঁজি।"
>
> (গৃহস্থবিলাপ)

কিংবা এই সমস্ত পঙ্‌ক্তিতেও:

> "তবু তারা কালের সারথি,
> তাদের দোস্তি, তাদের গতি
> আমার পরমা যতি।"
>
> (ঐ)

বলা বাহুল্য, বক্তব্যের অন্তর্দ্বন্দ্বের জীবন্ত প্রকাশ এবং শেষপর্যন্ত সেই দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য-

বিধানেই কবিকর্মের সার্থকতার নির্ভর। আর এ-সমস্যা আজকের প্রত্যেক সক্ষম কবির। এবং সমরবাবুর সাম্‌নেও আজ এই মৌল প্রশ্ন : কাব্যবস্তুর অন্তর্বিরোধের গোলকধাঁধাঁয় তিনি জীবনের এই ক্রমিক ধারাবাহিকতার যোগসূত্রটি খুঁজে পাবেন, না মাত্র কয়েকটি আশ্চর্য কাব্যিক মুহূর্তের, কয়েকটি উজ্জ্বল expression-এর কবিরূপেই তাঁর দুর্লভ কবিত্বের পরিসমাপ্তি ঘট্‌বে ?

আজকাল তিনি ক্রমশই কম লিখছেন দেখে আমরা রীতিমত শঙ্কিত।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

Soviet Art and Artists—by Jack Chen; The Pilot Press, London, 5/ net.

জ্যাক চেন জাতিতে চীনা। বর্ত্তমানে তিনি ইংলণ্ডে বাস করেন। কার্টুনিস্ট হিসাবে ও নানা অভিনব পদ্ধতির ছবি আঁকিয়া তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। রুশ বলশেভিকের সহিত তিনি প্রথম সংস্পর্শে আসেন ১৯২৬ সালে চীন দেশে। সুন-ইয়াৎ-সেন-এর রুশ উপদেষ্টা মাইকেল বোরোডিন্‌কে বলা হইত "চীনা বিপ্লবের গোপন শক্তি।" তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাতেই সোভিয়েট ইউনিয়ন ও তাহার সংস্কৃতি সম্বন্ধে নানা আলোচনা হইল। ১৯২৭ সালের শরৎকালে জ্যাক চেন মস্কোতে পৌছান ও দশবৎসরের অধিককাল সোভিয়েট রাষ্ট্রে অতিবাহিত করেন। তাঁহার এই অভিজ্ঞতার ফল, বিশেষ করিয়া চিত্রবিদ্যা ও চিত্রকরগণের সম্বন্ধে, এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অনেকগুলি চিত্রের প্রতিলিপি সংযোজিত করিয়া গ্রন্থকার আপন বক্তব্যকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টায় ত্রুটি করেন নাই।

চিত্র-চর্চ্চা সোভিয়েট রাষ্ট্রে ব্যক্তি বা গোষ্ঠিবিশেষের খেয়ালী আত্মপ্রকাশ বা চিত্ত-বিনোদনের উপায় নহে। নূতন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব লইয়াছে যে রাষ্ট্র, ইহা তাহার বহুমুখী প্রচেষ্টার অন্যতম। এখানে আর্টিস্ট একজন উদ্ভট ব্যক্তি বা ভাড়াটিয়া লোকরঞ্জক নহে। সে হইতেছে "সমাজ-মনের স্থপতি", সুমার্জ্জিত আনন্দ-উপভোগের প্রধান সামাজিক উৎস। ব্যক্তিত্ববিকাশের অজুহাতে অন্যান্যদেশে আর্ট-প্রচেষ্টায় জনসাধারণকে বর্জ্জন করিবার যে মনোভাব দেখা যায়, সোভিয়েট রাষ্ট্রে তাহার আদব নাই। লেনিনের মতে, "আর্ট জনসাধারণের সামগ্রী, তাহার মূল যেন জনসাধারণের মর্ম্মে গভীরভাবে প্রবেশ করে। আর্ট এই জনসাধারণের বোধগম্য হওয়া চাই ও তাহাদের প্রিয় হওয়া চাই। তাহাদের গভীর আবেগ, চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তিকে সংহত করা, উদ্বুদ্ধ করা, ইহাই হইল আর্টের কাজ।"

এই নীতির অনুসরণের ফলে আজ সোভিয়েট দেশে উচ্চতম থিয়েটার, অপেরা, মিউজিয়ম, চিত্রশালা প্রভৃতির দ্বার জনসাধারণের নিকট সর্ব্বদাই উন্মুক্ত, যেখানে আগে অভিজাত বংশের দুলালগণ ছাড়া অন্য কাহারো প্রবেশাধিকার দুর্লভ ছিল।

প্রশ্ন উঠিবে, এই সুযোগ দিলেই কি জনসাধারণ বৃহত্তম শিল্পসৃষ্টি উপভোগের উপযোগী হইয়া উঠিবে? ইতিহাসে এ পর্য্যন্ত তাহা হয় নাই। এতদিন পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে, মহৎ

শিল্পের সম্যক উপলব্ধি বিশেষ প্রতিভা ও সুদীর্ঘ সাধনার ফল। সুতরাং মহৎ শিল্পকে জনসাধারণের নিকট পৌঁছাইয়া দিলেও জনসাধারণ, অর্থাৎ অন্নবস্ত্রের সংস্থানেই যাহাদের দিন কাটে, তাহাদের উপযোগী হইয়া উঠিবে না। বরং অতিপরিচিতির ফলে মহৎ শিল্প সম্বন্ধে তাহার শ্রদ্ধা কমিয়া যাওয়ায় শিল্পসাধনার সমূহ ক্ষতি হইবে।

শিল্প-আলোচকদের পক্ষে এতদিন ধরিয়া এই প্রশ্নের নির্ভরযোগ্য উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল না। সোভিয়েটের উদ্ভবের আগে পৃথিবীব্যাপী যে সমাজব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাহাতে উন্নততম দেশেও অতি অল্পসংখ্যক মুষ্টিমেয় শিক্ষিতশ্রেণী সংস্কৃতির দীপ জ্বালাইয়া রাখিত, আর বহু-র দল ছিল অবজ্ঞাত ও অবজ্ঞেয় "সভ্যতার পিলসুজ।" এ ব্যবস্থার যে কোনো মূলগত পরিবর্ত্তন সম্ভব তাহা এতকাল শিক্ষিতশ্রেণীর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। এই অভিজাত নেতৃত্ব চিরকাল তাহাদের হাতে থাকিবে ইহাই ছিল সংখ্যাল্প শিক্ষিতশ্রেণীর আন্তরিক প্রত্যয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রবর্ত্তন সম্ভব করিয়া সোভিয়েট রাষ্ট্র বীরের মতো এই "গভীর গ্রন্থি" কাটিয়া দিয়াছে। সে রাষ্ট্রে জনসাধারণের জীবনযাত্রা এখন আর দিনগুজরানেই পর্য্যবসিত নহে। অবসর প্রচুর বাড়িতেছে, শিক্ষার সীমাহীন প্রসার হইতেছে, সুমার্জ্জিত আনন্দ উপভোগের চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে, ও সেই চাহিদা মিটাইতে শিল্পসৃষ্টির আয়োজনও হইতেছে বিরাট ও বহুমুখী। যেখানে যাহার যতটুকু প্রতিভা আছে তাহার যেন অপচয় না হয়, তাহার যেন সামাজিক সদ্ব্যবহার হয়—ইহা হইতেছে সোভিয়েট শিক্ষানীতির মূলমন্ত্র। সৃজনীপ্রতিভা কোনো শ্রেণীবিশেষের খাস সম্পত্তি নয়, হইতেও পারে না। এতকাল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে সকল দেশের জনসাধারণ আপন আপন সম্ভাবনা বিকাশের সুযোগ হইতে বঞ্চিত থাকিত বলিয়া শিক্ষিতশ্রেণীর মর্ম্মে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, যাহারা অশিক্ষিত তাহারা বুঝি অশিক্ষণীয়। এই ধারণায় শিক্ষিতশ্রেণীর আত্মপ্রসাদের সুবিধা হয়, ঐতিহাসিক সত্যের মর্য্যাদা বজায় থাকে না।

সোভিয়েটের দৃষ্টিতে আর্টের কার্য্যকারিতা ব্যাখ্যা করার পর স্বকীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নানা পরিচ্ছেদে জ্যাক চেন ওই দেশের আর্টিস্টদের শিক্ষাব্যবস্থা, কর্ম্মতৎপরতা ও জীবনযাত্রার বর্ণনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে আর্ট আলোচনায় বিভিন্ন প্রশ্নের উত্থাপন অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। যেমন সৌন্দর্য্য কাহাকে বলে, নিছক আর্টের সহিত প্রচারবৃত্তি আর্টের কি সম্বন্ধ, লোকশিল্পের সার্থকতা কোথায়, বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন ধারার আর্টের কি ভাবে বিচার করিতে হইবে। বলা বাহুল্য এই সকল প্রশ্নের যথাযথ মীমাংসা করিতে হইলে রূপশাস্ত্রের গোড়ার কথায় পৌঁছিতে হয়। সেরূপ আলোচনার ক্ষেত্র এই পুস্তিকার উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। কিন্তু যে দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এই বিচারে প্রবৃত্ত হইলে সমাধান অভিমুখে অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা, তাহার একাধিক ইঙ্গিত ইহা পড়িলে পাওয়া যাইবে।

আমাদের দেশের শিল্প-আলোচনায় নূতন তরঙ্গের অভিঘাত আসিয়া লাগিয়াছে। এই সময়ে এই পুস্তিকাখানি পড়িলে তর্কের বিষয়বস্তু অনেকটা স্পষ্ট হইবে। অনেক বিভ্রান্তি সহজেই ধরা পড়িবে; চিন্তার শিথিলতা পরিহার করা যাইবে। তাই শিল্পদরদিগণের ভিতর এই পুস্তিকার প্রচলন একান্ত বাঞ্ছনীয়।

নীরেন্দ্রনাথ রায়

সংস্কৃতি-সংবাদ

কালীনাথ রায়

গত ৯ই ডিসেম্বর অকস্মাৎ লাহোরের ট্রিবিউনের সম্পাদক কালীনাথ রায় কলিকাতায় তাঁর পুত্র অধ্যাপক সমর রায়ের গৃহে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল, স্বাস্থ্যও বিনষ্ট হচ্ছিল; কিন্তু তবু তাঁর বহুগুণগ্রাহী শিক্ষিত সাধারণের নিকট সংবাদটি আকস্মিক এসেছে। এমন সুদৃঢ় মত ও সস্নেহ আতিথেয়তা বয়ঃকনিষ্ঠদের নিকট ক্রমশই দুর্লভ হয়ে উঠছে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পরে কালীনাথ রায়ই ছিলেন বাঙালী সম্পাদকদের শেষ গর্ব। তাঁদের সঙ্গে বাঙলা দেশের স্বাধীন-চেতা ও স্বাধীনতার সাধক সম্পাদকদের যুগ শেষ হল। আজ সংবাদপত্রে ব্যবসায়ীদের যুগ শুরু হয়ে গিয়েছে। সম্পাদকরা হয়ে পড়ছেন সংবাদ-সেবক ও মালিকের মত-প্রচারক। একটা যুগ থেকে ভারতীয় সংবাদপত্রের আর একটা যুগের এই যাত্রা-পথ কালীনাথ রায় নিজে দেখেছেন। সে পথ বেশ বিশ্লেষণের যোগ্য—আর হয়ত তিনি তা পরিষ্কার করে নির্দেশ করতে পারতেন। এ দেশের অন্য কোনো সাংবাদিক অন্তত কালীনাথ রায়ের কালকে বর্ণনা করবেন, আমরা এই আশা করি।

গোপাল হালদার

কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়

শিক্ষা ও সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের স্থান কতখানি সে-কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ বিষয়ে আমাদের দেশবাসী আজও ততটা সচেষ্ট নন। রাশিয়া, আমেরিকা, গ্রেট বৃটেন ও জগতের অন্যান্য দেশের দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারি এ-বিষয়ে আজও আমরা কতটা পেছনে পড়ে রয়েছি। তবে ভরসার কথা এইটুকু যে, আমাদের দেশেও গ্রন্থাগার-আন্দোলন শুরু হয়েছে। বরোদা রাজ্য ও পাঞ্জাব প্রদেশই আমাদের দেশের এই আন্দোলনের পুরোভাগে। বরোদার ভূত-পূর্ব্ব মহারাজা সয়াজী রাও গায়কোয়াড় বরোদার নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ক'রে তাঁর রাজ্যের জনগণের অশেষ উপকার সাধন করেন। এ-ছাড়া তিনি উপযুক্তরূপে শিক্ষিত গ্রন্থাগারিকের অভাব দূর করার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারিক-ট্রেনিং-এরও ব্যবস্থা করেন। পরে তাঁর দৃষ্টান্ত পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষও অনুসরণ করেন। বাংলাদেশে গ্রন্থাগার-আন্দোলন ও গ্রন্থাগারিক-ট্রেনিং-এর সূত্রপাত হয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠার পরে। বাঁশবেড়িয়ার কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় এই পরিষদের প্রাণ-স্বরূপ ও মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত এর সভাপতি ছিলেন। সম্প্রতি তাঁর মৃত্যুতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, গ্রন্থাগার-আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। কারণ তিনিই ছিলেন বাংলাদেশে এই আন্দোলনের জনক। তিনি আজীবন নীরবে অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে ও বিরল আন্তরিকতা নিয়ে এই আন্দোলনের সেবা করেছিলেন। বঙ্গীয় আইন পরিষদের সভ্যরূপে তিনি একথা স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করেছিলেন যে, সরকারের মনোযোগ ও সাহায্য ছাড়া এ আন্দোলন পরিপুষ্ট হতে পারে এবং এটা সরকারেরও একটি অন্যতম কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের সরকার এ বিষয়ে আজও মনোযোগী হতে পারেনি।

মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতির পদ ছাড়া গ্রন্থাগার জগতে আরও অনেকগুলি বিশিষ্টপদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। তিনি কয়েকবার নিখিল ভারত সাধারণ গ্রন্থাগার সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং ১৯৩৫ সালে স্পেনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক গ্রন্থাগার সম্মেলনে তিনিই ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। সেই উপলক্ষে তিনি গ্রেট বৃটেন, স্পেন, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ইতালী ও ইয়োরোপের আরও কয়েকটি দেশের সমস্ত বিখ্যাত গ্রন্থাগার পরিদর্শন ক'রে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন পরবর্ত্তীকালে সেই অভিজ্ঞতা তিনি স্বদেশের গ্রন্থাগার-আন্দালনের উন্নতিকল্পে নিয়োজিত করেন।

কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের মত নীরব, নিঃস্বার্থ ও নিষ্ঠাবান কর্ম্মীর আমাদের দেশে বড় অভাব; কাজেই তাঁর মৃত্যুতে দেশের ও দশের যে ক্ষতি হ'ল তা পূরণ করা সহজ নয়। আমরা তাঁর বিশিষ্ট অবদানের কথা সশ্রদ্ধ অন্তরে স্মরণ করি এবং তাঁর স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা প্রত্যেক শিক্ষাব্রতী ও গ্রন্থাগারেরই কর্ত্তব্য বলে মনে করি। গ্রন্থাগার-আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট যুবক কর্ম্মীরা তাঁর উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হলে আমাদের দেশে এ-আন্দোলনের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল একথা সুনিশ্চিত।

অনিলকুমার রায়চৌধুরী

ইতরতার বেসাতি

কবি গোলাম কুদ্দুস লেখক ও সাংবাদিক। গত বৎসরও তিনি ছিলেন বাঙলার প্রগতি লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক। ৯ই ডিসেম্বর, রবিবার, সন্ধ্যায় তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক অফিস থেকে তাঁর একজন মুসলমান বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়ে আস্‌ছিলেন, লোয়ার সার্কুলার রোড ও ক্রীক্ রো'র সংযোগস্থলে তাঁকে কয়েকজন যুবক-ধরনের গুণ্ডা মিলে আক্রমণ করে, মারপিট করে, কুদ্দুস আহত হন। আক্রমণকারীদের অজুহাত—কুদ্দুস কমিউনিস্ট, কমিউনিস্ট পার্টি অফিস থেকে বেরুচ্ছেন, এবং কমিউনিস্টরা পূর্ব্বদিন (শনিবার, ৮ই ডিসেম্বর) দেশপ্রিয় পার্কের আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কিত সভার লাউড স্পীকারের তার কেটেছে।

অবশ্য কুদ্দুস একাই প্রহৃত হননি, সেদিন ঐ আফিস থেকে একা-একা যাঁরা বেরুচ্ছিলেন তাঁরা অনেকেই ঐ সন্ধ্যায় প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হন। ঐ অঞ্চল ছাড়াও কলকাতায় কালিঘাট ও হাওড়ার কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় অফিস আক্রান্ত হয়। 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র পরিচালিত একটি শিশু-শিক্ষালয়ে তার একজন শিক্ষয়িত্রী আক্রান্ত হন। সোমবার, ১০ই বঙ্গবাসী কলেজেও শুনেছি কমিউনিস্ট-ভাবাপন্ন ছাত্ররা অন্যান্য ছাত্রদের হাত থেকে কোনোরূপে লাঞ্ছনা না পেয়ে নিষ্কৃতি পায়। অন্যত্র সর্বক্ষেত্রে আক্রমণকারীরা মারধর, ইটছোঁড়া ছাড়াও যে ইতর গালাগালি প্রয়োগ করে গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীদের মুখে ছাড়া তা বাঙলাদেশে অন্যত্র শোনা যায় না! এই সব আক্রমণের ফলে যাঁরা আহত হন তাঁদের মধ্যে হিন্দু আছেন মুসলমান আছেন, যুবক আছেন তরুণী আছেন, হরতালী মজুর আছেন, আছেন আন্দামান-ফেরৎ সদ্য-কারামুক্ত রাজনীতিক কর্মী,—আর আছেন গোলাম কুদ্দুসের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, বাঙালি লেখক ও

সাংবাদিক। সর্বক্ষেত্রেই একই ওজুহাত আক্রমণকারীরা ঘোষণা করে—কমিউনিস্টরা দেশপ্রিয় পার্কের সভায় লাউড্ স্পীকারের তার কেটেছে। রবিবার, ৯ই ডিসেম্বর, 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' এ-সংবাদ বিশদভাবে প্রকাশিত হয় যে, ৮ই ডিসেম্বরের সভায় সভার অন্যতম উদ্যোক্তা শ্রীমান্ অমিয়কুমার বসু সভাক্ষেত্রে এইরূপ ঘোষণা করেছিলেন, এবং দু'জন লোককে সেরূপ অপরাধী কমিউনিস্ট ব'লে মঞ্চের উপরে তুলে দেখিয়েছিলেনও। অতএব, যারা আক্রমণ করেছে তাদের যুক্তি বা প্ররোচনার অভাব ঘটেনি। অভাব ঘটেছিল শুধু একটি জিনিসের—সংযম ও সভ্যতার।

কিন্তু তারও পূর্বে অভাব ঘটেছে আর একটি জিনিসের—সত্যের। কারণ ১১ই ডিসেম্বর মঙ্গলবারের, 'যুগান্তর', 'বসুমতী' প্রভৃতি কংগ্রেসী কাগজে দেখা গেল কয়েকটি চিঠি: দু'জন অভিযুক্ত লোকই জানিয়েছেন তাঁরা সম্পূর্ণ নির্দোষ; জোর ক'রে সেদিন মঞ্চের উপর তুলে নিয়ে তাঁদের এ-ভাবে লাঞ্ছনা করা হয়, মারধরও করা হয়। তাঁরা কেউ কমিউনিস্ট নন—একজন ভবানীপুর অঞ্চলের দোকানদার, আর-একজন কংগ্রেস কর্মী, ১৯৩০-এ জেলভোগ করেন, '৪২-এ আগষ্ট সংগ্রামেও' যোগদান করেন, লাঞ্ছনা ভোগ করেন (অমিয়বাবু তখন বিলাতে ব্যারিস্টারি পাশের সংগ্রাম করছিলেন)। সেই সংবাদপত্রেই সেদিনকার সভার দু'জন ব্যাণ্ডপার্টির ভলান্টিয়ারেরও পত্র প্রকাশিত হয়, তাতে তাঁরাও প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসাবে জানান, নিরীহ ও নির্দোষ মানুষদেরই এভাবে লাঞ্ছিত করা হয়েছে। অবশ্য এসব পত্র আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। আবার, সেদিনকার সংবাদপত্রেই দেখি পণ্ডিত জওহরলাল বড়বাজারের সভায় বলেছেন—(ক) ২১শে নবেম্বরের কলকাতার ছাত্র বিক্ষোভও কারও উস্কানিতে হয়েছিল বলে তিনি বিশ্বাস করেন না (পূর্বে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু তা উস্কানির ফল ও "জনযুদ্ধওয়ালাদের উস্কানির" ফল ব'লে পুনঃপুনঃ প্রচার করেন, আনন্দবাজার পত্রিকা তা যথাশক্তি সাধারণের নিকট ছাপিয়ে ধরে; গত সংখ্যা পরিচয় এ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য। মৌলানা আজাদ ১১ই তারিখের প্রেস প্রতিনিধিদের নিকট এই সত্যই আরও তীক্ষ্ণতর ক'রে বলেছেন, এ প্রসঙ্গে তাও স্মরণীয়)। (খ) কমিউনিস্ট বা যে কোনো দলের প্রতি আক্রমণ ও অত্যাচার করা কংগ্রেসের নীতিবিরুদ্ধ। (গ) দেশপ্রিয় পার্কের সভায় তার কাটা হয়েছিল, এ কথা জওহরলালজী বিশ্বাস করেন না। বলা বাহুল্য, এ-সব কোনো কথার একটি বর্ণও আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, অভাব যা ঘটেছে দেশে সে হচ্ছে সত্যের, প্রাদুর্ভাব যা হচ্ছে তা ইতরতার। তাই ইতিমধ্যে শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা বিবৃতি দিয়েছেন; জানি না তা কোন্ কোন্ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। সংস্কৃতি-অনুরাগী হিসাবে আমরা এ-দিকে বাঙলার সংস্কৃতিবান্‌দের মনোভাব স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করবার দায়িত্ব বোধ করছি। কমিউনিস্টদের স্বপক্ষে এ-বিষয়ে আমরা কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। তাঁরা রাজনীতিক কর্মী। হিটলার মুসোলিনীর দাপটে যাঁরা তলিয়ে যাননি, তাঁরা এ-দেশের নকল হিটলারী হীনতায় অভিভূত হবেন, তা সম্ভব নয়—বিশেষত যখন জানি গত চার মাসের ইতরতার ঝড়েও তাঁদের ৪০ হাজার সভ্যের মধ্যে ৪ জনও পার্টি ছাড়েননি,—এমনি তাঁদের আত্মপ্রত্যয়; আর তাঁদের মেয়ে, তাঁদের মজুর, তাঁদের কর্মীদের মধ্যে রয়েছেন এমনি

বহু বহু সভ্য যাঁরা ফাঁসির হুকুম, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, সুদীর্ঘ কারাবাস,—সব অকুণ্ঠিতভাবে গ্রহণ করেছেন—এমনি তাঁদের বিপ্লবী ঐতিহ্য। নিজেদের মতের ও পথের দাম তাঁরা এ-সময়েও পুরোপুরিই দেবেন। আর না দিতে পারলে মরবেন—সে জন্য দুঃখ করবারও কারণ দেখি না। নিজেদের নীতির হিসাব বুঝে বিপ্লবী দলের মতই তাঁরা চল্‌বেন—রক্ষা করবেন সত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মর্যাদা।

সেই সত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার দায়েই আমরা এদেশের শিক্ষিত সাধারণের কর্তব্যও এই ইতরতার উদ্বোধনকালে স্পষ্ট ক'রে বলা প্রয়োজন মনে করি। তিন বৎসর আগে ঢাকার রাস্তায় তরুণ লেখক সোমেন চন্দ ঘাতকের ছুরিকায় নিহত হন। সেদিন বাঙ্‌লা দেশের সমাজ তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। রলাঁ ও রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা নিয়ে তাঁরা অনেকে ফ্যাশিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ সংগঠিত করেন—গোলাম কুদ্দুস ছিলেন তারই অন্যতম সম্পাদক, এখনও সেই প্রতিষ্ঠানের একজন পরিচালক। যে ইতরতার বেসাতি বাঙলা দেশের সাম্‌নে খুলে আজ তার এক উপনেতার দল দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করছে সে ইতরতাকে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করবার দায়িত্ব আজ আমাদের—আমরা যারা কুদ্দুসের সতীর্থ বাঙলা লেখক, আমরা যারা রলাঁ-রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বকেই মানি, জানি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ইতরতার অভিযান অন্যদেশে যখন রণক্ষেত্রে নিশ্চিহ্ন হয়েছে এদেশেই তখন তা বাসা খুঁজছে সাম্রাজ্যবাদের বিকৃত পরিবেশে।

সংস্কৃতির সৈনিক হিসাবে আজ আমাদের আবার ডাক পড়ল। নতুন করে আমরা শপথ নিচ্ছি প্রত্যেকে—I WILL NOT REST.

সেই সৈনিক হিসাবেই আমাদের তাই লক্ষ্য রাখতে হবে কয়েকটি দিকে :

প্রথমত, যুদ্ধান্তে বিপ্লবী-চেতনাকে এদেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী খাদ থেকে সাম্যবাদ-বিরোধী খাদে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এটাতে এ-দেশীয় ও বিদেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের সমান স্বার্থ। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সেই চক্রান্তে জেনে না-জেনে যোগ দিচ্ছে ইতরতার ব্যবসায়ীরা। সংস্কৃতির সৈনিক হিসাবে আমাদের প্রথম দায়িত্ব—ভারতের বিপ্লব-মুখী জন-চেতনাকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী খাদে রেখে তীব্রতর করে তোলা, বিপ্লবকে স্বাগত করা।

দ্বিতীয়ত, এই ইতরতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের পথ হবে কি? এক, দেশের নেতাদের নিকট ঘটনা-সত্য বিবৃত করে তাঁদের শুভ চেতনা প্রবুদ্ধ করা। দুই, দেশের জনশক্তিকে,—মজুরকে, কৃষককে, শিক্ষিত দরিদ্রকে এই ইতরতার বিরুদ্ধে আরও সচেতন, আরও সংগঠিত, আরও সক্রিয় করে তোলা। তিন, জাতির শিক্ষা-দীক্ষা ও বিবেক-বুদ্ধির সংরক্ষক হিসাবে লেখক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি সকল সংস্কৃতি-কর্মীকে এই সংগ্রামের সৈনিকরূপে প্রস্তুত করা।

কাজটা সহজ বা বিপদশূন্য নয়। আততায়ীর ছুরিকা সোমেন চন্দকে খুন করেই থামেনি। গোলাম কুদ্দুসকে আঘাত করেও তা থাম্‌বে এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। তাই প্রমাণ করতে হবে—সোমেন চন্দের জাত শুধু লেখে না, মরতেও জানে।

"কাশ্মীর চিত্রাবলী"

শীত আরম্ভ হতেই কলিকাতায় দু'একটি শিল্প-প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে। দিলীপ দাশগুপ্তের আঁকা কাশ্মীর চিত্রের প্রদর্শনী তার মধ্যে প্রধান। ২৫শে নভেম্বর থেকে ৯ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সে প্রদর্শনী চলে। আর্ট স্কুলের অভ্যন্তরস্থ সার্ভিস্ আর্টস্ ক্লাবের উদ্যোগে ক্লাবের গৃহে প্রদর্শনী বসেছিল।

দিলীপ দাশগুপ্ত বয়সে তরুণ হলেও আমাদের শিল্পীসমাজে অপরিচিত নন। তাঁর একাধিক্ চিত্র পূর্ব পূর্ব প্রদর্শনীতে প্রশংসা পেয়েছে, পুরস্কারলাভও করেছে। বৎসর তিন আগে চৌরঙ্গীতে একটি শিল্প সমিতির উদ্যোগে তাঁর নিজস্ব একটি চিত্র-প্রদর্শনীও হয়েছিল। তাতে তাঁর অঙ্কিত মালয়ের মানুষ ও প্রাকৃতিক দৃশ্য, পোট্রেট ও ল্যাণ্ডস্কেপ, অয়েল ও ওয়াটারকলার, এবং জয়পুর রাজপুতনার দৃশ্যাবলী অনেকেরই মনে আশার সঞ্চার করে। তার পরে যুদ্ধের বাজারে শিল্পীদের পক্ষে শিল্পোপকরণও দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে, দিলীশ দাশগুপ্ত সার্ভিস আর্টস্ ক্লাবে সম্পাদক ও শিক্ষকরূপে শিল্প-সেবায় সময় কাটাতে বাধ্য হন। এই সময়ে তাঁর অঙ্কিত নূতন চিত্র আর বেশি সাধারণে দেখতে পায়নি। এবার দিলীপবাবু তাঁর সঞ্চিত শক্তি ও বিকশিত দৃষ্টির প্রমাণ নিয়ে আবার উপস্থিত হওয়াতে স্বভাবতই শিল্পানুরাগীরা বিশেষ আশ্বস্ত হয়েছেন।

তিন সপ্তাহের ছুটিতে কাশ্মীর গিয়ে শিল্পী খান ৬০ ছবি আঁকবার সুযোগ পান। তিন সপ্তাহের অনেকটা সময় চলে যায় বৃষ্টি বাদলে, তখন তিনি কাশ্মীর দেখবার ও ছবি আঁকবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। তারপরে অল্প কয়দিনে তিনি এঁকে চলেন মোট খান ৬০ ছবি—তার ৪০ খানা তিনি এই প্রদর্শনীতে দিয়েছেন। খান ১০ পোট্রেট্; বাকী বেশির ভাগ ওয়াটারকলারে আঁকা কাশ্মীরের দৃশ্য, শ্রীনগরের বাড়িঘর, পথ ঘাট, দোকানপাট; আর দুখানা স্ক্যাচুলা। বহুচিত্রের ভিড় নেই বলে দেখা যেমন সুখকর হয়েছে তেমনি এই প্রদর্শনীর চিত্রাবলী দেখে শিল্পরসিকেরা আনন্দলাভ করেছেন।

পোট্রেটের মধ্যে ১নং চিত্র 'বৃদ্ধ মাঝি' সকলকে প্রথম থেকেই আকৃষ্ট করে। আরও খান দুই তিন পোট্রেট্‌কেও প্রথম শ্রেণীর বলা চলে। তা ছাড়া মোটামুটি সব কয়টি প্রতিকৃতিতেই শক্তির প্রমাণ রয়েছে। 'বৃদ্ধ মাঝি'ই শিল্পীর কাশ্মীরে আঁকা প্রথম ছবি! মনে হয় স্বভাবতই শিল্পীর মনের আশা ও আগ্রহ তাতে উৎসাহিত হয়ে পড়েছিল। দর্শকও তাকে সহজভাবেই প্রথম স্থান দিতে অসুবিধা বোধ করেন না।

ওয়াটারকলারের আঁকা দৃশ্যগুলিও চমৎকার। যাঁরা শ্রীনগর-কাশ্মীর দেখেছেন তাঁরা এসব চিত্র দেখে বিশেষ উৎফুল্ল হন। কিন্তু সকলেরই প্রথমে চোখে পড়ে এ চিত্রাবলীর এক উজ্জ্বল স্বচ্ছতা। সাধারণত আমাদের শিল্পীদের এদিকে এতটা দৃষ্টি ও প্রকাশ-কুশলতা দেখা যায় না। অথচ আমাদের দেশের আকাশ রোদে ভরা, উজ্জ্বল; বিলাতের আকাশের মত তা মেঘে-ঢাকা গোমড়া নয়। বিলাতী ল্যাণ্ডস্কেপ নিদর্শনের ছায়াবাহুল্য আমাদের শিল্পীদের মন ও মেজাজের উপর ছায়াপাত করে কিনা জানি না। নইলে স্বভাবত আমাদের শিল্পীদের মন এদেশের প্রাকৃতিক প্রভাবে উজ্জল হয়ে উঠবার কথা, আর তাঁদের চিত্রাঙ্কনেও প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল স্বচ্ছতা। দিলীপ দাশগুপ্তের ছবিতে এই স্বাভাবিক সত্যেরই আবির্ভাব দেখতে পাই।

কিন্তু সব চেয়ে এ চিত্রাবলীতে যা দর্শকমাত্রকেই মুগ্ধ করে তা শিল্পীর অঙ্কিত তুষারাবৃত পাহাড়ের দৃশ্যাবলী। এরূপ খান সাত-আট বরফঢাকা দৃশ্য প্রদর্শনীতে উপস্থিত করা হয়েছে (১৫নং ও ৩৫নং থেকে ৪০নং পর্যন্ত চিত্রাবলী)। প্রত্যেকটিই অতি চমৎকার। খিলিনমার্গ থেকে দেখা তুষারদৃশ্য (৩৮নং) কিংবা গুলমার্গ (৩৭নং) কিংবা চন্দন ওআড়ির তুষারসেতু (৩৯নং)—এক-একটি এক একজনকে বিশেষভাবে বিমুগ্ধ করে। একজন বিলাতী শিল্পীর কথায় বোধ হয় এই বরফ 'ঢাকা' দৃশ্য-চিত্রগুলির ভালো পরিচয় লাভ করা যায়। দেখতে দেখতে তিনি বলেন, "আমার যেন শীত করছে।" গরমের দেশের শিল্পী বরফের দেশের শিল্পরসিককে যখন এভাবে নাড়া দিতে পারেন, তখন বুঝতে পারি, তাঁর সৃষ্টি কতটা উত্তীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু একটি বিশেষ ধরনের কাজের জন্য দিলীপ দাশগুপ্ত আমাদের শিল্পীদের মধ্যে সম্ভবত এখনো একক। তা তাঁর স্প্যাচুলার কাজ। সে-সব কাজের নিদর্শন এই প্রদর্শনীতে ছিল; 'ঝিলম্ নদী' (১৩ নং চিত্র) এইটিই তাঁর এবারকার প্রদর্শনীর সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন; আর বোধ হয় তা সর্ববাদিসম্মত। আগেও শিল্পী এদিকে কাজ করেছেন; তাতেও তাঁর শক্তির পরিচয় ছিল। কিন্তু 'ঝিলম্ নদী'তে তিনি আরও উৎকর্ষ দেখিয়েছেন।

এই ছোট নিদর্শনী দেখে সন্দেহমাত্র থাকে না দিলীপ দাশগুপ্ত শিল্পী হিসাবে একটা সুনির্ভর ক্ষেত্রে সমুত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁর দৈহিক (কৈশোরে দুরন্ত ব্যাধির ফলে তাঁর একটি হাত ও একটি পা ছেদন করতে হয়) বা আর্থিক কোনো বাধাই তাঁর শিল্পশক্তি ও শিল্পীমনকে ব্যাহত করতে পারবে না।

ভালো প্রতিলিপি মুদ্রিত করে না দিলে শুধু মাত্র লিখে কোনো চিত্রকলার স্বরূপ বুঝানো প্রায় দুঃসাধ্য। লেখার মধ্য দিয়ে আমরা গুণগ্রাহী দর্শকদের এদিকে আগ্রহ জাগাতে চেষ্টা করতে পারি। সে জন্যই শিল্পীদের কাছ থেকেও আমরা দাবি করি—আরও প্রদর্শনী ও যথাসম্ভব চিত্রের দাম কম করা; যাতে সাধারণ মধ্যবিত্তও চিত্রকলার আদর করতে উৎসাহ পান। কিন্তু দেশের সাময়িকপত্রগুলোর কাছ থেকে আরও একটু সহানুভূতি নিশ্চয়ই সকলে প্রত্যাশা করেন। এই প্রদর্শনীর সংবাদটুকুও প্রায় কোনো দেশীয় সংবাদ-পত্রে ভালো ক'রে প্রকাশিত হয়নি; প্রদর্শিত চিত্রের কোনো সমালোচনা বা প্রতিলিপি প্রকাশ তো এই সংবাদপত্রের চিত্রে-বাক্যে প্রলাপ-প্রশস্তির মধ্যে পাওয়াই যায়নি। তথাপি এ সময়েও অবশ্য আমাদের সংবাদপত্র শিল্প ও সংস্কৃতির সংবাদ ও চিত্র প্রকাশ করবেন—হয়ত তা করবেন বিলাতী ও দেশী কর্তাদের হাতে লেখা বা ছবি সার্টিফিকেট পেলে পর।

বিস্মৃত "স্মৃতিভাণ্ডার"

যথারীতি রবীন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডারের কথা আর সংবাদপত্রের পাতায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শুনেছি ১০।১১ লক্ষ টাকা উঠেছে। নিশ্চয়ই এখন অন্যান্য ভাণ্ডারে যখন অর্থ-সঞ্চয় প্রয়োজন, নির্বাচনও সন্নিকট, তখন 'রবীন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডার' তার উৎসাহী ব্যবসায়ী পরিচালকবর্গের আর ততটা মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারছে না,—কাজেই দেশের লোকের মন থেকেও ক্রমেই তা পিছনে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর পরে কোনো

একদিন আবার যদি হঠাৎ সংবাদপত্রের স্তম্ভে তাকে জীইয়ে তোলা হয়, আর তার ভাণ্ডার-পরিচালকবর্গের মধ্যে আবার এই সংবাদপত্র স্তম্ভাশ্রয়ীরাই জেঁকে বসেছেন দেখতে পাই, তাতেও বিস্মিত হব না। তবে এই ধারণাটাই তাতে দৃঢ় হবে যে, যা হয়ত অনেকটা দায়িত্ববোধে এক সময়ে এই ভাণ্ডারের নতুন কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে থাকবেন, তা ব্যবসায়ীসুলভ মন ও কাজের গুণে শেষ পর্যন্ত একটা ব্যবসায়ের 'চালেই' এসে ঠেকেছিল। আরও ভালো 'চাল' হাতের কাছে জুট্‌তেই 'রবীন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডারের' প্রচারে আজ মন্দা দেখা দিয়েছে,—অবশ্য সে ব্যবসাটাও পকেটস্থই আছে, তা দেখা যাবে পরিচালনার সময়ে।

একটা ভরসা তবু করছি—গান্ধীজী ও জওহরলাল যখন বাঙলায় এসেছেন, শান্তিনিকেতনেও যাবেন (?) তখন নিশ্চয়ই 'বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডারকে' তাঁরা একেবারে বিস্মৃত হতে পারবেন না। আর তাঁরা বিস্মৃত না হলে, তাঁদের সাংবাদিক এজেণ্টরাও আবার সঙ্গে সঙ্গে একটু অবহিত হবেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাঁদের পরস্পর সহযোগে ধনিক বণিকের নোটের তাড়ায় রবীন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডার পূর্ণ হতে পারে। আর তাহলে পর সে ভাণ্ডারের পরিচালনভারও কারা গ্রহণ করবেন, তা অনুমান করা অসম্ভব নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে—ওই ভাণ্ডার পূরণটি শীঘ্র সম্পন্ন হোক।

মূল স্মৃতিভাণ্ডারের কর্তৃপক্ষদের উৎসাহ এদিকে নিবে যাচ্ছে অন্য দিকে অনেক জোরে জলে উঠ্‌বার স্বার্থে। কিন্তু সাহিত্যিকদের সংগঠিত 'স্মৃতিভাণ্ডারের' বিষয়ে সাহিত্যিকদের উৎসাহ নিবে গেল কোথায় জলে উঠ্‌বার জন্য? ভারপ্রাপ্ত কোনো কোনো সাহিত্যিক কর্তা যদি ব্যাধিতে অচল হয়ে থাকেন, তাতে তো উৎসাহী অন্য সাহিত্যিকদের নিশ্চল বা নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকার কারণ নেই। সাহিত্যানুরাগীদেরও আমরা এদিকে উদ্যোগী হতে বল্‌ব,—কারণ, রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিবিশেষের ব্যবসা নন, ইতিহাসের খাতায় বাঙালীর ও ভারতবাসীর তিনি পরিচয়পত্রও।

১২।১২।৪৫ ইং

গোপাল হালদার

পাঠক-গোষ্ঠী

'কবিতা' পত্রিকা ও কবিতার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু সম্বন্ধে বিগত শ্রাবণের পরিচয়ে পত্রিকা-প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ মন্তব্য ছিল। উক্ত মন্তব্যের প্রতিবাদ স্বরূপ শ্রীযুক্ত অরুণকুমার সরকার যে-চিঠি লিখেছেন নিচে তা সম্পূর্ণ ছাপা হোলো ঃ

'পরিচয়' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

গত শ্রাবণ মাসের পরিচয়ে শ্রীযুক্ত হিরণকুমার সান্যালের স্বাক্ষরিত একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। শিরোনামা দেখে মনে হয়েছিল সমালোচকের উদ্দেশ্য বুঝি 'কবিতা' পত্রিকাটির সাহিত্যিক-মূল্য যাচাই করা। কিন্তু সেদিক থেকে আমাদের একেবারেই

হতাশ হতে হয়েছে। 'কবিতা'কে আলতোভাবে ছুঁয়ে, ঠেলে সরিয়ে রেখে—শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুকেই তীব্র আক্রমণ করেছেন সান্যালমশাই এবং পরিশেষে হুঁসিয়ারী হিতোপদেশ দিতেও কার্পণ্য করেননি।

সমালোচকের অভিযোগ এই যে, (১) বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আওতায় আশ্রয় নিয়েছেন; (২) ইতিহাসকে উপেক্ষা করেছেন এবং (৩) প্রগতি এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী সংকীর্ণ পথে বিহার করছেন।

সমালোচকের লজিক থেকে স্বভাবতই এই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হই যে: রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আওতায় আশ্রয় নেওয়ার অর্থই হোলো—ইতিহাসকে উপেক্ষা করা, প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী সংকীর্ণ পথে বিহার করা। সমালোচক হয়ত নিজেই জানেন না, পরোক্ষভাবে তিনি কী মারাত্মক ভ্রমাত্মক মতবাদ প্রকাশ করেছেন। নতুবা কার বুকের পাটা আছে এতবড় একটা অযৌক্তিক মিথ্যা কথা বলবার?

চার বছর হোলো রবীন্দ্রনাথের শারীরিক মৃত্যু হয়েছে, তবুও অগ্রচারী ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আজকের পৃথিবীতেও তাঁর প্রতিভা ভাস্বর অম্লান এবং জীবন্ত। কিন্তু সান্যালমশায়ের কাছে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ 'অসহ' বলে মনে হয়। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হবার দিন আজ গত; রবীন্দ্রসাহিত্যে অনুকরণীয় আর কিছুই নেই। এ-কথা বলার অর্থ কি এই নয় যে, রবীন্দ্রসাহিত্য মৃত এবং প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে? রবীন্দ্রনাথকে এতবড় অপমান আজ পর্যন্ত অন্য কোনো সমালোচক করেছেন বলে জানি না। এ-কথা যদি সত্য হয় যে, রবীন্দ্রসাহিত্য মহৎ এবং জীবিত, তা হোলে আজও সেই সাহিত্যের অনুকরণ হবে এবং সেই অনুকরণের দ্বারাই পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হবে যে, রবীন্দ্রনাথ আজও মহৎ, আজও জীবিত।

বুদ্ধদেব বসুর রচিত রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্ত কবিতার সংখ্যা অজস্র এবং সেগুলি স্বকীয় সার্থকতায় সমুজ্জ্বল। 'কঙ্কাবতী' ও 'দময়ন্তী'র কবি আপন বৈশিষ্ট্যের জোরেই বাংলা-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, হিরণবাবুর 'কৃতজ্ঞতার' অপেক্ষা না রেখেই! (বুদ্ধদেবের প্রতিষ্ঠাকে উপেক্ষা করতে পারেননি বলেই হিরণবাবু সমালোচনার অবতারণা করেছেন।) বুদ্ধদেবের দু'একটি সাম্প্রতিক কবিতায় যদি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এসে পড়ে, তা হোলে বুঝতে হবে যে তিনি সজ্ঞানেই রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেছেন। এই করাটা যে মোটেই দোষণীয় নয়, বরং রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন—সাহিত্যরসিক মাত্রেই তা স্বীকার করবেন।

বুদ্ধদেব বসু যে ইতিহাসকে উপেক্ষা করেন না, 'পশ্চিম' কবিতাটিই তার জলজ্যান্ত প্রমাণ নয় কী? এর থেকেই কী প্রমাণিত হয় না যে, চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে যথেষ্টই সজাগ তিনি? (অবিশ্যি একজন কবির কাছ থেকে যতটুকু সচেতনতা আশা করা যায়।) হয়ত রাজনৈতিক অর্থে 'পশ্চিম' কবিতাটি প্রতিক্রিয়াশীল, হয়ত বা তা নয়। সাম্যবাদী রাজনীতির দিক থেকে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের অনেক অনেক কবিতাই তো স্পষ্টতঃ প্রতিক্রিয়াশীল। পত্রপ্রেরক নিজেই এমন একশ'টি কবিতা উদ্ধৃত করতে পারেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী'তে একটি কবিতা লিখেছেন—'ফিনল্যাণ্ড চূর্ণ হোল সোভিয়েট বোমার বর্ষণে।' রাশিয়ার পোল্যাণ্ড আক্রমণের অন্তর্নিহিত

রাজনৈতিক তাৎপর্য্য রবীন্দ্রনাথ হয়ত বুঝতে পারেননি কিন্তু তাই বলে কেউ বলবে না, রবীন্দ্রনাথ চিন্তাসম্পদে দেউলে। যে বলবে সে তার ধৃষ্টতাই প্রকাশ করবে। কেন না, রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখতে বসেছেন মতবাদ প্রচার করতে নয়। 'পশ্চিম' কবিতাটি কবিতা হিসাবে সার্থক, এটি যদি রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ হয়ে থাকে তো সে হিসাবেও সার্থক। রাজনৈতিক মতবাদের দাঁড়িপাল্লায় কাব্যকে যাচাই করতে যাওয়া সবসময় সম্ভব নয়! যাঁরা রাজনৈতিক কবিতা লিখে থাকেন, সুস্পষ্ট রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাস করেন, দলবিশেষের হয়ে দালালি করেন—একমাত্র তাঁদের কবিতাকেই রাজনীতির কষ্টিপাথরে যাচাই করা যায়। আমি অন্ততঃ এমন কয়েকজন শিক্ষিত কাব্যামোদী ভদ্রলোককে জানি যাঁরা 'পশ্চিম' কবিতাটিতে যথার্থ রসের সন্ধান পেয়েছেন। বলা বাহুল্য আমিও তাঁদের মধ্যে একজন। বুদ্ধদেব ইতিহাসকে উপেক্ষা করেননি বলেই তাঁর পাঠশালায় আজকালকার অনেক মুখর প্রগতিবাদী কবির হাতেখড়ি হয়েছে।

প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার রাজনৈতিক সংজ্ঞা দিনের পর দিন বদলে যায়। আজ যে-ব্যবস্থা প্রগতিশীল, আগামী কালই তা হয়ত প্রতিক্রিয়াপন্থী। যথার্থ কবিতা সাময়িক সাংবাদিকতা নয় বলেই তাকে প্রগতি ও প্রচলিত প্রতিক্রিয়ার সংজ্ঞা দিয়ে বিচার করা চলে না। ১৩৫১ সালের কার্তিক-পৌষ সংখ্যার কবিতায় বুদ্ধদেববাবু যে সম্পাদকীয় মন্তব্য করেছিলেন সবাই তার সঙ্গে একমত হবেন। বুদ্ধদেব লিখেছেন, "কোনো বই সম্বন্ধে এইটেই যখন একমাত্র উল্লেখযোগ্য কথা হয় যে এতে চলতিকালের ঘটনার বর্ণনা আছে কিম্বা নেই, এবং লেখক রাজনীতির দিক থেকে ঠিক রাস্তাই ধরেছেন কিম্বা ধরেননি, তখন বুঝতে হয় যে সরস্বতীকে রাজমন্ত্রীর পরিচারিকারূপে ব্যবহার করিয়ে নেবার চেষ্টা চলেছে, এবং জাত লেখক সঙ্গে সঙ্গেই সতর্ক হয়ে পড়েন।"

হিরণবাবুর আর একটি অভিযোগ: যাঁরা নতুন ছাঁদের রচনায় উৎসাহিত হয়েছেন বুদ্ধদেববাবু তাঁদের আঙ্গিক পর্যন্ত কিছু কিছু আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করেছেন। সমালোচকের কী উচিৎ ছিল না উদাহরণের দ্বারা বক্তব্যকে পরিষ্কার করে দেওয়া? নতুবা, এরূপ মন্তব্য অশোভন ও অসঙ্গত নয় কী?

শুনতে পাই মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় 'পরিচয়ে'র আস্থা আছে! তাই আমার বিশ্বাস বর্তমান পত্রটি প্রকাশিত হবে এবং এর যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দেওয়া হবে।

এই পত্রের অনুলিপি শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর কাছে পাঠালাম।

বিনীত

অরুণকুমার সরকার

সমালোচনার সমালোচনা ছাপতে গেলে পত্রিকা চালানো দুরূহ হয়ে পড়ে বিশেষত বর্তমান কাগজ সংকোচের সময়ে। কিন্তু অরুণবাবু শুধু সমালোচনার উত্তর দিয়ে সন্তুষ্ট নন, তার প্রত্যুত্তর চেয়েছেন। এক্ষেত্রে এই প্রত্যুত্তর ছাপাতে আমরা প্রস্তুত, মামুলী রীতি লঙ্ঘন ক'রেও, কেননা পত্রলেখক এমন দুএকটি প্রশ্ন তুলেছেন যার বিস্তারিত আলোচনা বাঞ্ছনীয়। এই আলোচনায় যোগ দিতে আমরা পাঠকবর্গকেও আমাদের সাদর আহ্বান জানাচ্ছি ও তাঁদের সুযোগ দেবার জন্যে শ্রীযুক্ত হিরণকুমার সান্যালের

প্রত্যুত্তর ছাপানো আমরা আপাতত স্থগিত রাখলাম। আশা করি পরবর্তী সংখ্যায় এই প্রত্যুত্তর ও পাঠকবর্গের মতামত এই আলোচনাটি জমিয়ে তুলবে।

পরিচয় সম্পাদক

প্রাপ্তি স্বীকার

(১) জাতীয় আন্দোলন—প্রফুল্ল সরকার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার। (২) গভর্ণমেণ্ট ইনস্পেক্টর—অনুবাদক অনিলেন্দু চক্রবর্তী—সঞ্চয়ন পাব্লিশার্স। (৩) মাকড়সা—রজত সেন—পূরবী পাবলিশার্স। (৪) নয়ন চারা—সৈয়দ ওয়ালীউল্লা—পূর্বাসা লিমিটেড্। (৫) অনুরাগ, (৬) অতসী—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—বেঙ্গল পাবলিশার্স। (৭) অমর মরণ—মণীন্দ্র দত্ত—বেঙ্গল পাবলিশার্স। (৮) এ মেয়ে মেয়ে নয়, মানসী—শিবপদ দাস—দাশগুপ্ত এণ্ড কোং। (৯) নাট্টশ্রী—ত্রৈমাসিক পত্রিকা। (১০) একক—পত্রিকা। (১১) অমৃতের সন্ধানে—প্রতুলচন্দ্র ঘোষ, টুয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরী পাবলিশার্স। (১২) Shakespeare—A. A. Smirnov—Progressive Forum. (১৩)Chinese Women & Freedom by Anil de Silva—Kutub Publishers (১৪) প্রাচীরপত্র—অনিলকুমার সিংহ, (১৫) অসমতল—নরেন্দ্রনাথ মিত্র—ইণ্টারন্যাশানাল পাবলিশিং হাউস। (১৬) বেদিয়া-ছন্দ—রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, (১৭) হলদে বাড়ি—নরেন্দ্রনাথ মিত্র—অগ্রণী বুক ক্লাব। (১৮) কাব্য-মালঞ্চ—আবদুল কাদির, রেজাউল করীম—নূর লাইব্রেরী।

একটি ত্রুটি

পরিচয়ের এ-সংখ্যায় 'ইউ-কে-আর' গল্পের লেখক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের কাছ থেকে আমরা নিচেকার পত্রখানা পেয়েছি ঃ

কোনও সাপ্তাহিকে 'আগুন' নামে একটি গল্প দেই। কয়েক দিন পরেই গল্পটা পরিবর্তন করিব স্থির করিয়া সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করি উহা যেন ছাপানো না হয়। তিনি ঐ অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মতও হন। পরে ওই গল্পটিকে ভাবগতভাবে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিয়া ইউ-কে-আর লিখি। "পরিচয়ে" "ইউ-কে-আর" মুদ্রিত হওয়ার সমসময়ে পূর্বোক্ত সাপ্তাহিকে 'আগুন' প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া আমি বিস্মিত হই। সম্পাদক মহাশয়ের অনবধানতা ক্রমেই এরূপ হইয়াছে বলিয়া মনে হইল। তবুও এই ব্যাপারের জন্য আমি আপনাদের নিকট বিশেষ লজ্জিত হইয়াছি। আশা করি ত্রুটি নিবেন না। ইতি—১৫-১২-'৪৫ ইং

রমেশচন্দ্র সেন